REGISTERED No. C. 192.

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

পঞ্চদশ খণ্ড,—১ম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

বৈশাখ, ১৩২১।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

কৃষক।

সূচীপত্র।

বৈশাখ, ১৩২১ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ খণ্ড। | বৈশাখ, ১৩২১ সাল। | ১ম সংখ্যা।

নারিকেল চাষ

গোলাপ বান্ধব প্রণেতা শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার লিখিত

নারিকেল কোকোনুসিফেরা জাতির অন্তর্গত। নারিকেল গাছ ভারতবর্ষ, সিলোন, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, সিঙ্গাপুর, পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বহুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহা আমাদের উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী। বৈদ্য শাস্ত্রে ইহার বহুবিধ গুণ ও হিতকারিতা উল্লিখিত আছে। লবণাক্ত সরস বেলে জমিতে ইহার চাষ ভাল হয়। ইহার চাষের সম্বন্ধে কৃষক, কৃষি-সম্পদ প্রভৃতি পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু কেহই আমাদের দেশে নারিকেল বৃক্ষের রোগ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। আমি তাহা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। নারিকেল গাছের কোন অংশই বৃথা নষ্ট হয় না। সেই জন্য আমাদের শাস্ত্রের অনুশাসন মতে ইহাকে পক্ষীরাজ্যের শুখ পাখীর মত উদ্ভিদ্ রাজ্যে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনা করা হয় এবং একটি নারিকেল গাছ ছেদনে বহুবিধ প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ আছে।

নারিকেল গাছের পাতা হইতে শিকড় পর্য্যন্ত আমাদের প্রয়োজনে লাগে বলিয়া আমাদের দেশে নারিকেলের এত আদর। আফ্রিকা দেশে এক প্রকার নারিকেল ফল জন্মায় তাহা ডবল। বিলাতি ভাষায় তাহাকে "কোকোডিমার্" বলে। ইহা "লোডোইসিয়া সিচেলেরাম্ জাতীয় পামের অন্তর্গত। ইহা ভারতমহাসাগরের সিসেলিস্ দ্বীপপুঞ্জে বহুল জন্মায়। পূর্ব্ব আফ্রিকার সমুদ্রতীর দেশ হইতে উগাণ্ডা প্রদেশ পর্য্যন্ত এই পাম বা তালজাতীয় বৃক্ষ বহুল জন্মিয়া থাকে। দশবৎসরে ইহার ফল ধরে ও তখন মনুষ্যের খাদ্যোপযোগী হয়। ইহা

ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার, লুসিয়া, কলম্বিয়া প্রভৃতি দেশে বহু প্রকার তাল ও নারিকেল বৃক্ষ জন্মায়। এক প্রকার নারিকেল হইতে প্রাইস্ কোম্পানীর মোমবাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পশ্চিম ও পূর্ব ভারত দ্বীপপুঞ্জের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে ও এব, সেলিবিস্ সুমাত্রা, বালি, সিঙ্গাপুর ও ভারত উপকূলস্থ স্থান সমূহে যে নারিকেল গাছ জন্মায় তাহাতে নারিকেল তৈল প্রস্তুত হয়। সহস্র সহস্র টন নারিকেল বিলাত ও জার্ম্মেনী দেশে রপ্তানী হইয়া নারিকেল ননী (butter) এবং কোকোনাটীন নামক অতীব পুষ্টিকর সুখাদ্য প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এত নারিকেল হয় কিন্তু তাহা হইতে এক খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে নারিকেল তৈল, রসকরা, নারিকেল চিড়া প্রভৃতি ছাড়া অপর কোন রূপ পুষ্টিকর খাদ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে আমরা প্রস্তুত করিতে পারি না। আমাদের দেশ হইতে শ্রদ্ধাস্পদ রায় যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের চেষ্টা ও উদ্যোগে প্রতিবৎসর শত শত বালক বিদেশ যাত্রা করিতেছে কিন্তু এই সকল আবশ্যকীয় এবং জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষার জন্য কৃষককুল হইতে কেহই বিদেশে যায় না।

নারিকেল গাছে অনেক প্রকার রোগ ধরে। তাহার মধ্যে গোড়ায় পোকা ধরা, ক্ষত স্থান হইতে কাল গুঁড়া বাহির হওয়া, গুঁড়ী হইতে লাল আটাযুক্ত রস বাহির হওয়া, পাতা কোঁকড়ান, পাতার গোড়াতে বা বালদোতে পোকা ধরা, পাতায় পোকা ধরা, মাজে পোকা ধরা, বালদোর গোড়ায় পোকা ধরা, মাজ শুখাইয়া যাওয়া, এই রোগ গুলাই প্রধান। লঙ্কা, যাবা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই সব রোগের প্রসার দেখিয়া অধ্যাপক এইচ এ টেম্ পানি, টি জ্যাক্সন (আন্টিকোয়া) জেম্‌স্, চার্চ, মোরার (ত্রিনিদাদ), জন্‌সন্, ষ্টকডেল্, এফ্ ডাব্লু, উরিক্, টি, পেচ্, জার্ডিন্, প্রভৃতি প্রথিতনামা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ নারিকেল গাছের যাবতীয় রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশই পুস্তক পাওয়া যায় না। আমি বাল্যকালে তাঁহাদের পুস্তক পড়িয়া নিজেদের নারিকেল বাগানের ও অপরাপর বন্ধুবর্গের নারিকেল গাছের সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিয়া যাহা জ্ঞাত হইয়াছি তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সাধারণের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিলাম। লঙ্কাদ্বীপের নারিকেল রোগ সম্বন্ধে অধ্যাপক পেচ্ বিস্তারিত পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন কিন্তু ফার্গুসান সাহেবের পুস্তক এবিষয়ে বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। প্রধানতঃ নারিকেলের তিন চারি প্রকার মুখ্য রোগ জন্মায়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ মনোযোগের বিষয়।

১। শিকড়ের রোগ। ইহা অত্যন্ত সংক্রামক এবং গাছকে একবার আক্রমণ করিলে তাহা হইতে উদ্ধার হওয়া বড় দুষ্কর। প্রথমে পাতাতে এই রোগ ধরে,

পাতাগুলা কোঁকড়াইয়া যায়, ও ছেঁদা ছেঁদা হয় পরে হলুদে বর্ণের হইয়া মাঝা মাঝি ভাঙ্গিয়া যায় অথবা কখন কখন বালদোর গোড়া হইতে ভাঙ্গিয়া গিয়া গাছের বহু নিম্ন পর্য্যন্ত ঝুলিতে থাকে। কখন বা মাথির নিম্ন স্তরের পাতায়, কখন বা মাঝের স্তরের পাতার বালুদোর গোড়ায় ধরে। তাহার পর বালুদোর মধ্যে পোকা ধরে, অথবা গাছের মধ্যে পোকা ধরে। গাছের মাজে (Stem) বা গুঁড়ীতে পোকা ধরিলে গাছ হইতে লাল বর্ণের রস নির্গত হইয়া গাছকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে অবশেষে গাছ মরিয়া যায়। এই রোগের আক্রমণ কিছু অগ্রসর হইলে গাছের পাতা শুখাইতে আরম্ভ হয়। গাছের গুঁড়ি ও শিকড়ের উর্দ্ধ কতক দূর পর্য্যন্ত কাল দাগ ধরে এবং টক গন্ধযুক্ত লাল আটার মত রস নির্গত হয়। দেখিলেই বেশ জানা যায় যে গাছে কোন রোগাক্রমণ করিয়াছে। এই রস নির্গত হওয়ায় গাছ অধিকতর নিস্তেজ ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। এই রোগ বীজ (Fungus) ঘটিত এবং শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ গুঁড়ির উপরদিকে উঠে এবং গাছের বর্ণ কাল হয় ও মধ্যে মধ্যে ফাটিয়া লাল লাল দাগ ধরে এবং ঐ দাগের মধ্য হইতে টক গন্ধযুক্ত উপরোক্ত রূপ রস নির্গত হয়। ক্রমশঃ গাছ নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যায়। এই রোগের শেষ অবস্থায় মাথি আক্রমিত হয় এবং মাথিতে ধসা ধরে ও শেষে মাজ পচিয়া গাছ মরিয়া যায়। কখন কখন বা মাথিটি শুখাইয়া গিয়া গাছ মরিয়া যায়। লঙ্কাদ্বীপে এই রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। বৃক্ষের জীবনধারণোপযোগী রসের চলাচল মাটী হইতে না হওয়ায় বা চলাচলের ক্রমিক ব্যতিক্রম ঘটায় গাছের গায়ে লাল দাগ জন্মে বলিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। মৃত বৃক্ষের দেহ পরীক্ষায় বিষাক্ত ও সংক্রামক ছত্রক (Fungus) প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেক সময়ে এই রোগ বালুদোর গোড়ায় ধরে। অনেক সময়ে এই রোগের আক্রমণ গাছের গোড়া বা শিকড় হইতে ধরে। এই সময়ে শিকড় লাল বর্ণের হইয়া দাঁড়ায়। ত্রিনিদাদ দ্বীপের কীটতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক এফ্ ডব্লু, উরিক বলেন যে নারিকেল গাছের শিকড়ে রোগ ধরিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার কঠিন পতঙ্গ (Bettles) গুঁড়িতে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে ডিম পাড়ে এবং ক্রমশই কীটের বংশ বিস্তার হইয়া গাছটিকে ঝাঁঝরা করিয়া শেষে প্রাণে মারিয়া ফেলে। এই কীটের মধ্যে রীনা হার্বিরোস্ট্রীস্ (Rhina Harbirostris) জাতীয় কীট গুলিই কেবল গুঁড়ি আক্রমণ করে। দুর্ব্বল গাছগুলিতেই বেশী কীটকুল আক্রমণ করে। তাহাদের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমি চুণ এবং লবণ ব্যবহার করিয়া বেশ উপকার পাইয়াছি। ফলতঃ নারিকেল গাছের অনেক শত্রু আছে। প্রথমতঃ পিঁপড়াতে গাছকে বড়ই অভিভূত করে। চুণ, গন্ধক ব্রাবণ ১·১৫ মাত্রায় মিশাইয়া গাছের মাথায়

ছিটাইলে অব্যাহতি পাওয়া যায়। আর্সেনেট অব্ লেড্ (Arsenate of lead) ৫ পাউণ্ড ৫০ গ্যালন জলে মিশাইয়া গাছে স্প্রে করিলে বা ছিটাইলে উহারা একেবারে কিছু কালের জন্য অন্তর্হিত হয়। অনেক প্রকারের পোকা নারিকেল গাছের শত্রু হয়। পিঁপড়া ও কতকগুলি কীট এবং নারিকেলের মক্ষি কচি নারিকেল বা নারিকেল মুচি এবং পুষ্পের বিশেষ শত্রু। নারিকেল বৃক্ষের শত্রু কীটাদিকে "ককীডি" (Coeiedea) বলে। অধ্যাপক ডাঃ এস্ প্যাটোইলা বলেন যে এই জাতীয় কীটকুল অপরিপক বীজ জাত গাছ গুলিকেই তাহাদের দুর্ব্বল প্রকৃতি বশতঃ আক্রমণ ও নষ্ট করিতে সমর্থ হয়। ৩.৪ মাসে এই রোগাক্রান্ত গাছ মরিয়া যায় এবং মৃত গাছের চতুর্দ্দিকে অপরাপর ভাল গাছগুলিকেও শেষে এই রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায়। সেই জন্য রোগা গাছকে শিকড় শুদ্ধ তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য এবং মাটিতে অগ্নি ধরাইয়া দিয়া পরে চুণ ও গন্ধক সার দিয়া মাটী তাজা ও তেজস্কর করিতে হয়। এই জমীতে কিছু কাল নারিকেল রোপণ বন্ধ করা উচিত। যাহাতে কীটাণুগুলি সমূলে বিনষ্ট হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই রোগের প্রসার বন্ধ করা বড় দুষ্কর কিন্তু রোগাক্রান্ত গাছ নষ্ট, রোগাক্রান্ত ভূমি বর্জ্জন, তাহা কিছুকাল ফেলিয়া রাখা এবং উপরোক্ত সার প্রয়োগ, বায়ুর চলাচল এবং সেচনের সুব্যবস্থা এবং কষ্ট ও রোগ সহিষ্ণু গাছের বীজ রোপণে যে গাছ জন্মায় তাহার চাষ করা ইত্যাদি উপায়ে রোগের প্রসার কতকটা বন্ধ করা যায় কিন্তু দেশ হইতে একেবারে তাড়াইয়া দেওয়া বড় দুষ্কর। রোগা গাছে বোর্দোমিক্শ্চার ও ফেরস্ সালফেটের পিচকারী (Spray) দিয়া বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে। গ্রীণ স্পেনিশ জাতীয় নারিকেল বীজ জাত গাছে এই রোগের আক্রমণ হয় না তাই তাহার গাছ রোপণ করা প্রত্যেক গৃহস্থের উচিত।

কোন কোন ছত্রক রোগ অক্সালিক এসিড, সোডিয়াম হাইড্রেড্ লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড্) কপার সাল্‌ফেট্, ফর্ম্মালীন প্রয়োগে বন্ধ হয়। গাছের শুঁড়ী বা মাজাতে এই রোগ ধরিলে তাহা ফাটিয়া রস গড়ায়। রোগগ্রস্ত গাছের ছাল গুলিকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই রুগ্ন অংশ নিরোগ গাছের নিকট কদাচ ফেলিবে না বরং তাহা পোড়াইয়া ফেলা ভাল। অনেক পাশ্চাত্য অধ্যাপকের মতে রুগ্ন গাছে বোর্দো মিক্শ্চার স্প্রে করা ভাল। কর্ত্তিত স্থানে আল্‌কাতরা দেওয়া অথবা কেরোসিন তৈল দেওয়ায় বেশ সুফল পাওয়া গিয়া থাকে। কোন কোন দেশে এই রোগ থিলাভিয়োপসিস্ জাতীয় ছাতা (fungus) হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই জাতীয় ছত্রক বা ধসা আক গাছ হইতে অর্থাৎ চিনি হইতে বিশেষতঃ উৎপন্ন

হইয়া মিষ্ট ফলে প্রসার লাভ করে। আনারস, আম্র, ইক্ষু, বীট আদি বৃক্ষে ইহার জন্ম এবং আর্দ্র ও অন্ধকারযুক্ত স্থানেই বেশী বৃদ্ধি লাভ করে। রস পড়া রোগ, পত্র রোগের অন্তর্গত। রুগ্ন গাছের ছাল, পোকা বা পিঁপড়ার দ্বারায় অপর ভাল গাছে নীত হয়। ছোবড়ার কারখানা হইতেও এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য অধ্যাপক অনুমান করেন; কিন্তু পরে প্রমাণ হইয়াছে যে ছোবড়া বা কয়ারের কারখানা হইতে এই রোগের প্রসার হয় না। ফাটিয়া রস গড়ান রোগ রসাধিক্যেও হইতে পারে এবং অনেক স্থানে গাছে বজ্রাঘাত বা অগ্নি দগ্ধ হইলে এইরূপ হয়। গাছের গুঁড়িতে ছিদ্র করিয়া দিয়া গোড়ায় সার দিলে অনেক স্থলে উপকার পাওয়া যায়। রুগ্ন গাছের পক্ষে সার উপকারক বলিয়াছি। তাহা বলিয়া অত্যধিক নাইট্রোজেন ঘটিত সার গাছে প্রয়োগ করা কদাচ সমীচীন নহে।

আমাদের দেশে তাড়ির জন্য নারিকেল গাছ কদাচ কাটা হয় না। কিন্তু জাভা, সিলোন, পূর্ব্ব উপকুলস্থ দ্বীপপুঞ্জ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, কিউবা, জামেকা প্রভৃতি স্থানে তাড়ির জন্য নারিকেল গাছ কাটা বহুল প্রচলিত আছে। কচি বা যুবা গাছের মুচি কাটিয়া তাড়ি বাহির করার প্রথা লঙ্কাদ্বীপে খুব বেশী প্রচলিত আছে। এই রস হইতে গুড়ও প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই গুড়ের গ্লুকোস্ হইতে সার চিনি লইয়া অবশিষ্টাংশ হইতে পাশ্চাত্যদেশে বিশেষতঃ আফ্রিকা ও আমেরিকার উপকুলস্থ দেশ সমূহে পশুখাদ্য প্রস্তুত হইয়া বিশেষ লাভের কারবার হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীগণের এমনই অদ্ভুত আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা (inventive genius) এবং এই ক্ষমতাটি বর্ত্তমান রসায়ন বিদ্যার উন্নতিতে এতই প্রসারিত হইয়াছে যে, কাঠের গুঁড়া হইতে বাষ্পের উত্তাপ প্রয়োগে পশুখাদ্যের সরবরাহ হইতেছে। তাড়িকাটা গাছে ধসা ধরিতে পারে না বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দেশে নারিকেলের মাঝা পচা রোগে কোন কোন কৃষক গাছের মাথিতে গুড় ঢালিয়া দিয়া পিপীলিকা আনাইয়া কীটের ধ্বংস করাইয়া থাকেন, ইহাও মন্দ উপায় নহে। কোন কোন স্থানে রুগ্ন বৃক্ষের গোড়ায় হাঁড়িতে করিয়া খুব তীব্র খইল জলে ভিজাইয়া রাখা হয়। ইহাতে কীটগুলি খইলের আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দেয়। আমি এই উপায়ে আমার এক স্থানের ৩৫টি গাছের মধ্যে ৬টি আক্রান্ত গাছকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। কখন কখন কাইনিটের থলি গাছের মাথায় ঝুলাইয়া দেওয়া হয় কিন্তু কাইনিটের প্রয়োগও তত সুবিধা জনক নহে। চুণ, গন্ধক এবং তুঁতে চুর্ণ নারিকেল তৈলে মলমের মত করিয়া কর্ত্তিত ছালে বা গর্ত্তে প্রয়োগ করিলে ছত্রকের প্রসার বন্ধ করা যাইতে পারে। এই সব রোগ বঙ্গদেশে আগে

ছিল না কিন্তু এখন ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, হাবড়া ও ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার কোন কোন গাছে আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়।

"লবণ সার নারিকেলে বিশেষ উপকারী। যেমন সাল্‌ফেট্‌ পটাস্‌, ম্যাগনিসাল্‌ফ্‌ এবং লবণ ঘটিত সারে প্রধান পশুখাদ্য ম্যানগেল্‌ উরগেল (mongel worzel) কন্দের চাষে বিশেষ উপকার হয় সেই রূপ ঐ উপাদানগুলি বিশেষতঃ লবণ সারে নারিকেল গাছের বিশেষ উপকার দর্শে। খনার বচনানুসারে নারিকেল গাছের গোড়ায় ছায়ের সার দেওয়া খুব ভাল। ইহাতে গাছ বাড়ে, তেজস্কর হয় এবং পোকা ধরা বন্ধ হয়। সময়ে সময়ে সামান্য লবণ এবং চুণ মিশাইয়া দিলেও মন্দ হয় না। নারিকেল গাছের পক্ষে এই সারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নারিকেলের চাষ সম্বন্ধে জার্ম্মানিদেশ হইতে ওল্‌সার শেফার, ফিলেপাইন দ্বীপ হইতে তথাকার প্রধান অধ্যাপক মিঃ ডবলিউ, এস্‌, লিওন (W. S. Lyon) কৃষি ব্যুরো হইতে ৮ নম্বর ফার্ম্মার বুলেটীনে, মাদাগাস্কার হইতে এম্‌, এ, ফাউশেয়ার (M. A. Fauchere) ১৯০৭ সালের এপ্রেল মাহার ট্রপিকাল এগ্রিকালচারাল জার্ণালে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছেন। ফার্গুসান সাহেবের "কোকো-প্ল্যান্টার্স ম্যানুয়েল" প্রত্যেক নারিকেল চাষীর পাঠ করা কর্ত্তব্য। লবণাক্ত জমীতেই যে নারিকেল গাছ জন্মে এরূপ কোন কথাই নাই। লবণ সার যে একান্ত প্রয়োজন তাহা বলা যায় না, কিন্তু দিলে মন্দ হয় না। তিনি লঙ্কাদ্বীপের নারিকেল চাষ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। জমি যদি সারহীন থাকে তাহা হইলে তুঁষ, ছাই ও লবণ দিলে ভাল নারিকেল গাছ চাষোপযোগী মাটী প্রস্তুত হইতে পারে।

২। পাতার রোগ—(Leaf disease)—এই রোগ সাধারণতঃ নারিকেল গাছের পাতায় আক্রমণ করে। এই রোগ হইলে গাছের পাতায় পাঁশুটে রঙের পরিবর্ত্তে হরিদ্রাভ রঙ ধরে এবং পাতা এরূপ ঝাঁঝরা হয়ে যায় যে মাঝামাঝি বা অর্দ্ধেক হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়া গাছের চতুর্দ্দিকে ঝুলিতে থাকে। বেশী রোগাক্রান্ত হইলে গাছের মাজ সোজা দাঁড়াইয়া থাকে বটে, কিন্তু সকল পাতা পোকা ধরিয়া নষ্ট হওয়ায় গাছ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া শেষে মাজটি শুখাইয়া গিয়া ৪।৫ বা ৬ মাসের মধ্যে গাছটি মরিয়া যায়। যবদ্বীপে এইরূপ পাতার রোগ ডাঃ চার্লস বার্ণার্ড (Dr. Charles Bernard) আবিষ্কার করিয়া অতি আবশ্যকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে এই রোগ পেষ্টালোজিয়া পামারুমা (Pestalozzia Palmaruma) জাতীয় ফাঙ্গাস বা মধুরিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিউবা দ্বীপের নারিকেল গাছেও এইরূপ রোগ এই ফাঙ্গাস জাতি হইতে ধরে বলিয়া তথাকার কীট তত্ত্ববিৎ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন।

এই রোগ ধরিলে গাছের উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস হয়, ফুল কম হয় এবং ফল ক্ষুদ্রতর হইয়া থাকে। বহু পরীক্ষা অনুসন্ধানের পর ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে পাতা আক্রমণ কারী মধুরিকা অপর মধুরিকা অপেক্ষা দুর্ব্বল (weak parasite) এবং গাছগুলিকে স্বাস্থ্যাবস্থায় রাখিলে বড় হানি করিতে সমর্থ হয় না। ইক্ষুগাছের ফাঙ্গাস নারিকেল গাছকে অভিভূত করে। এই রোগ যে গাছকে ধরে তাহাতে রাইনো বীট্‌ল্‌ নামক একপ্রকার পোকাও ধরে। ইহাদের আক্রমণ বড়ই তীব্র। তাহার হাত এড়াইবার জন্য কেরোসিন ইমালসন বা বোর্দো মিক্‌শ্চার ছিটান খুব প্রকৃষ্ট।

৩। মুচি পড়া (Budro) রোগ লাগিলে গাছের পক্ষে বড়ই মারাত্মক। এই রোগ ধরিলে গাছের মুচি পচিয়া গিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, পরে মাথিতে পোকা ধরিয়া মাজ কাটিয়া নষ্ট করে, শেষে গাছটি মরিয়া যায়। মরণের পূর্ব্বে মাথিটা ক্রমশঃ হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে, পরে গাছটি মরিয়া যায়। এই রোগ বড়ই সংক্রামক এবং অধিক অনিষ্টকারক সেই জন্য রুগ্ন গাছের ছাল, মাথি, বাকল, পাতাদি সব ভাল করিয়া পোড়াইয়া এই রোগের প্রসার বন্ধ করিবে; এবং গাছের শিকড়াদি তুলিয়া সেই স্থানে গন্ধক ও চূণ দিয়া কিছু কাল ফেলিয়া রাখিবে।

নারিকেল (COCOO NUCIFERA, LINN.)

উদ্যান তত্ত্ববিদ্ শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত

এমন একটি ফল যে ইহার জন্মস্থান ও জন্ম বৃত্তান্ত জানিতে সকলেই উৎসুক। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ইহার নিজ আবাস ভূমি। সেখান হইতে ইহা ভারতে ও অন্যত্র নীত হইয়াছে। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপবাসীর নিকট পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক ভাস্কোডিগামা ইহার পরিচয় দেন। ইউরোপীয়গণ ইহাকে Indian Nut বলিয়া জানিতেন। নারিকেলের, মুখের মত আকৃতি বলিয়া ইহার পর্ত্তুগীজ ভাষায় নাম দেওয়া হয় Cocoo, a face, কোকো অর্থে মুখ বুঝায়।

নারিকেলের জন্ম প্রশান্তমহাসাগর উপকূলে হইলেও সুপক্ক শুষ্ক ঝুনা নারিকেল সমুদ্রের তরঙ্গে পড়িয়া বাতাসে চালিত হইয়া অন্যান্য সমুদ্র তটে নীত হইয়াছে এবং তথায় আশ্রয় স্থান পাইয়া গাছ জন্মিয়াছে।

নারিকেলের গাছগুলি দেখিতে প্রায়ই এক রকম। প্রত্যেক গাছের প্রকৃতি গত ও শরীর গঠনগত পার্থক্য থাকিলেও মানুষে স্বাভাবিক চক্ষে তাহা ধরিতে পারে

না। নারিকেল গাছের কাণ্ডগুলি প্রায় সোজা উঠিতে দেখা যায় না, কিছু উচ্চ হইয়াই বাঁকিয়া যায়। নারিকেল গাছের শাখা বাহির হইতে কদাচিত দেখা যায়। কিন্তু ফিজি দ্বীপপুঞ্জে তিন মাথা কিম্বা ৭ মাথা বিশিষ্ট নারিকেল দেখা গিয়াছে। বাঙলা দেশে আমরা তিন, চারি, দশ কিম্বা বার মাথা খেঁজুর গাছ দেখিয়াছি। কিন্তু অধিক মাথা বিশিষ্ট নারিকেল গাছ ভারতে প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু আমি কৃষকের সহকারী সম্পাদকের বাগানে দুই মাথা বিশিষ্ট নারিকেল বৃক্ষ দেখিয়াছি। বোধ হয় মাথায় কোন প্রকার আঘাত পাইয়া কিম্বা কীটাক্রান্ত হইয়া নারিকেল জাতীয় পাম এই প্রকার একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়। ফিজি দ্বীপে নারিকেল বৃক্ষের শাখা নির্গমের এই কারণও হইতে পারে।

সাত মাথা বিশিষ্ট নারিকেল বৃক্ষ

অনেক জাতীয় নারিকেল আছে। সিংহলের নারিকেল এত বড় যে তাহার মধ্যে আড়াই তিন সের জল ধরে। এক প্রকার লম্বা নারিকেল আছে, যে তাহার ছোবড়া ছাড়াইলেও দীর্ঘে তাহার পরিমাণ ১ ফুট, ১॥ ফুটের অধিক হয়। ভারতের সন্ন্যাসী ফকীরগণ তাহার খোলের অর্দ্ধেকটা লইয়া পানিপাত্র প্রস্তুত করে। অপেক্ষাকৃত ছোট নিরস গুগাল নারিকেল খোলে তামাকু ধূম পান করিবার হুঁকা প্রস্তুত হয়।

এখানকার নারিকেল ছোট। ফ্রেণ্ড্লি দ্বীপে সম্রান্ত ও ভদ্র ব্যক্তিগণ নারিকেল জল পান করিয়া থাকেন। এখানকার নারিকেল ছোট। নারিকেলের অন্য ব্যবহার তথায় জানা নাই। নারিকেলের ছোব্ড়া বর্ত্তুলাকারে কাটিয়া লইয়া ঐ দ্বীপবাসীগণ পাত্র সম্মার্জ্জনী প্রস্তুত করেন। তথায় নারিকেলের এই দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহার দেখা যায়।

ফিজি দ্বীপের নারিকেল বৃক্ষ

নারিকেল গাছের পাতার, নারিকেলের জলের, নারিকেলের শাঁসের, নারিকেলের ছোব্ড়ার ব্যবহার ভারতে অবিদিত নাই। ইউরোপীয়গণ যখন প্রথমে প্রশান্ত মহাসাগর স্থিত দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হন, বিস্তৃত ইক্ষু ক্ষেত্রের পাশে ছোট বড় নারিকেল গাছগুলির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। সিংহলে তাঁহারা দেখিতে পান যে, নারিকেলের মুচী কাটিয়া খেজুর গাছের মত রস বাহির করা হইতেছে, সেই রস হইতে তাহারা তাড়ী ও গুড় তৈয়ারি করে। নারিকেলের শাঁস হইতে তৈল বাহির করিতেও তাঁহারা দেখিয়াছিলেন। যাঁহারা ব্যবসায়ী, তাঁহারা এতদ্দেশে সমুদ্র তল হইতে মুক্তা ঝিণুক খুঁজিতে লাগিলেন এবং স্থল হইতে নারিকেল তৈল চালান দিতে লাগিলেন।

সরকারী কৃষি সংবাদ

আলুর কাল ধসা রোগে বোর্দোঁ মিশ্রণ

শ্রীযুত এ, এল, সোম ছত্রক তত্ত্ববিদ্ (ঢাকা) লিখিত

আলুর কালা রোগ পাহাড়েই অধিক হয়। এক্ষণে এই রোগ নিম্নতর প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রঙপুর জেলায় ইহার প্রকোপ সমধিক দৃষ্ট হয়।

মানুষের হাম বসন্তের মত ইহাও ছোঁয়াচে রোগ। এই রোগের বীজ বাতাসে, বৃষ্টির জলে ও জন্তু প্রভৃতি দ্বারা একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়।

রোগের প্রথম লক্ষণ পাতাতে দেখা যায়। পাতাতে পাটকিলা রঙের দাগ হয়। দাগগুলি ক্রমশঃ পরিসরে বাড়িতে থাকে এবং পাতা কোঁকড়াইয়া যায়। রোগ কঠিন হইলে পাতা এবং ডাঁটা কাল হইয়া যায়, অল্পদিনের মধ্যেই গাছ মরিয়া যায় এবং গাছগুলি হইতে একটা দুর্গন্ধ বাহির হয়। আলুতেও দাগ ধরে। দাগধরা আলু কাটিলে পাটকিলা ও কালরঙের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই আলু রাখিয়া দিলে পচিয়া যায়। দাগী আলু রাঁধিলে সিদ্ধ হয় না এবং তাহা খাওয়া যায় না।

পাতার ভিতর পিঠে যে দাগ থাকে তাহার মধ্যে সূত্রবৎ শাদা রেখা দৃষ্ট হয়। এই সূত্রগুলির উক্ত ছত্রক রোগের শাখা প্রশাখা। ইহাদের অগ্রভাগে রোগের বীজাণু থাকে। সেই বীজাণু গুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত শাদা চোখে দেখা যায় না।

রোগের প্রতিকার—

নীরোগ বীজ আলু লইয়া চাষ করিতে হইবে। রোগ-দুষ্ট ক্ষেতের বীজ আলু চাষের জন্য কদাচ ব্যবহার করিবে না। এই আলুগুলি দৃশ্যতঃ ভাল বোধ হইলেও ইহাদের ভিতর রোগের বীজাণু লুকাইয়া থাকিতে পারে এবং এক দুই বৎসরে নষ্ট হয় না। প্রতি বৎসর এক ক্ষেতে আলু চাষ না করা ভাল।

রোগের সামান্য চিহ্ন প্রকাশ পাইবা মাত্র আলু ক্ষেতে বোর্দোঁ মিশ্রণের পিচকারী দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে রোগ সম্পূর্ণ সারিয়া না গেলেও, আর ততটা অনিষ্ট হইতে পারে না। কতকটা ফসল পাওয়া যায়। রোগের চিহ্ন দেখা না গেলেও বোর্দোঁ মিশ্রণ ব্যবহার করা ভাল, কেন না ইহাতে রোগাক্রমণ নিবারিত হইবে এবং ইহা সারের মত ফসল বাড়াইবে।

বোর্দোঁ মিশ্রণ প্রস্তুত প্রণালী—

একটি মাটির গামলায় ১ মণ জল রাখিবে। তাহা হইতে ৫ সের জল লইয়া অন্য পাত্রে রাখ এবং তাহাতে ৮ ছটাক তুঁতে (Copper

Sulphate) ফেলিয়া দাও। তুঁতে গলিয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইবে। অন্য একটি পাত্রে ৬ ছটাক সদ্য দগ্ধ চুণা পাথর (যে পাথর পুড়াইয়া তাহাতে জল পড়ে নাই) রাখিয়া তাহাতে জল দাও। উহা গলিয়া তরল লেইয়ের * মত হইবে। অতঃপর ইহাতে ৫ সের জল দিয়া গুলিয়া পাত্‌লা করিয়া লইতে হইবে। এই বার তুঁতের জল ও চুণের জল বড় গামলার জলে ঢালিয়া দিয়া অনবরত নাড়িয়া মিশাইয়া লও। চুণের গোলা গামছায় ছেঁকিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এই কার্য্যের জন্য মাটির গামলা ব্যতীত অন্য গামলা ব্যবহার করা অনুচিত। মিশ্রণটি কয়েক মিনিট ঠাণ্ডা হইতে দিলে দেখিবে যে তাহার তলায় ঈষৎ নীলাভ শাদা গুঁড়া পড়িয়াছে।

মিশ্রণ পরীক্ষা—

এক খানি ছুরির ডগা এই মিশ্রণে ডুবাইয়া যদি দেখ যে তাহাতে তামার কস্ লাগিয়াছে তবে জানিবে যে, মিশ্রণটি ঠিক মত হয় নাই তাহাতে আরও চুণ মিশাইতে হইবে। যদি কোন দাগ না লাগে তবে কার্য্য ঠিক হইয়াছে।

ব্যবহার—

এক বিঘাতে ছড়াইবার জন্য সাধারণতঃ ৩ মণ মিশ্রণ যথেষ্ট। দিবাভাগে মিশ্রণ ছড়ান আবশ্যক।

রোগের বৃদ্ধি দেখিলে ১৫ দিন বা ২১ দিন অন্তর ক্রমান্বয়ে ৩ বার ছড়ান আবশ্যক। বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে সে দিন মিশ্রণ ছড়ান উচিত নহে। কেননা জলে ধুইয়া গেলে কোন কাজ হয় না।

ছড়াইবার যন্ত্র—

ইহাকে স্প্রেয়ার বলে ; ইহাতে মিশ্রণ পুরিয়া মাটিতে রাখিয়া পিচকারির মত পম্প করিলে ক্ষেতের অনেক দূর পর্য্যন্ত ছিটান যায়। পৃষ্ঠে লইয়াও কাজ করা যায়। ইহাতে ২০ সের জল ধরে, দাম ৬০ টাকা। ইহাকে সক্‌সেস্ ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার বলে।

বকেট পম্প—

এক প্রকার বাল্‌তি কল। সাধারণ লোহার কলাই বাল্‌তি বা কেরোসিন টিন লইয়া কাজ সারা যায়। ইহাতে জল রাখিয়া দু-নলা পিচকারী দ্বারা পম্প করিলে কাজ হয়। পিচকারীর দাম ১৪৲ টাকা। তবে ন্যাপস্যাক

---

* লেইয়ের মত—কাগজ জুড়িবার ময়দার আটার মত।

স্প্রেয়ারে অপেক্ষাকৃত বেশী কাজ হয়। ইহাদ্বারা এক দিনে দুই একর জমিতে জল ছিটান যায় এবং ১৫ ফিট উচ্চ গাছের মাথা গুলিও ইহাদ্বারা ধৌত করা যায়। পিচকারীর মুখ যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশিষ্ট হইবে তত সরুধারে বাষ্পাকারে জল পড়িবে।

যন্ত্র পাইবার ঠিকানা—

মেঃ উইলকিন্‌স্‌ন হেউড, ক্লার্ক এণ্ড কোং লিমিটেড্, ওরিয়েণ্টাল বিল্‌ডিং, ফোর্ট বোম্বাই।

Messrs Wilkinson, Heywood, Clark & Co. Ltd., Oriental Buildings, Fort Bombay.

আমাদের মতে বিলাতী এক প্রকার দুই মুখ বিশিষ্ট পিচকারী আছে তাহাতে আলু ক্ষেতে পিচকারী দেওয়া, গাছের চূড়ায় ও গাত্রে জল ছিটান চলে। এক প্রান্ত কোন জলপূর্ণ পাত্রে স্থাপন করিয়া, পম্প করিলে অপর মুখ দিয়া বাষ্পাকারে জল বাহির হইতে থাকে। এই মুখটি রবারের নল দ্বারা পম্পের গাত্রে সংলগ্ন থাকে। ইহা বেশ মজবুত, ইহার দাম অধিক নহে, ১০৲ হইতে ১২৲ টাকা। ভারতীয় কৃষি-সমিতি তাহাদের স্ব-ক্ষেত্রে এবং চারা বাগানে ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন। কৃঃ সঃ।

বৈশাখ, ১৩২১ সাল।

ভারতীয় কৃষি।

জগতের প্রধান প্রধান সুসভ্য দেশ সমূহের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে ভারতে কৃষি-জীবির সংখ্যা যেরূপ দৃষ্ট হয় অন্য কুত্রাপি সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এতদ্দেশে ইংরাজ রাজের আগমনে সামাজিক ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বহুল পরিবর্ত্তণ সংঘটিত হইলেও ভারতের জন সাধারণ সেই সুবিপুল জন-সংঘ যাহারা রাজ সরকারের প্রধান প্রাণ কেন্দ্র হইতে বহুদূরে বাস করে তাহারা দুই শতাব্দী পূর্ব্বে যে স্থানে ছিল আজও সেই স্থানে আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৯০১ সালে ভারতের জন সংখ্যা ছিল ২৯ কোটি ৪২ লক্ষ। তাহার মধ্যে ১৯ কোটি ৫৭ লক্ষ লোকের জীবিকার উপায় কৃষি। আবার এই সংখ্যার সহিত যদি ১ কোটি ৭৫ লক্ষ মজুরের সংখ্যা যোগ করা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে মোট জন সংখ্যার ⅔ ভাগের উপর লোক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য জমির উপর নির্ভর করে। উক্ত বৎসরে ব্যবসা বাণিজ্যে এবং শ্রমশিল্পে যথাক্রমে শতকরা ৩ ভাগ ও ১৫ ভাগ লোক নিযুক্ত ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিতেছেন ভারতে কৃষি কার্য্যের প্রাধান্য কত অধিক। ১৯১১ সালের আদম সুমারীতে লোক সংখ্যা ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার সহিত অবশ্য কৃষি-জীবির সংখ্যাও আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কাল ক্রমে জমির উপর অধিকতর চাপ পড়িতেছে কিন্তু তাহার সহিত উৎপাদনী শক্তিও কি বাড়িতেছে? ইহা একটি বিশেষ চিন্তার বিষয়।

সার ও জল এই দুইটিই ফসল উৎপাদনের প্রধান সহায়। আমাদের দেশে এই দুইটিরই জন্য কৃষক অনেকটা দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

যদি জমিতে স্বভাবতঃ সার থাকে ত ভালই, তাহা না হইলে নদীর পলি, গ্রামের আবর্জ্জনা ও গৃহ পালিত পশ্বাদির মল মূত্র এই সমুদয়ই প্রধান অবলম্বন। অন্তদিকে জলের জন্ম এখনও আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে। এক পসলা বারিপাতের তারতম্যে এখনও ভারত গবর্ণমেণ্টের মহামান্ত অর্থ সচীব হইতে কুটীরবাসী অনশন ক্লিষ্ট সামান্ত কৃষকের সমস্ত মতলব ও হিসাব উল্টা পাল্টা হইয়া যায়। সুতরাং জল সম্বন্ধে কৃষক যাহাতে দৈবের হস্ত হইতে কতক পরিমাণে রক্ষা পাইতে পারে তাহার কি ব্যবস্থা হইতেছে তাহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়।

কৃষি-বিষয়ক অঙ্কাদি হইতে দৃষ্ট হয় যে ১৯১১-১২ সালে মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ২১ কোটি ৫৯ লক্ষ একর ছিল তন্মধ্যে কেবল মাত্র ৪ কোটি ৬ লক্ষ একরে জল সেচনের বন্দোবস্ত ছিল। অর্থাৎ কর্ষিত জমির শত করা ১৮ ভাগ জমি জলের জন্ম শুধু দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে নাই। এতদ্দেশে কৃত্রিম উপায়ে জল প্রয়োগের প্রধান উপায় সরকারী ও বেসরকারী খাল, পুষ্করিণী এবং কূপ। এতদ্ভিন্ন অন্ত উপায়ও আছে কিন্তু এই কয়টিই প্রধান। নিম্ন প্রদত্ত তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে, ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে বিভিন্ন উপায়ে কি পরিমাণ জমিতে জল সেচন হইয়া থাকে। সিঞ্চিত জমির পরিমাণ ধরিতে গেলে পঞ্জাবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষক সমাজের উন্নতির হিসাবে বিবেচনা করিতে গেলে পঞ্জাবে খাল বসতি (Canal Colony) যেরূপ অর্থশালী ও উন্নতিশীল হইয়াছে সেরূপ অন্ত দেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

ক্রমিক নং	প্রদেশের নাম	কর্ষিত জমির পরিমাণ	জল সিঞ্চিত জমির পরিমাণ					
			সরকারী খাল	বে সরকারী খাল	পুষ্করিণী	কূপ	অন্যান্য	মোট
১	উত্তরব্রহ্ম	৪৬২০১২৯	৪১৯৭৯২	২০৪৪৮৪	১৩৫৭৮৬	৮১০৪	৮০৯৪৮	৮৪৯,০১৪
২	নিম্নব্রহ্ম	৮৭১৯৭৮৭	৩৯৬	২১৭৯০	৩৫০৫	২২১৮	৭৮৭২৯	১০৬,৬৩৮
৩	আসাম	৫৭১১৬৯৮	৯৭৮	১১৯০৯৩			১৯৬৬১৭	৩১৬,৬৮৪
৪	বঙ্গ	২৪৯৩১১০০	১১১৩২৩	২৪৪৩৮১	৭৮১০৪	২০৭৭৩	৫৬৫২৬২	১,৬৫৯,৮৪৩
৫	বিহার ও উড়িষ্যা	২৭৫৫৬৩০০	৭৯৭৬৭৯	৩৩৪৪৫৫	৬২৮৮৯৪	৬২৫৮৫৮	১৪৫৮০৮৩	৩,৮৪৪,৯৬০
৬	আগরা	২৬৩৯০৬১৮	১৯৭১৩৩৩	২০৫২১	৪৮৫৫৫	২৯৭৪৮৪৩	১৩০৮৩৭৮	৬,৩২৩,৬৩০
৭	অযোধ্যা	৯২০০০৯৩				৮৯৯৯৪০	৭১২৫৪৪	১,৬১২,৪৮৫
৮	আজমীর মাড়বার	২২০১৭৫			২৫১৩৪	৯১১৯০	৫১	১১৬,৩৭৫
৯	পরগণা মানপুর	৭১৮৮				১৩৩		১৩৩
১০	পাঞ্জাব	২২২৫৭০৫৩	৬৯৮৪৪৩৯	৪২০০০২	৭৪৩৫	৩৪২০৪৪৪	১৪২১৮২	১০,৯১৪,৬০২
১১	উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	২২৮৪৫৯৪০	২২১০৮৭	৪৩৯৩৪৪		৮৮৯১৩	৯৭২৭৩	৮৪৬,৬১৭
১২	সিন্ধু	২৯৪০৯৩৮	২৬৩৬৮৪৫	৬৬৯৩৯		৪৬৬৮৫	১৩৪০৯২	২,৮৮৪,৫৬১
১৩	বোম্বাই	২২৯০৬১২৭	১৪৬৭০৫	১৫৯৩৬	৫৮২৫৬	৬৯৬৩৬৫	৮৭৯২০	১,০০৫,১৮২
১৪	মধ্যপ্রদেশ	১৭৯৬৮৮৮৬	১২৮১৩	১৮৭৯	৪২৭৭০৮	৫৮৭৯৬	২৩১৮৫	৫২৪,৪৪১
১৫	বেরার	৭০৫৭৪১৪			২৩৮	৩১৮৮২	৫২১	৩২,৬৪১
১৬	মাদ্রাজ	৩৩০৬৮৪০৯	৩৫৩৪৮২৭	১১৯৬০৪	৩২৯৮৬৮৬	১৪৪২২৮০	১১৩১৪৮২	৯,৫৮৬,৮৭৪
১৭	কুর্গ	১৪১২২৪	২৬১০		১৮৪০			৪,৪৫০
মোট		২১৫৯৮১৬৮৩	১৬,৮২০,৮২৭	২০,৬৮,৪২৮	৫৬,৬৪,২০০	১০,৪০৮,৪২৪	৬০,১৭,৬৬৪	৪০,৬৭৯,১৪২

জল সেচন সম্বন্ধে যে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই এবং ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৭-৮ সালে সিঞ্চিত জমির পরিমাণ ৩৯,৯১৩,৫৭১ একর ছিল। পঞ্জাব ব্যতীত সিন্ধু প্রদেশ ও মান্দ্রাজেও জল সেচন বিষয়ে অনেকটা উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। জল সেচনের অবশ্য প্রধান উপায় খাল। তন্নিম্নে কূপ এবং তাহার পর পুষ্করিণী। অন্তবিধ উপায়ের কথা আমরা বলিতেছি না। পুষ্করিণী অপেক্ষা কূপ হইতে কৃষি কার্য্যের জন্য যে অধিক পরিমাণ জল পাওয়া যায় তাহা শুনিলে এতদ্দেশে অনেকে আশ্চর্য্য হইতে পারেন কিন্তু ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক যে বঙ্গ, মান্দ্রাজ ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশ ভিন্ন অন্য কোথাও স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত কৃষি-কার্য্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ফলতঃ প্রাকৃতিক জল প্রপাত ভিন্ন অন্য উপায়ে আমাদের রাজ সরকার আমাদের কৃষি-কার্য্যের বারি প্রাপ্তি সম্বন্ধে কি সাহায্য করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিতে গেলে দেখিতেই পাওয়া যায় যে বিগত পাঁচ বৎসরে এতৎ বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু সার সম্বন্ধে তাহা বলিতে পারা যায় না। এখনও এতদ্দেশে গো মহিষাদির মলমূত্রই প্রধান সার। অপরাপর যে সমুদয় সার পরীক্ষিত হইয়াছে কিম্বা হইতেছে তৎ সমুদয়ের মধ্যে কোনটিই সাধারণ কৃষক মণ্ডলীর ব্যবহারোপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। উক্ত সার সমূহের মধ্যে কতকগুলির প্রচলন অধিকতর ব্যয় সাপেক্ষ এবং অন্য কতকগুলি পূর্ণ মাত্রায় উদ্ভিদ খাদ্য সরবরাহ করে না।

সার ও জল, কৃষির এই দুইটি প্রধানতম সহায় বাদ দিয়া অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতীয় এবং প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগ সমূহ বিশেষ বিশেষ ফসলের উন্নতি কল্পে কতিপয় পরীক্ষার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পূর্ব্বোপেক্ষা কৃষি-কার্যের উপর রাজ সরকার অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছেন। ১৯১১-১২ সালে কৃষি-বিভাগ সমূহের জন্য ৩৪,৯৪,৮২৪ টাকা ব্যয় হয়। তাহার মধ্যে ৪,৪৮,২৩৪টাকা ভারতীয় কৃষি-বিভাগের জন্য এবং বাকি টাকা প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগ সমূহের জন্য। কিন্তু নামে কৃষি-বিভাগ সমূহের জন্য উক্ত টাকা ব্যয় হইলেও কার্য্যতঃ এই খরচের মধ্যে কৃষি ব্যতীত অন্যবিধ খরচ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, সাধারণ পূর্ত্ত কার্যের জন্য যে ৫৯,৫৯৪ টাকা ব্যয় হইয়াছিল তাহাও মোট খরচের মধ্যে ধরা আছে এবং পশু চিকিৎসার বিভাগ স্বতন্ত্র হইলেও উক্ত বিভাগে বাবদ ১৮,০০০ টাকা কৃষি-বিভাগে ধরা হইয়াছে। এইরূপে কৃষি-বিভাগের টাকা হইতে অপরাপর খরচও যে না হয় এমন নহে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মুক্তেশ্বরের জীবাণু তত্ত্বানুসন্ধানাগারে বাৎসরিক যে ২ লক্ষ ৬ হাজার টাকা খরচ হয়, তাহাও কৃষি-বিভাগের খরচের সহিত যোগ করা হয়।

কৃষি বিষয়ক আয় ব্যয় আলোচনা করিতে গেলে এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে অর্থ কৃষি-বিভাগের জন্য মঞ্জুর হয়, তাহার সমস্তই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষির উন্নতি কল্পে ব্যয় হয় না। আয় সম্বন্ধে মোটের মাথায় এই কথা বলিতে পারা যায় যে, রেল, পোষ্ট আফিষ ও তার বিভাগ প্রভৃতির ন্যায় কৃষি-বিভাগ কিছু আয়কর বিভাগ বলিয়া পরিগণিত হয় না। সরকার অথবা প্রজাবর্গ কেহই আশা করেন না যে, কৃষি-বিভাগ হইতে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া যাবতীয় সরকারী কৃষি-ক্ষেত্র যে কেবল আয়হীন ব্যয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবে তাহাও স্বীকার করিতে পারা যায় না। যাহা দেখিয়া লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে, যাহাকে আদর্শ বলিয়া জন সাধারণ বিবেচনা করিবে, সে গুলিতে যে বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালী অবলম্বন করিয়া লাভ হইতেছে তাহা প্রদর্শন করাও সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু আমাদের দেশে শুধু কৃষি বিষয়ে কেন অন্যান্য অনেক বিষয় উন্নতি হইবার প্রধান অন্তরায় এই যে যাঁহাদের হস্তে কৃষি-উন্নতি কল্পে অর্থ ব্যয়ের ভার আছে, তাঁহারা সকল সময় দেশের প্রকৃত অভাব বোঝেন না বা বুঝিতে চেষ্টা করেন না। এতৎ সম্বন্ধে আবার প্রদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের অনেক স্থলে স্বইচ্ছায় কিছু করিবার উপায় নাই। অনেকে বোধ হয় বিদিত নহেন যে, বিশেষ বিশেষ প্রদেশে বিশেষ বিশেষ উপায়ে আয়ের অর্থ ভিন্ন অন্য সমস্ত অর্থ ভারত গভর্ণমেণ্টকে দিতে হয়। ভারত গভর্ণমেণ্ট এই উপায়ে প্রাপ্ত অর্থ হইতে নিজেদের আবশ্যক মত অর্থ রাখিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ ইচ্ছামত প্রদেশ সমূহের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। ইহাতে দুই প্রকার অসুবিধা হয়, প্রথমতঃ প্রদেশ সমূহ স্বীয় স্বীয় আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে পারে না এবং দ্বিতীয়তঃ উহারা এক দিকে আপাততঃ অনাবশ্যকীয় বিষয়ে যেমন অধিক দান প্রাপ্ত হয় অন্য দিকে তেমনই হয়তঃ উহাদিগকে অর্থাভাবে অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সমূহ স্থগিত রাখিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বঙ্গদেশের উল্লেখ করিতে পারা যায়। বর্ত্তমান বঙ্গদেশে পৌনপুনিক আয়ও ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫·৭৪½ ও ৫·৬৩½ কোটি টাকা। সুতরাং সাধারণ উদ্বৃত্ত টাকার পরিমাণ ১১ লক্ষ টাকা। কিন্তু যে হিসাবে ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে সে হিসাবে আয় বৃদ্ধি পাইতেছে না। অনেক সময় অতিরিক্ত খরচ ভারত গবর্ণমেণ্টের দান হইতে নির্ব্বাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে সমস্ত বিষয়ে বাস্তবিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে বহুবৎসর ব্যাপী প্রচুর অর্থব্যয় আবশ্যক, যেমন কৃষির উন্নতি, সে সকল বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ। তাহা না হইলে অধিকতর জমিতে জল সেচনের উপায়; কৃষকের অবস্থার উপযোগী সুলভ সার, সুবীজ সংগ্রহ, গবাদি পশুর উন্নতি, গ্রামবাসী কৃষক-

গণের ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণের কৃষি বিষয়ে জ্ঞান ও অনুরাগ প্রসার প্রভৃতি কার্য্যের উপায় বিধান প্রথমেই অনুষ্ঠিত হইত। অর্থ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টই সকল প্রদেশের ভাগ্য বিধাতা। তাঁহাদের দানের উপরই প্রদেশ সমূহের উন্নতি নির্ভর করিতেছে, যতক্ষণ তাঁহারা প্রত্যেক প্রদেশের বিশেষ বিশেষ অভাব অনুধাবন করিয়া অর্থবণ্টন না করেন ততক্ষণ কোন স্থায়ী উন্নতির আশা নাই।

নব বর্ষারম্ভে কৃষক কি বলিতে চায়!

অন্যান্য বর্ষের ন্যায় বিগত বর্ষও কৃষকের সুখ দুঃখে কাটিয়াছে। ইহা বর্ষগতির অবশ্যম্ভাবী ফল।

প্রেসিডেণ্টের অকাল মৃত্যু—কৃষক, ভারতীয় কৃষি-সমিতির মুখপত্র, কৃষকের কথাই ভারতীয় কৃষি সমিতির কথা। ১৩১৮ সালে ভারতীয় কৃষি সমিতির সহৃদয় প্রেসিডেণ্ট, মহারাজা শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের মৃত্যু হয়। কিছুকাল পরে ভারতীয় কৃষি সমিতি তাঁহার উপযুক্ত পুত্র মহানুভব মহারাজ শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরকে প্রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কালের এমনি কুটিলগতি, ভারতীয় কৃষি-সমিতি অতি অল্পকালই তাঁহার মহানুভবত্ব উপভোগ করিতে পারিয়াছেন। তিনি অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে কুচবিহারের রাজপদে তাঁহার ভ্রাতা মহারাজ শ্রীজীতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর অধিষ্ঠিত। ভারতীয় কৃষি সমিতি তাঁহাকেই প্রেসিডেণ্ট পদে বরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সমিতির ডিরেক্টরের অসুস্থতা হেতু কলিকাতা হইতে বাহিরে অবস্থান করিতেছেন, এই জন্য সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার বিলম্ব ঘটিতেছে। এই গুলিই কৃষকের দুঃখের কথা।

কৃষি-সমিতির সম্পাদক কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় সমিতির কার্য্য সর্ব্বদা পর্য্যালোচনা করা তাঁহার পক্ষে অসুবিধা-জনক হইয়াছে সেইজন্য সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষকে (Manager) সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

উদ্ভিদতত্ত্বালোচনা—সমিতির উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ বিগতবর্ষে অসুস্থতা নিবন্ধন বিশেষ কোন নূতন তত্ত্বালোচনায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই; যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা এই—

১। বিভিন্ন জেলায় উৎপাদিত আমের গুণাগুণ ও শাস্ত্রীয় লক্ষণ বিচার করিয়া তাহার তালিকা প্রস্তুতের চেষ্টা করিতেছেন।

২। যেমন কীটতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয় তেমনি ক্ষেত্র ও উদ্যানজ আগাছা কুগাছা প্রতিকার করিতে হইলে তাহাদেরও জীবন কাহিনী আলোচনার আবশ্যক। এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে ঐ সকল আগাছা কুগাছার নমুনা সংগ্রহ আবশ্যক। আপাততঃ তিনি সেই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

যে সমিতির কার্য্য কতিপয় মাত্র বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, সে সমিতির কর্ম্মক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ। তাঁহারা যে সব কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করিয়া উঠিতে পারিবেন এ দুরাশা তাঁহারা হৃদয়ে পোষণ করেন না। তাঁহাদের চেষ্টায় যদি সাধারণের উৎসাহ হয়, বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের বিশেষজ্ঞগণের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি কিম্বা ভিন্ন দেশীয় নূতন আবিষ্কারের মর্ম্মগুলি বা বিভিন্ন স্থানের কৃষি ও উদ্যান রক্ষার প্রথাগুলি সাধারণ সমক্ষে সহজবোধ্য ভাষায় ধরিতে পারেন, তবে উক্ত সমিতি তাহার শ্রম সফল মনে করিবেন এবং কৃষক তাহার দৌত্য সু-আচরিত বলিয়া বিবেচনা করিবে।

চেষ্টা করিলে সফল কাম হওয়া যায়। যদি কামনা সিদ্ধ না হয় তবে বুঝিতে হইবে যে, চেষ্টায় কোন না কোন ত্রুটি আছে। কৃষক তাহার কার্য্য সমালোচনা করিতেছে, তাহার গুণাগুণ দেখাইবার জন্য নহে, তাহার কার্য্যে কোথায় ত্রুটী টুকু রহিয়া গিয়াছে, কোথায় তাহার কি কসুর হইয়াছে তাহা ধরিবার জন্য।

কৃষক প্রচার—কৃষক চায় যে, বঙ্গের ঘরে ঘরে কৃষক বিরাজ করুক কিন্তু তাহা এখনও হয় নাই। কৃষকে, যে কেহ কৃষি সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্ন করিতে পারেন, স্থানীয় ও বিভিন্ন স্থানের অনেক কৃষি কথার আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণের এ বিষয়ে তাদৃশ আগ্রহ দেখা যায় না। বিদ্যা দিয়া বিদ্যালাভের চেষ্টায় যে কত ফল, কত সুখ, সাধারণে তাহা এখনও সম্যক বুঝে না। প্রত্যেক কৃষি মেলাতে উপস্থিত হইয়া, প্রতি কৃষক পল্লীতে যাইয়া, প্রত্যেক জমিদারের জমিদারীতে যাইয়া এই কথা বুঝাইতে হইবে, তবেত যা চাও তাহা দেখিতে পাইবে। তোমার শিখা বিদ্যা তাহাদিগকে দিতে হইবে এবং তাহাদের অভ্যস্থ জ্ঞান তোমাকে লইতে হইবে। দেশ, কাল, পাত্র বিচার করিয়া কার্য্য পরিচালনের সহজ পন্থা বাহির করিতে হইবে। ভারতীয় কৃষি-সমিতির ইহাই প্রধান লক্ষ্য—প্রধান কার্য্য। তাঁহারা যেখানে যখন যান সেখানকার কৃষকগণের সহিত মিশেন এবং তাহাদের কার্য্যে কোথায় কি গলদ আছে তাহা দেখাইয়া দেন। তাঁহাদের সমিতি গৃহে যে কেহ আসেন তাঁহাদিগকে কৃষি কার্য্যে সুযুক্তি দিয়া থাকেন।

আলুর চাষ—ভারতীয় কৃষি-সমিতির প্রযত্নে গোবিন্দপুর কৃষি-ক্ষেত্রের কাছে নিকটে অন্ততঃ ২০।২২ জন চাষী আলু চাষে মনোযোগী হইয়াছে। চাষীরা তাহাদের মজ্জাগত আলস্য ত্যাগ করিয়াছে ; তাহারা পাট কাটিয়া লইয়া পাটের

জমিতে আলু বসাইতেছে। কিন্তু চাষীদের অভাব অনাটন ত আছেই। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতা বশতঃ এবং পয়সার অভাব হেতু ৮৲ ১০৲ ১৫৲ টাকা মণ দর দিয়া বীজ-আলু খরিদ করিতে পারে নাই। বাজারের কল ওয়ালা (Sprouted) আলু কিনিয়া বসাইয়া অতিশয় ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। আলু গাছ বেশ জন্মিল, গাছের তেজ বেশ হইল, কিন্তু ২০ দিনের মধ্যেই গাছে ফুল হইয়া গাছ মরিয়া গেল। আলু যাহা ফলিল তাহাতে তাহাদের ক্ষেত কোপাইবার খরচ উঠিল না। ভারতীয় কৃষি-সমিতি মনে করিয়াছেন যে তাহাদিগকে চাষের সময় বীজ-আলু সরবরাহ করিবেন এবং পরে ফসল উঠিলে আলুর দাম লইবেন।

দুই একজন চাষী নিজক্ষেত্রের পূর্ব্ব বৎসরের বীজ আলু যত্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদেরও কিছু লোকসান হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসরের পাহাড়িয়া নুতন বীজ ব্যবহার করা যে ভাল তাহা তাহারা অতঃপর বুঝিয়াছে। দুই একজন ক্ষেতে বোর্দ্দোঁ মিশ্রণ ব্যবহার করিয়াছে। ২৪ পরগণার দক্ষিণে আলুর ক্ষেত্রে আলুতে এখনও পোকা দেখা দেয় নাই। চাষ বাড়িতেছে, পোকাও বীজের সঙ্গে কোন না কোন দিক দিয়া হাজির হইবে। এইজন্য পূর্ব্ব সাবধানতা মন্দ নহে। বোর্দ্দোঁ মিশ্রণ কেবল রোগ নিবারক নহে, ইহাতে চূণ থাকা হেতু কতকটা সারের কার্য্য করে ভারতীয় কৃষি সমিতি ইহা কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছেন। আখমাড়া কল যেমন একজন রাখিলে গ্রামের অনেক চাষীর কাজ চলে, বোর্দ্দোঁ মিশ্রণ ছিটাইবার যন্ত্রপাতি ঐভাবে রাখিয়া ভাড়ায় খাটান হউক, ভারতীয় কৃষি সমিতি এইরূপ ইচ্ছা করেন।

ওলন্দা মটর—হলণ্ড হইতে এই মটর ভারতে আমদানী হইয়া এখন আমাদের দেশেরই মটর হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এক জায়গায় মটর বারম্বার চাষ করিলে মটর ছোট হইয়া যায়, তাহার মিষ্টত্বও কমে। ভারতীয় কৃষি-সমিতি দেখিয়াছেন যে, নদীয়া জেলার বীজ আনিয়া ২৪ পরগণায় চাষ করা ভাল, ২৪ পরগণায় বীজ লইয়া নদীয়ায়, এমনকি এক জেলাতেই উত্তরের বীজ লইয়া দক্ষিণে, দক্ষিণের বীজ লইয়া উত্তরে চাষ করিলে ফল পাওয়া যায়। কিন্তু নদীয়া জেলার সোণামুগ ২৪ পরগণায় আসিয়া কিছুতেই তাহার সব গুণ ঠিক রাখিতে পারিল না। বিলাতী ও এমেরিকান মটর দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ে যাইয়া এদেশের জল হাওয়া সহিষ্ণু একটি সতন্ত্র জাতি হইয়াছে। তাহারা দার্জ্জিলিঙ হইতে অবশেষে বাঙলার সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিলেও বিশেষ কোন অসচ্ছন্দ বোধ করে না, ফলে ভাল, ফলও বড় হয়। তাহাদিগকে বিলাতীর মত এত যত্ন লইতেও হয় না। ভারতীয় কৃষি-সমিতি সেইজন্য বিলাতী টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ, এমেরিকান ওয়াণ্ডার প্রভৃতি বিদেশীয় মটর দার্জ্জিলিঙে জন্মাইয়া তাহাদিগকে তাত বাত সহিষ্ণু ও

আপনাদের দেশের মত করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছেন। কতকাল ধরিয়া কত পয়সা দিয়া আর আমরা বিদেশ হইতে নিজ দেশের চাষের জন্য বীজ আনাইব!

সুবীজ সংগ্রহ—বর্ত্তমান বর্ষে কৃষক সানন্দে জানাইতেছে যে ভারতীয় কৃষি-সমিতির বীজাগারে কেবলমাত্র খাসীকাটা মূলা বীজ ও পাটনাই ফুল কপিবীজ নাই। তাহারা স্বক্ষেত্রোৎপন্ন ও তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে সুচাষীর ক্ষেত্রজ, কাঁটাশূন্য দেশী আমুনে বেগুন বীজ, উৎকৃষ্ট আশু বেগুন বীজ, আষাড়িয়া, কার্ত্তিকে ও ভাদুই শসা বীজ, উৎকৃষ্ট ঢেঁরস বীজ, ভাল টমাটো বীজ, ভাল জাতীয় ফুটী, কাঁকুড় ও উচ্ছে, করলার বীজ, ভাল দেশী কুমড়ার বীজ, ভাল লাউ বীজ, ভাল সীম বীজ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। মটর বীজ তাঁহারা দার্জ্জিলিঙে উৎপন্ন করেন। পাটনা হইতে তাঁহারা সালগম ও কপি বীজ সংগ্রহ করিয়া লোককে দেন। ওলন্দা মটর তাঁহারা স্বক্ষেত্রে উৎপন্ন করেন। যব গম কেহ চাহিলে তাঁহারা বক্সার হইতে আনাইয়া দেন। আলু বীজ তাঁহারা দার্জ্জিলিঙ ও হলদুখানি হইতে আনাইয়া দেন এবং যাঁহারা তাহাদের পরামর্শ চান বাজারের বীজ লইয়া আলু চাষ করিতে নিষেধ করেন। মাট বাদামের বীজ এলাহাবাদেরই ভাল। সেইখান হইতে সেইটি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের উৎপন্ন বীজের পরিমাণ কত হইবে বা তাঁহারা একাই বা কত বীজ সংগ্রহ করিবেন যে তাঁহারা সমগ্র বাঙলায় বীজ যোগাইবেন, ভারতের কথাত দূরে থাকুক! কৃষক বলিতেছে যে, তোমরা সকলে প্রতিজ্ঞা কর যে ভাল বীজ ভিন্ন, ভাল জায়গার বীজ ভিন্ন, অন্য বীজ ব্যবহার করিবে না, তোমাদের বীজ যথা তথা মিলিবে।

সার—আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতীয় কৃষি-সমিতি গরীব চাষীর মুখের দিকে চাহিয়া কথা কন। কেননা তাহারা চাষীগণকে পারত পক্ষে কোন প্রকার দামী খণিজ সার বা রাসায়নিক মিশ্র সার ব্যবহার করিতে বলেন না। তাঁহারা বলেন গবাদির মলমূত্র সযত্নে রক্ষা করিতে এবং তাহাই ক্ষেতে উপযুক্ত মাত্রায় প্রদান করিয়া তাহাদের জমির ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে। গোমযে যে বৃক্ষলতা গুল্মাদির খাদ্যোপযুক্ত নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক অম্ল ও পটাস, তিনটি উপাদানই সহজ গ্রাহ্য অবস্থায় অল্পাধিক পরিমাণে আছে। প্রত্যেক ফসলের সারেই এই তিনটী উপাদান থাকা চাই। একটির সম্পূর্ণ অভাব হইলে অপরটি প্রচুর পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও কার্য্য করিতে পারে না। অবশ্য প্রত্যেক ফসলের সারের বিভিন্ন উপাদানের অল্পাধিক পরিমাণ নির্ণিত আছে। ছাই মিশ্রিত এক বৎসরের গোময়, গো-মূত্রযুক্ত গোয়ালের আবর্জ্জনা সারকে তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ স্থান দেন। গোময় কিম্বা এই প্রকারের মিশ্র সার না মিলিলে অগত্যা অন্য সারের সন্ধানে ফিরিতে হয়। জমিতে পুরাতন পাঁকমাটি কিম্বা খাত কিম্বা পগার ঝালাইয়া

তাঁহার মাটি ব্যবহার করা, চাষীদের অনুসৃত প্রথা খুব ভাল বলিয়া অনুমোদন করেন। সমর্থ পক্ষে কে না সোরা, হাড়ের গুড়া কিম্বা সুপারফস্ফেট, কাইনিট ব্যবহার করিতে পারেন? তাঁহারা বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের নির্দ্দেশানুসারে চাষীগণকে শণ, ধঞ্চে বুনিয়া জমিতে সবুজ সার দিতে বলেন। ইহাও বিশেষ ফলদায়ী। চাষী কিম্বা সৌখীন চাষী যাহাতে শণ, ধঞ্চে সহজে পাইতে পারেন তজ্জন্য প্রতি বৎসরই সমিতি ঐ সকল বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখেন। বিগত বর্ষে উক্ত সমিতি ৩৫॥৫ মণ ধঞ্চে বীজ ৫।৭।১০ সের হিসাবে ১৭৯ জন লোকের মধ্যে বিতরন করিয়াছেন। জাভা নেটাল নীলও একটি বিশিষ্ট সবুজ সার। ইহার প্রচলন ক্রমশঃ বাড়িতেছে। তাহারও সন্ধান ইহাঁরা দিয়াছেন।

মালঞ্চ—কৃষক দেখিতেছে যে ভারতীয় কৃষি-সমিতি সৌখীন উদ্যান পালকগণের কথা ভুলেন নাই। তাঁহারা কয়েকজনকে মালঞ্চ রচনায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে বাগানে মার্শাল নে, পলনিরোঁ, ব্লাকপ্রিন্স, লেবিনিয়া, প্রেসিডেন্ট মাস্ গোলাপ বসাও, রজনীগন্ধের ঝাড় তৈয়ারি কর, বেল জুঁইয়ের ক্ষেত তৈয়ারি কর। সঙ্গে সঙ্গে ফার্ণের চাষ কর। ফার্ণ কয়লার ঘেঁসের মধ্যে পাতা পচা সারের উপর আমগাছ তলায় ও অন্য গাছ তলায় ঠাণ্ডা জায়গায় হইবে। বারমাস কাটা ফুল কিম্বা ফুলের তোড়া যোগাইতে হইলে তোমাকে সেন্টোরিয়া, ভার্ব্বিনা, মিগ্নোনেট প্রভৃতি মরসুমী ফুলও করিতে হইবে। দুই একটা চাঁপা, দুই একটি গন্ধরাজ, টগর, এমন কি পদ্ম ভাট থাকিলে সামান্য কাজে সাদা সিধে তোড়ায় চলিয়া যাইবে। উক্ত সমিতি মালঞ্চ রচনার বিশেষ কথা কৃষকে লিখিবেন বলিয়াছেন। তাঁহারা বিগত বর্ষে উদ্যান চর্চ্চা করিতে করিতে গোলাপের একটা বিশিষ্ট সারের সন্ধান দিয়াছেন।

গোলাপ গাছের সার—২ পাউণ্ড নাট্রেট অব লাইম, ১ পাউণ্ড সুপার-ফস্ফেট বা বন সুগার, ১ তোলা সালফেট অব আয়রণ বা হীরাকস বেশ ভালরূপে গুঁড়াইয়া মিশাইয়া লইতে হয়। এই মিশ্রের সহিত পুরাতন আটাল মাটি মিশাই ২০ পাউণ্ড পরিমাণ মিশ্র সার প্রস্তুত করতঃ ২০টি গাছে প্রদান করিতে পারা যায়। সার প্রদান করিয়া গাছে জল দিতে হইবে।

ফলের বাগান—ফলের বাগান রচনায় এই সমিতি অনেক কৌশল দেখাইয়াছেন। তাহা তাঁহাদের এই পত্রিকায় প্রকাশিত ধারা বাহিক প্রবন্ধ গুলিতে জানিতে পারা গিয়াছে। নারিকেল গাছের সার নির্ণয়ে তাঁহারা দেখাইয়াছেন চুণ, পটাস ও উদ্ভিজ সার নারিকেলের পক্ষে প্রশস্ত। আটাল মাটিতে পটাসের ভাগ সমধিক এবং ইহাতে গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকে এই হিসাবে ইহা উদ্ভিজ্জ সার বিশেষ। আটাল বা পাঁকমাটি ও উপরন্ত জলের পানা, ঝাঁঝি

নারিকেল গাছের গোড়ায় দিয়া নারিকেলের ফলন বাড়িয়াছে তাহা তাঁহারা দেখিয়াছেন। লবণ নারিকেল গাছের সার নহে ইহা সিংহল বোটানিক উদ্যানতত্ব পরিচায়ক পত্রিকায় বহু আলোচনা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। লোণা জমিতে নারিকেল গাছ কোন অসুবিধা বোধ করে না এইমাত্র। হয়তঃ তাহার কাণ্ডস্থিত রস লবণাক্ত হয় তথাপি তাহার শরীর বৃদ্ধি বা রক্ষার জন্য লবণের আবশ্যক নাই। নারিকেল বৃক্ষ লবণ পাইলে সন্তুষ্ট কিম্বা লবণাভাবে অশান্তি বোধ করে ইহাও নহে। ১৯০৯ সাল হইতে ভারতীয় কৃষি-সমিতি ১০টা গাছে লবণ দিয়া এবং ১০টাতে লবণ না দিয়া দেখিয়াছেন, গাছের বৃদ্ধি ও ফলন একই রূপ। ভারতীয় কৃষি-সমিতির উদ্যান ২৪ পরগণা বারুইপুরের সন্নিকটে। এখানকার জল মাটি লোণা নহে। সার প্রদান করিয়া প্রত্যেক গাছে বৎসরে ১২০ হইতে ১৫০ শত ফল হইয়াছে। সম্প্রতি বাদুরের (bats) উৎপাতে নারিকেল নষ্ট হইতেছে। নারিকেলে জল সঞ্চার হইলেই বাদুরে ছিদ্র করিয়া জল খায় ও বোঁটা কাটিয়া নীচে ফেলিয়া দেয়। ইন্দুর ও কাট বিড়ালও ঐ রকমে শত্রুতা করে। জাল দ্বারা ঘিরিলে বাদুর আটকান যাইতে পারে কিন্তু ইন্দুরে আটকাইতে অন্য উপায় করা আবশ্যক। গাছের গায়ে হিঙ মিশ্রিত রঙ দিলে ইন্দুর কাটবিড়াল উঠে না।

কলম—উক্ত সমিতি ১৩১৬ সাল হইতে কাঁটালের ও কালজামের জোড় কলম করিয়া আজ কয়েক বৎসর ফলাফল পরীক্ষা করিতেছেন। প্রতি বৎসরই নুতন কলম করা হইতেছে। পুরাতন কলম গুলি ভাল রকম ফলিতে দেখা যায় নাই। কালজামের জোড় কলম করিবার চেষ্টা অদ্যাপিও ফলবতী হয় নাই। গোঁড়া লেবুর সহিত অন্য লেবুর জোড়ও তাদৃশ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে না।

গাছ বসান—সমিতি বাগানে কোণা কুণি গাছ বসাইয়া বিঘাতে অধিক ধরাইবার এবং বাগানে লাঙ্গল মই দিবার সুবিধা দেখাইয়া দিয়া অনেকের নিকট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। বাগানের রাস্তাঘাট নির্ম্মানের ব্যবস্থা দেখিয়া সকলেই ভাবিবেন যে, সমিতির উদ্যানতত্ত্ববিদ বেশ সৌখীন ও কাজের লোক।

কৃষি-যন্ত্র—সমিতি নিজের ক্ষেতে কাঠের উন্নত প্রণালীর লাঙ্গল ব্যবহার করাই পর্য্যাপ্ত মনে করেন কিন্তু আবশ্যক বোধ করিলে তাঁহারা মার্টি উল্টান, লোহার লাঙ্গল (Turumwrest Plough) কিম্বা মেষ্টন লাঙ্গল ব্যবহার করিতে বলেন।

সিন্ধু প্রদেশেও বেহারের দুই এক জায়গায় কলের লাঙ্গল চলিতেছে। নব জমিতে কিম্বা সাধারণ চাষীর পক্ষে কলের লাঙ্গল ব্যবহার করা সাধ্যায়ত্ব নহে। সুতরাং তাহাদিগকে Planet junior নামক চক্র চালিত কোদাল লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে

হইবে। এই যন্ত্র দ্বারা গাছের ফাঁকে ফাঁকে কোপাইবার কার্য্য বেশ ভাল হয়। ইহাতে কম খরচে কাজ হয়। আলু তোলা যন্ত্রও বেশ কার্য্যোপযোগী এবং সাধারণ চাষীর ব্যবহার উপযোগী। যখন ধনীগণ চাষীদের সহিত মিলিত হইয়া সুবৃহৎ ক্ষেত্র রচনা করিবেন, তখন ধান, যব, বৈ কাটা যন্ত্র, আখকাটাযন্ত্রের বহুল ব্যবহার হইবে। ছোট খাট ক্ষেতে হাত কোদাল, কাস্তে, দেশী বিদে, মই, লাঙ্গলই ভাল।

ক্ষেতে জল সেচন—অনেক রকম পম্প বাহির হইয়াছে। এঞ্জিন বসাইয়া পম্প চালান বড় ক্ষেতের জন্য চলে। সমিতি হাতে চালান পম্পের পক্ষপাতী। চাকাওয়ালা দমকলের গাড়ীর মত পম্প হইবে এবং যেখানে ইচ্ছা ঠেলিয়া লইয়া গিয়া ক্ষেতে জল তুলিয়া দিতে পারা যাইবে, সমিতির এইরূপ ইচ্ছা।

সমব্যায় সমিতি—কৃষি-সমিতির ইচ্ছা যে, প্রত্যেক সবডিবিসনে এক সম্প্রদায় লোক সর্ব্বপ্রকার উন্নত প্রণালীর কৃষি-যন্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখুন। যেমন আখমাড়া কল, গুড়জ্বাল দেওয়া কটাহ, ভাড়ায় চলিতেছে তেমনি জল তোলা দমকলের গাড়ী, ধান, যব কাটা যন্ত্র, আলু তোলা, আখকাটা আখের গোড়া তোলা যন্ত্র, ক্ষেতে ও গাছে জল ছিটান যন্ত্র ভাড়ায় খাটিবার জন্য থাকুক। এই সকল যন্ত্রের ভাড়া অধিক না হয় তাহাও দেখা উচিত। এইরূপে কাজ চলিতে চলিতে আশা করা যায় যে ক্রমশঃ চাকাওলা মোটর লাঙ্গল ও মোটর পম্প চাষীদের কাজ চালাইবে।

নূতন কৃষি গ্রন্থ—বিগত বর্ষে সমিতি, কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত **কৃষি-রসায়ন** প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা রসায়ন পরিচয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ হইলেও এক খানি সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ বলা যায়। কৃষি রসায়নে স্থান পাইবার যোগ্য অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ সমিতির সম্পাদক প্রণীত **সব্জী চাষ**। দেশী ও বিলাতী সকল রকম শাক সব্জী চাষের বিশেষ বিবরণ ইহাতে দেওয়া আছে। এই পুস্তক পাঠে আমরা বুঝিতে পারি যে, লেখকের হাতে হাতিয়ারে কাজ করা অভ্যাস আছে, বিজ্ঞানানুমোদিত কৃষির প্রতি দৃষ্টি আছে, কৃষির সহজ-সাধ্য উপায় অবলম্বনের কৌশল জানা আছে। পুস্তক খানিতে অনেক চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। তৃতীয় পুস্তক **বীজ বপনের সময় নিরূপণ তালিকা**। ইহা বীজ বপন ও বৃক্ষাদি রোপণের বাৎসরিক পঞ্জিকা বিশেষ। ইহাতে প্রতি বৎসর একই কথা থাকিলেও বর্ষ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যে পরিবর্ত্তন হয়, যে নূতন জ্ঞান হয়, তাহা দেওয়া হয় বলিয়া এই পঞ্জিকা প্রতি বৎসরই নূতন। ৪র্থ পুস্তক উক্ত নিবারণ বসুর **খাদ্য তত্ত্ব** ইহার সহিত কৃষির বিশেষ কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ না থাকিলেও ইহা খাদ্য বিজ্ঞান বলিয়া সমিতি ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। খাদ্য বিচার, খাদ্য নির্ণয়, খাদ্যের মূল্য নিরূপণ, খাদ্য

প্রস্তুত ইত্যাদি অনেক কাজের কথা ইহা হইতে শিখা যায়। একটা বাজে কথা নাই। আমরা দেখিতেছি যে নিবারণ বাবু কেবল কৃষি-রসায়ন তত্ত্ববিদ্ নহেন, খাদ্য বিজ্ঞান তাঁহার বেশ জানা আছে।

অভিনব হরিৎ সার

এতদ্দেশে অনেক স্থানেরই কর্ষিত জমিতে স্বাভাবিক সারের পরিমাণ যে বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে তাহা কৃষক মাত্রেই বিদিত আছেন। বিনা সারে অথবা অনুপযুক্ত পরিমাণ সারে বৎসরের পর বৎসর ফসল উৎপাদন করিতে থাকিলে মৃত্তিকা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং অনেক স্থলে তাহাই ঘটিয়াছে। মূলধনের অভাবে চাষী অধিক পরিমাণ সার কিনিতে পারে না এবং পূর্ব্বে যে সমস্ত স্বাভাবিক উপায়ে জমিতে সার পড়িত, অর্থাৎ আবর্জ্জনা, পশ্বাদির মল মূত্র ও হাড়, নদীর পলিমাটি প্রভৃতি, সেগুলিও কালক্রমে অন্তর্হিত হইয়াছে কিম্বা হইতেছে। এরূপ অবস্থায় সার প্রয়োগ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। কিন্তু কোন্ সার কৃষকের পক্ষে উপযুক্ত? রাসায়নিক সারেরত কথাই নাই তদ্ভিন্ন হাড়ের গুঁড়া, গুয়ানো, মিশ্র ক্ষেত্রজ সার এগুলিরও যেরূপ দর তাহাতে সকল কৃষক আবশ্যকীয় পরিমাণ সার ব্যবহার করিতে পারে না। একমাত্র হরিৎ অথবা সবুজ সারই সস্তা এবং কৃষকের সাধ্যায়ত্ব।

যে সময় হইতে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হেলরিজেল্ কতকগুলি শিম জাতীয় উদ্ভিদের মূলের সোরাজান সংগ্রহ করিবার শক্তি আবিষ্কার করেন, সেই সময় হইতে হরিৎ সারের আদর অনেক পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। সবুজ সার হিসাবে ধঞ্চের কোন কোন স্থানে চলন আছে। অরহরও নূতন আবাদী জমিতে চষিয়া দিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি জাভা নেটাল নামক এক জাতীয় নীল এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। নীল উৎপাদক শক্তি ব্যতীত ইহার সবুজ সার হিসাবে অনেক উপকারিতা আছে বলিয়া অনেকে বলিতেছেন। কৃষি-কার্য্যে লিপ্ত সাহেব মহলে ইহার খুব আদর এবং ইহার চাষে যথেষ্ট উৎসাহ। এমন কি মিঃ রবার্ট এইচ, কেভ্ নামক জনৈক সাহেব, ঠিকানা কলসি ষ্টেট, কাটিহার, চারি আনার ডাক মাশুল পাঠাইলে পরীক্ষার উপযুক্ত পরিমাণ বীজ দিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

জাভা নেটাল নীলের বৈজ্ঞানিক নাম Indigofera arrecta আমাদের দেশীয় নীলের (Indigofera Sumatraua) সহিত ইহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। ইহার গাছ

৬৷৹-৭ হাত পর্য্যন্ত বড় হয়, ডাল পালা যথেষ্ট, এবং সকল স্থানে না হইলেও, এক এক স্থানে যথেষ্ট পরিমাণ বীজ প্রসব করে। শীতের প্রায় সকল ফসলের সহিত ইহা বপন করা চলে। গোধূম, সরিষা এবং যইএর সহিত চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে যে পূর্ব্বোক্ত ফসল সমূহ পরিপক্ক হওয়ার সময় ইহা সামান্যই বড় হইয়াছে। সুতরাং প্রধান ফসলের কোন অপকার হয় নাই। তৎপরে জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম বারিপাত হইতেই নীল গাছ শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায় এবং আষাঢ় মাসের শেষে প্রায় চারি হাত আন্দাজ বড় হইয়া উঠে। কিন্তু সবুজ সার করিতে হইলে বিশেষতঃ যেখানে সাধারণ গো মহিষ দ্বারা চাষ হয় সে স্থলে, নীল গাছ ২-২৷৹ হাত পর্য্যন্ত বড় হইলেই কাটিয়া ফেলিয়া জমির সহিত চষিয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছ খুব বড় হইয়া গেলে মাটির সহিত ভাল করিয়া চষিতে অসুবিধা হয়। বর্ষাতেই ইহা পচিয়া ঠিক হইয়া যায় এবং পরবর্ত্তী ফসলের জন্য গলিত উদ্ভিজ্জ সার প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া থাকে। যদি সরিষার সহিত ইহা বপন করিতে হয় তাহা হইলে এক বিঘার উপযুক্ত সরিষা বীজের সহিত ৫ ছটাক নীল বীজ দিলেই যথেষ্ট হইবে। অন্যান্য ফসলের সহিতও ঐ একই মাত্রায় নীল বীজ আবশ্যক। এক সের বীজের মূল্য প্রায় ১ টাকা হইবে। বস্তুতঃ এই সার ব্যবহারে বীজের দামই এক মাত্র খরচ। তাহার পর ইহার জন্য আর স্বতন্ত্র ভাবে চাষ বা পাইট করিতে হইবেনা। ইহার সহিত অথবা সাহায্যে উৎপাদিত ফসলের চাষ এবং পাইটই ইহার পক্ষে যথেষ্ট। ফলতঃ এই নূতন হরিৎ সারের তিনটি বিশেষ গুণ দেখা যাইতেছে ঃ—(১) প্রধান ফসল পরিপক্ক হওয়ার সময় ইহা সামান্যই বৃদ্ধিপায় অর্থাৎ জমির সার অতি অল্প পরিমাণেই ব্যবহার করে ;—(২) ইহার জন্য কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হয় না (৩) পরবর্ত্তী ফসল বড় হইবার আগেই ইহা সারে পরিণত হইয়া যায়। সর্ব্ব শেষে ইহার মূল্যও অধিক নহে। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে ইহা সবুজ সার রূপে পরীক্ষার উপযুক্ত।

পত্রাদি

কুরচি ও অনন্তমূল—শ্রীরসিকলাল সরকার, মহুলিয়া, সিংভূম।

কুরচি ও অনন্তমূল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাঠাইতে পারেন। উহার খরিদ্দার কে জানিতে চান।

এখানে কবিরাজ বাটী মাত্রেই উহার গ্রাহক। অধিকমাত্রায় বেঙ্গল কেমিকাল ওয়ার্কস্, মেঃ বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্ কলিকাতা ইহাদিগকে পত্র লিখিয়া দর ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয় জানিতে পারেন। বোধ হয় নমুনা পাঠাইয়া দর জিজ্ঞাসা করাই ভাল।

কৃষি কর্ম্মে বা রেশম আবাদ কার্য্যে নিয়োগ প্রার্থী

শ্রীপ্রেমরঞ্জন নাগ, বরদি পোঃ, ঢাকা।

পুষা কলেজে রেশম বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু কাল শিক্ষা করিয়াছেন এবং ঐ কর্ম্মে যোগ্যতা জ্ঞাপক পত্র পাইয়াছেন। পুষায় অবস্থান কালে পুষায় অনুষ্ঠিত কৃষি-কর্ম্মেরও খোঁজ খবর লইতেন। কৃষি বা রেশম আবাদ কার্য্যে অংশীদার বা কর্ম্মচারী রূপে লিপ্ত হইতে চান। কৃঃ সঃ

বাদাম তৈল—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, পুরুলিয়া।

জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, বাজারে বাদাম তৈল পাওয়া যায়, তাহা কোন্ বাদামের তৈল? কাবুলী বাদামের তৈল কি এত বেশী পাওয়া যায়? তাহার দাম কত এবং ব্যবহার জানিতে চান। তদুত্তরে তাঁহাকে জানান যাইতেছে যে কাবুলী বাদামের তৈল অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না। যে অল্প পরিমাণ পাওয়া যায় তাহা ঔষধার্থে কিম্বা চুলে কিম্বা গাত্রে মাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার দর খুব অধিক, ১৲ টাকা সেরের কম নহে। ইহাকে ইংরাজিতে Amond oil বলে। বাজারে যে বাদাম তৈল বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় তাহা মাটবাদাম তৈল (Ground nut oil) ইহার দর সস্তা ১৫৲ টাকা হইতে ১৮৲ টাকা মণ মূল্যে বিক্রয় হয়। এই তৈল ঘৃতের সহিত মিশাইয়া কিম্বা ঘৃতের পরিবর্ত্তে ব্যবহার হয়।

ধানে ফস্ফেট সার—শ্রীচন্দ্রকান্ত দাস, চিলাহাটী, রঙ্গপুর।

মহাশয়, ধানের ক্ষেত্রে গোময় দিবার কথা শুনি, কেহ বলেন যে হাড়ের গুঁড়া

কিম্বা সোরা দিলে ভাল হয়। ধানে কোন সারটি বাস্তবিক লাভজনক নিঃসন্দেহে বুঝিতে ইচ্ছা করি।

উত্তর—সার নির্ব্বাচন কালে আবশ্যকানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হয়। নাইট্রোজেন সারে গাছের ডাল পালা পাতার খুব বৃদ্ধি হয়। ফস্ফরাস সারে ফল ও শস্যের বৃদ্ধি হয় এবং পটাস সারে শ্বেতসারের বৃদ্ধি করে সুতরাং ধানের জন্য পটাস এবং ফস্ফরাস প্রধান সার ব্যবহার করিতে হইবে। মাটিতে পটাসের ভাগ কিয়ৎ পরিমাণে সব জমিতেই থাকে। এইজন্য ধানে ফস্ফরাস প্রধান সারই প্রধানতঃ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

গোময় নাইট্রোজেন প্রধান সার—ইহাতে যদিও ফস্ফরিক অম্ল আছে কিন্তু ধান জমিতে গোময় দিলে গাছেরই খুব বৃদ্ধি হয় ধানের ফলন তাহার অনুপাতে বাড়ে না। সোরাও নাইট্রোজেন প্রধান সার ইহাতে সমধিক পরিমাণে পটাস থাকিলেও কেবল সোরা প্রয়োগে নাইট্রোজেনের কার্য্য অধিক হয়, পটাসের কার্য্য তাদৃশ হয় না। ধানে ফস্ফরিক সার ব্যবহারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হাড়ের গুঁড়াতে শতকরা ২০ ভাগ ফস্ফরিক অম্ল থাকে, নাইট্রোজেনের মাত্রা ৪.৫ ভাগ মাত্র। হাড়ের গুঁড়ার সহিত সোরা মিশাইয়া ব্যবহার করিলে আরও ভাল। সোরার সহিত মিশিলে হাড়ের গুঁড়া শীঘ্র গলিয়া যায়। কেবল হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে সদ্য বৎসরে বেশী ফল না হইলেও আরও দুই বৎসর জমিটি সারবান থাকে কিন্তু সুপার ফস্ফেট ব্যবহারে সদ্য বৎসরে ফল পাওয়া যায়। বিঘাতে ২ মণ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে যে কাজ হয়, ১ মণ হাড়ের গুঁড়ার সহিত ১০ সের সোরা প্রদানে কিম্বা ১ মণ সুপার ফস্ফেট ব্যবহারে সমান ফল হয়। সুপার ফস্ফেট সারের ক্ষমতা কিন্তু সদ্য বৎসরেই খরচ হইয়া যায়, জমিতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। "কৃষি-রসায়ন" পুস্তকে সার সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করা হইয়াছে। আপনার এক খানি কৃষি-রসায়নের আবশ্যক।

বিদা বা আঁচড়া—শ্রীনিশাপতি রায়, তমলুক।

বিদা কাহাকে বলে বা তাহার কার্য্য কি, দামই বা কত জানিতে চান—গ্রাম্য ভাষায় যাহাকে আঁচড়া বলে তাহাকেই বিদা বলে। একটি কাটের বা লোহার পাটির উপর সমান্তরে ১৫, ২০,২৫ টা লোহার গজাল বসান থাকে। ইংরাজীতে রেক বলে (Rake)। হাত আঁচড়া বা হাতরেক আছে। ইহার কাঠের বাঁট ধরিয়া মাটির উপর টানিলে ইহারদ্বারা মাটি উস্কাইবার কাজ হয়, আগাছা মারা যায় কিম্বা ঘন বোনা চারা পাতলা করিয়া লওয়া যায়। বড় রেক বা আঁচড়া গরুতে টানে। লৌহ গজালের পরিবর্ত্তে বাঁশের বাখারির গজালও আছে। একখানা বিদা তৈয়ারি করিতে ৫৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা খরচ পড়ে। বাঁশের গজাল হইলে ৩৲।৪৲ টাকায় তৈয়ারি হইতে পারে। ইহা কিন্তু দীর্ঘকাল কার্য্যোপযোগী থাকে না।

প্রবন্ধে পারিতোষিক—

প্রবন্ধের বিষয়—গবাদি জন্তুর খাদ্যের দোষাদোষ নিরুপণ সময়ে প্রবন্ধ লিখিয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পারিতোষিক পাইয়াছেন।

১। ডাক্তার এস, সি, চাটার্জ্জি B.A., L.M.S., কলিকাতা ২০০৲ টাকা সুবর্ণ পদক সমেত।

২। ডাক্তার মিস্ ক্যাথলিন্ গমিস্ L.M.S. বোম্বে ১৫০৲ সুবর্ণ পদক সমেত।

৩। ,, পরেশ রাম শর্ম্মা L.M.S. ১০০ সুবর্ণ পদক সমেত।

৪। অনিলচন্দ্র মুখার্জ্জী মেদিনীপুর ৫০৲ ,,

পারিতোষিক দাতা বোম্বায়ে জীবে-দয়া-জ্ঞান-প্রসারক সভা, পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য বিগত মাসে শেষ হইয়াছে।

কদলী ব্যবসায়ে তার হীন বৈদ্যুতিক সংবাদ—পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীরা কোন বৈজ্ঞানিক অবিষ্ক্রিয়াকে কাজে লাগাইতে সাধ্যমত চেষ্টা না করিয়া ছাড়েন না। এক সময় বিলাতে কদলী একটি অপূর্ব্ব পদার্থ ছিল। কিন্তু এক্ষণে জাহাজ জাহাজ কদলী জ্যামেকা, বারবাডোস্ প্রভৃতি স্থান হইতে বিলাতে প্রেরিত হইতেছে। সহস্র সহস্র মাইল দুর হইতে আসিলেও ইহা অত্যন্ত যত্নের সহিত আহৃত এবং প্রেরিত হওয়ায় ইংলণ্ডে ভাল অবস্থায়ই আসিয়া পৌঁছে। কিন্তু যতই হউক জাহাজের দেরী সকল সময় বন্ধ করা যায় না। তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণ কদলী নষ্ট হইয়া যায়। যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ সামান্য ক্ষতিও না হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা হইতেছে যে, যে সকল জাহাজ কদলী ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকিবে;

তাহাদের সকলেরই তার হীন সংবাদের যন্ত্র থাকিবে। আকস্মিক দুর্ঘটনা বশতঃ কোন স্থানে বিলম্ব হইলে যন্ত্র সাহায্যে সে জাহাজকে খবর দিয়া তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবে এবং আবশ্যক হইলে মাল তাহাতে তুলিয়া দিতে পারিবে। বলা বাহুল্য যে, ভারতবর্ষে পুরাণ কথিত কদলীবন থাকিলেও এখান হইতে কদলী রপ্তানি হয় না। সম্ভবতঃ উৎপাদিত কদলী দেশের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত নহে কিম্বা উৎযোগ এবং উদ্যমের অভাবে কদলী জন্ম স্থানেই লয় প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গদেশীয় জঙ্গল বিভাগ—বিগত বৎসরের সরকারি বিবরণীতে প্রকাশ যে বঙ্গের জঙ্গল বিভাগের আয় মোট নয় লক্ষ পাঁচ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহা তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এক লক্ষ দুই হাজার টাকার অধিক। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ ব্যতীত অপর সকল স্থানেই আয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। অরণ্য জাত দ্রব্যাদির প্রতি এখনও ব্যবসায়ীগণের সম্পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই। তাহা হইলে অরণ্য বিভাগের আয় আরও বাড়িয়া যাইত। বর্ত্তমান বৎসর হইতে কলিকাতার প্রসিদ্ধ বার্ণ কোম্পানি তিস্তা, কারসিয়ং এবং দার্জ্জিলিং প্রদেশ হইতে কাষ্ঠ এবং বাঁশ প্রভূত পরিমাণে বাহির করিবে। তজ্জন্য ব্যোম রজ্জু পথ প্রস্তুতের বন্দোবস্ত হইতেছে। জঙ্গল বিভাগের অন্যান্য লাভের মধ্যে গত বৎসর তিনটি হস্তী ধরা হইয়াছে। অনেকে শুনিয়া সুখী হইবেন সুন্দরবনে বাঘের উপদ্রব বিগত বৎসর অনেক কম ছিল। কেবল মাত্র ৭০ জন লোক ব্যাঘ্রের হস্তে মৃত্যু লাভ করে। তৎপূর্ব্ব বৎসরে উক্ত কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৪২ এবং গত পাঁচ বৎসরের গড় পড়তা ১২২।

সার-সংগ্রহ

প্রাচীনভারতের কৃষিবিদ্যা বৃক্ষ-পোষণ

সকল প্রকার পুষ্পের সৌরভ দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার প্রক্রিয়া।

যস্য কস্যাপি পুষ্পস্য সৌরভেনাধিবাসিতান্।
মৃত্তিকা সকলান্ মূলে বৃক্ষাণাং বহুলান্ ক্ষিপেৎ।
কুষ্ঠপত্র মুরা মুস্তা তগরোশীরচূর্ণকৈঃ।
র্মিশ্রিতেনাম্ভসা সেকাৎ্তাসং সৌরভসম্ভবঃ।

যে কোন পুষ্পবৃক্ষের মূলে যে কোনও পুষ্পের সুগন্ধে আমোদিত মৃত্তিকাচূর্ণ বহুপরিমাণে ক্ষেপণ করিয়া তাহাতে কুড়, তেজপাতা, মুরামংসী, মুথা, তগর ও

বীরণমূলের চূর্ণমিশ্রিত জল সেচন করিলে এই বৃক্ষে পুষ্পের গন্ধ এক মাসকাল স্থায়ী হইবে।

মহাকবি কালীদাস মেঘদূত কাব্যে স্বর্গের সেই অলকাপুরীর সমৃদ্ধিবর্ণনা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—সেই অলকা!

"যত্রোন্মত্ত-ভ্রমরমুখরা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ"

যেখানে,—উন্মত্তভ্রমরকুলের মধুর গুঞ্জনে মুখরিতা নলিনী, নিত্যই পদ্মযুক্ত সেই নগরীই ধনপতির দিব্য রাজধানী অলকা।

ভারতের কৃষিতত্ত্ববিদ্ মহর্ষিগণ এই পৃথিবীরাজ্যে স্বর্গসম্পৎ আনয়ন করিয়াছেন, এখানে পদ্মিনীকে উন্মত্তভ্রমরমুখরিত নিত্যপদ্ম যুক্ত করিবার বিজ্ঞান-সম্মত উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—

শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে,—

কুল্মাষ দন্তিদন্তানাং চূর্ণযুক্পঙ্কসম্ভবা।
প্রত্যহং পুষ্পিতাম্ভোজমণ্ডিতা পদ্মিনা ভবেৎ॥

অর্দ্ধসিদ্ধ চণক, গোধূম, মাসকলাই ও হস্তিদন্তের চূর্ণ মিশ্রিত কর্দ্দমে পদ্মরোপণ করিলে, সেই নলিনী, প্রত্যহই (হেমন্তবর্ষা বারমাস) প্রস্ফুটিত পদ্মের শোভায় সুশোভিত হইয়া থাকে।

সকল প্রকার বৃক্ষের পুষ্টিকর সাধারণ ব্যবস্থা

সিদ্ধার্থ কদলীদলানি শফরী বিট্ কোলমার্জ্জারয়োরেতেষাং সমভাগমাজ্যসহিতং চূর্ণং, তরুভ্যো হিতম্। দত্তং ধূম বিলেপনোপচরণে রাপ্যায়নং, রোগহৃৎ স শাখাপল্লবয়ত্যলং মধুকরব্যালোলপুষ্পচ্ছদাঃ॥

শ্বেত সর্ষপ, কদলীপত্র, পুটিমাছ এবং শূকর ও মার্জ্জারের বিষ্ঠার চূর্ণ সমভাগ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া বৃক্ষের মূলে সার দিলে এবং ঐ সকল দ্রব্যের লেপও ধূম দিলে, বৃক্ষ, সুস্থ, সবল ও নীরোগ হয় এবং এই সারপুষ্ট বৃক্ষের শাখাসমূহ বহুতর পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয়, পুষ্পগুলি এতই সৌরভযুক্ত হয় যে, সর্ব্বদা মধুকরকুলের চরণতাড়নে আন্দোলিত হইতে থাকে। এই সার সকলবৃক্ষের পক্ষেই উপকারী।

(২)

অঙ্কোলকাথতোয়েন মিশ্রিতং ঘৃতমাক্ষিকম্।
বসাকিটিতুরঙ্গানামেতৈঃ সিক্তা মহীরুহাঃ॥
সিদ্ধার্থকফলোপেতাঃ সর্ব্বদা ফলশোভিতা।
জায়ন্তে পত্রপুষ্পাঢ্যা সচ্ছায়া রোগবর্জ্জিতাঃ।

অঙ্কোলের কাথজলে মিশ্রিত ঘৃত ও মাক্ষিক, শ্বেত সর্ষপ এবং ঘোড়া ও শূকরের বসার সার দিলে সেই বৃক্ষ পত্রপুষ্পদ্বারা সুশোভিত ও ছায়াযুক্ত এবং রোগশূন্য হইয়া থাকে।

(৩)

যষ্টিমধুক-পুষ্পানি সিতা কুষ্ঠং সমাক্ষিকং।
নিঃক্ষিপ্য গুলিকাং কৃত্বা মূলে সর্ব্বত্র নিঃক্ষিপেৎ॥
দুগ্ধসেকঞ্চ বৃক্ষস্য যস্য কুর্য্যাদ্‌ বিচক্ষণঃ।
ফলং সুনিশ্চিতং তস্য মধুরং জায়তে স্ফুটং॥

যষ্টি মধুর পুষ্প, চিনি, কুড় ও মধু একত্র মিশাইয়া গুলিয়া বৃক্ষের মূলে নিক্ষেপ করিবে, তাহার উপর দুগ্ধ সেচন করিলে অবশ্যই সেই বৃক্ষের ফল সুমিষ্ট হইবে।

পূর্ব্বকালে এইরূপ লোকাতীত কৃষিতত্ত্ব ভারতীয় সুধীসমাজে কেমন সরলভাবে আলোচিত হইত, তাহা ভাবিলেও পুলকিত হইতে হয়।

বৌদ্ধদর্শনে উদাহরণস্থলে একস্থলে লিখিত আছে—

(১)

কার্পাসের বীজ আল্‌তার রসে ভিজাইয়া রোপণ করিলে সেই বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষে রক্ত কার্পাস ফলিতে থাকিবে।

(২)

পাতঞ্জলদর্শনের একস্থানে লিখিত আছে,—বেত্রবীজ অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া রোপণ করিলে, তাহা হইতে কদলীকাণ্ডের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

কৃষিতত্ত্ববিদ্ মহাত্মাগণ এই সকল শাস্ত্রীয়তত্ত্বের পরীক্ষা করিতে পারেন। (সুরমা)

বাগানের মাসিক কার্য্য

জ্যৈষ্ঠ মাস।

কৃষিক্ষেত্র।—এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউশ ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুন ভাঁটি বান্ধিয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়। শাঁকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সব্জী বাগ,—এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল হইতে ইতি মধ্যে ভুট্টা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স, পালা ঝিঙ্গা, পালা শশার বীজও এই মাসে বপন করা চলে। বর্ষাতি মুলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে। জলদি ফুল কপি খাইতে গেলে এই সময় হইতে পাটনাই ফুল কপি বপন করিয়া চারা তৈয়ারি করিতে হইবে।

ফুলবাগিচা।—এইসময় জিনিয়া, দোপাটী, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজ ও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়া মূল এই সময় বসাইতে বলেন, আমরা কিন্তু বলি আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূল গুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে, সেই জন্য বর্ষান্তে বসাইলেই ভাল। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্বে কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমরান্থাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মাটিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ বপনের এই সময়।

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্য্য। তবে কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের থাপকলম করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কিন্তু ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। বাঁধা কপি ও ফুলকপির বীজ এখন বপন করা যায়।

REGISTERED No. C. 104.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

পঞ্চদশ খণ্ড,—২য় সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সুরমা ও সুকেশ।

সুকেশ না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। বস্তুতঃ কেশই কামিনীগণের প্রধান সৌন্দর্য্য। নিখুঁৎ সুন্দরীকেও কেশের অভাবে বড় কদর্য্য দেখায়। অতএব কেশের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। উপায় থাকিতে তাহাতে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? শুনেন নাই কি?—আমাদের "সুরমা" তৈল কেশের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে অদ্বিতীয়! "সুরমা" ব্যবহারে অতিশীঘ্র কেশ ঘন, দীর্ঘ কাল ও কুঞ্চিত হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। সন্দেহ করিবেন না, শুধু ইহাই নহে,—"সুরমা" মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাজ্বালা, অনিদ্রা প্রভৃতি যন্ত্রণারও সত্বর উপশম করে। কোন ঔষধে যে টাক ভাল করিতে পারেন নাই, একবার সুরমা ব্যবহার না করিয়া, তাহাতেও হতাশ হইবেন না। বিশ্বাস রাখিবেন—সুরমার সদ্‌গন্ধ—জগতে অতুলনীয়। বড় একশিশির মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা। একত্র বড় তিন শিশির মূল্য ২৲ টাকা, মাশুলাদি ৸৶৹ আনা। ৶৹ আনার টিকিট পাঠাইয়া নমুনা লউন।

সূতিকারিষ্ট।

সূতিকারোগ স্বভাবতই দুঃসাধ্য। প্রসবকালে অতিরিক্ত রক্তস্রাবাদি কারণে দেহ একবারে ভাঙ্গিয়া যায়। কাজেই যে কোন রোগ সে অবস্থায় উপস্থিত হইলে, তাহা মারাত্মক হইয়া উঠে। আমাদের 'সূতিকারিষ্ট' সূতিকারোগসমূহের বিশেষ পরীক্ষিত অব্যর্থ মহৌষধ। অজীর্ণ, অক্ষুধা, অম্লপিত্ত, পেটফাঁপা, ভেদ-বমি, জ্বর, দুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতা প্রভৃতি উৎকট অবস্থায়, সূতিকারিষ্ট আশ্চর্য্য উপকার করিয়া থাকে। যাঁহাদের দুগ্ধ অল্প, তাঁহারাও এই ঔষধ সেবনে আশানুরূপ উপকার পাইবেন। গর্ভাবস্থা হইতে এই ঔষধ সেবন করিলে, কোনরূপ সূতিকারোগ আক্রমণ করিতে পারে না। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

কর্ণ-বিন্দু।

কাণ পাকিলে বা কাণে জল ঢুকিলে, কাণের ভিতর দারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়। সে সময়ে দুই একবিন্দু 'কর্ণবিন্দু' কাণে দিলেই তৎক্ষণাৎ সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হইয়া, ক্রমশঃ পুয়স্রাব বা জলস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। কাণের ভিতর নানাপ্রকার শব্দ হইলে, কিংবা কাণে কম শুনিলেও এই ঔষধ ব্যবহার করিবেন। ইহা কর্ণরোগ মাত্রেরই আশু উপকারী অমোঘ মহৌষধ। এক শিশির মূল্য ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ পাঁচ আনা মাত্র।

গন্ধদ্রব্য।

আমাদের প্রত্যেক ফুলের অটো—যথা অটো ডি রোজ, অটো ডি খস্‌খস্‌, অটো ডি মতিয়া, অটো ডি নিরোলী প্রভৃতি, সকলের নিকট সমান আদরণীয়। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র, মাশুলাদি ।৶৹ পাঁচ আনা। আমাদের ল্যাভেণ্ডার-ওয়াটার এক শিশি বার আনা, ডাক মাশুল ।৶৹ আনা। অডিকলোন এক শিশি ॥৹ আনা, ডাক মাশুল ।৶৹ আনা।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্‌।

পেটেণ্ট ঔষধে অবিশ্বাসী রোগী একবার আমাদের ঔষধগুলি
শেষ পরীক্ষা না করিয়া কখনও হতাশ হইবেন না।

দি, নিউ ফরমুলা কোম্পানী প্রশংসাপত্র না ছাপাইয়া মফঃস্বল হইতে এত দম্ভ করিয়া পেটেণ্ট ঔষধে অবিশ্বাসী রোগীকে আহ্বান করিতেছে কেন একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক বিশ্বাস করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আলছারিণ।—আমাদের আলছারিণে পারদাদি দূষিত ও জৌবিক বিষাক্ত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে আদালতে দণ্ডনীয় হইব।

বিনা অস্ত্রে আলছারিণ নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রকার ক্ষত, দূষিত পচা ক্ষত, ফোড়া, বাগী, কারবাঙ্কোল অতি সত্বরে সারাইয়া থাকে।

আলছারিণ।—নালীঘা, ভগন্দর ও উপদংশের ব্রহ্মাস্ত্র।

আলছারিণ।—দূষিত ক্ষত ও বিস্ফোটকের তীব্র জ্বালা সদ্য সদ্যই নিবারণ করিয়া থাকে, ইহা কখনই বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নহে।

আলছারিণে।—ক্ষত ধুইতে হয় না,—আলছারিণে ব্যাণ্ডেজ করিতে হয় না।

আলছারিণে।—অস্ত্র ও প্রোবের ছায়াও মাড়াইতে হয় না। এমন নির্দ্দোষ ঔষধ এমন মূল্যবান ঔষধের মূল্যও এজেন্টগণের অনুরোধে অনেক কম করিয়াছি। মূল্য শিশি ৸৵০ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। বিনামূল্যে বিবরণ পত্র পাঠাই।

কখনও শুনিয়াছেন কি? সোডা ও পটাস বিবর্জ্জিত
এসিডের আস্বাদ নাই সেবনে সুস্বাদু, অজীর্ণ
অম্লের কোন ঔষধ হইতে পারে?

আমাদের এণ্টাসিডি।—ব্যবহার করুণ এ সকল কিছুই নাই; সেবনে সুস্বাদু অজীর্ণ, কোষ্ঠ বদ্ধ ২।১ দিন অন্তর কঠিন কাল মল ত্যাগ, অম্ল, বুকজ্বালা, পেট ফুটফাট, আহারের পর পেটে বেদনা ধরা, পেটজ্বালা, সকাল সন্ধ্যায় মুখ দিয়া জল উঠা, এমন কি অম্লশূল ও অন্ত্রক্ষতে যাঁহারা দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন তাঁহারা একবার আমাদের এণ্টাসিডি ব্যবহার করিয়া দেখিবেন। মূল্য বড় শিশি ১।০ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। বিনামূল্যে বিবরণ পত্র পাঠান হয়।

বাতঘ্নী।—আমাদের বাতঘ্নী কেবল সর্ব্ব প্রকার বাত, রিউমাটিজম, গাউট, গণোরিয়া বা উপদংশ জাত বাতের মহৌষধ নহে, অর্কাইটিস (অণ্ডকোষ প্রদাহ) ও একশিরার প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ পরীক্ষিত মহৌষধ, এইসঙ্গে প্রসিদ্ধ আলম বুড়ির বাত ও একশিরার মাদুলীও বিনামূল্যে দিয়া থাকি। মূল্য শিশি ১।০ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

আমাদের পারদ বিহীন দ্রুক্রলীন।—সর্ব্বপ্রকার দাদ, কোচদাদ, কেশদাদ, রসযুক্তদাদ একজিমা, বিখাজের ফলপ্রদ ঔষধ, কাপড়ে দাগ লাগে না, সুগন্ধী, যন্ত্রণা নাই।

ভদ্রলোক ও স্কুল, কলেজের ছাত্রদিগের বিশেষ উপযোগী মূল্য শিশি ।৵০ আনা মাত্র।

দি, নিউ ফরমূলা কোম্পানী।
পোঃ কান্দী, মুর্শিদাবাদ।

কৃষক।

সূচীপত্র।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ খণ্ড। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ সাল। | ২য় সংখ্যা।

রাস্না বা অর্কিড

উপক্রমণিকা

অর্কিড তত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিত

যাঁহাদের সখের বাগান আছে, যাঁহারা বাগানে নানা প্রকার ফুল ফুটাইতে চান, লতা, গুল্মে, গাছে ফুলের শোভা দেখিতে চান, তাঁহাদের বাগানের পুষ্পশোভা যেন সম্পূর্ণ হইবে না যদি তাঁহাদের বাগানে অর্কিডের ফুল না ফুটে। গাছের গায়ে, দেওয়ালের গায়ে, গৃহের ছাদ হইতে লম্বমান রজ্জুতে বাঁধা কিম্বা মৃত্তিকা সংলগ্ন কৃত্রিম পাহাড় গাত্রে অর্কিডের যখন পুষ্পোদ্গম হয় তখন বাগানটি এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। আমরা বাহিরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনুকরণে ঘর, বাড়ি, বাগান সাজাই এবং অনুকরণটি যত স্বাভাবিক হয় তত সুন্দর দেখায়। সময় সময় সর্ব্বোপমা দ্রব্যের একত্র সম্মিলনে বুঝি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে হার মানাইয়া দেয়। সেই জন্য উদ্যান যাঁহাদের প্রিয় তাঁহাদিগকে আমরা অর্কিড পালন শিক্ষা করিতে বলি। এমন কিছু কঠিন কাজ নহে, যাঁহারা গোলাপ চাষ জানেন, ক্যানা, ক্রিসান্থিমমের (Chrysanthemum) ফুল ফুটাইতে পারেন, তাঁহারা অর্কিডেরও ফুল ফুটাইতে পারিবেন। অর্কিড জাতীয় গাছের মর্ম্ম সৌখীন লোকে বুঝিতেছেন এবং ক্রমশঃ সাধারণের নিকটও তাহার আদর বাড়িতেছে। অন্যান্য ফুলের সহিত অর্কিডের ফুলের বিচিত্র আকার, জমকাল দৃশ্য, রঙের উজ্জ্বলতা ও মনোহারীত্বের তুলনা করিলে মনে হয় যে অর্কিডের ফুল বিধাতার সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আদর্শ। কোন কোন ফুলের গঠনের সহিত ফলমূলের সাদৃশ্য আছে, শুধু তাহাই নহে কোন ফুল দেখিতে টিকটিকি গিরগিটির মত, কোনটি দেখিতে ঘুঘু পাখীর মত, কোন গুলি মক্ষিকাকৃতি। কতরকমের আকার যে আছে

তাহার সংখ্যা নাই। অর্কিড ফুলের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার ফুল শীঘ্র ঝরিয়া যায় না, এমন কি ৩ হইতে ৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত ইহার সৌন্দর্য্য মলিন হয় না।
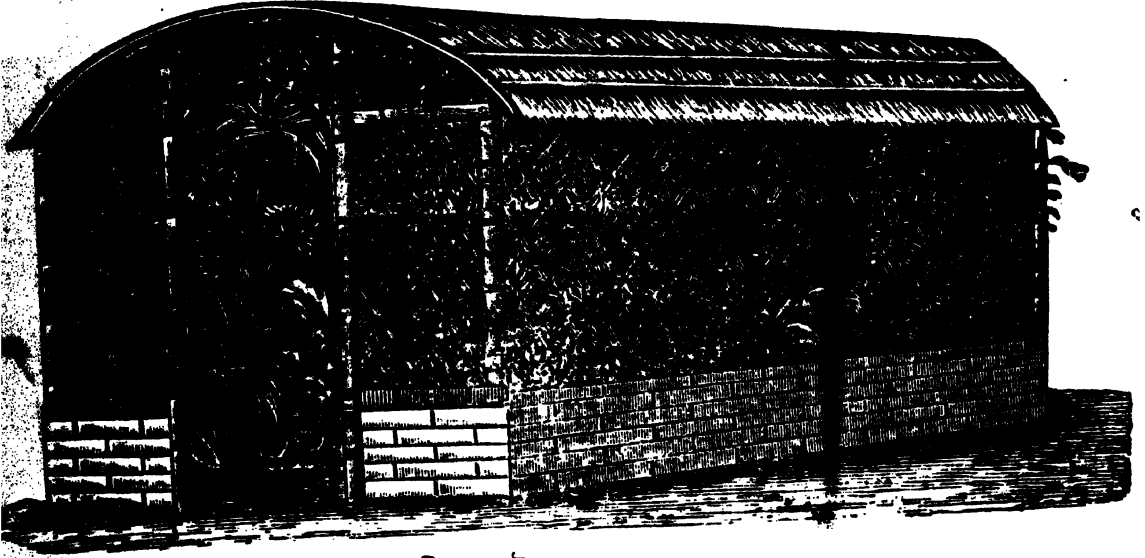
গ্রীণ হাউস বা গাছ ঘর

গ্রীণ হাউস বা গাছ ঘর কাহাকে বলে সৌখীন উদ্যান স্বামীগণ সকলেই অবগত আছেন। সাধারণতঃ আমরা বুঝি যে, কতিপয় বৃক্ষ, গুল্মাদিকে আবশ্যকানুযায়ী ঠাণ্ডায় রাখিবার জন্য আমরা যে ঘর বাঁধি তাহাকে গাছ ঘর বলে। এই ঘর আশেপাশে উপরে উলু দ্বারা পাতলা করিয়া ছাওয়া। সূর্য্য রশ্মি প্রবেশ করিবে বটে কিন্তু রৌদ্রের প্রখরতা গাছ গুলিকে স্পর্শ করিবে না, কুয়াসার আকারে বৃষ্টিকণা প্রবেশ করিবে বটে কিন্তু প্রবল বারিধারা গাছ গুলির উপর পড়িবে না, হাওয়া চলাচল করিবে বটে কিন্তু হাওয়ার প্রবল বেগ প্রশমিত হইয়া তবে ঐ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবে। এই ঘর গুলি গ্রীষ্মকালে শীতল থাকে এবং শীতের দারুণ ঠাণ্ডা হাওয়া যখন প্রবাহিত হয় তখন এই ঘর অপেক্ষাকৃত গরম থাকে। বাঙলার নিম্ন ভূভাগে অর্কিড পালন করিতে হইলে যে অর্কিড গুলিকে ঠাণ্ডায় রাখিতে হইবে তাহাদের জন্য এই রকম একটি ঘরের প্রয়োজন, যেমন পাহাড়ের উপর ঠাণ্ডা হইতে গাছ গুলিকে বাঁচাইবার জন্য কাঁচ নির্ম্মিত ঘরের প্রয়োজন। কোন কোন অর্কিড বাহিরে মুক্ত বাতাসে জন্মান চলে।
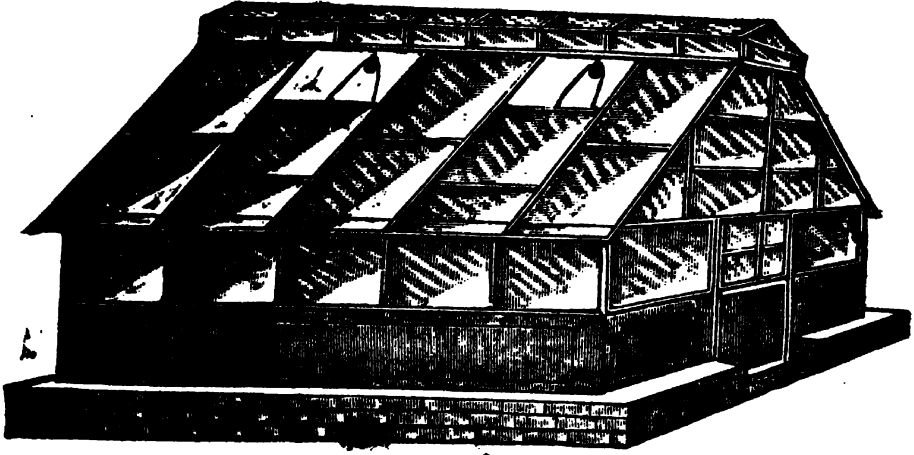
কাঁচঘর বা কনসারভেটরি

কাঁচ ঘর নিম্নে কিয়দূর্দ্ধ পর্য্যন্ত কাঠের পেনেল, তদুপরি চারিদিক কাঁচের ফ্রেমে আঁটা। উপরে বায়ু চলাচলের পথ আছে। উপরের দুই খানি কাঁচ ইচ্ছামত খোলা কিম্বা দেওয়া যায়। এই ঘর ইচ্ছামত গরম ও ঠাণ্ডা করা যায়। পরদেশীয় গাছগুলি তাত বাত সহিষ্ণু করিবার জন্য এরূপ ঘরের নিতান্ত প্রয়োজন। গরম দেশের অনেক গাছ শীত প্রধান দেশে কাঁচ ঘরের ভিতর ভিন্ন জন্মে না।

প্রথমে সামান্য ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়, ক্রমশঃ অর্কিড পালনে জ্ঞান জন্মিলে দুই তিন বৎসরের মধ্যে তুমি একজন সুনিপুণ অর্কিড পালক হইয়া উঠিবে। এই কার্য্যের একটু পারিপাট্য আছে বটে কিন্তু নিতান্ত কঠিন নহে। দুই চারি জনে পারে না বটে কিন্তু তুমি আমি চেষ্টা করিলে না পারিব কেন?

অর্কিড জন্মাইবার ও পালনের কৌশল বুঝিয়া লইতে পারিলে অন্য গাছ জন্মানর মত ইহাও কার্য্যে সহজ হইয়া যায়। কোন্ অর্কিড কি রকম আবহাওয়ায়, কি প্রকারে জন্মে তাহা জানা থাকিলে তুমি সেই রকম অবস্থায় সে গুলিকে জন্মাইতে ও বাড়াইতে পার ইহার আর বিচিত্র কি?

এখন এই অবস্থা গুলি কি, তাহার বিচার করা যাউক। এক কথায় এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। অর্কিড খুব গরম ও সরস নিম্নভূমিতে আছে, আবার উচ্চ পর্ব্বত শিখরে যেখান হইতে কিছু উর্দ্ধে গমন করিলেই তুষার মণ্ডিত গিরিচুড়া দেখিতে পাওয়া যায় সেখানেও আছে। কতকগুলি অর্কিড, উচ্চ গাছের অনাবৃত গাত্রে উন্মুক্ত বাতাসে বেশ জন্মিয়া আছে, কোন কোন অর্কিড দেখা যায় যে নদী, সরোবর বা অন্য জলাশয়ের উপর যে গাছ বা পাহাড় হেলিয়া, ঝুঁকিয়া আছে তাহাদের গাত্রে জন্মিতেছে, অপর শ্রেণীয় অর্কিড আর্দ্র পাহাড় বা, মাটিতে বেশ স্বচ্ছন্দে বৰ্দ্ধিত হইতেছে। কখন বা দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে, যেখানে

সূর্য্যালোকের প্রবেশ পথ নাই বলিলেই হয় সেখানেও অর্কিড ফুটিয়া থাকিতে দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় এত পার্থক্য যে, কোন অর্কিড পালন করিতে হইলে তাহার স্বাভাবিক অবস্থার ও তাহার নিজ স্বভাবের পর্য্যালোচনা করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়ে।

বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা অর্কিড জাতীয় গাছ গুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লইতে পারি (১) Epiphital বা সহজীবি, যে গুলি গাছের উপর জন্মে অথচ বৃক্ষ হইতে রস বা আহার গ্রহণ করে না; (২) Terestrial বা ভৌম, যে গুলি মাটিতে জন্মে; (৩) Parasital বা পরজীবি, যে গুলি অন্য বৃক্ষাদির উপর জন্মে এবং সেই উদ্ভিদ রস হইতে পরিপুষ্ট হয়। প্রথম দুই শ্রেণীর অর্কিডই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই দুই শ্রেণীরই প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের দেশের সাধারণতঃ ধারণা এই যে, অর্কিড মাত্রকেই এক খণ্ড কাঠে জড়াইয়া বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিলেই তাহারা বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাহাতে পুষ্পোদগম হয়। এই ধারণা নিতান্ত ভুল। কোন্‌টি ভূমিজ (Terrostrial) কোন্‌টি বায়ুজীবি (Epiphital) ভাল করিয়া চিনিয়া লইতে হইবে এবং যে যে প্রকৃতির অর্কিড তাহাকে সেই রকমে পালন করিতে হইবে।

অর্কিডের ফুল দেখিলে মন বিমোহিত হয় এবং প্রাণে এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভূত হয়, মনে হয় প্রকৃতি কতই সাজ সজ্জা করিয়া সেই পরম পুরুষের সেবায় নিযুক্ত আছেন। সৌন্দর্য্যে মানব মন প্রেমরসে আপ্লুত হইয়া উঠে এবং যিনি এই সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া পরম পুরুষের সন্ধান দিতেছেন সেই প্রকৃতি দেবীর পুজা আগে আবশ্যক, হৃদয়ে এই মহাভাব জাগিয়া উঠে।

যাঁহারা দার্জিলিঙ কিম্বা সিলঙের শৈলমালায় পরিভ্রমণ করিতে গিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই অর্কিডের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হন এবং প্রত্যাবর্ত্তন কালে স্বস্থানে পালন করিবার মানসে দুই চারিটা অর্কিড ক্রয় করিয়া বা লোক দ্বারা আহরণ করাইয়া লইয়া আসেন। তাঁহারা প্রায়ই অর্কিড পালনে অনভিজ্ঞ। অর্কিডের স্বভাব না বুঝিয়া যথেচ্ছা কাঠে ঝুলাইয়া দিয়া বা গামলায় বসাইয়া দিয়া সেগুলিকে মারিয়া ফেলেন। দার্জিলিঙ ও সিলঙ অনেক উচ্চে অবস্থিত এবং ঐ সকল স্থানের আবহাওয়া সাতিশয় শীতল। এই সমস্ত আর্দ্র শীতল প্রদেশ হইতে অর্কিড আনিয়া নিম্ন স্থানের প্রখর খোলা রৌদ্রে রাখিয়া দিলে সেগুলি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং অবশেষে মরিয়া যায়। অনেক সময় যে অর্কিড গুলি তাঁহারা শৈলাবাস হইতে সাধারণ ফিরিওয়ালার নিকট হইতে খরিদ করিয়া আনেন, সে গুলি নিতান্ত খারাপ ও রুগ্ন গাছ এবং অযত্ন পালিত বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব অধিক কাল থাকে না। আমরা এই রকমের কতশত গাছ পাল্টিত হইতে

দেখিয়াছি, পালন কর্ত্তা কতই না যত্ন করিতেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাতে ফুল হয় না। পালনকর্ত্তা ক্রমশঃ হতাশ হইয়া পড়েন এবং মনে করেন যে অর্কিড পালন দুঃসাধ্য ও পরিত্যজ্য।

নিম্ন ভূমিতে যে অর্কিড গুলি জন্মিবে সেই গুলি লইয়া প্রথমে অর্কিড পালন আরম্ভ করিলে আর বিফল মনোরথ হইতে হয় না। আমরা জানি যে অনেক গুলি অর্কিড নিম্ন ভূমিতে জন্মিবে, আবার কতকগুলি পর্ব্বতে ঠাণ্ডায় ব্যতীত জন্মিবে না। সুবুদ্ধি অর্কিড পালক ভূমিজ অর্কিডগুলিকে কাঠে বাঁধিয়া টাঙ্গাইয়া দিয়া এবং বায়ুভূক অর্কিডগুলিকে গামলায় বসাইয়া মারিয়া ফেলেন না কিম্বা উচ্চ পর্ব্বত শিখরের অর্কিড আনিয়া নিম্ন ভূমিতে অথবা নিম্ন ভূমির অর্কিড লইয়া গিয়া তুষারাবৃত পাহাড় গাত্রে পালন করিবার বিফল প্রয়াস করেন না।

তিনি অর্কিডের প্রকৃতি ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করেন এবং যে গুলি লইয়া তিনি পালন করিবেন সেই অর্কিডগুলি তাহার স্বাভাবিক বাসস্থানে কি প্রকারে জন্মিতেছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং তাহাদের স্বাভাবিক অবস্থার অনুকূল অবস্থায় তাহাদিগকে পালন করিবার চেষ্টা করেন। সকলের পক্ষে প্রত্যেক অর্কিডের আবাস স্থান বা স্বাভাবিক অবস্থা দেখিয়া বেড়াইবার সুযোগ ঘটা সম্ভব নহে; তাঁহাদিগকে এই জন্য অর্কিড তত্ত্ববিদের নিকট পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে হয়।

সুদক্ষ অর্কিড পালক বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখেন যে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে যখন উত্তাপ অধিক এবং বায়ু আর্দ্র তখন অর্কিড গুলি বর্দ্ধিত হয়, শীতকালে, শীতের শুষ্ক আবহাওয়ায় তাহাদের শরীর যৎসামান্য বা কিছুই গঠিত হয় না। এই কালই শীত নিদ্রার কাল, এই সময় বৃক্ষ লতা অসাড় হইয়া থাকে। এই সময় স্থির ভাবে থাকিতে পাইলে তবে পরবর্ত্তী কালে পুষ্পোদ্গমের সুবিধা হয়। ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া তাহারা সঞ্চিত নবশক্তি দ্বারা পুষ্পোদ্গমে প্রয়াসী হয়। যদি বৃক্ষ লতাকে ঘুমাইতে না দিয়া জাগাইয়া রাখা যায় তাহারা তাহাদের শীত কালীন জড়তা পরিত্যাগ করিয়া শীত কালেও তাহাদের অঙ্গ গঠনে প্রবৃত্ত হইতে পারে কিন্তু তাহারা অঙ্গে পুষ্পশোভা ধারণ করিবে না।

অর্কিডগণ ছায়াযুক্ত স্থানে থাকিতে ভালবাসে। গাছের ছায়া তাহাদের বড় প্রিয়। তাহারা গাছ লতায় যতটুকু আবশ্যক উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় অথচ সূর্য্যের প্রখর কিরণ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। উহাদের গাত্রে অন্তর্নিহিত গ্রন্থি সমূহ স্ফীত করিয়া তোলা ও তাহাহইতে পত্র পুষ্প উদ্গত করা উষ্ণতার কার্য্য। যেখানে বর্ষা বেশী হয় সেই খানেই অর্কিডের আবাস। যেখানে আবহাওয়া বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ তিন চারিমাস আর্দ্র থাকে সেই স্থানেই অর্কিড জন্মে।

তাহারা শৈত্য ভালবাসে তাহাদের গ্রন্থী প্রদেশে বা শিকড়ে জল বসিলে বা পচাজল জমিয়া থাকিলে তাহারা প্রীত হয় না। তাহারা এই কারণে পর্ব্বত গাত্রে বা গাছের গায়ে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে ভাল বাসে। এমতাবস্থায় জল প্রবাহিত হইয়া তাহাদের মূল দেশ বা শিকড়ের উপর দিয়া সর্ব্বদা চলিয়া যাইতে পারে কিন্তু জল তাহাতে গোড়ায় কখন জমিয়া থাকিবে না। (ক্রমশঃ।)

আলুর চাষ।

কর্ণেলের কৃষি সদস্য শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার লিখিত

বিলাতি আলু একটি প্রধান তরিতরকারি। ইহা সভ্য জগতে প্রথমে সারওয়াল্টার রেলে আনয়ন করিয়া বিলাতে চাষ প্রবর্ত্তন করেন। ১৫৯২ সালে ভারতের প্রধান মোগল সম্রাট বাদসাহ আকবর ইহা ভারতে আনয়ন করেন। তাহার পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্ব কেহ জানিত না। ইহা আয়রলণ্ড দেশের নিম্ন কৃষক-গণের প্রধান খাদ্য সামগ্রী। আমাদের দেশেও ইহা কি ধনী কি গরিব সকলেই ঝোলে, ডালে, অম্বলে, পোড়া ও ভাতে, চড়্‌চড়িতে, সকল প্রকারেই খাইয়া থাকে। আজকাল কৃষির উন্নতির সহিত প্রায় শতাধিক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় আলু পৃথিবীতে উৎপাদিত হইতেছে। আমাদের দেশে গোল আলু, চুবড়ী আলু, পালা আলু, রাঙ্গা আলু ইত্যাদি অনেক প্রকার আলু জাতীয় কন্দ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু গোল আলুর মত কোনটিও খাদ্য হিসাবে এত সাদরে গৃহিত হয় নাই। আলুর চাষ সম্বন্ধে বিলাতী বহু পুস্তক আছে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবোধ বাবুর পুস্তক এবং ২।৪টি মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধ ছাড়া বড় কিছু দৃষ্ট হয় না। ভাদুই ফসল উঠিয়া যাইবার পর সেই ক্ষেত্রে কর্ষণ করিয়া সার দিয়া আলু রোপণ করাই প্রশস্ত। আলুর জমীতে ৬।৭ বার বেশ করিয়া শিবপুর লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিয়া ক্ষেতের ঢেলা মাটী ভাঙ্গিয়া সমান করিয়া দিবে। তাহার পর মাটীতে সার দিবে। প্রত্যেক বিঘায় নিম্নলিখিত রূপ সার দিবে—

১।	হাড়ের গুঁড়া	...	...	২	মণ।
	রেড়ির খোল	...	...	৬	,,
২।	গোবর	...	...	২০০	,,
	রেড়ির খোল	...	...	৬	,,
৩।	গোবর	...	...	২০০	,,
	হাড়ের গুঁড়া	...	...	২	,,

৪।	গোবর	...	...	১০০	মণ।
	ছাই	...	...	২৫	,,
৫।	অথবা হাড়ের চূর্ণ	...	...	৪	,,
	রেড়ির খোল	...	...	২	,,

আলুর চাষে সার কিছু বেশী লাগে এবং যে সার প্রয়োগ হয় তাহার কতকটা জমিতে থাকিয়া যায় এবং পরবর্ত্তী ফসলের ফলন বৃদ্ধি করিয়া কৃষকের লাভ রূপে আনন্দ বর্দ্ধক হইয়া থাকে। আমি ৪ নং সার নিজ ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া সর্ব্বোচ্চ সুফল পাইয়াছি। গোবর সার খুব পচা ও পুরাতন হওয়া দরকার নচেৎ কচিগাছে পোকা ধরে। গোবরের পরেই ছাই দেওয়া কর্ত্তব্য। আলুর জমি উপর্যুপরি হাল দিয়া মৈ দিয়া মাটী ধুলা সই করিতে হয়। হাড়ের গুঁড়া প্রথম মাটী ধরাইবার সময় অর্দ্ধেক এবং বক্রী দ্বিতীয় বার মাটী ধরাইবার সময় প্রয়োগ করা উচিত। আমি আলু রোপণ, জল সেচনাদি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে লিখিব না কারণ তাহা কৃষক মাত্রেই জানেন। তাহা কৃষক পত্রিকায় বা অপর কোন পত্রিকায় আলুর চাষ সম্বন্ধে পাঠ করিলেই জানিতে পারা যাইবে। আমাদের দেশে গোল এবং নইনিতাল এই দুই প্রকার আলু দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক বিঘা জমীতে নইনিতাল আলুর বীজ তিন মণের অধিক লাগে না। ঐ আলু কাটিয়া "চোখ" বসাইলেও চলে। বীজ ৬ হইতে ৮ বা দশ ইঞ্চি অন্তর বসাইতে হয়। প্রত্যেক সারি ১৷০ ফিট অন্তর হইবে।

প্রায় ১২ দিনের মধ্যে গাছ বাহির হয়, কিন্তু তাহা যদি না হয় তবে একবার জল সেচন করিতে হয়। তাহার পর মাটী ধরাইতে হয় এবং মাটী শুখাইয়া যাইলে জলের সেচ দিতে হয়। গাছ শুকাইয়া যাইলে চাষীরা আলু তুলিয়া থাকে। শুষ্ক চারা বা গাছের লতা পাতা গুলি পশু খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। রোগের মধ্যে আলুর ধ্বসা রোগ বড় মারাত্মক। তাহা নিবারিত করিবার জন্য ২০ ভাগ সালফেট্ অব কপার ও ১৫ ভাগ চুণ এবং হাজার ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া তাহা আলু গাছে সেচন করিলে এই রোগ হয় না। বীজের আলু বালির মধ্যে রাখাই শ্রেয়। শতকরা দুই ভাগ গন্ধক দ্রাবকে ১০০ ভাগ জল মিশাইয়া তাহাতে আলু ১০ ঘণ্টা ডুবাইয়া পরে শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিলে আলু বহুদিন পর্য্যন্ত ঠিক রাখা যায়। কিন্তু বীজের আলুকে কদাচ এই ঔষধে শোধন করিবে না। তাহাহইলে ইহার অঙ্কুর সব নষ্ট হইয়া যায়।

আলুর গাছের ও লতার বহু প্রকার শত্রু আছে। বহু প্রকারের কীট, পোকা গাছের ডগা ও গোড়া কাটিয়া গাছ মারিয়া ফেলে। পাতায়ও সময়ে সময়ে পোকা ধরে। ইহার প্রতিকার দোক্তা পাতা ভিজা জলের পিচ্‌কারী। অথবা বোর্দ্দো মিকৃশ্চারের দ্বারা স্প্রেকরা। ইহার বিবরণ "কৃষকে" প্রকাশিত হইয়াছে।

ভুষো কালি আলু রোপণ সময়ে দিয়া পুঁতিলে বিশেষ উপকার হয়। ঝুল এবং ভুষায় পোকা নষ্ট হয়। বিলাতে কৃষকগণ বৈজ্ঞানিক সার প্রয়োগ করেন। আমি চেশিয়ারের কৃষকগণকে নিম্ন লিখিত সার প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইতে দেখিয়াছি। সোডিনাইট্রেট্ অর্দ্ধ হন্দর, সাল্‌ফর এমোনিয়া ঐ পরিমাণ, সুপার ফস্‌ফেট্ও ঐ পরিমাণ এবং সাল্‌ফ্ বা মিউরেট্ পটাশ এক হন্দর একত্রে মিশাইয়া সার ক্ষেতে দিবে। তিসির ক্ষেতেও আমি নিম্নরূপ সার দিতে টেক্‌সাসে দেখিয়াছি। তথাকার কৃষকগণ অন্য প্রকার সার দিয়া ও বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। উপরের এবং পরবর্ত্তী সারের পরিমাণ একর পিছু প্রয়োজ্য। ইহা হইতেই আমাদের দেশে বিঘায় কত দেওয়া যাইবে তাহা কসিয়া বাহির করিয়া লইবে। তিসি খেতে দেয় সারের নিয়ম—

এমোন সাল্‌ফ	...	...	$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$—cwt
সুপার ফস্‌ফেট	...	...	৩ cwt
পটাস্ মিউরেট	...	...	$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$—cwt

ক্রমশঃ।

সরকারী কৃষি সংবাদ

চট্টগ্রাম আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্র—

এই ক্ষেত্রটির পরিমাণ ৪৮ একর। ইহার মধ্যে ৮ একর পাহাড় ও জঙ্গলে আবৃত। অবশিষ্ট জমি ৫ বৎসরের জন্য পাট্টা দিয়া বিলি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাট্টাদারের সহিত বন্দোবস্ত এই যে গভর্ণমেণ্টের পরামর্শ মত অন্ততঃ ৬ একর জমিতে চাষ করিবেন। বাকী জমি তিনি ইচ্ছা মত ব্যবহার করিতে পারেন। মৌলভি আমজাদ আলীকে এই জমি বিলি করা হইয়াছে। তিনি একজন অবসর প্রাপ্ত সবডেপুটী কলেক্টর। তিনি গভর্ণমেণ্টের পরামর্শমত চাষ আবাদ করেন নাই, উপরন্তু রাস্তা, সাঁকো, খামার, ক্ষেত্রস্থিত ঘর দুয়ার গুলি বেমেরামতে খারাপ করিয়া ফেলিয়াছেন। মেয়াদন্তে জমি তাঁহার নিকট হইতে লওয়া হইবে এবং আর বিলিকরা হইবে কি না সন্দেহ। গভর্ণমেণ্ট মতলব করিতেছেন যে এখানে পশু-রক্ষণ ক্ষেত্র নিদ্ধারিত হইবে এবং তাহা হইলে সমস্ত জায়গাটাই সেই কার্য্যে আবশ্যক হইবে।

[এই প্রকার আদর্শক্ষেত্র স্থাপন করিয়া তাহা চাষীগণের মধ্যে বিলিকরা আমাদের একান্ত ইচ্ছা। অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী কিম্বা সমাজে গণ্য মান্য উচ্চ পদস্থ লোক দেখিয়া জমি বিলি করা নিতান্ত ভুল। প্রকৃত চাষী লইয়া একযোগে কার্য্য করিলে গভর্ণমেণ্ট অধিকতর সুবিধা বুঝিতে পারিবেন এবং তাহাতে চাষীরও কল্যাণ হইবে। তাহারা যদি অৰ্দ্ধ খাজনায় ভাল জমি পায়, গভর্ণমেণ্ট সাহায্যে অল্প মূল্যে ভাল বীজ পায় এবং চাষের নূতন পন্থা যদি তাহাদিগকে হাতে হাতিয়ারে দেখাইয়া দেওয়া হয় তবে তাহারা ভদ্রতাভিমানী লোক অপেক্ষা নিশ্চিতই অধিক কার্য্য করিবে। কৃঃ সঃ]

পাহাড়িয়া আলু—

পূর্ব্ববঙ্গে চাষীদের মধ্যে আলু চাষের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। যে কোন চাষী তথায় আলু চাষ করে তাহারা পুনঃ পুনঃ একস্থানের বীজ লইয়া চাষ করিয়া আলুচাষের কোন ভাল ফল বা উন্নতি দেখিতে পায় না। গভর্ণমেণ্ট এই কারণে পাহাড়িয়া আলু আনাইয়া বিশিষ্ট চাষীগণের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন এবং সরকারী লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে নূতন কৌশলে আলু চাষ শিখাইয়া দিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে চাষীর উপকার করিতে হইলে এই উপায়ই অবলম্বন করিতে হয়। ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, ভারেঙ্গা, নাটোর, এবং জলপাইগুড়িতে আলু চাষের বন্দোবস্ত করায় ফল ভালই হইয়াছে।

রাজসাহীতে দার্জ্জিলিঙ ও ইতালীয় আলু—

রাজসাহী গভর্ণমেণ্ট-ক্ষেত্র চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দার্জ্জিলিঙ এবং ইতালীর আলুই ভাল রকম জন্মায়। জেলার অন্যান্য স্থানেও এই দুই শ্রেণীর আলু চাষে লাভ হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে আলু চাষের পরীক্ষাকালে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করা হইয়াছে, বড় বড় বীজ আলু আস্ত বসাইয়া ফলন অধিক দাঁড়াইয়াছে।

রাজসাহীতে ধান—

এখানে সাধারণ চাষীরা মরিচবতী আউশ ধানের আবাদ করিয়া থাকে। ধান কাটিবার সময় যদি ভাল বীজ ধান সঞ্চয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা যায় তাহাহইলে এই ধানের আরও উন্নতি হইতে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে ধানের চাষ আয়কর সেই ধানই সেই জেলাতে সকলেই আবাদ করিয়া থাকে।

রাজসাহীতে আখ ও আলু—

এখানকার মাটি আখ এবং আলু চাষের বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখানে আলু এবং আখ চাষের একটা প্রধান সুবিধা এই যে, এই দুইটি ফসলের জন্য অন্যত্র সেচের আবশ্যক হইলেও এখানে জল সেচনের আবশ্যকতা দেখা যায় না এবং সারের মধ্যে একর প্রতি ১৫০ মণ গোময় সারই পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হয়।

গভর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রে রঙপুরের ভেণ্ডামুখী এবং হুগলির শ্যামসাড়া আখের চাষ করা হইয়াছিল। ইহাতে গুড়ের পরিমাণ অধিক হইয়াছে। একর প্রতি স্থানীয় ইক্ষু অপেক্ষা ২০ মণ অধিক গুড় উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এখানকার লোকে স্থানীয় ইক্ষুর চাষই অধিক পসন্দ করে, কারণ তাহার চাষে খরচ খুব কম। স্থানীয় ইক্ষু অনেকটা খড়ি শ্রেণীয়।

বুড়িরহাট ক্ষেত্রে তামাক—

রঙপুর জেলাতে সাধারণ চাষীতে এক একরে ১০ হইতে ১৫ মণ তামাক উৎপন্ন করে। সেই তামাকের দর ১৫৲ টাকা মণ। ভালজাতীয় বড় পাত তামাক ২০৲ টাকা এবং নিরেষ বিষপাত তামাক ৮৲ হইতে ১০৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়। কিন্তু বুড়ীর হাট ক্ষেতে একর প্রতি ১৫ হইতে ২০ মণ তামাক পাতা জন্মিয়াছে। সেই পাতা চুরুটের গায়ে জড়াইবার উপযুক্ত। পাতাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া দর প্রতিবৎসরই বাড়িতেছে ১৯১০ সালে ৪০৲ টাকা মণ, ১৯১২ সালে ৯০৲

টাকা বিক্রয় হইয়াছে। ১৯১১ সালে ৯০৲ টাকা দর উঠিয়াছিল। কিন্তু এই প্রকার ভাল তামাক পাতা তৈয়ারি করিতে অনেক খরচ ও পরিশ্রম করিতে হয়। পাতা ছাড়াইয়া শুকাইতে হইবে, ঝাড়িতে বাছিতে হইবে, জাঁতদিতে ও ঘামাইতে হইবে ইত্যাদি অনেক খুটীনাটি কাজে অনেক আয়াস সহ্য করিতে হয়। তারপর ভাল তামাক বিক্রয়ের হাট মান্দ্রাজ কিম্বা ত্রিচিনাপল্লীতে। সেখানে পাতা পাঠাইতেও খরচ অনেক। যাহা কিছু অধিক লাভ হয় তাহা খরচে খাইয়া যায়। যতদিন না বাঙলায় চুরুট প্রস্তুতের কারখানা হইতেছে ততদিন এত ভাল তামাক উৎপন্ন করিয়া লাভ নাই। চলনসই তামাক চাষ করাই বরং লাভজনক। তামাক চাষের উন্নতি এই ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত বাবু কামিনী কুমার বিশ্বাস কর্তৃক সংসাধিত হইয়াছে।

বুড়িরহাটে সিগারেটের তামাক—

সিগারেট প্রস্তুতের জন্য আমেরিকান তামাক, তুর্কি তামাক ও সুমাত্রা তামাকের আবাদ করা হইয়াছে। আমেরিকান তামাক ১৯১২ সালে ২৬৷৹ টাকা মণ, তুর্কি তামাক ৭০৲ টাকা মণ বিক্রয় হইয়াছে। সুমাত্রা তামাকের আজিও দর ঠিক হয় নাই।

রঙপুর কৃষি ক্ষেত্র—

এখানে প্রধানতঃ হেউতি পাটের চাষ হয়। ইহার আঁস ভাল এবং ফলনেও অধিক।

বাদসাভোগ মিহিধান এই জেলায় ভাল জন্মায়।

আখ—গাণ্ডারি, শাদাটানা, ডোরাকাটা টানায় চাষে লাভ আছে। এই সকল ইক্ষু এদেশের মাটির উপযুক্ত। জল সেচন ব্যতীত এখানে একরে ১০০ মণ গুড় হয়। সার—একরে ১৫ গোময় এবং ১৫ মণ সরিষার খৈল দেওয়া হইয়াছিল।

রঙপুরে দার্জ্জিলিঙ আলু—

এখানকার মাটিতে দার্জ্জিলিঙ আলু বেশ জন্মায়। একর প্রতি কেবল মাত্র ৩০০ মণ গোময় ব্যবহার করিয়া ২০০ মণ আলু উৎপন্ন হইয়াছে। প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বড় বীজ আলু আস্ত বসানই লাভজনক।

জোয়ার কিম্বা রবিখন্দ জৈ ও মটর—

পশু খাদ্যের অভাব বোধ করিলে জোয়ার, জৈ কিম্বা মটর চাষ অনায়াসে করা যাইতে পারে।

রঙপুরে কৃষি-যন্ত্রের পরীক্ষা—মেষ্টন লাঙ্গল এবং প্লানেট হাতকোদাল এদেশের মাটির বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়।

কৃষি-বিভাগের বিশেষজ্ঞগণের অভিমত—

১। তত্ত্ববিদ্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাটের ক্ষেতে হাড়ের গুঁড়া ও চূণ ব্যবহার করিলে একই বৎসরে পাট ও সরিষা দুইটি ফসল জন্মিবে এবং দুইটি ফসলই লাভজনক হইবে।

২। ইক্ষুচাষ সম্বন্ধে মেগিট্ সাহেবের মত যে, আখের ক্ষেতে জমি পাইট ভাল রকম করিতে পারিলে এবং তাহাতে রেড়ীর খৈল ও চূণ সার দিলে যে ক্ষেতে একরে ১০ টন ইক্ষু জন্মিতে, সেই ক্ষেতে ৩০ টন ইক্ষু জন্মিবে। ১ টনের ওজন ২৭৷০ মণ।

৩। ঢাকায় মাটির পক্ষে হাড়ের গুঁড়া ও চূণ বিশেষ সার। সেখানে রবিখন্দে এই সার দেওয়া চাই।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ সাল।

শর্করা ব্যবসায়

শর্করা জীবন ধারণের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান না হইলেও ইহাও যে অল্প বিস্তর মাত্রায় শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য আবশ্যক হয় তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ভারতে শর্করা ফসলের মধ্যে অবশ্য ইক্ষুই প্রধান। অন্য গুলি নগণ্য। ইক্ষু ফসলের প্রাধান্য খাদ্য ও তৈল শস্যের পরেই। ১৯১১-১২ সালে সমস্ত ভারতে ২১৫৯ লক্ষ একর কর্ষিত জমির মধ্যে অন্যূন ২৪ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষু উৎপাদিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের সর্ব্বত্র কিছু সমান পরিমাণে ইক্ষু উৎপাদিত হয় না। নিম্নোলিখিত উদ্ধৃত তালিকা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—

প্রদেশের নাম	ইক্ষু উৎপাদনের জমির পরিমাণ একর হিঃ		একর প্রতি উৎপাদিত গুড়ের পরিমাণ	
যুক্ত প্রদেশ, আগ্রা ও অযোধ্যা	১,৩৪০,৬৩৭	...	২,৬০০	পাঃ
পঞ্জাব ...	২৯৮ ২৯৬	...	১,৬৮৬	"
বিহার উড়িষ্যা ...	২৬৩,১০০	...	২,৪৬০	"
বঙ্গ ...	২২২,৬০০	...	২,৯০৫	"
মান্দ্রাজ ...	১০৮,০৩২	...	৬,৭০১	"

যে সমস্ত অঞ্চলে লক্ষাধিক একর জমিতে ইক্ষু চাষ হয় সেই গুলির নামই পূর্ব্বোক্ত তালিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল দেশে লক্ষের নিম্ন সংখ্যা জমিতে চাষ হয়, সে গুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তালিকা দেখিলেই বোধগম্য হইবে যে যুক্তপ্রদেশই ইক্ষু চাষের প্রধান কেন্দ্র। বঙ্গদেশ ইক্ষু ফসলের হিসাবে চতুর্থ

স্থান অধিকার করে। ১৯১১-১২ সালে পূর্ব্ব প্রদর্শিত যে পরিমাণ জমিতে ইক্ষু চাষ হয়, তাহা হইতে উৎপাদিত গুড়ের পরিমাণ ২৩,৯০,৪০০ টন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার সমস্তই দেশেই কাটিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন প্রায় ১৩½ কোটি টাকার চিনি বিদেশ হইতে আমদানি হয়। ইহা হইতেই দেশীয় শর্করা ব্যবসায়ের পরিসর বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করা যে কতদূর আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

অপরাপর শ্রমশিল্প এবং সাধারণ কৃষির ন্যায় শর্করা ব্যবসায়ের উন্নতির প্রধান অন্তরায় কৃষকের নিঃস্ব অবস্থা এবং উদ্যম ও যৌথ চেষ্টার অভাব। একদিকে অপকৃষ্ট জাতীয় ফসল এবং অন্য দিকে গুড় অথবা অপরিষ্কৃত শর্করা উৎপাদন বাহুল্যতা এই দুই গুরুতর অন্তরায়ের মধ্যে পড়িয়া ভারতীয় শর্করা ব্যবসায় নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে গমন করিতেছে। ইহার প্রতিবিধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রধানতঃ দুইটি উপায় অবলম্বন করিতেছেন—প্রথমতঃ ইক্ষু জাতির উন্নতি সাধন; সাধারণতঃ যে সমুদয় জাতীয় ইক্ষু হইতে গুড় প্রস্তুত করা হয় সে গুলিতে শর্করার মাত্রা কম। ১মণ গুড় তৈয়ারি করিতে হইলে এতদ্দেশে ১৫।১৬ মণ ইক্ষু আবশ্যক হয়। পক্ষান্তরে যবদ্বীপ, মরিসস্ প্রভৃতি স্থলে ১০ মণ ইক্ষু হইতেই এক মণ গুড় পাওয়া যায়। অবশ্য শেষোক্ত দেশ সমূহে বিভিন্ন জাতীয় ইক্ষুর চাষ হয়। যাহাতে সঙ্কর উৎপাদন দ্বারা এতদ্দেশেও সমগুণ বিশিষ্ট ইক্ষু উৎপাদন করিতে পারা যায় তজ্জন্য ডাক্তার বারবারের তত্ত্বাবধারণে মান্দ্রাজে একটি ইক্ষু-সঙ্কর-উৎপাদন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ৯০ জাতীয় ইক্ষু লইয়া এস্থলে পরীক্ষা চলিতেছে এবং ইহার মধ্যেই ২।৪ টি জাতি হইতে যে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে তাহা বোধ হইতেছে।

ইক্ষু রস হইতে শর্করা প্রস্তুতের অভিনব প্রণালী সমূহ সম্বন্ধে সাধারণ কৃষক গণের অনভিজ্ঞতাও শর্করা ব্যবসায়ের উন্নতির অন্যতম অন্তরায়। যাহাতে লোকে এই বিষয়ে উপযুক্তরূপ শিক্ষা পায় তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট এক জন শর্করা ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করিয়াছেন। আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশই ইক্ষু উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া শর্করা ইঞ্জিনিয়ার আপাততঃ উক্ত অঞ্চলেই পরীক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। পিলিভিত জেলায় দিনে ২৭৫০ মণ ইক্ষুর রস প্রস্তুত হইতে পারে এই রূপ একটি কল স্থাপন হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিহার প্রদেশে প্রায় ৮টি কেন্দ্র কারখানা চলিতেছে এবং সাজাহানপুর, আসামের গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলায় চিনির কারখানা অচিরেই খোলা হইবে। মান্দ্রাজে প্রায় ৯০০০ বিঘা জমিতে লাল মরিসস্ জাতীয় ইক্ষু উৎপাদিত হইতেছে এবং তাহা হইতে গুড় না প্রস্তুত করিয়া একবারেই রস হইতে শর্করা প্রস্তুত হইতেছে।

স্থূলতঃ ইক্ষু চাষের বর্ত্তমান অবস্থা এই রূপ। এক্ষণে চিনির কারখানা সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপেতঃ আলোচনা করিব। উপযুক্ত ভাবে শর্করার ব্যবসায় চালাইতে পারিলে প্রস্তুত কারক এবং ব্যবসায়ী উভয়েরই যে লাভ আছে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অপরাপর ব্যবসায়ের ন্যায় ইহাতেও অগ্র পশ্চাৎ ভাবিবার অনেক বিষয় আছে। পরিষ্কৃত চিনির কাটতি এতদ্দেশে বহুল বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া গুড়ের কাটতি কম নয়। কৃষকেরা ক্ষেত্র সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে, ইক্ষু মাড়াই করিয়া, গুড় প্রস্তুত করিয়া মহাজনকে বিক্রয় করিতে চিরকাল অভ্যস্ত। এই রূপ অবস্থায় যিনি চিনির কারখানা খুলিবেন তাঁহার পক্ষে ইক্ষু পাওয়া শক্ত। পক্ষান্তরে গুড় প্রস্তুত করিয়া কৃষক যে লাভ পায়, যদি সেই লাভ দিয়া কলওয়ালা গণ তাহার নিকট ইক্ষু ক্রয় করেন তাহা হইলে কলে উপযুক্ত পরিমাণ ইক্ষু সরবরাহ সম্ভবপর। কিম্বা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ইক্ষু সরবরাহ করিতে হইবে এই রূপ সর্ত্তেও ইক্ষু চাষী কারখানার লাভের অংশীদার হইতে পারে। যদি সেরূপ বন্দোবস্ত সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে অবশ্য কলওয়ালাকেই আবশ্যক মত ইক্ষু উৎপাদন করিতে হয়। এই দুই প্রকার বন্দোবস্ত থাকিলে ব্যবসায়ের ভিত্তি যে সুদৃঢ় হয় তৎ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ বিহারের অনেক নীলকর সাহেব যাঁহারা আজকাল নীলের আবাদ ছাড়িয়া ইক্ষু চাষ আরম্ভ করিয়াছেন এই উভয় প্রথাই অবলম্বন করিয়াছেন।

অর্থশালী নীলকর সাহেবদের কথা ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শর্করা কারখানা প্রতিষ্ঠার সর্ব্ব প্রধান অন্তরায় মূল ধনের অভাব। পাটের কিম্বা তুলার কল খুলিবার সময় মূল ধনের অভাব হয় না অথচ চিনির কারখানা খুলিবার সময় দেশীয় ধনী সমূহ সহজে অগ্রসর হন না কেন, তাহা একটা ভাবিবার বিষয়। ইহার কারণ অভিনব প্রণালীতে শর্করা উৎপাদন বিষয়ে অনভিজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখনও চিনির কারখানা এতদ্দেশে নূতন। সুতরাং এ বিষয়ে শীঘ্র কিছু ফল ফলাইতে হইলে গভর্ণমেণ্টের কতক পরিমাণে উৎসাহ প্রদান করা উচিত। যুক্তপ্রদেশে এই কার্য্যে গভর্ণমেণ্ট অগ্রসর হইয়াছেন এবং তদ্দেশে ২।১টি কারখানা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে।

সাধারণের চিনির কারখানায় লাভালাভ সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কোনও জ্ঞান নাই। যদি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত একটি কেন্দ্র কারখানা স্থাপিত হয়, তাহা হইলে উক্ত কারখানা হইতে কি পরিমাণ লাভ আশা করিতে পারা যায় তাহা অনেকেই জানেন না। সুতরাং এ স্থলে উহাই আলোচনা করা যাইতেছে। মরিসস্ দেশে উৎকৃষ্ট জাতীয় ইক্ষুর ১ টণের (২৭½ মণ) দাম ৮৲ টাকা। যদি গভর্ণমেণ্ট অন্ততঃ ১০৲ টাকা টণ হিসাবে ইক্ষুর মূল্য দিয়া এবং সরকারী স্থানে কারখানা

বসাইতে দিয়া সাহায্য করেন তাহা হইলে একটি কেন্দ্র কারখানা স্থাপিত হইতে পারে। এইরূপ একটি কারখানায় দিনে ১৫০ টণ ইক্ষু লাগিবে। বৎসরে ৪ মাস এই কারখানা চলিতে পারে এবং ৪ মাস অর্থাৎ ১২০ দিবস কাজ হইলে কলে ১৮০০০ হাজার টণ ইক্ষু আবশ্যক হইবে। যদি একর প্রতি ৩০ টণ, ইক্ষু উৎপাদনের পরিমাণ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে উক্ত পরিমাণ ইক্ষু চাষের জন্য ৬০০ একর অর্থাৎ ১৮০০ শত বিঘা জমি প্রয়োজনীয়।

নবাবিষ্কৃত কল কব্জার সাহায্যে মধ্যম প্রকারের ইক্ষু হইতে ওজন হিসাবে শতকরা ১২-১৩ ভাগ চিনি ও গুড় পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ১৮০০০ হাজার টণ ইক্ষুতে উৎপাদিত চিনি ও গুড়ের পরিমাণ ২,১৬০ টণ হইবে। ইহার মধ্যে শত করা ৭০ ভাগ প্রথম শ্রেণীর চিনি, ২০ ভাগ দ্বিতীয় শ্রেণীর চিনি এবং অবশিষ্টাংশ গুড় হইতে পারে। বলা বাহুল্য যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর চিনির আবশ্যক হইলে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আজ কাল কানপুরের যে "দেশী" চিনি ময়রা প্রভৃতি লোকে ব্যবহার করে তাহা পরিষ্কৃত গুড় মাত্র। ইহার দর টণ করা ২৮০৲ টাকা এবং মরিসস্ হইতে যে চিনি আমদানী হয় তাহার দাম প্রতি টণ ২২০৲ টাকা। এই দরের উপর ভিত্তি করিয়া হিসাব করিলে কারখানার আয় ব্যয় নিম্নরূপ দাঁড়ায়—

আয়।

১,৫১২ টণ	১ম শ্রেণীর চিনি ২২০৲ টাকা টণ হিসাবে	...	৩,৩২,৬৪০৲
৪৩২ টণ	২য় শ্রেণীর চিনি ২২০৲ টাকা টণ হিসাবে	...	৮৬,৪০০৲
২১৬ টণ	গুড় (অবশিষ্টাংশ) ৩০৲ টাকা টণ হিসাবে	...	৬,৪৮০৲
২,১৬০ টণ	মোট উৎপাদন	মোট টাকা	৪,২৫,৫২০৲

ব্যয়।

১৮০০০	টণ ইক্ষু ১০৲ টাকা টণ হিসাবে	...	১,৮০,০০০৲
২,১৬০	টণ প্রস্তুতের খরচ টণ ৪০৲ টাকা হিসাবে	...	৮৬,৪০০৲
	ইমারৎ ও কলকব্জার মূল্য হ্রাস শতকরা ১০ ভাগ হিসাবে		৩০,০০০৲
			২,৯৬,৪০০৲

কারখানার মূলধন ৬ লক্ষ টাকা নিম্নরূপে বিভক্ত হইবে—

ইমারৎ প্রস্তুত ও কলকব্জার মূল্য	...	...	৩,২০,০০০৲
প্রথম বৎসরে ইক্ষুর মূল্য	...	...	১,৮০,০০০৲
কারখানার খরচ	...	...	১,০০,০০০৲
			৬০০,০০০৲

ভারতে উৎপন্ন মরিসস্ ইক্ষু

এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে পূর্ব্ব প্রদত্ত টন করা ৪০৲ টাকা প্রস্তুতের খরচের মধ্যে কারখানার লোকের মাহিনা প্রভৃতি, কারখানার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ও জ্বালানি প্রভৃতির দর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। জ্বালানি অনেক পরিমণে শুষ্ক ইক্ষু দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত হিসাব হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্যয় বাদে ১,৯,১২০৲ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে অর্থাৎ লাভের মাত্রা শতকরা ২০ ভাগ দাঁড়ায়। ইহা হইতে শতকরা দশ ভাগ রিজার্ভ ফণ্ড, ম্যানেজিং এজেণ্ট, দালালি প্রভৃতির জন্য বাদ দিলেও শতকরা দশ টাকা হিসাবে লাভ থাকে।

ভারতীয় কৃষি—ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিষয়ক উপদেষ্টা, মিঃ ম্যাক্‌কেনা সাহেবের বিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিগত বৎসর (১৯১২-১৩) ভারতীয় কৃষি বিভাগ সমূহের আর কিছু উন্নতি হউক আর না হউক অন্ততঃ কার্য্যের শৃঙ্খলা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে মিঃ ম্যাক্‌-কেনার উক্তি অনেকটা সত্য। তিনি বলিতেছেন যে কোন বিশেষ বিষয়ে কৃষি-বিভাগের সফলতা তদনুষ্ঠিত কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র সমূহের অথবা তৎসংশ্লিষ্ট নিত্যভিজ্ঞ পরিদর্শক বর্গের সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করে না। কোন কৃষি-বিভাগ সফলতার পথে আসিয়াছে কিনা তাহা বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, দেশ অনুযায়ী বিশেষ কৃষি অভাব ও অভিযোগ বাস্তবিক কি পরিমাণে দূরীকৃত হইয়াছে। ফলতঃ পাঁচ রকম কাজে মনোনিবেশ করা অপেক্ষা আপাততঃ অত্যাবশ্যকীয় কাজে দৃঢ়ভাবে সময় নিয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়তর। ম্যাক্‌কেনা সাহেব যদি এই সমুদয় মন্তব্য সমস্ত ভারতের কৃষি-বিভাগ সমূহের উপর প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্য আমাদের কোন আপত্তির কারণ ছিল না। কিন্তু তাঁহার বিবরণী পাঠ করিলে বোধ হয় যে তিনি বঙ্গ ও বিহারকে উপলক্ষ করিয়াই এই রূপ বক্তৃতা করিয়াছেন। বস্তুতঃ যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তাঁহার উক্তি অযৌক্তিক। বঙ্গদেশ অনেক কার্য্যে সফল হইবার আকাঙ্খা করিয়াছে সত্য এবং বর্ত্তমান সময়ে তৎসমুদয়ের মধ্যে অধিকাংশই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে তাহাও সত্য কিন্তু দোষটা কিছু দুরাকাঙ্খার কিম্বা বিফল প্রয়াসের নহে। প্রকৃত ভাবে দেখিতে গেলে প্রধান দোষ গভর্ণমেণ্টের। বিগত কয়েক বৎসর হইতে প্রায়, প্রত্যেক বৎসরেই কৃষি-বিভাগের নূতন নূতন কর্ত্তা হইতেছে। কর্ত্তারা কিছু কৃষি অভিজ্ঞ ব্যক্তি নহেন, সিভিল সার্ভিসের লোক মাত্র ; সুতরাং ইহা আশ্চর্য্য নহে যে প্রত্যেক নূতন কর্ত্তা আসিয়া তাঁহারা কৃষির অবস্থা বুঝিয়া লইতে লইতে তাঁহার বদলি হইবার সময় হয়। কাজেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা আফিসের কার্য্য ছাড়া আর কোন কার্য্য করিতে পারেন না। এই সমুদয় মিঃ ম্যাক্‌কেনার জানা উচিত ছিল।

ভারতীয় কৃষির সাধারণ উন্নতি হিসাবে বলিতে গেলে বিগত বৎসর নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। পুষা ক্ষেত্রে উৎপাদিত গোধূম ভারতীয় গোধূম চাষের যে অনেক উন্নতি সাধন করিবে তাহা অনেকটা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্ম, মান্দ্রাজ, বঙ্গদেশ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ এবং বোম্বাই প্রদেশে ধান্য চাষেরও উন্নতির চেষ্টা কম হইতেছে না এবং দুই একস্থানে সুফল ফলিবার আশা আছে। মান্দ্রাজে ও বোম্বাই অঞ্চলে নূতন প্রবর্ত্তিত ও দেশী তুলার উৎপাদন ও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডাক্তার বারবারের শর্করা-অভিজ্ঞ রূপে নিয়োজিত হওয়ার পর ইক্ষু ও শর্করা উৎপাদনের ভবিষ্যত যে কতক পরিমাণে উজ্জ্বলতর হইয়াছে তাহা বলা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সর্ব্ব শেষে ইহা বলিতে পারা যায় যে, মৌলিক অনুসন্ধান বিভাগে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই সমুদয়ের উপকারিতা সাধারণে আপাততঃ না বুঝিতে পারিলেও ইহাদের ফল সুদূর ব্যাপী অবশ্য স্বীকার্য্য।

মনসার ফল—ফণী মনসা, তেকাটা, সিজ এবং এই জাতীয় অন্যান্য গাছ অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহাদের দ্বারা বেড়া দেওয়া ভিন্ন গৃহস্থের আর কোন উপকার হয় না। যেগুলিতে কাঁটা কম সে গুলি পশু খাদ্য রূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু Times of India পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, মেক্সিকো দেশে চাষের ও নির্ব্বাচনের গুণে এমন এক প্রকার মনসা জাতীয় ফল উৎপাদিত হইয়াছে যে, তাহা অতি শীঘ্র উপাদেয় আহার্য্য রূপে পরিগণিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। মেক্সিকো হইতে নিউইয়র্ক এবং বোষ্টন সহরে আজকাল এই ফল নাকি রীতিমত চালান আসিতেছে। ফলগুলি দেখিতেও যেমন সুন্দর আহার্য্য হিসাবেও সেই রূপ অসাধারণ ভাবে পুষ্টিকর। স্বাদ ও তার সুপক্ক কদলী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। কমলা লেবুর মত দরে ইহা বিক্রয় হয় এবং ইহা উৎপাদন করিবার ব্যয় আপেল, নাসপাতি, আঙ্গুর প্রভৃতি মেওয়া ফলের চাষ অপেক্ষাও কম। "কৃষকে" কিছু দিবস পূর্ব্বে যে একটি আশ্চর্য্য মার্কিণ ফলের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল, তাহার সহিত এই মনসা ফলের বোধ হয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

কাটা ফুল—ফুলের সখ আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে থাকিতে পারে। কিন্তু ফুল যে গৃহসজ্জার একটা অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য তাহা এ পর্য্যন্ত আমরা সামান্য পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছি মাত্র। কিন্তু অল্প চেষ্টায় বৎসরের অধিকাংশ সময় গৃহাদি ফুল দ্বারা সুসজ্জিত করিতে পারা যায়। কি উপায়ে কাটা ফুল অধিক দিবস পর্য্যন্ত তাজা রাখিতে পারা যায় তাহা অবশ্য প্রথমেই জানা আবশ্যক। আমরা এস্থলে কয়েকটি বিশিষ্ট উপায়ের উল্লেখ করিতেছি। ফুল তুলিবার সময় তাহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণ কাণ্ড থাকা আবশ্যক। যদি ঠিক ফুল কাটিয়াই ফুলদানিতে

রাখা না হয় তাহা হইলে ফুলদানিতে রাখিবার সময় আবার সামান্য রূপে কাণ্ড ছাঁটিয়া দেওয়া দরকার। গরমের সময় ইহা আরও আবশ্যক। যদি বোঁটা কিম্বা কাণ্ড কঠিন হয় তাহা হইলে অল্প মাত্রায় ছাল তুলিয়া দিয়া ডাঁটার কতকটা চিরিয়া দিতে হয়, তাহাতে উদ্ভিদের শিরা প্রভৃতিতে সহজে জল প্রবেশ করিতে পারে। বলা বাহুল্য যে একটি ফুলদানীতে অধিক সংখ্যক ফুল রাখা ঠিক নয়; সেরূপ স্থলে কাণ্ড পচিয়া যাওয়া ও ফুল শুষ্ক হইয়া যাওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। প্রত্যহ ফুলদানির জল সকালে বদলাইয়া দেওয়া আবশ্যক, যাহাতে নূতন জলের তাপ পুরাতন জলের তাপ অপেক্ষা ম্লান অথবা অধিক না হয় তজ্জন্য সকালে যে জল দিতে হইবে সেই জল রাত্রে ফুলদানীর নিকট রাখিয়া দেওয়াই ভাল। জল যাহাতে পচিয়া না যায় তজ্জন্য ফুলদানীর নিচে কাঠের চূর্ণ কয়লা সামান্য পরিমাণে রাখিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়। পুষ্পদণ্ডগুলি এই চূর্ণ কয়লার স্তরের সহিত সংলগ্ন করিয়া রাখিতে পারা যায়। ভাল করিয়া ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে এক বারের কয়লাগুঁড়া অনেক বার ব্যবহার করিতে পারা যায়।

জল বদলাইবার সময় অপরাপর পচন নিবারক পদার্থও ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে সোডা কার্ব্বনেট, সোরা, সোডা নাইট্রেট ও কর্পূর অন্যতম। ইহার মধ্যে কোনটি সামান্য মাত্রায় জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে পুষ্পদণ্ড শীঘ্র পচিয়া যায় না। যে কোন কারণে হউক, অধিক সময় অনাবৃত অবস্থায় থাকার জন্য কাটা ফুল সমূহ যখন ঝিমাইয়া আইসে তখন তাহাদের বোঁটা অথবা কাণ্ড সামান্য পরিমাণে ছাঁটিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যদি ফুটান্ত জলে ডুবাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ফুল গুলি আবার তাজা হইয়া উঠে। যতক্ষণ গরম জল ঠাণ্ডা হইয়া আসে ততক্ষণে ফুলের পাঁপড়িগুলি আবার পূর্ণরূপে প্রসারিত হয় এবং পুষ্পদণ্ডের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ফিরিয়া আইসে। অবশ্য ফুল যদি একবারেই শুষ্ক হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে সমস্ত চেষ্টাই বৃথা হইয়া যায়। কিন্তু এইরূপে ফুলগুলি তাজা হইয়া উঠিলে তাহাদিগের কাণ্ড আবার কিয়দংশ ছেদন করিয়া এবং শুষ্ক ও পচা অংশাদি বাদ দিয়া ঠাণ্ডা জলে রাখিয়া দিতে হয়। কিয়ৎ পরিমাণে কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা দিলে আরও ভাল হয়। সাধারণতঃ শাদা ফুল অপেক্ষা রঙ্গিন ফুল এবং পাতলা পাঁপড়ি বিশিষ্ট অপেক্ষা পুরু পাঁপড়ি বিশিষ্ট ফুল শীঘ্র তাজা হয়।

যদি কাটা ফুলের ঝোঁকে কিম্বা গুচ্ছ কোন বিশেষ উপলক্ষে ব্যবহৃত হইবার জন্য কয়েক দিন রাখা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একটি কাঁচের জারে অর্থাৎ বিস্তীর্ণ মুখ লম্বা পাত্রে নিম্নে কয়লার গুঁড়া দিয়া দরকার মত জল দিয়া ফুলগুলি রাখিতে হয়। তাহার পর উক্ত জার একটি রেকাবির উপর রাখিয়া একটি বড় কাঁচের গ্লাস অথবা অন্য প্রকার ঢাকনি দ্বারা ঢাকিয়া দিয়া রেকাবিতে সামান্য পরিমাণ

জল ঢালিয়া দিতে হয়। তাহাতে বায়ু চলাচলের পথ বন্ধ হইয়া যায় এবং পুষ্প ও পুষ্পদণ্ডের স্বাভাবিক রস বায়ু মণ্ডল দ্বারা শোষিত হইতে পারে না। ম্যানগোলিয়া, লিলি প্রভৃত বড় বড় মুকুল যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র ঝরিয়া না যায় তজ্জন্য বোঁটায় সামান্য পরিমাণ টিসু কাগজ সন্ধ্যার সময় জড়াইয়া দিয়া সকালে খুলিয়া লইতে পারা যায় কিম্বা ফুলের মধ্যে কিঞ্চিৎ গঁদের আঠা ঢালিয়া দিতে পারা যায়। ডাকে ফুল পাঠাইতে হইলে ছোট গভীর বাক্স অপেক্ষা পাতলা বড় বাক্স ব্যবহার করাই ভাল। নিম্নে আর্দ্র তুলা কিম্বা টিসু কাগজ দেওয়া আবশ্যক। যদি ফুলের সহিত ফার্ণ কিম্বা বাহারী পাতা প্রভৃতি থাকে তাহা হইলে ফুল বেশ তাজা অবস্থায় গিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছে।

পত্রাদি

পাউড্রেট সার—শ্রীঅনিলচন্দ্র সরকার, চকবাজার, বর্দ্ধমান।

মহাশয়,

কৃষি পুস্তকাদিতে পাউড্রেট সারের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই সার কোথায় পাওয়া যায়? গোময় অপেক্ষা তেজস্কর বলা হইয়াছে, কি পরিমাণে বা কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হয় তাহা বলা নাই, আপনি ইহার মীমাংসা করিয়া দিলে আমার মত সাধারণ অজ্ঞ চাষীর বিশেষ উপকার হইবে।

উত্তর—ইহা মনুষ্য মলের রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র। গোময় অপেক্ষা মনুষ্যমল তেজস্কর তাহাতে সন্দেহ নাই। গোময়ে নাইট্রোজেনের মাত্রা শতকরা ৩০ কিন্তু মনুষ্যমলে ১॥০ কিম্বা ২ ভাগ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। মনুষ্য মল চূণ কিম্বা জিপসম (Sulphate of lime) সংযোগে শুষ্ক করিয়া গুঁড়াইয়া লইতে পারিলে পাউড্রেট সার (Poudrette) প্রস্তুত হইল। পাউড্রেটে ২ ভাগ নাইট্রোজেন ১ ভাগ পটাস ও কিছু অধিক ভাগ ফস্ফেট অব লাইম থাকে। যে ক্ষেতে ৫০ মণ গোময় দিতে হয় সেই ক্ষেতে ১০ মণ পাউড্রেট সার দিলে যথেষ্ট হয়। গোময়ের মত মাটির সহিত চষিয়া দিতে হয়। গোময় যেমন সদ্য জমিতে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, ইহাও তেমনি মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া কিছু দিন পচাইয়া লইলে ভাল হয়।

মৎস্যের আবাদ (Carp Culture.)—শ্রীযুত কে, এম বন্দোপাধ্যায়।

মৎস্য চাষ সম্বন্ধে কোন পুস্তক ও বিশেষজ্ঞের খবর জানিতে চাহিয়াছেন। বাঙলা দেশে মৎস্যের চাষ সম্বন্ধে সবকথা জানা যায় এমন কোন ভাল পুস্তক

আমরা দেখিতে পাই না। কলিকাতা "বসুমতী" অফিস হইতে প্রকাশিত "মৎস্যের চাষ" নামক পুস্তকে অনেক বিষয় আপনি জানিতে পারিবেন। সেই গুলি নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারা যায় কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না, কেননা হাতে হাতিয়ারে কাজ করিলে তবে লিখিত বিষয়ে সত্যাসত্য প্রমাণ হয়। মৎস্যের আবাদ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এক্ষণে মৎস্য জীবিগণ। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের তত্ত্বাবধানে একটি মৎস্যের আবাদ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিভাগে এক জন ডেপুটি ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অনেক তত্ত্বাবধায়ক আছেন তাঁহারা বঙ্গে মৎস্যের আবাদ সম্বন্ধে তত্ত্ব লইতেছেন। মৎস্য চাষে বিশেষজ্ঞের অভিমত ইহাঁদের নিকট হইতে পাইবেন। মৎস্যের আবাদ সম্বন্ধে পুস্তকাদিও এই বিভাগ হইতে পাইতে পারেন।

এই বিভাগ হইতে Carp Culture by Mr. B, L. Chaudhury এবং Report on Bengal Fishery by Honb'le Sir K. G, Gupta এই দুই খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

আমেরিকায় কৃষি-কার্য্যে আয়—আমেরিকার কৃষি-বিভাগের কার্য্য-বিবরণী পাঠে জানা যায় যে তথাকার কৃষি-জাত পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৎসরে ২৮,৫০,০১১,০০,০০০ আটাইশ লক্ষ, পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা অপেক্ষা অধিক। ভারতীয় কৃষিজাত পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করা বড়ই সুকঠিন। ভারত হইতে যে মাল বিগত বর্ষে রপ্তানি হইয়াছে তাহা হইতে আমরা একটা আভাস পাইতে পারি। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ধাতু ও ধাতুজাত দ্রব্য ও কাঠের গঠন গুলি বাদ দিলে প্রায় বৎসরে ২,১০,৬২,২১,৩২৮ দুই শত দশ কোটি টাকার কৃষি-জাত পণ্য রপ্তানি হইয়াছে। কোন দেশ হইতে যে কোন পণ্য রপ্তানি হয় তাহা সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের অনুপাতে দশমাংশের একাংশ অপেক্ষা বোধ হয় অধিক হইবে না। এই অনুমানে বুঝা যায় যে ভারতের কৃষি-জাত দ্রব্যের মূল্য দুই হাজার দশ কোটি টাকা হইবে।

ভারতের ভূমির পরিমাণ ১৮,৭০,০০০ বর্গমাইল। আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের ভূমির পরিমাণ ভারতের অপেক্ষা দ্বিগুণের কিঞ্চিৎ অধিক। নদী, খাল, বিল, পাহাড়, জঙ্গল, মরুভূমি ও উষর ক্ষেত্র বাদ দিয়া আমরা ৩৮৫,৬৬৪,৩৭৬ একর চাষাবাদ উপযোগী জমি পাই। ইহারও কতক জমি পড়িয়া থাকে, প্রতি বৎসর চাষ হয় না। বিগত বর্ষে ২১৫,৯৮১,৬৮২ একর জমিতে মাত্র আবাদ হইয়াছিল। আমেরিকায় কিন্তু আবাদী জমির মাত্রা দিন দিন বাড়িতেছে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছে এবং চাষের উন্নতি দেখা যাইতেছে। আমেরিকানগণ প্রতি বিঘায় ৬০ হইতে ৭০ মণ বীট উৎপন্ন করিতে পারিতেছে। অন্যান্য মূলজ

খন্দ অপেক্ষা বীটের শিকড় মাটির নীচে অধিক দূর পর্য্যন্ত যায় এবং উপরের মাটি নিরস হইলে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তর হইতে রস সঞ্চয় করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বীট এই কারণে অপেক্ষাকৃত অনাবৃষ্টি সহ। শীত এবং শীতের শেষে দুইবার বীটের চাষ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে চিনি প্রস্তুতের জন্য বীটের চাষ কোথাও দেখিতে পাই না। ভারতের নানা স্থানের মাটি ও জল হাওয়া বিভিন্ন। বাঙলায় যে ফসল উৎপন্ন করা অসম্ভব তাহা হয়ত যুক্তপ্রদেশে কিম্বা পঞ্জাবে সম্ভব। আমেরিকায় সম্প্রতি ২৮,০০০ আটাইশ হাজার বিঘা একটি তুলার আবাদ পত্তন করা হইয়াছে, ফল সন্তোষজনক হইতেছে। ভবিষ্যতে ইউরোপীয় বাজারের বেশীভাগ তুলা তাঁহারাই যোগাইবেন।

ধান, পাট, যব, যৈ, তুলা, আলু, রবিশস্য, ইক্ষু ও বীটের চাষ আমেরিকাতে আছে এবং এদেশেও আছে। আমেরিকাবাসীগণের চেষ্টায় শস্যের ফলন অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে আর এখানে ক্রমশঃ ফলন কমিতেছে।

১৯১২ সালে আমেরিকায় ১,৬২,০০,০০০ মণ বীট চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯১৩ সালে উৎপন্ন বীট চিনির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১,৮৯,০০,০০০ মণ। অধ্যবসায়ী আমেরিকানগণ তাঁহাদের অধ্যবসায়ের গুণে ঘণ্টায় ৩২৫ কোটী টাকা কৃষিজাত পণ্যের আয় দাঁড় করাইতে পারিয়াছেন।

পশুখাদ্যে গোলঞ্চ—গোলঞ্চ (Tinospora Cordifolia) অনেক ঔষধের অনুপান অনেকেই জানেন। কেবল গোলঞ্চের কাথ খাইলে জ্বরাদি রোগ আরোগ্য হয় এমন নহে, আয়ুর্ব্বেদে গোলঞ্চের অনেক গুণ বর্ণিত আছে। সম্প্রতি গোলঞ্চের আর একটি গুণের কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি। গোলঞ্চলতা কুচাইয়া গরুকে খাইতে দিলে গরুর দুধ বাড়ে এবং গবাদির দেহ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। প্রথমতঃ গবাদি ইহা খাইতে চায় না, তিক্তস্বাদ ইহার কারণ। কিন্তু খৈল, কলাই কিম্বা গমের ভুসি মাখাইয়া ক্রমশঃ খাওয়াইতে অভ্যাস হইয়া গেলে পরম পরিতৃপ্তির সহিত ইহা খাইতে থাকে। গোলঞ্চ লতা রীতিমত খাওয়ান অভ্যাস হইলে গবাদি বিনা খৈল ভুসিতে খাইতে থাকিবে। কৃষকের জনৈক গ্রাহক ইহা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং তিনি সাধারণকে গবাদির খাদ্যার্থ গোলঞ্চ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেছেন। গোলঞ্চ সহজে জন্মে। ইহার লতা খুব বৃদ্ধিশীল। একবার কোন গাছে উঠাইয়া দিতে পারিলে এক বর্ষায় গাছ ছাইয়া ফেলে এবং যত কাটা যায় তত ইহার নূতন লতা বাহির হয়।

কলার খোলাও (Bahmana Tree) গবাদির খাদ্য—কোন কোন গো মহিষ ইহা সাগ্রহে খায়, অনেকে আবার খায় না। কলার খোলা কুচা করিয়া খৈল ভুসী মাখাইয়া খাওয়ান অভ্যাস করিতে পারা যায়। কিন্তু ইহা গোলঞ্চের মত সারবান নহে। গোলঞ্চে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার পাওয়া যায়, কলার খোলাতে শ্বেতসার অতি অল্পই আছে। যেখানে গবাদির খাবার দ্রব্যের অভাব তথায় তাহাদের উদর পূরণের জন্য এই ব্যবস্থা মন্দ নহে।

"বিজ্ঞান" বলিতেছেন—একটা কোন কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া তবে নিশ্চয়ই এই দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়; কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা এই পরিবর্ত্তন ধরা যায় না। মানবের গন্ধানুভব ও আস্বাদন শক্তি দ্বারাই তাহাদের নিকৃষ্টতা পরীক্ষিত হইয়া থাকে।

কোন কোন ধাতব পদার্থের সংস্পর্শে মাখন হইতে একরূপ বিশ্রী দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়। ইউনাইটেডষ্টেট্‌সের কৃষিবিভাগে প্রমাণিত হইয়াছে, যে মাখনের সহিত অত্যল্প পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত হইলেও একরূপ দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়। যাঁহারা মাখনের কারবার করেন, তাঁহারা মাখন হইতে যে গন্ধ নিঃসৃত হয় অবস্থা অনুসারে তাহার ৩ প্রকার নাম দিয়া থাকেন:—(১) তৈল গন্ধ, (২) ধাতব গন্ধ, (৩) আঁইস গন্ধ। প্রতি ১০,০০,০০০ দুগ্ধে ১ হইতে ৫০০ ভাগ লৌহ মিশ্রিত করিলে মাখনে লৌহের দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই লৌহ মিশ্রিত মাখন বিশুদ্ধ মাখনের সহিত তুলিত হইয়াছে; এইরূপ তুলনায় দেখা গিয়াছে যে, লৌহ মিশ্রিত মাখনে অতি সত্বর দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়। এই দুর্গন্ধই ক্রমে ক্রমে তৈল গন্ধ ও আঁইস গন্ধে পরিণত হয়।

সঞ্চিত মাখনের অধিকাংশই ধাতব পাত্রে, যেমন টিনের ক্যানিস্তা ইত্যাদিতে সংরক্ষিত হইয়া থাকে এই সমস্ত ক্যানিস্তায় প্রায়ই মরিচা পড়ে। এইরূপ ক্যানিস্তায় রক্ষিত মাখন হইতেও একপ্রকার ধাতব গন্ধ নিঃসৃত হয়। বিশুদ্ধ মাখনের গন্ধ ও এই মাখনের গন্ধে এত পার্থক্য, যে কোনটি বিশুদ্ধ তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারা যায়।

মাখনের উপরে তাম্রের কোনরূপ শক্তি আছে কি না তাহাও পরীক্ষিত হইয়াছে। তাম্র পাত্র বা তাম্র মিশ্রিত মাখনে অতি শীঘ্র আঁইস গন্ধ নিঃসৃত হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যদি মাখন প্রস্তুত কালে কোন না কোন সময়ে মাখন লৌহ বা মরিচা ধরা ক্যানিস্তা বা তাম্রের সংস্পর্শে আইসে, তাহা হইলে ইহাতে তৎক্ষণাৎ তাম্র বা লৌহ মিশ্রিত হয়। এই মিশ্রিত মাখন হইতে গন্ধ নিঃসরণ অনিবার্য্য।

মাখন প্রস্তুত কালে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিলে মাখন কিছুতেই ধাতব পাত্রের সংস্পর্শে আসিতে পারে না। আমাদের দেশে মৃৎপাত্রে মাখন সঞ্চিত করা হয়। মৃৎপাত্রের অভ্যন্তর ভাগ মাজিয়া ঘষিয়া গ্লেজ বা পালিশ করিয়া লইলে মাখনে কোন দোষ হইতে পারে না।—বিজ্ঞান

সার-সংগ্রহ

রিয়া

রিয়া জিনিষটা কি, তাহা বোধ হয় অনেকে অবগত নহেন। আজকাল যেমন পাট অত্যাবশুক দ্রব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পূর্ব্বে রিয়াও সেই প্রকার হইয়াছিল। পূর্ব্বে পাটের চাষ লোকে কম করিত এবং রিয়ার আবাদ বেশী পরিমাণে হইত। ভারতে রিয়ার চাষ লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে পাটের মত যত্ন সহকারে ইহার বিস্তৃত আবাদ হইতেছে।

রিয়া প্রধানতঃ দুই জাতীয় ;—এক জাতীয় সবুজ, অপর জাতীয় শাদা। ইহার ইংরাজী নাম (1) Bœhmeria Nivea green, often called the green leaved. (2) Bœhmeria Nivea white often called the white leaved. ভারতবর্ষে ইহাকে রিয়া বলে, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে ইহা নানা নামে অভিহিত হইয়া থকে। চীনদেশে ইহাকে চীনাঘাস (china grass) বলে। হিমালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিয়ো প্রভৃতি দ্বীপেও ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তথায় ইহাকে "রেমী" বলা হয়। এই বিভিন্ন দেশজাত রিয়া জল, বায়ু ও মৃত্তিকার জন্য বিভিন্ন আকৃতি হইয়া থাকে। কোথাও বা ইহা লম্বা কোথাও বা একটু ছোট হয়, কিন্তু মূলে ইহা এক জাতীয়।

রিয়ার চাষ প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। নেটাল, মরিসাস্, আলজিরিয়া, করসিকা দ্বীপে, দক্ষিণ আফ্রিকা, চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জে, এমন কি গ্রেট ব্রিটনেও রিয়ার চাষ আছে। আমেরিকায়ও রিয়ার চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রিয়া কিরূপ মাটী ও জল হাওয়ায় হয় জানিলেই বুঝা যায় যে কোথায় রিয়া জন্মিতে পারে এবং কোথায় জন্মিবে না।

মাটী—রিয়ার গাছ সহজে এবং যে কোন মাটিতে জন্মে। তবে দোয়াঁশ বালুকা সারবান মাটি হইলে ত কথাই নাই। চষা ক্ষেত ও অল্প ছায়াযুক্ত স্থান পাইলে রিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া বাড়িতে থাকে। ইহার শিকড় মাটির নিচে ১২ হইতে ১৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

জল হাওয়া—উষ্ণতর স্থান হওয়া চাই, অথচ বারিপাত নিতান্ত কম হইলে সেখানে রিয়া হইবে না। আবহাওয়া সরস ও মাটি সরস থাকা আবশ্যক।

বঙ্গদেশের আসাম প্রদেশ রিয়ার জন্মভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আসাম চায়ের জন্য বিখ্যাত। এক সময়ে এমন ছিল, যখন কেবলমাত্র চীনের চা দেশ-বিদেশে ব্যবহৃত হইত। এখন ইংরাজ প্লানটারের অনুগ্রহে আসামের এমন স্থান নাই যেখানে চায়ের বাগান নাই। এই আসামী চা এখন প্রতিদ্বন্দীতায় সকলকেই এক প্রকার হটাইয়াছে। আসামের চায়ের যাঁহারা বিলাতী শিপ্‌মেণ্ট দেখিতে ইচ্ছা করেন, একবার তাঁহারা J. Thomas কোম্পানীর আফিসে গিয়া দেখিয়া আসিবেন; বুঝিতে পারিবেন, ব্যবসা কাহাকে বলে, আর কি পরিমাণ চা ভারতে উৎপন্ন হইয়া দেশ বিদেশে প্রেরিত হয়।

এই চা আসামে নীত হওয়া সম্বন্ধে অনেক প্রকার প্রবাদ আছে। কেহ বলেন যে, চায়ের জন্মভূমি চীন—সেই স্থান হইতে চা আসামে আসিয়াছে। আবার কেহ বলেন যে, আসামেই প্রথম চা উৎপন্ন হইত। আসামের Northern Sub Tropical jone হইতে চীনের Temperate jone এ এই চা উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন আকৃতির হইয়াছে। আসামে চা-গাছ বৃক্ষ নামে অভিহিত হয় এবং চীনে ইহা গুল্ম (shrub বা plant)। যাহাই হউক, এক্ষণে এই আসাম হইতে যে রিয়া চীনে আমদানী হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আসামে রিয়া গাছের পাতাগুলি চওড়া হয় এবং গাছগুলিও দীর্ঘাকার হয়—কিন্তু চীনে গাছগুলি ছোট ছোট হয় এবং পাতাও তদ্রূপ হইয়া থাকে। ইহাতেই বেশ প্রমাণিত হয় যে, মৃত্তিকার গুণে রিয়া চীনে ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

এখন বুঝা যায় যে, রিয়ার উপযুক্ত স্থান আসাম প্রদেশ। কারণ আসামের জল হাওয়া রিয়া চাষের একমাত্র উপযোগী। যাঁহারা পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা ইহা সহজে বুঝিতে পারিবেন।

ব্রহ্ম প্রদেশেও রিয়া উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহার পরিমাণ তাদৃশ অধিক নহে। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অর্থাৎ মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানেও ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আজকাল চীন, জাপান, আমেরিকা, মধ্য-ইউরোপ, আলজিরায়স্ প্রভৃতি প্রদেশে ইহার যথেষ্ট আবাদ হইতেছে। কিন্তু আসামের রিয়া অপেক্ষা ইহা অনেক নিকৃষ্ট। যদিও এই সকল প্রদেশে রিয়া ভাল উৎপন্ন হয় না, তবুও ঐ সকল স্থানের অধিবাসীরা ইহার আবাদের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিতেছেন, আর আমাদের দেশে ইহার চাষের যথেষ্ট সুবিধা থাকাতেও আমরা নিশ্চেষ্ট

হইয়া বসিয়া আছি। দুঃখের বিষয়, আসামে এই রিয়ার চাষ আজকাল নাই বলিলেও চলে।

আসাম, কুচবিহার, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দুয়ার্স প্রভৃতি স্থানে রিয়াকে রিয়া বা কঙ্কুরা বলে। পূর্ব্বে এই সকল স্থানে, আজকাল যে প্রকার পাটের চাষ হইতেছে, সেই প্রকার রিয়ার চাষ হইত, পাট ও রিয়ার উপযোগীতা প্রায়ই এক প্রকার। কিন্তু পাটের দর বেশী, কাজেই দুপয়সা প্রাপ্তির আশায় লোকে রিয়ার চাষ পরিত্যাগ করিয়াছে।

ধীবরদিগের যে সকল বড় বড় জাল দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা রিয়া হইতে প্রস্তুত হয়। ধীবরেরা এই জালের জন্য রিয়া গৃহস্থের নিকটে অধিক মূল্য দিয়া গ্রহণ করে। নর্দ্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের ডোমার নামক ষ্টেশনের নিকট গোদাগাড়ী নামক একটী হাট আছে। এই হাটে এখনও রিয়া ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে। যাহারা বিক্রয় করে, তাহারা দরিদ্র গৃহস্থ, এবং ক্রেতা ধীবরজাতীয় লোকই বেশী। তাহাদের আবশ্যকানুযায়ী ইহা সময়ে সময়ে অতি উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। টাকায় একসের রিয়াও সময়ে সময়ে হইয়া থাকে। রিয়ার চাষ নাই বলিয়া ইহা এই প্রকার উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয়। রিয়া ব্যবসায় উপযোগী দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত হইলে খরিদ্দার বৃদ্ধি হইবে এবং আপনা আপনি ইহা বিস্তৃতি লাভ করিবে।

চা বৃক্ষের জন্য ঐ সকল স্থান যেরূপ উপযোগী, তদ্রূপ রিয়াও উপযোগী একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রিয়া আবাদ করিতে ভূমি নির্ব্বাচন চাই। যে স্থানের মাটী দো-আঁসলা, এবং বারমাস স্যাঁৎসেঁতে থাকে, অথচ কোনও প্রকার বন্যার জলে প্লাবিত হয় না, এবং যে স্থান এতদঞ্চলের মধ্যে উত্তাপ, শৈত্য ও বর্ষাতে সমাবস্থাপন্ন, সেই স্থানেই আসামজাতীয় রিয়ার অতি উত্তম আবাদ হইতে পারে। রিয়ার আবাদ করিতে হইলে বেশী পরিশ্রমের আবশ্যক করে না।

পাশ্চাত্য জাতি এই রিয়ার চাষ করিতে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহারা রিয়া ব্যবসায়ের উন্নতি বিধানে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইউরোপে আদর্শ ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ জমিতে উপযুক্ত সার দিয়া তাহার চাষ করা হইয়াছিল। ইহাতে যে প্রকার গাছ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে ব্যবসায়ীরা মনে করিয়াছেন যে, বেশী পরিমাণ জমিতে চাষ করিলে নিশ্চয়ই প্রভূত অর্থোপার্জ্জন হইবে। জমিতে মৈ দেওয়ার পর, পাতার সার কিম্বা আবর্জ্জনা পচিয়া যে সার উৎপন্ন হয় তাহা উত্তমরূপে ছড়াইতে হয়, তারপর রিয়ার কলমগুলি বসাইতে হয়। কলম বসান হইয়া গেলে বেড়া দ্বারা উত্তমরূপে উহা ঘিরিয়া দিতে হয়। তাহার কারণ, এদেশে প্রবাদ আছে যে, রিয়ার গায়ে বাতাস লাগিলে শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হইতে থাকে,

এবং তদ্বারা সুতা লম্বা হয় না। এজন্য গাছের উচ্চতা ৬।৭ হাত করণার্থ এই বেড়া প্রদত্ত হইয়া থাকে। বাস্তবিকই দেখা গিয়াছে যে, গাছ যে সময়ে উক্ত বেড়া ছাড়িয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ে রিয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। বোধ হয় ইহা হইতেই উক্ত প্রবাদের সার্থকতা হইয়াছে। কিন্তু বেশী পরিমাণ জমিতে ঘিরিতে খরচ অত্যন্ত অধিক পড়ে।

জলপাইগুড়িতে অদূরা বলিয়া একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে। ইহার ছাল ও অন্যান্য লতাদির মত ইহার দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্ব গুণ সকল যেরূপ অতি পূর্ব্বকাল হইতে সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন—তদ্রূপ রিয়া বৃক্ষের ছালের দৃঢ়তা ও বৃষ্টি ও রৌদ্রের প্রতাপসহনশীলতা গুণও ভারতবাসী, আসামীয়, চীনবাসী, মালয়ান এবং ইজিপসিয়ান প্রভৃতি জাতি মধ্যে পরিজ্ঞাত ছিল এবং এক্ষণেও আছে।

মিশরের "মমী" এবং আসামের উপস্থিত মৃতশব সকলের আচ্ছাদনী বস্ত্র দ্বারা এবং উপরোক্ত স্থান সমূহের ধীবরগণের মৎস্য ধরিবার জাল ও সুতা পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বহুপূর্ব্ব হইতেই লোকে এই রিয়ার ব্যবহার জানিত। প্রায় তিন শত বৎসর হইল ইউরোপীয় জাতি এই রিয়ার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত হিসাবে ন্যূনাধিক ১০০ বৎসর মধ্যেই অর্থাৎ এই বিগত উনবিংশ শতাব্দীতেই নানা জাতি মধ্যে ইহার উন্নতিকল্পে বহুতর চেষ্টা হইতেছে। ইহাকে বাণিজ্য দ্রব্যে পরিগণিত করিবার জন্য এবং কল কারখানা ও উপায় উদ্ভাবন জন্য গভর্ণমেন্ট পুরস্কার প্রচার করেন। গভর্ণমেন্টের এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

Rea Fiber treatment নামক একটী কোম্পানী গঠিত হইল। এই কোম্পানী অদ্যাবধি এই রিয়ার চাষ সম্বন্ধে যত্ন করিতেছেন এবং যাহাতে জনসাধারণ ইহা অবগত হইতে পারে তন্নিমিত্ত বহু পুস্তক সাধারণ্যে বিতরণ করিতেছেন।

পাটের চাষ, নীলের চাষ, প্রভৃতি যে প্রকারে নিম্নশ্রেণীর কৃষকদিগের মধ্যে বিস্তৃত করাইয়া দেওয়া হইয়াছে, রিয়ার চাষও সেই প্রণালীতে করাইলে সাফল্যের আশা করা যায়।

এই রিয়া কোম্পানীর হেড আফিস বোম্বাই নগরীতে। রিয়া সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাত হইতে হইলে পাঠকবর্গ উক্ত কোম্পানীকে পত্র লিখিলেই সম্যক অবগত হইবেন।

রিয়া হইতে ভারতের উপযোগী সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। যদি সর্ব্বত্র রিয়ার চাষ হয়, তাহা হইলে যথেষ্ট আমদানী হইবে এবং বহু কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়া কলের দ্বারা রিয়ারও উত্তম উত্তম বস্ত্র বয়ন করিতে পারিবে। ভারতের কৃষক যেরূপ দরিদ্র, তাহাতে তাহাদের দ্বারা উক্ত কার্য্যে অগ্রণী হওয়া সম্ভব নয়, রিয়া কোম্পানী এখন যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের পন্থাবলম্বনে আর

কয়েকটী ঐ প্রকার কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে সুফলের আশা করা যাইতে পারে।

ছত্রকের (MUSHROOM) চাষ

মাটির ভিতর কাঠ পাতা পচিয়া যখন ছত্রক ফুটিয়া উঠে তাহা অনেকাংশে ছাতার আকৃতি। তাই অনেকে এদেশে ইহাকে ব্যাঙের ছাতা বলে। কোঁড়ক ইহার সাধারণ নাম।

আমেরিকার কোন রেল-কোম্পানীর পরিত্যক্ত প্রায় সাড়ে চারিশত ফুট লম্বা ও বাইশ ফুট চওড়া একটি টানেল বা পর্ব্বত সুড়ঙ্গ-পথের মধ্যে অতি বিস্তৃত আকারে ছত্রকের চাষ হইতেছে। উহা পৃথিবীর মধ্যে ছত্রকের বৃহত্তম চাষ।

সুড়ঙ্গ পথটী অনেক কাল ধরিয়াই পড়িয়াছিল। আজ কাল কর্ম্মকুশল উদ্যোগী পুরুষদের দৃষ্টি পতিত হওয়ায় উহার বাস্তবিকই সদ্ব্যবহার হইতেছে।

ডাক্তার অসবার্ণ নামে একজন ভদ্রলোকের মাথায় ঐ টানেলের মধ্যে ছত্রক চাষ করিবার মতলব আসে। বিশেষতঃ তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখিলেন যে ঐ টানেলের স্বাভাবিক উত্তাপ ও মাটীর অবস্থা ব্যাঙের ছাতার পক্ষে আদর্শ স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইরূপে পরীক্ষা দ্বারা সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ডাক্তার অসবার্ণ ঐ টানেলের মধ্যে ব্যাঙের ছাতার বীজ রোপণ করিলেন। তাহাতে যে ফসল উৎপন্ন হইল, তাহা এত আশাতীতরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে ডাক্তার অসবার্ণ আরো অধিক পরিমাণ স্থানে উহার চাষ ব্যাপ্ত করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি টানেলের মধ্যে সারি সারি সেল্‌ফ্‌ বসাইয়া তাহার তিন চারিটী থাকে মাটী, পচা খড় প্রভৃতি ব্যাঙের ছাতার উপযোগী সার দিয়া তাহাতেই বীজ রোপণ করিলেন। আজ কাল টানেলের প্রায় সমগ্র ভূমিখণ্ড ও সেল্‌ফই ব্যাঙের ছাতায় ছাইয়া ফেলিয়াছে।

ব্যাঙের ছাতা বা ছত্রক যে গাছ তাহা অনেকেই জানেন না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহা গাছ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ছত্রক নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ। ইহাদের না

আছে ডাল, না আছে পাতা, শিকড় বা কিছু। এমন কি উদ্ভিদ রাজ্যের বিশেষত্ব যে সবুজ রঙ তাহাও নাই।

ইহাদের শিকড় নাই বলিয়া মাটী হইতে রস সংগ্রহ করিয়া তাহা পরিপাক করিবার ক্ষমতা নাই। ইহাদের জীবন ধারণ ব্যাপারটা কিছু অদ্ভুত রকমের।

সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে ছত্রক স্যাঁৎসেঁতে ভিজা মাটীতে বা পচা খড় সার প্রভৃতির উপর ছাড়া শুষ্ক ভূমিতে কখনও হয় না। ইহাই বিশেষত্ব। ইহা পচা নানা প্রকার পদার্থ ও পচা জৈবিক পদার্থ হইতে আপনার খাদ্য সংগ্রহ করে। শিকড় রস সংগ্রহ করিবে। গাছের সবুজত্ব যাহা রসাদি পরিপাকের অতি আবশ্যকীয় উপকরণ, তাহার সম্পূর্ণ অভাব বলিয়া ছত্রক ও ঐ শ্রেণীর গাছের মাটী হইতে সংগৃহীত রস পরিপাক করিবার ক্ষমতা নাই; তাই তাহারা পচা দ্রব্যাদি ও জৈবিক পচা পদার্থের রস যাহা স্বভাবতই জীর্ণ হইয়াই থাকে তাহাই শোষণ করিয়া নিজের দেহ পুষ্টি করে।

ইহা অপর উদ্ভিদ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও ইহা উদ্ভিদ—গাছ ছাড়া আর কিছুই নহে।

পাশ্চাত্য দেশে অতি উপাদেয় খাদ্য। এমন কি রাজপরিবারে আদরণীয় আহার্য্য বস্তুর মধ্যে ব্যাঙের ছাতা একতম। সে দেশে ইহার বিক্রয় এবং আদরও যথেষ্ট।

সে দেশের বাজারে ব্যাঙের ছাতা বা কোঁড়ক ৪৲—৪॥৹ সেরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে যদিও উহার বেশী প্রচলন নাই তথাপি উহার চাষ করিবার হানি ত দেখি না। আমরা নিজেরা যাহা কেবল খাইয়া থাকি তাহা ছাড়া কি অপর কিছুর চাষ করিতে নাই?

আমরা ব্যবসার কূটতত্বটি এখনো আদৌ শিখি নাই। পাকা ব্যবসায়ী হইতে না পারিলে মঙ্গল নাই। এদেশের স্বাভাবিক উত্তাপ এবং বেশী ভাগ স্থানের মাটীর সরসতা ছত্রক চাষের সম্পূর্ণ উপযোগী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি উহা রসা ভূমিতে পচা খড় সার প্রভৃতির উপরেই জন্মিয়া থাকে। এদেশে সেরূপ স্থানের অভাব নাই। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী একটি করিয়া পচা পদার্থের গাদা আছে। তাহাতে রীতিমত একটি ছত্রকের ছোট খাট আবাদ হইতে পারে।

আমাদের দেশেও ছত্রক খায় না এমন নহে। তবে চাষ করিয়া খাইবার সাধ রাখে না। ভাল করিয়া চাষ করিলে এদেশেও বেশ বিক্রয় চলে। আমেরিকায় পূর্ব্বোক্ত টানেলে ও সেলুফে মিলিয়া সর্ব্বসমেত একলক্ষ বর্গফুট জমিতে ছত্রক চাষের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এখন যে অংশ টুকুতে চাষ চলিতেছে সেই অংশ হইতে

প্রতিদিন ২৫।৩০ সের ব্যাঙের ছাতা বাজারে বিক্রয়ার্থ যাইতেছে ও তদ্বারা দৈনিক প্রায় এক শত হইতে দেড় শত টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতেছে।

এ ব্যবসার প্রায় ষোলো আনাই লাভ। অন্যান্য ফসলের যেরূপ পাট আছে ইহার সে সমস্ত কিছুই নাই। ইহার জমি সর্ব্বদা নানাবিধ পচা পদার্থে পরিপূর্ণ রাখিতে হইবে এবং উহা স্যাঁৎসেঁতে ভিজা ভূমি হওয়া দরকার। এই উহার পাট, সুতরাং উহার ষোল আনাই লাভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাগানের মাসিক কার্য্য

আষাঢ় মাস।

সব্জীবাগ।—শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তুত হইতে হইবে। আমন বেগুনের তলা ফেলিতে হইবে। এই সময় শাকাদি, সীম, লঙ্কা, শীতের শসা, লাউ, বিলাতী বেগুন, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই সালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী বীজ বপন করিতে হইবে।

পালম্ শাক, টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতি সব্জী বীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

মকাই (ছোট মকাই) এবং দে-ধান চাষের এই সময়।

হলুদ, আদা, জেরুজালেম, আর্টিচোক, এরোরুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। দাঁড়া বাঁধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় এবং গাছগুলি জলে গোড়া আল্গা হইয়া পড়িয়া যায় না।

ফুলবাগিচা।—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা) এমারন্থস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম (Sunflower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখন গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কাটিং করিয়া চারা তৈয়ার করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাপা, চামেলি, যুঁই, বেল, প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান—বর্ষা নামিলে আম, লিচু, পিয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইতে হয়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন—ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়, কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া শিকড় পচিয়া না যায়। আম, লিচু, কুল, পিচ, নানা প্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত

নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এই সময় কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের মোকা বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পিচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়। পেঁপে বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বর্ষার জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি খোঁড়া উচিত, এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। হাড়ের গুঁড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ, যথা,—শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচুড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

যাঁহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছ গুলি দস্তুর মত গজাইয়া উঠিবে।

শস্যক্ষেত্র—কৃষকের এখন বড় মরশুম, বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতকস্থানে কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পাট বোনা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে পাট তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। তথা হইতে নূতন পাট এই সময় বাজারে আমদানী হয়। দক্ষিণ-বঙ্গে পাট কিছু নাবি হয়, কিন্তু এখানেও পাট বুনিতে আর বাকি নাই। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে হইয়া যায়।

বর্ষাকালে ঘাস এবং আগাছা ও কুগাছার বৃদ্ধি হয় সুতরাং এখন সব্জী ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে নিড়ানি দেওয়া উচিত। ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও আবশুক। ফলের বাগানের আগাছা কুগাছাগুলি উপড়াইয়া তুলিয়া দিলে ভাল হয়। আগাছাগুলির বীজ পাকিয়া মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বে তাহাদের বিনাশ করিতে পারিলে তাহাদের বংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কপি চারা ক্ষেত্রে বসান হইতেছে। পূজার পূর্ব্বেই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে কলিকাতায় কপি, কড়াইশুঁটী প্রভৃতি আমদানি হয়।

এই সময় পার্ব্বত্য প্রদেশে সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, কস্‌কোম্ব, কেপ গাঁদা, দোপাটী প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করা হইতেছে।

REGISTERED No. C. 192

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

পঞ্চদশ খণ্ড,—৩য় সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস

আষাঢ়, ১৩২১।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সুরমা ও সুকেশ।

সুকেশ না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। বস্তুতঃ কেশই কামিনীগণের প্রধান সৌন্দর্য্য। নিখুঁৎ সুন্দরীকেও কেশের অভাবে বড় কদর্য্য দেখায়। অতএব কেশের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। উপায় থাকিতে তাহাতে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? শুনেন নাই কি?—আমাদের "সুরমা" তৈল কেশের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে অদ্বিতীয়! "সুরমা" ব্যবহারে অতিশীঘ্র কেশ ঘন,দীর্ঘ কাল ও কুঞ্চিত হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। সন্দেহ করিবেন না. শুধু ইহাই নহে,—"সুরমা" মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাজ্বালা, অনিদ্রা প্রভৃতি যন্ত্রণারও সত্বর উপশম করে। কোন ঔষধে যে টাক ভাল করিতে পারেন নাই, একবার সুরমা ব্যবহার না করিয়া, তাহাতেও হতাশ হইবেন না। বিশ্বাস রাখিবেন—সুরমার সদ্‌গন্ধ—জগতে অতুলনীয়। বড় একশিশির মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা। একত্রে বড় তিন শিশির মূল্য ২৲ টাকা,মাশুলাদি ৸৶৹ আনা। ৵৹ আনার টিকিট পাঠাইয়া নমুনা লউন।

সূতিকারিষ্ট।

সূতিকারোগ স্বভাবতই দুঃসাধ্য। প্রসবকালে অতিরিক্ত রক্তস্রাবাদি কারণে দেহ একবারে ভাঙ্গিয়া যায়। কাজেই যে কোন রোগ সে অবস্থায় উপস্থিত হইলে, তাহা মারাত্মক হইয়া উঠে। আমাদের 'সূতিকারিষ্ট' সূতিকারোগসমূহের বিশেষ পরীক্ষিত অব্যর্থ মহৌষধ। অজীর্ণ, অক্ষুধা অম্লপিত্ত, পেটফাঁপা, ভেদ বমি, জ্বর, দুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতা প্রভৃতি উৎকট অবস্থায়, সূতিকারিষ্ট আশ্চর্য্য উপকার করিয়া থাকে। যাঁহাদের দুগ্ধ অল্প, তাঁহারাও এই ঔষধ সেবনে আশানুরূপ উপকার পাইবেন। গর্ভাবস্থা হইতে এই ঔষধ সেবন করিলে, কোনরূপ সূতিকারোগ আক্রমণ করিতে পারে না। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

কর্ণ-বিন্দু।

কাণ পাকিলে বা কাণে জল হইলে, কাণের ভিতর দারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়। সে সময়ে দুই একবিন্দু 'কর্ণবিন্দু' কাণে দিলেই তৎক্ষণাৎ সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হইয়া, ক্রমশঃ পূয়স্রাব বা জলস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। কাণের ভিতর নানাপ্রকার শব্দ হইলে, কিংবা কাণে কম শুনিলেও এই ঔষধ ব্যবহার করিবেন। ইহা কর্ণরোগ মাত্রেরই আশু উপকারী অমোঘ মহৌষধ। এক শিশির মূল্য ৷৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।⁄৹ পাঁচ আনা মাত্র।

গন্ধদ্রব্য।

আমাদের প্রত্যেক ফুলের অটো—যথা অটো ডি রোজ, অটো ডি খস্‌খস্‌, অটো ডি মতিয়া, অটো ডি নিরোলী প্রভৃতি, সকলের নিকট সমান আদরণীয়। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র, মাশুলাদি ।⁄৹ পাঁচ আনা। আমাদের ল্যাভেণ্ডার-ওয়াটার এক শিশি বার আনা, ডাক মাশুল ।৶৹ আনা। অডিকলোন এক শিশি ৷৷৹ আনা, ডাক মাশুল ।৶৹ আনা।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্‌।

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম-বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

কৃষক।

সূচীপত্র।

আষাঢ়, ১৩২১ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কটিং দ্বারা বাঁশের বংশ বৃদ্ধি কি রূপে হয় তাহা উপরের চিত্রে দেখান হইয়াছে। চীনা বাঁশের কটিং হইতে সহজেই চারা উৎপন্ন হয়।

(“উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি” প্রবন্ধ দেখ)

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ খণ্ড। } আষাঢ়, ১৩২১ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

ডুম্বুর

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায় লিখিত

সহরের হাওয়া অনেক দিন হইতে মফঃস্বলে লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। মফঃস্বলের তরিতরকারী সহরে আমদানী হইয়া দুর্ম্মূল্যে বিক্রীত হইলেও পল্লীগ্রামে তাহারা সেরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিত না, কিন্তু এক্ষণে সুদূর পল্লীগ্রামে যেখানে রেল যায় নাই সেখানে পর্য্যন্ত মিষ্টি কুমড়ার ফালি দিয়া বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে, বেগুন ওজনে বিক্রয় হয়, পুঁটীমাছ বেচিতেও বাগ্‌দীরা সের বাটখারা আনে, বনের কচুশাকও হাটে বিক্রয় হইতে আসে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত অনাবাদি উপাদেয় তরিতরকারী গুলি প্রকৃতির উদ্ভিদ রাজ্যে—আপনিই জন্মাইতেছে, আপনিই ফলদান করিয়া করিয়া মরিয়া যাইতেছে কেহ দেখেনা কেহ যত্ন করে না—আমাদের সেগুলিকে যত্ন করিবার, আদর করিবার, খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া তাহাদের পুষ্টি সাধন করিবার সময় আসিয়াছে, আমরা যদি এক্ষণে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য না রাখি তবে ভবিষ্যতে আমাদিগকে বিশেষতঃ পল্লীবাসীকে অন্নের উপকরণ তরকারীর জন্য আরো লালায়িত হইয়া পড়িতে হইবে। যেমন কলমি শাক, শুশুনি শাক, গাধমণি, কাঁটানটে, কচুশাক ও ওল প্রভৃতি কতকগুলি শাক সব্জীর বিশেষ কোন পাট ঝাট না করিলেও তাহারা পাড়াগাঁয়ে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মাইয়া পল্লীবাসীর আহারের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকে ডুমুরের গুণ জানেন না, ডুমুরের আস্বাদ বোঝেন না। ডুমুরের যে কত বিভিন্ন প্রকারের উত্তম মুখরোচক ব্যঞ্জন রন্ধন হইতে পারে, তাহার কোন সন্ধানও রাখেন না, এমন কি আমি দেখিয়াছি রাঢ় দেশে এই উপাদেয় তরকারীর কোন ব্যঞ্জন রাঁধিতে তারা জানে না, কেবল কচিৎ কখনও রোগের পথ্য স্বরূপ

ডুমুর ছেঁচকি খাইয়াও ডুমুরের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে। মানুষের যত প্রকার উদ্ভিদ খাদ্য আছে তাহার মধ্যে মানকচু, ওল, পেঁপে, ডুমুরের সমকক্ষ কোনটিও নহে, পটল হইতেও ইহারা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ।

ডুমুর আবার দুই জাতীয়,—দেশী ও যজ্ঞডুমুর; দেশী ডুমুরকে কোন কোন স্থানে কাট ডুমুর কহিয়া থাকে। হিন্দুদিগের যাগ, যজ্ঞ, হোমাদিতে যে ডুমুর কাষ্ঠ ও পত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাকেই যজ্ঞডুমুর কহে। ডুমুর সুস্বাদু, শীতল, ইহার দ্বারা কফ, পিত্ত, অর্শ, পাণ্ডু-রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে, ইহা রক্ত-দোষ প্রশমক ও মুত্রাতিসার উপশম কারক। বহুমুত্র ও যকৃত-দোষ-যুক্ত রোগে ডুমুর নিত্য ভোজনে প্রকৃত ঔষধের কার্য্যই করিয়া থাকে।

যজ্ঞ ডুম্বুর সম্বন্ধে ভাব প্রকাশ বলেন—
উডুম্বরো হিমোরুক্ষো গুরু পিত্ত কফাস্রণুৎ।
মধুরস্ত বরোবর্ণ্যো ব্রণ শোধন রোপণ॥

অর্থাৎ এই স্বনাম খ্যাত প্রসিদ্ধ ফলের গুণ মধুর, শীতল, গুরু, রুক্ষ, কান্তিকারী, পিত্তদোষ, কফদোষ ও রক্তদোষ নাশক এবং ব্রণ শোধন ও রোপণ কারী। বেশী কথা বলিতে কি কবিরাজদিগের মুত্রাধিকারে যজ্ঞ ডুমুরের গুঁড়া ভিন্ন ঔষধের অনুপান নাই; ডাক্তারদিগের কোষ্ঠ কাঠিন্য ও যকৃত দোষে (Habitual Constipation ও Liver Function) ভাল করিতে ডুম্বুরাসব (Syrup of Figs) ভিন্ন প্রেসক্রপসন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গবাদি পশুগণ চাড়া না করিলে অর্থাৎ ভাল করিয়া সানি * না খাইলে ডুমুর পত্রই তাহাদের একমাত্র আহার ও ঔষধ। দদ্রু প্রভৃতি রোগাক্রান্ত স্থান ডুমুরের পাতা দিয়া অল্প ঘসিয়া ঔষধ লাগাইলে রোগ সমূলে আরোগ্য হইয়া থাকে, সবুজ পাতার ঝোপ যুক্ত ডালের মধ্যে থলো থলো রাঙা টুকটুকে পক্ক ডুমুর বেশ সুন্দর দেখায়। পাকা ডুমুর কাক, কোকিল, শালিক, হারিয়াল, বাদুড় প্রভৃতির প্রিয় খাদ্য। ডুমুরের ফুল দেখা যায় না। লোকে বলে ফুল ডুমুরের ভিতরে থাকে, ভিতরে ফুল ফুটিলে কি করিয়া যে ফলের উৎপত্তি হয় তাহা উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌দিগের বিচার্য্য। যাই হউক ডুমুরের ফুল দেখা যায় না বলিয়াই আমাদের বন্ধু বান্ধব কাহাকেও বেশী দিন না দেখিতে পাইলে বা কেহ দলে না মিশিলে আমরা “ডুমুরের ফুল” হ'য়ে পড়লে যে এই বাক্যটী ব্যবহার করিয়া থাকি। সাধারণতঃ দেশী ডুমুরই খাইতে অধিক সুস্বাদু এবং ইহার দ্বারাই বাঙলা দেশে বিভিন্ন প্রকারের তরকারী রান্না হইয়া থাকে। কচি যজ্ঞডুমুরও তরকারীর জন্য ব্যবহৃত

* খড়, কুটীর সহিত খৈল বা ভুষী দিয়া যে জাব মাখিয়া দেওয়া হয় তাহাকে সানি বলে। জাবে অরুচির নাম চাড়া না করা।

হয় এবং ভাতে দিয়া সিদ্ধ খাইলেও বেশ ভাল লাগে। ডুমুরের কাঠে বেশ জ্বালানি হয়। এই কাঠ কিছু হাল্কা সেই কারণে গাছ কাটার ২।৩ দিন পরে জ্বালানির উপযুক্ত হইয়া উঠে। এই যে ডুমুর গাছ পাড়াগাঁয়ের বনজঙ্গলে, সহরগুলির উজাড় ভিটায়, পুকুর পাড়ে, খানা ডোবার ধারে, বেড়ার গায় আপনিই রাশি রাশি জন্মিতেছে ও অকালে কালকবলিত হইতেছে, এদিকে কি কোন গৃহস্থ লক্ষ্য রাখিয়াছেন? পটল, কাঁকুড়, আলু, কপি ফসলের জন্য কৃষাণ যেরূপ খরচ করিয়া থাকেন, জমির যেরূপ পাইট করিয়া থাকেন, এই প্রকৃতি পালিত স্বভাব জাত ডুমুর বৃক্ষের প্রতি কি কেহ তাহার শতাংশের একাংশও তদ্বির করেন? ডুমুরের চাষ করিতে হয় না, ডুমুর গাছের জন্য জমি চষিয়া বীজ বুনিতে হয় না, ডুমুর বাগানে জল নিকাশের পথও প্রস্তুত করিতে হয় না। গৃহস্থ যদি আগাছা বলিয়া ইহার হতাদর না করেন, পল্লীবাসী যদি জ্বালানি কাঠের জন্য শৈশবেই ডুমুর বৃক্ষের ধ্বংস সাধন করিয়া না বসেন ত এই স্বভাবজাত ডুমুর বৃক্ষে গ্রামের নিবিড় জঙ্গল প্রায় ভরিয়া যায় এবং এই আকালের বাজারে অভাবের দিনে ডুমুর আমাদের একটী প্রধান উপাদেয় রুচিকারক তরকারী রূপে জীবন ধারণের সহায়তা করিতে পারে। ডুমুর গাছের গোড়ার বন জঙ্গল মাঝে মাঝে পরিষ্কার করিয়া কোপাইয়া দিলে গাছ সতেজ হয় এবং বারমাসই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফল ধরিতে থাকে, আর ফলও সুস্বাদু ও মোলায়েম হয়। দেশী বা কাঠ ডুমুরের কত প্রকার তরকারী রাঁধা যাইতে পারে আমি সংক্ষেপে তাহাই বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ডুমুর বেশী পাকিয়া গেলে তাহা পাখীর খাদ্য হয়। সামান্য ডাঁসা ডুমুর ছাঁকা তেলে ভাজিলে তাহা অত্যন্ত মুখ প্রিয় হয়, কুলবড়ি বা ঝালবড়ি ভাজা, দাইলের যেমন উপলক্ষ্য, ডুমুর ভাজা তাহা হইতেও উপাদেয়। ডুমুর ভাজিতে গেলে বেগুন ভাজার মতন ইহাকে চাকা চাকা করিয়া কুটিতে হয়। অনেকে তৈলের সাশ্রয় করিবার জন্য ডুমুর আগে সিদ্ধ করিয়া লইয়া পরে অল্প তেলে ভাজিয়া থাকেন; ইহাকে ডুমুর ছেঁচ্‌কি বলে। ডুমুর ছেঁচ্‌কি রাঢ় দেশে আমাশয় ও জ্বররোগীর প্রধান পথ্য। ডুমুর সিদ্ধ করিয়া কাথ ফেলিয়া দিলে বাস্তবিকই ডুমুরের আস্বাদ অনেক কমিয়া যায়, উহার উপকারীতা গুণের অনেক হ্রাস হইয়া যায়। প্রথমেই একটু তৈল দিয়া ভাজিয়া লইলে ডুমুরের কষায় দোষ নষ্ট হইয়া যায়। মধ্য-বঙ্গে ডুমুরের নিরামিষ ডাল্‌না, ডুমুর মাছের তরকারী ও ডুমুরের শুক্ত অতি আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডুমুরের নিরামিষ ডাল্‌নায় প্রথমে কচি কচি ডুমুর কুটিয়া আলু ও বড়ি তৈলে ভাজিতে হয় পরে জিরে, মরিচ, ধনে, তেজ পাতা, লঙ্কা বাটা জলে গুলিয়া সেই জলে ডুমুর সিদ্ধ করিতে হইবে, জরিয়া আসিলে, পৃথক সম্বরা দিয়া পুনরায় জ্বালে চড়াইতে হয়,

সামান্য পরিমাণ জল থাকিতে গরম মসলা ও ঘি দিয়া নাড়িয়া বেশ মাখ মাখ হইলে নামাইয়া রাখ, দেখিবে ডুমুরের ডালনা কেমন মধুর জিনিস হইল। ডুমুর মাছ রাঁধবার সময় প্রথমেই সম্বরা দিয়া ডুমুর ভাজিয়া লইয়া আগে অল্প সরিষা ও লঙ্কা বাটা দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়, পরে জল মরিয়া আসিলে সেই সময় পৃথক আলুভাজা ও মাছভাজা উহাতে মিশাইয়া অল্প ফুটাইয়া একটু ঝোল বেশী থাকিতে থাকিতে ঘি ও গরম মসলা দিয়া নামাইয়া লইতে হয়। ডুমুরের শুক্ত—প্রথমে ডুমুর ভাজিয়া পরে সরিষা বাটার জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়, পরে সিদ্ধ হইলে পৃথক ভাজা আলু ও বড়ি এবং সামান্য একটু মিষ্টি তাহাতে মিশাইয়া পাতলা থাকিতে থাকিতে নামাইয়া, পুনরায় নিম পাতা বা পটল পাতা তেজপাতা মেথির সম্বরা দিয়া একটু সামান্য ফুটাইয়া নামাইবার সময় সামান্য একটু চাউলের গুঁড়া দুধ ও ঘি মিশাইয়া নামাইলে উত্তম উৎকৃষ্ট শুক্ত প্রস্তুত হইল।

অবশেষে আমি বলিতে চাই যে, যে জিনিস আমাদের এত উপকারী এত সর্ব্বগুণ সম্পন্ন, যে উদ্ভিদ আপনা আপনিই বন জঙ্গলে জন্মাইয়া মানুষের উপকারের জন্য, মানুষের আহারের বারমাস প্রতীক্ষা করিয়া থাকে এবং তরকারীর মধ্যেও প্রথম শ্রেণীর তরকারী, তাহাকে কি গৃহস্থ, কি গরিব কি বড়লোক সকলেই আদর করিতে শিখিলে, তাহাদের বংশরক্ষার জন্য সকলেই সচেষ্ট থাকিলে, আমাদের উপকার ভিন্ন, আমাদের সাহায্য ভিন্ন,—আমাদের মঙ্গল ভিন্ন কখনও অমঙ্গল হইবেনা এবং ডুমুরকে রক্ষা করিতে গেলেও আমাদের কোনও বেগ পাইতে হইবে না।

ধানের আবাদ

আমরা বিগত বর্ষে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষকে ধান চাষ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ভারতে ধান একটা প্রধান খন্দ কেন না চাউল ভারতবাসীর একটা প্রধান খাদ্য—ভারতে লোকে দুই বেলার মধ্যে এক বেলা ভাত খায় না এমন লোক খুব কমই দেখা যায়। সুতরাং এ দেশের চাষীরা ধান চাষের কৌশল কিছু কিছু অবগত আছে। তাহারা আউশ ধানের জমি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে, পৌষ ধানের প্রকার ভেদে কোন জমিতে কোন ধান রোপণ বা বপন করিতে হইবে, কোন ধানেরজমিতে কতটা জল রক্ষা করা আবশ্যক তাহা তাহারা বুঝে। ধানের চাষের কখন্ জমি তৈয়ারি করিতে হইবে, কখন্ তাহাতে সার দিবে তাহাও না জানে তাহা নহে। তবে তাহারা

অন্য দেশের চাষীর তুলনায় কিঞ্চিৎ উৎসাহ শূন্য। বৃষ্টির জল হইতে বঞ্চিত হইল, আচ্ছ দেখা যাক্, সেচন জলে আবাদ রক্ষা করা যায় কি না, এ চেষ্টা তাহাদের নাই। দূর হইতে জল আনিয়া ক্ষেতে যোগাইবে, সার নির্ব্বাচন করিতে করিতে এমন সারের সন্ধান করিবে যে, যাহা দ্বারা এক মণের স্থানে দুই মণ ফসল উৎপন্ন হইবে, এবং কলে কৌশলে চাষ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সর্ব্বদাই একাগ্র চিত্ত, এরূপ একটা প্রাণপাত দৃঢ়তা, এদেশের চাষীর ভিতর প্রায়ই দেখা যায় না। এ দেশের চাষীরা কিছু উদ্যমহীন এবং তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার লোকও বিরল। অন্য দেশে রাজা উদ্যোগী, জমিদারগণ উদ্যোগী, ব্যবসায়ীরা উদ্যোগী সুতরাং কৃষককুল সকলের যত্নে যত্নবান। কৃষকদিগের সেই উদ্যম উত্তেজনার জন্য আমরা ধান চাষের জানা কথা নূতন করিয়া জানাইতে চাই এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বুঝাইতে চাই যে, সুচাষ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ থাকিলে তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষেতের সুব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং নিজ ক্ষেতের চাষ আবাদের সুপ্রণালী দেখাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কৃষকগণের নিকট একটা দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া দাঁড়াইতে পারিবেন।

যে কোন স্থানে ধানের ক্ষেত নির্ব্বাচিত হইবে তাহার আইলে বা চারি ভিতে জঙ্গল থাকিলে ঐ সমস্ত জঙ্গল ধান চাষের পূর্ব্বেই পরিষ্কার না করিলে ধানের ক্ষেতটা পরিষ্কার রাখা যায় না বা পোকার উপদ্রব আশঙ্কা ঘুচে না। যেখানে এক টানা ১০ কিম্বা ৫ মাইল ধরিয়া কৃষি ক্ষেত্র চলিয়াছে সেখানে অনেক চাষীকে ক্ষেতের ধার ভিত পরিষ্কার করিবার জন্য ভাবিতে হয় না কিন্তু কোন চাষী যেন তাহার নিজের ক্ষেত জঙ্গল করিয়া ফেলিয়া না রাখে, এমন কিছু বিধি ব্যবস্থা করা উচিত। নূতন আবাদ পত্তনে কিন্তু এমন হয় না। ক্ষেতটা কোন জঙ্গল বা পাহাড়ের ধারে হইলে ক্ষেতের চারি দিকে ৪ কিম্বা ৫ হাত ভূমি পরিষ্কার রাখা চাই। তারপর ক্ষেতের জল নিকাশের উপায় করিতে হয়। যথোপযুক্ত পয়ো-নালা রাখিলে জমিতে জল বসিবে না। জমিতে জল বাঁধিয়া রাখিবার জন্য জমির চারি দিকে ছোট বড় বাঁধ বা আইল দিতে হয়। কখন কখন জমিতে জল ঢুকাইবার বা বাহির করিবার জন্য ছোট খাট খাল কাটিতে হয় ও খালের মুখে কপাট কল বসাইতে হয়। সুন্দর বনে আবাদ করিতে গেলে গাঙ্গের দিকে বিশেষ উঁচু ও চওড়া বাঁধ দিবার আবশ্যক। এই সকল বাঁধকে ভেড়ী বলে। লোনা গাঙ্গ বা খালের লোনা জল ঢুকিলে আবাদ নষ্ট হইয়া যায়। বাঁধের মাঝে মাঝে পুল, জল নিকাশ, জল প্রয়োগের ব্যবস্থা করাতেই ধানের আবাদের কৌশল প্রকাশ পায়। নূতন আবাদ পত্তন করিতে গেলে বন কাটিয়া তাহাতে লাঙ্গল মই দিয়া একেবারে ধান রোপণ করা চলে না। বন কাটিয়া কতকটা জমি পরিষ্কার হইয়াছে মাত্র এখনও ক্ষেত হইতে বড় গাছের গুঁড়িগুলি উঠে নাই।

এরূপ স্থলে ফাঁকে ফাঁকে লাঙ্গল মই চালাইয়া জমি কতকটা সমতল করিয়া লইয়া ধান বপন করা চলে মাত্র, ধান বীজ রোপণের সুযোগ হয় না। এই রকমে দুই এক বৎসর যাহা কিছু ধান জন্মান যায় তাহার চেষ্টাই একমাত্র কাজ। এমন জমিতে কোন সারের আবশ্যকতা দেখা যায় না। নদী বা খালের পলি পড়া প্রভৃতি নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ সারে জমি সাতিশয় সারবান থাকে। কোদাল খোন্তা দ্বারা গাছের গোড়াগুলি তুলিয়া ফেলিবার পর জমি সম্পূর্ণ সমতল হইলে তবে তাহাতে ধান রোপণের সুবিধা হইবে। এইরূপে নূতন ধানের আবাদ ক্রমশঃ পুরাতন আবাদে পরিণত হয়।

পুরাতন আবাদে ধান কাটিয়া লওয়ার পর ধান ক্ষেতে গরু বাছুর চরিতে দেওয়ার বিধি মন্দ নহে। তাহাতে অনেক আগাছা কুগাছা, পোকার বাসা নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদের মলমূত্রে জমি, ফসল উৎপন্ন করিয়া যে টুকু সার হীন হইয়া পড়িয়াছে তাহার কথঞ্চিৎ পুরণ করিয়া লইতে পারে। ধান ক্ষেতে ভেড়ার পাল কিছু দিন থাকিতে দিলে, তাহারা ক্ষেতে খাইতে, শুইতে, রাত্রে বিশ্রাম করিতে পাইলে ক্ষেতটি বিশেষ সারবান হইয়া পড়ে। তাহাদের মলমূত্রত ক্ষেতে সঞ্চিত হয়ই, তাহারা ক্ষেতে দাঁড়াইয়া যে খৈল ভুষী খায় তাহার কতকাংশ ক্ষেতে ছড়াইয়া যায় ও সারের কার্য্য করে। বাঙলার রসামাটিতে ভেড়ার পাল রক্ষা করিবার বড় সুবিধা হয় না, পাটনা, গয়া, বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই প্রকারে জমি সারবান করিয়া লওয়া চলে। এক পক্ষ বা ১৫ দিন ক্ষেতে গবাদি পশুকে চরিতে দিয়া বা মেষাদি রক্ষা করিয়া তাহার পর ক্ষেত লাঙ্গল দ্বারা চষিতে হয়। ধানের জমিতে কোদাল দিবার আবশ্যক নাই কারণ ধানের শিকড়গুলি গুচ্ছমূল, শিকড়, অধিক দূর মাটিতে প্রবেশ করে না সুতরাং জমিতে অনতি গভীর চাষ হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, বরং কোদাল দ্বারা কোপাইবার কালে উপরের পলি মাটিটা নীচে পড়িয়া গেলে ক্ষতি আছে। প্রথম বার চাষের সময় জমিতে ধানের যে গোড়া গুলি থাকে বা জমির উপর যে সবুজ ঘাস তৃণ জন্মিয়া থাকে সে গুলিকে উত্তম রূপে কর্ষণের সঙ্গে মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে পারিলেই লাভ আছে কারণ, সে গুলিও জমির অপহৃত সারের অংশ যোগাইবে। ক্ষেতটি দুই চারিবার চষিয়া জমিটি তিন সপ্তাহকাল ফেলিয়া রাখা উচিত। এই সময় রৌদ্র বাতাস লাগিয়া জমি আবাদোপযোগী হইয়া উঠে। উত্তাপ সংযোগে খড়, কুটা, ঘাস প্রভৃতি আবর্জ্জনাগুলির পচন ক্রিয়া সংসাধিত হয়। বাতাস সহযোগে বায়ুস্থিত অম্লজান কিয়ৎপরিমাণে মাটির সহিত মিশিয়া মাটিকে উর্ব্বরা করিয়া তুলে। রৌদ্র বাতাস লাগিয়া আর একটা মহৎ উপকার হয়। যে সকল নিচু জলাজমিতে ধান চাষ হয় তাহাতে আগাছা কুগাছা পচিয়া একপ্রকার অম্লরস সঞ্চিত হয়।

এই সকল জলা জমি বৎসরের এক সময় শুখায়। এই সময় চাষ দিলে রৌদ্র বাতাসে সেই অম্লরস বিনষ্ট হয়। এই অম্লরস বর্ত্তমান থাকিতে ধানের আবাদ ভালরূপ হয় না। এই সকল কারণে ধানের আবাদের পূর্ব্বে জমিতে রৌদ্র বাতাস লাগান নিতান্ত আবশ্যক। যে জমিতে রৌদ্র বাতাস পায় না বা যাহাতে চাষ আবাদ দ্বারা মৃত্তিকার ভিতর বাহিরে প্রত্যেক ক্ষুদ্রাংশে রৌদ্র বাতাস লাগাইবার ব্যবস্থা নাই, সে সকল জমি নিতান্ত অপকৃষ্ট ও চাষাবাদের অযোগ্য। মাটিতে উত্তাপ ও হাওয়া লাগাইবার জন্য জমি ৩ সপ্তাহ কাল ফেলিয়া রাখিয়া পুনবায় তাহাতে আবার চাষ দিতে আরম্ভ করিতে হয়। এই চাষের পর জমিতে সার ছড়াইবার উপযুক্ত সময়। এই সময় পটাস নাইট্রেট বা নাইট্রেট অব লাইম (চুণ প্রধান সার) ছড়াইলে মৃত্তিকাস্থিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ সমূহ শীঘ্র পচিয়া সারে পরিণত হয়। মাটিতে সার সমানভাবে মিশাইবার জন্য জমিতে লাঙ্গল, দ্বারা চষিয়া মই দিতে হয়। মই দ্বারা সমান করিয়া মাটি চাপিয়া রাখাও কর্ত্তব্য। জমি সরস না থাকিলে রৌদ্রের উত্তাপে সারস্থিত এমোনিয়া উবিয়া যাইতে পারে সুতরাং জল সেচন করিয়া জমিতে রস রক্ষা করিতে না পারিলে তোমার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে না। সার, মাটিতে মিশিবার জন্য এক সপ্তাহ বা ১২ দিন সময় ক্ষেপন করিতে হইবে। তারপর বীজ বপন। চাপা মাটিতে বীজ পড়িলে চলিবে না সুতরাং জমিতে পুনরায় একবার লাঙ্গল দিয়া অঙ্কুরিত ধান বীজ হাতে সব ক্ষেতময় ছড়াইতে হয়। এই সময় ক্ষেত সরস থাকিবে মাত্র, জল থাকিবে না, জল থাকিলে পূর্ব্ব হইতে জল বাহির করিয়া দিয়া জমি শুকাইয়া বীজ বপনের উপযোগী করিয়া লওয়া আবশ্যক, এ কথা চাষীমাত্রেই জানে। বীজ ধান রোপণ করিতে হইলে জমিতে জল প্রবেশ করাইয়া লাঙ্গল মৈ দ্বারা কাদা ও জমি সমান করিয়া লইয়া গুচ্ছ গুচ্ছ বীজ ধান রোপণ করিতে হয়। বীজ ফেলিয়া বীজ-ধান স্বতন্ত্র ক্ষেতে তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়। সেই বীজ ক্ষেত্রটিও সারবান হওয়া আবশ্যক। তেজস্কর বীজ না হইলে আবাদ ভাল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বাছিয়া তেজস্কর বীজই ক্ষেতে রোপণ করা কর্ত্তব্য। ছায়া জায়গার বীজ দেখিতে নধর, কাল ও ঢ্যাঙ্গা হয় সে বীজ ধান অপেক্ষা রোদ পৃষ্ঠা স্থানের ঈষৎ খর্ব্বাকৃতি দৃঢ়াবয়ব বীজই ভাল। বীজের গুণেই আবাদ। নির্ব্বাচন দ্বারা ভাল বীজ সংগ্রহ করা আবশ্যক আমরা অতঃপর সেই কথারই আলোচনা করিব। বীজ ক্ষেত্র দুই প্রকার জমিতে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এক সরস উচ্চ জমিতে, দ্বিতীয় নিচু জলা জমিতে। উচ্চ জমির বীজ কিছু ভাল হয়। চাষ কারকিৎ করিয়া আউশ ধানের ক্ষেত্রের মত বীজ ক্ষেত্র রচনা করিতে হয়। নিচু জমিতে জল থাকিলে তাহাতে চাষ দিয়া কাদা করিয়া তাহাতে কল (অঙ্কুর) ওয়ালা ধান বীজ বপন করা হয়। জমি কর্দ্দমাক্ত

থাকিবে কিন্তু জলে ডুবিয়া থাকিবে না। যদি দৈবক্রমে বৃষ্টির জলে ক্ষেতটি ডুবিয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ জল সেচিয়া ফেলিতে হইবে; ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে বীজ খারাপ হইবে। উচ্চ জমির বীজক্ষেত্রকে শুকতলা এবং নিচু জমির বীজক্ষেতকে পেঁকে তলা বলে।

এলুমিনম্ ধাতুপাত্র

আজকাল বাজারে এলু মিনম্ ধাতুর বাসনে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। বাজারে কাঁসা পিতলের বাসনের কাট্‌তি কমাইয়া দিয়াছে। আগে এই ধাতুজাত দ্রব্যের অধিক মূল্য ছিল বলিয়া সাধারণে ইহা ব্যবহার করিতে পারিত না। ইংলণ্ডের জনৈক মিঃ ই রিষ্টোরি সাহেব ১৫ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে এই ধাতু পাত্রের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি তখন বলিয়াছিলেন যে শীঘ্রই এই ধাতু পাত্র বাজারে অতি অল্পমূল্য বিক্রিত হইবে এবং ইহার বহুল প্রচলন হইবে। তাঁহার কথা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

এলুমিনমের ছোট খাট বাসনের কথা ছাড়িয়া দাও, এখন দেখিতে পাইবে এলুমিনাম্ ফলক লিথোগ্রাফিতে প্রস্তর ফলকের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া কাজ ভাল হইতেছে; কেন না এই ধাতু নির্ম্মিত চাদর গুলি সহজে বাঁকিয়া "রোটারি প্রেসের" মধ্য দিয়া যাইতে পারে। মোটর গাড়ী নির্ম্মাণে এই ধাতু অধিক মাত্রায় লাগিতেছে কেন না ইহা অতি হাল্কা। খুব সম্ভব যে ইহা ডাকগাড়ী ও রেল গাড়ী নির্ম্মাণে বহু পরিমাণে আবশ্যক হইবে এবং এই ধাতু ব্যবহার করিলে অনেক স্থলে গাড়ীর ফর্ম্মা তৈয়ারি করার বাজে খরচ বাঁচিয়া যাইতে পারিবে।

ভারতের মান্দ্রাজ নগরে এলুমিনমের সুপ্রসিদ্ধ কারখানা। গভর্ণমেণ্ট এই কারখানার অনেক জিনিষ ব্যবহার করেন। এই কারখানায় এখন প্রচুর পরিমাণে জলাধার, দুগ্ধাধার, বিবিধ রন্ধন পাত্র, চুরুট ও সিগারেটের বাক্স, প্রভৃতি বহুবিধ তৈজস প্রস্তুত হইয়া ভারতের নানা দিকে চালান হইতেছে।

ইউরোপ হইতে এই ধাতু চাদর (Sheets) ও থান আকারে (discs) ভারতে আমদানী হয়। ১৫ বৎসর আগে এই ধাতু ৮০০ হন্দর পরিমাণ ভারতে আমদানী হইয়াছিল। তখন ইহার দাম এক লক্ষ টাকা। প্রতি হন্দরের মূল্য ছিল ১২৫৲ টাকা। এক্ষণে আমদানীর মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ধাতুর মূল্য অনেক কমিয়াছে—বর্ত্তমান মূল্য ১১০৲ টাকা হন্দরের অধিক নহে।

ভারতের পক্ষে একটা সুসমাচার এই যে, ভারতের মধ্য-প্রদেশে এলুমিনিম্ ধাতুর খনি পাওয়া গিয়াছে। এই খনির কার্য্য ঠিকমত চলিলে বোধ হয় আর এই আমদানী হইবে না। ধাতু

এলুমিনম্ ধাতুর ব্যবহার—রন্ধনে ও খাদ্যাদি পরিবেষণে এই ধাতু পাত্র ব্যবহারে কোন প্রকারে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা আছে কি না স্বতঃ লোকের মনে এই কথার আন্দোলন হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে আমরা বুঝিয়াছি স্বর্ণপাত্র সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, তাহার নিম্নে রৌপ্য পাত্র এবং লৌহ পাত্র সর্ব্ব নিকৃষ্ট। চোর ও কয়েদীগণের লৌহ পাত্রে ভোজনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। স্বর্ণ পাত্রে অম্লের বা লবণের কোন ক্রিয়া হয় না বলিয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্ব। এলুমিনম্ পাত্রে স্থূল দৃষ্টিতে অম্লের বা লবণের কোন ক্রিয়া হইতে দেখা যায় না। তার উপর কিছু প্রমাণ চান আমরা সুপ্রতিষ্ঠিত "বিজ্ঞান" পত্রে প্রকাশিত ল্যান্‌সেট নামক বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসা পত্রিকার অভিমত কৃষকের পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম—

"নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, খাদ্যে এলুমিনিয়ম ধাতুর তৈজস ব্যবহার তত বিপজ্জনক নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে লৌহের তৈজস খাদ্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কড়া, খুন্তি ইত্যাদি রন্ধন-শালায় অবশ্য ব্যবহার্য্য। খাদ্য এবং জলের প্রভাব লৌহ তৈজসে যতটুকু পরিলক্ষিত হয়, এলু-মিনিয়মে তদপেক্ষা আদৌ অধিকতর নহে। সকলেই অবগত আছেন যে জল ও বায়ু সংস্পর্শে লৌহে অতি শীঘ্র মরিচা পড়ে। এতদ্ব্যতীত অঙ্গারমূলক এসিড মাত্রেই ইহার উপর যথেষ্ট ক্রিয়া করে। চিকিৎসকগণ বলেন, লৌহ-জাত রাসায়নিক লবণসমূহ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে শরীরে বিষক্রিয়া উৎপাদিত হয়। এইরূপ এলুমিনিয়ম জাত লবণসমূহও বিপজ্জনক। উদাহরণ স্বরূপ ফট্‌কিরি ও এলামক্লোরাইডের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত যত প্রকার খাদ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোনটিই লৌহ বা এলুমিনিয়ম তৈজসে প্রস্তুত করিলে তাহা দ্বারা স্বাস্থ্যহানিকর কোনরূপ রাসায়নিক লবণ উৎপাদিত হয় না। পরীক্ষার দ্বারা যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, এমন কি অঙ্গারমূলক অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ বা জান্তব দ্রাবক ব্যবহার করিলেও অতি সামান্য মাত্র ধাতু বিগলিত অবস্থায় খাদ্যে মিশ্রিত থাকে এবং তাহার পরিমাণ করাও অসম্ভব। কিন্তু ক্ষারধর্ম্ম বিশিষ্ট পদার্থ বর্ত্তমান থাকিলে অবস্থা অন্যরূপ হয়। সোডা-কার্‌বনেট লৌহে কোনরূপ ক্রিয়া করে না কিন্তু এলুমিনিয়মে ইহার ক্রিয়া অতিশয় অধিক। সেইজন্য যে খাদ্যে সোডিয়ম কারবনেট থাকে তাহা এলুমিনিয়ম তৈজসে প্রস্তুত করা উচিত নহে। যদি এরূপ খাদ্য প্রস্তুত করিতে এলুমিনিয়ম ব্যবহৃত হয়, তাহার দ্বারা আদৌ স্বাস্থ্যহানিকর কোন পদার্থ উৎপাদিত হয় কি না এখনও তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাহা হউক সোডা কারবনেট যে খাদ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রস্তুত করিতে এলুমিনিয়ম পাত্র ব্যবহার না করাই

ভাল। কিন্তু আমাদের দেশের খাদ্যে অথবা জগতের সকল লোকের খাদ্যেই সোডিয়াম কারবনেট কচিৎ ব্যবহৃত হয়।

এই এলুমিনিয়ম পাত্রে জল পান করিলে তাহার অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে নানা প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। সামান্য সাবধানতা অবলম্বন করিলে কোনরূপ ক্ষতি হয় না। অর্থাৎ জল পান করিয়া পাত্রে জল ফেলিয়া না রাখাই ভাল। কেন না আর্দ্র এলুমিনিয়ম বায়ু সংস্পর্শে অক্সিডাইজ্‌ড্‌ হয় অর্থাৎ ইহাতে "মরিচা" পড়ে। পানীয় পাত্র সর্ব্বদা শুষ্ক ও পরিচ্ছন্ন রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

প্রথমে এলুমিনিয়ম পাত্রের মূল্য অধিক ছিল। সেই জন্য লোকে ব্যবহার করিতে পারিত না। বর্ত্তমানে সে অসুবিধা দূর হইয়াছে। পূর্ব্বে বিশুদ্ধ এলুমিনিয়ম পাওয়া যাইত না। এখন প্রায় বিশুদ্ধ এলুমিনিয়ম পাওয়া যাইতেছে। বিখ্যাত কারখানা সমূহের পাত্রে মাত্র শতকরা ২ ভাগ "খাদ" থাকে। ইহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

ল্যান্‌সেটের মতে বিখ্যাত কারখানার পাত্রে খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত আদৌ বিপজ্জনক নহে। লোকের যে ধারণা রহিয়াছে যে, এলুমিনিয়ম পাত্রে খাদ্য বিষাক্ত হয়, তাহা নিতান্ত ভিত্তিশূন্য। কেননা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সাধারণ খাদ্যের উপরে এলুমিনিয়মের কোনও বিষময় ক্রিয়া নাই। অধিকন্তু এলুমিনিয়ম অতি উৎকৃষ্ট তাপ-পরিচালক ধাতু। অন্যান্য ধাতুর তৈজস উত্তপ্ত করিতে যত পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজনীয় ইহাতে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্পতর তাপ প্রয়োজন হয়। সেই জন্য ইহাতে খাদ্য প্রস্তুত করিতে সময় অল্প আবশ্যক হয় এবং জ্বালানি কাষ্ঠেরও পরিমাণ বেশী প্রয়োজন হয় না। অন্য ধাতুর তৈজস রক্ষা করিতে যতটুকু সাবধানতা প্রয়োজন ইহার জন্য তদপেক্ষা অধিকতর সাবধানতা প্রয়োজন হয় না। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রধান সুবিধা এই যে ইহা অত্যন্ত লঘু। ইহার পাত্র পর্য্যটকগণের বিশেষ সুবিধাজনক, গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্মেও আনন্দদায়ক। অধিকন্তু ইহার মনোহর উজ্জ্বল রজতবর্ণে মন তৃপ্ত হয়।"

আমেরিকার কৃষি-কার্য্য

আমেরিকার কৃষি-বিভাগের সম্পাদক ষোড়শ বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। তথায় কৃষিলব্ধ পণ্যের মূল্য ২৮,৫০,০০০,০০,০০,০০০ আটাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা অপেক্ষাও অধিকতর। সংখ্যায় মূল্য লিখিত হইয়াছে বলিয়া টাকার পরিমাণ কিরূপ সহসা ধারণা করা যায় না। যদি ১ সেকেণ্ড ৫৲ টাকা করিয়া গণনা করিতে একজন লোকের ১,৮০,০০০ এক লক্ষ আশি হাজার বৎসর সময় লাগে, অর্থাৎ আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর বয়ঃক্রম যত হইয়াছে, তত বৎসর প্রয়োজন হয়।

জীবন-ধারণের ব্যয়ভার লাঘবের একমাত্র উপায় কৃষি-জাত দ্রব্যের প্রাচুর্য্য। আমেরিকায় এরূপ প্রচুর শস্য উৎপাদনের মূল্য সোপান সরকারী ও বেসরকারী কৃষিপরীক্ষা-ক্ষেত্রের পরিপালন এবং এই সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত করিয়া সাধারণ্যে বিতরণ। এই উপায়েই গত কয়েক বৎসরে আমেরিকা কৃষি-জাত দ্রব্যসম্ভার উৎপাদনে জগতের শীর্ষস্থানে উন্নীত হইয়াছে। গত বৎসরের সহিত এ বৎসরের দুই একটি দ্রব্যের উৎপত্তি-পরিমাণ নিম্নে তুলিত হইতেছে :—

বীট হইতে গত বৎসর ১,৬২,০০,০০০ মণ চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল এ বৎসরে ১,৮৯,০০,০০০ মণ, অর্থাৎ ২৭,০০,০০০ সাতাইশ লক্ষ মণ অধিকতর। বীট উৎপাদনে বিশেষ সার প্রয়োজন হয় না, ব্যয়ও তত অধিক নহে। বায়ু-মণ্ডলের কারবন্-ডাইঅক্সাইড বীট গাছের প্রধান খাদ্য। কারবণ-ডাইঅক্সাইড ক্রয় করিতে হয় না। আমাদের দেশের কয়জন কৃষক বীট চাষের কথা জানেন— কয়জন জমীদার কৃষিকার্য্যে নিরক্ষর প্রজাগণের সহায়তা কল্পে নিযুক্ত? সম্প্রতি আমেরিকায় প্রতি বিঘায় প্রায় ৬৭ মণ বীট উৎপাদিত হইতেছে। যাহাতে ২০১ বৎসরের মধ্যেই ইহার পরিমাণ দ্বিগুণিত হয়, তজ্জন্য নানাবিধ পরীক্ষা চলিতেছে। ২৮,০০০ আটাইশ সহস্র বিঘা জমি লইয়া ইজিপ্ট দেশীয় তুলার চাষের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। পরীক্ষার ফল অতীব সন্তোষজনক। ভবিষ্যতে ইঁহারা তুলা যোগাইতে পারিবে কিনা, তৎসম্বন্ধে ইউরোপীয় সূত্রকারগণ ইতিমধ্যেই সংবাদ জানিতে চাহিয়াছেন। আমাদের কৃষকগণ তুলার চাষ ভুলিয়া যাইতেছেন। এক সময়ে আমাদের দেশের তুলাতেই ঢাকাই মসলিন্ প্রস্তুত হইত, আজ কাল মোটা কাপড়ও হয় না।

যে সমস্ত শুষ্ক নীরস জমী রহিয়াছে, আমেরিকান কৃষকগণ তাহাতে আফ্রিকার সালগম চাষের চেষ্টা করিতেছেন। এখানকার বৃদ্ধ ধনবান কৃষকগণ সহরে আসিয়া বাস করেন না। ক্ষেত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা কার্য্য করে, ক্ষেত্রে তাঁহার অর্থ ব্যয়িত হয়। কৃষকগণ জমীর উর্ব্বরতা-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের দেশের আফিসে যেরূপ হিসাব রাখিবার জন্য বহু লোকের প্রয়োজন হয়, আমেরিকার কৃষকের আবাসে হিসাবের জন্য সেইরূপ শত সহস্র কেরাণী প্রয়োজন হইয়া থাকে। সূর্য্যের সুমঙ্গল উত্তাপ, মেঘের প্রচুর বারি-বর্ষণ, মানবের শক্তি, প্রাচীনগণের জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা, আর জমীদারগণের অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ততা ও কৃষি সম্বন্ধীয় নানাবিধ পরীক্ষা—এই কয়েকটিই আমেরিকার কৃষিকার্য্যে সফলতার প্রধান উপাদান।

উক্ত বিবরণীতে একটি উৎকৃষ্ট হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে যে ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদিত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ যদি ১০০ বিঘা ধরা হয় তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া উহা ১৯১২ সালে ২০২'১ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ১৫ বৎসরে কৃষকগণের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়া প্রথম বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৪৬ হইয়াছে। জল স্রোতের ন্যায় ধন-স্রোত কৃষকের ক্ষেত্র হইতে পরিবাহিত হইতেছে। এই ১৫ বৎসরে জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের তিন চতুর্থাংশ একমাত্র কৃষকের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

আমেরিকায় প্রধানতঃ এই সমস্ত দ্রব্যের চাষ হইয়া থাকে:—ভুট্টা, কাগজ ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য ঘাস, তুলা, কার্পাস বীজ, গম, জই, আলু, যব, তামাক, পাট, শণ, ইত্যাদি ও রাই, ধান, রবিশস্য, ইক্ষু, বীট, ইত্যাদি। ইহাদের সমস্তই আমাদের দেশেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু পরিমাণে অল্প ও গুণে অপকৃষ্ট। ভারতবর্ষের পরিমাণ ১৯,০০,৭৭০ মাইল, আমেরিকারযুক্ত প্রদেশের পরিমাণ ৩৭,৩৫,৮৭০ মাইল অর্থাৎ ১৮,০৫,১০০ মাইল অধিকতর। ভারতের কৃষক এক সময়ে পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, আজকাল ভারতীয় কৃষক অন্নাভাবে শীর্ণ। পূর্ব্বে আমাদের নরপতিগণ স্বহস্তে হল কর্ষণ করিতেন। আজকাল ক্ষুদ্র কেরাণীকুল কৃষককে "চাষা" বলিয়া ঘৃণা করেন। ফলে ভারতের শস্য কয়েক বৎসর পরে ভারতবাসীর পক্ষেই যথেষ্ট হইবে না, বিদেশে রপ্তানী করিয়া অর্থ সঞ্চয়ত দূরের কথা। কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলিয়াছিলেন যে আমেরিকার লোক-সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে কিছুদিন পরে আমেরিকা অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া পড়িবে। কৃষক প্রাণপণ উদ্যমে তাঁহাদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। আর দুই এক বৎসরের মধ্যেই আমেরিকা অনেক দেশ প্রতিপালন করিবে ও অনেক দেশবাসীর লজ্জা নিবারণ করিবে।

আমেরিকান কৃষক দেশের অভাব দূর করিয়াও নিম্ন লিখিত দ্রব্যাদি প্রচুর রপ্তানি করিয়া থাকেন—চিনি, ঘাস, নানাজাতীয় তৈলের খইল, কার্পাস বীজের তৈল, তিসির তৈল, ধান, কার্পাস বীজ, তামাক, মটর ও অন্যান্য কলাই, পেঁয়াজ ও আলু। আমাদের ধনাঢ্যগণ এ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এতদিন দেশের কৃষকের ও সাধারণের অবস্থা অন্যরূপ হইত।

সরকারী কৃষি সংবাদ

পোকার উপদ্রব ও তাহার প্রতিকার—

পৃথিবীতে অশেষ প্রকার পোকা আছে, তাহাদের কতকগুলিকে কীট ও কতকগুলিকে পতঙ্গ বলে। কেঁচো, বিছা, মাকড়সা, আঠালু, ক্রিমি, জোঁক ইহারা কীট; আবার মাছি, মৌমাছি, মশা, বোল্‌তা, প্রজাপতি, ফড়িং, কাঁচপোকা, আরসুলা, পিঁপড়ে, গান্ধিপোকা, উই, উকুন ও ছারপোকা ইহারাও কীট কিন্তু ইহাদের পাখা বাহির হয় বলিয়া ইহাদিগকে পতঙ্গ বলে।

প্রায় অধিকাংশ পোকারই চারিটি অবস্থা আছে—

১। ডিম

২। কীড়া বা পলু—ডিম হইতে যখন ফোটে। কীড়া অবস্থায় খায়।

৩। পুত্তলি—এই সময় নিশ্চল অবস্থায় থাকে, এই অবস্থায় কিছু খায় না।

৪। পতঙ্গ—শেষ অবস্থা। এই কালে ইহারা উড়িয়া বেড়ায়, খায়, স্ত্রীপতঙ্গে সঙ্গত হয় এবং ডিম পাড়ে ও ডিম পাড়িয়া মরিয়া যায়।

দ্বিজন্ম পোকাও আছে, তাহাদের কীড়া ও পুত্তলি অবস্থা নাই। ডিম হইতে ছানা হয় এবং ক্রমে ডানা গজাইয়া মাতৃ পোকার সদৃশ হয়।

পতঙ্গদিগের জীবন বৃত্তান্ত অদ্ভুত। ইহারা ছোট বেলায় দেখিতে একরূপ, আর পূর্ণ বয়স হইলে আর একরূপ। বয়সে ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি এতই বদলাইয়া যায় যে, ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। রেসম পোকার পলু ও উহার পুত্তলি যে একই জীব, ইহা যে না জানে সে কখনই বিশ্বাস করিবে না। অধিকাংশ পতঙ্গেরই এইরূপ।

রেসম পোকার মত মাঠে ও জঙ্গলে আমরা নানা রকম পলু দেখিতে পাই। ইহারা নানাবিধ গাছের পাতা খাইয়া বাঁচে ও বড় হয়। অনেক সময় ইহাদের

দৌরাত্ম্যে গাছ পালা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলির গায় চুল বা শুয়া থাকে। সেগুলি'ক আমরা শুয়াপোকা বলি।

বাগানে শাকসজীর পাতার উপর কখন কখন দেখা যায়, ছোট ছোট ডিম একত্র সাজান রহিয়াছে। এগুলি কোন না কোন প্রজাপতির ডিম। পাতার উপর বসিয়া প্রজাপতি ডিম পাড়িতেছে, ইহাও কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। ডিম হইলে যথাসময়ে ছোট ছোট পলু বাহির হয়, ও পাতা খাইতে আরম্ভ করে। প্রজাপতি যেখানে সেখানে ডিম পাড়ে না। এরূপ গাছের পাতার উপর ডিম পাড়ে, যাহার পাতা খাইয়া উহার পলুগুলি বাঁচিতে পারে।

পলু পাতা খাইয়া ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। শরীর যত বড় য়, তত চামড়া কষিয়া ধরে। তাই মধ্যে মধ্যে, সাপে যেমন খোলস ছাড়ে, সেইরূপ পলুও খোলস ছাড়ে. অর্থাৎ গায়ের পুরাণ চামড়া খসিয়া পড়ে ও তাহার নীচে নূতন চামড়া দেখা দেয়। এইরূপ তিন চারি বার খোলস ছাড়িবার পর পলু পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হয়। তখন আর আহার করিবার দরকার থাকে না।

পলু তখন আর এক নূতন আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় পলুর নড়িবার শক্তি থাকে না। চামড়া ক্রমে শুকাইয়া গায়ের উপর টানিয়া বসে, ও চামড়ার ভিতর ক্রমে ক্রমে ডানা, পা প্রভৃতি ভাবী প্রজাপতির অবয়ব জন্মিতে থাকে। এরূপ অবস্থায় পোকাকে আমরা পলু বলি না, ইষে বা পুত্তলি বলি। অবশেষে ইষের চামড়া ফাটিয়া উহার ভিতর হইতে সুন্দর একটি প্রজাপতি বাহির হয়। পোকার এই চরম বা শেষ দশাকে প্রজাপতি বা পতঙ্গ অবস্থা বলা যায়।

অনেক জাতীয় প্রজাপতির পলু, ইষে অবস্থা পাইবার পূর্ব্বে, মুখ হইতে সূতা বাহির করিয়া, এক প্রকার ঘর নির্ম্মাণ করে। এই ঘরকে কোয়া বা গুটী বলে। রেসম, এণ্ডি ও মুগার পলু এইরূপ কোয়া বাঁধে। ইহাদিগের কোয়া হইতে সুন্দর রেসম সূতা প্রস্তুত হয়। সেই জন্য এই সকল পোকা মানুষে আদরে প্রতিপালন করে।

প্রজাপতির আকৃতির সহিত পলুর আকৃতির কোনই সাদৃশ্য নাই। তাহাদের প্রকৃতিও নিতান্ত বিভিন্ন। পলু গাছ পালার পাতা খাইয়া ধ্বংস করে। প্রজাপতি বেশী দিন বাঁচিয়া থাকে না; যে কয়েক দিন বাঁচে, শুধু ফুলের মধু খাইয়া থাকে। কোন কোন জাতীয় প্রজাপতি আদৌ খায় না, ডিম পাড়িয়াই মরিয়া যায়। রেসম পোকার চোকৃড়ি এইরূপ।

ডিম অবস্থার পরই একই পতঙ্গের বয়স ভেদে তিন প্রকার রূপ হয়; প্রথম পলু বা ক্রীড়া, দ্বিতীয় পুত্তলি, তৃতীয় প্রজাপতি বা পতঙ্গ। অধিকাংশ পতঙ্গেরই এইরূপ। কিন্তু সকলে নহে।

কতকগুলি পোকা আছে, যাহারা অন্য জীবের রক্ত খাইয়া বাঁচিয়া থাকে; যেমন উকুন ও ছারপোকা। ডিম হইতে বাহির হইবার পর মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহাদের রূপ বদলায় না। ইহাদের পুত্তলি ও পতঙ্গ অবস্থা নাই।

ফড়িঙের রূপ অল্প পরিমাণেই বদলায়। ফড়িঙের পলুর ও পতঙ্গ আকৃতি ঠিক বড় ফড়িঙের মত, কেবল ডানা নাই; সুতরাং উড়িতে পারে না, লাফাইয়া বেড়ায়; এইমাত্র প্রভেদ। ইষে অবস্থায় ফড়িং অন্যান্য কীটের মত নির্জ্জীব হইয়া থাকে না, তখনও ইহা লাফাইয়া বেড়াইতে পারে। প্রজাপতি চোকৃড়ি অবস্থা অর্থাৎ পূর্ণ আকৃতি পাইলে কমই আহার করে, অথবা আদৌ খায় না। ফড়িঙের বেলায় সেরূপ নহে। ফড়িং শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত খাইতে থাকে। সলভ বা পঙ্গপাল বলিয়া একরূপ ফড়িং আছে। ইহারা যখন উড়িয়া কোন স্থানে পড়ে, সেখানে গাছ পালা ও শস্যের পাতা থাকে না। পঙ্গপালের উৎপাতে দেশ উৎসন্ন হইতে শুনা গিয়াছে।

সকল পোকার খাইবার রীতি একরূপ নহে। কোন কোন পোকা খাদ্যবস্তু চিবাইয়া গিলিয়া খায়। এরূপ কত রকম পোকা আমরা বাগানে জঙ্গলে দেখিতে পাই, নাম করিবার দরকার নাই। আর কোন কোন পোকা খাদ্যের রস মাত্র চুষিয়া খায়; ইহাদের মুখে চুষিবার জন্য একটি নল বা শুঁড় থাকে। মাছি, মশা, গান্ধি, উকুন ও ছারপোকার মুখে এইরূপ নল আছে। প্রজাপতির শুঁড় খুব লম্বা। যখন দরকার হয় না, তখন শুঁড় জড়াইয়া গুটান থাকে। যখন প্রজাপতি ফুলের উপর বসিয়া মধু খায়, তখন শুঁড় খুলিয়া লম্বা করিয়া ফুলের ভিতর চালাইয়া দেয়। প্রজাপতির পলুর এরূপ শুঁড় নাই, তাহারা চিবাইয়া খায়।

কোন পোকারই নিশ্বাস লইবার জন্য নাক নাই। একটা বড় পলু বা প্রজাপতি হাতে করিয়া দেখ, উহার শরীরের দুই পার্শ্বে ছোট ছোট কতকগুলি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলি দিয়া উহার শরীরের ভিতর বায়ু প্রবেশ করে। এই ছিদ্রগুলির উপর ছাই বা অন্য কোন রকমের গুঁড়া ছড়াইয়া দেও, তাহাদের মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে, ও বায়ু শরীরের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারায়, পোকা শীঘ্রই মরিয়া যাইবে। শাক সব্জীর পাতায় পোকা লাগিলে আমরা ছাই ছড়াইয়া দিই, ইহার অর্থ এই।

আমাদের দেশের কোন কোন স্থানের কৃষকদিগের মধ্যে কীট সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা আছে। তাহারা মনে করে, আকাশে মেঘ হইলে অথবা বৃষ্টি বা দিক বিশেষ হইতে বাতাস বহিলে অথবা কারণ বিশেষে ক্ষেত্রে আপনা আপনি পোকা জন্মে। এই বিষম ভ্রম প্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা পোকা নিবারণ অর্থাৎ ভবিষ্যতে পোকা জন্মিতে না পারে এ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। বস্তুতঃ

পোকা একটি সাধারণ জীব। অন্যান্য জন্তুর পক্ষেও যেরূপ, ইহাদের পক্ষেও সেরূপ। ইহাদের স্ত্রী পুরুষ আছে ও তাহাদের সম্মিলনে সন্তানের উৎপত্তি হয়। স্ত্রী পতঙ্গ ডিম পাড়ে, ও ডিম হইতে যথাক্রমে পলু, ইষে ও পতঙ্গ উৎপন্ন হয়। এই নিয়মের ব্যত্যয় নাই। ক্ষেতের উপর কতকগুলি প্রজাপতি উড়িতে দেখিয়া, তখন হয়ত মনে হয় নাই যে, প্রজাপতিগুলি ডিম পাড়িবার জন্য ঘুরিতেছিল। অলক্ষ্যে ঘাসের বা শস্যের উপর কতকগুলি ডিম রাখিয়া গিয়াছে। ১৫ দিন বা এক মাস পরে দেখিবে শস্য পোকায় ভরিয়া গিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে যে প্রজাপতিগুলি উড়িতে দেখিয়াছিলে তাহাদের সহিত বর্ত্তমান পোকাগুলির যে কোন সম্বন্ধ আছে ইহা সহজে প্রতীতি হয় না বটে, কিন্তু পোকার উৎপত্তি সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংস্কার দূর হইলে, কীট জগতের এইরূপ অনেক আশ্চর্য্যজনক বিষয় বোধগম্য হইবে।

সাধারণের এখন বিশ্বাস যে গভর্ণমেণ্ট কীট তত্ত্ববিদ্ পোকা মারার সামান্য কিছু ঔষধ বা মন্ত্র বলিয়া দিতে পারেন। ইহা একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সময় সময় পোকার উপদ্রব নিবারণ করা একেবারে সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। পোকার প্রতিকারের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতে হয়। নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয়ে সতর্ক থাকিলে পোকার উপদ্রব অনেক পরিমাণে দমন হইতে পারে।

১। অনেক পোকা আগাছা কুগাছার আশ্রয় লইয়া থাকে, সুতরাং ক্ষেতের আগাছা কুগাছা নিয়তই মারিতে হইবে এবং ক্ষেতের ধার ভিত চতুর্দ্দিক সাফ রাখিতে হইবে।

২। ফসল কাটিয়া লইয়া ফসলের গোড়া ক্ষেতে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। সেগুলি লাঙ্গল দ্বারা উঠাইয়া পুড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ডাঁটা ছিদ্রকারী পোকাগুলি ঐ সকল শস্যের গোড়ায় আশ্রয় লয়।

৩। ফাঁদ ফসল—কোন ফসলের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান জন্মাইতে হয়। ফসলের সঙ্গে বা আগে ঐ গাছ জন্মিলে পোকারা ঐ আশ্রয় পাইয়া ফসলে তত উপদ্রব করিবে না। আখের সহিত ভুট্টা গাছ জন্মাইলে ভুট্টা আগে জন্মিবে। আখের ডাঁটা ছিদ্রকারী পোকাগুলি ভুট্টা গাছই আক্রমণ করিবে। তখন ভুট্টা গাছগুলি তুলিয়া পুড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

৪। মিশ্র ফসল—দুই তিন রকম ফসল এক সঙ্গে জন্মাইলে পোকার উপদ্রব কম হয়। পতঙ্গকে গাছ খুঁজিয়া ডিম পাড়িতে হয়, তাহাতে তাহাদের অসুবিধা হয়। আমাদের দেশে কলাই, সরিষা এক সঙ্গে বুনিবার প্রথা আছে।

৫। সতেজ গাছ—সতেজ গাছ, তেজস্বী মানুষের মত, রোগ ও পোকার উপদ্রব সহ্য করিতে পারে। এই কারণে জমিতে পর্য্যাপ্ত সার দিয়া সতেজ গাছ উৎপাদন করিবার চেষ্টা করা উচিত।

৬। পরিবর্ত্ত চাষ—পাল্টাপাল্টী দুই তিন রকম ফসল এক জমিতে চাষ করিলে, এক ফসলের পোকা অন্য ফসলে সংক্রামিত হইতে পারে না এবং তাহারা সময়ে খাবার না পাইয়া মরিয়া যায়। কিন্তু সব পোকার জীবন বৃত্তান্ত না জানিলে এই প্রকার পরিবর্ত্ত চাষের ব্যবস্থা করা কিছু সুকঠিন।

প্রত্যেক শস্যভুক্ পোকার জীবনবৃত্তান্ত ও স্বভাব যতদুর সম্ভব জানিতে চেষ্টা করা উচিত। পোকা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, অর্থাৎ ডিম, পলু, পতঙ্গ অবস্থায়, কতকাল ও কিরূপ স্থানে থাকে ও কি খায়; কোথায় ডিম পাড়ায়; কখন শস্যে প্রথম দেখা দেয়; কখনই বা অন্তর্হিত হয়; এই সমস্ত কথা জানিতে পারিলে উহাকে দমন বা নিবারণ করা সম্ভবপর হয়। অধিকাংশ শস্যভুক্ কীটের জীবন ইতিহাসে এরূপ একটী সময় আছে যখন তাহাকে সহজে আয়ত্বাধীন করিতে পারা যায়। না বুঝিয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে অধিকাংশ স্থলে অভিপ্রেত ফল পাওয়া যায় না। মাজেরা (মজ্জাভুক্) পোকায় আকের বিস্তর অনিষ্ট করে। ইহা একপ্রকার প্রজাপতির পলু; চারা আকের মাথার ভিতর থাকে। যে আকে এই পোকা ধরে তাহার আগা ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়। কিন্তু পোকা মরে না। আকের ভিতর ক্রমশঃ খাইয়া পূর্ণবয়সে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। প্রজাপতি আকের পাতার উপর অনেকগুলি ডিম পাড়ে, ও ডিম হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পলু বাহির হইয়া নূতন নূতন গাছ আক্রমণ করে। এরূপস্থলে, যদি ক্ষেতে গিয়া যে সকল চারা আকের আগা শুকাইয়া যাইতেছে দেখা যায়, ঐগুলি কাটিয়া পুতিয়া বা জ্বালাইয়া নষ্ট করা যায়, তাহা হইলে পোকার আর বৃদ্ধি হইতে পারে না। প্রথমে যত্ন করিলে অল্প আয়াসেই মাজেরা পোকা নিবারণ করা যাইতে পারে, কিন্তু আক একবার বড় হইয়া গেলে পোকার দমন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। আর একটী দৃষ্টান্ত বলি। বেগুনের গাছ কখন কখন শুকাইয়া মরিয়া যায়। ক্ষেত্রস্বামী অনেক সময় বুঝিতে পারেন না কেন গাছ মরিল। গাছের ডাঁটা চিরিলে দেখিতে পাইবেন ভিতরে একটী মাজেরা পোকা সুড়ঙ্গ করিয়া খাইয়াছে; ইহাই গাছের অকাল মৃত্যুর কারণ। কিন্তু ইহা জানা না থাকায়, অথবা জানিয়াও প্রাণ সংহার ভয়ে, ক্ষেত্রস্বামী মরা গাছটী উঠাইয়া, উহার অভ্যন্তরস্থ পোকা না মারিয়াই ফেলিয়া দেন। ফল এই হয় যে পোকা পরিত্যক্ত গাছের অভ্যন্তরে খাইয়া বড় হইয়া যথাকালে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়, ও পরে অসংখ্য ডিম পাড়িয়া রোগের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। কিন্তু এরূপ না করিয়া যদি সকল কৃষকেই মাজেরা পোকার লক্ষণ দেখিবামাত্র উহা মারিয়া ফেলে, তাহা হইলে মাজেরা পোকার উপদ্রব শীঘ্রই হ্রাস হইতে পারে।

শস্যে কোনরূপ পোকা লাগিলে উহার প্রতীকার যত সত্বর হয় করা উচিত। অনেক রকম পোকা কয়েক দিনের মধ্যেই ডিম হইতে জন্মিয়া যথাক্রমে পলু, পতঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় একশত, দুইশত বা ততোধিক ডিম দিয়া মরিয়া যায় অর্থাৎ কয়েক দিনের মধ্যেই একটী ডিমের স্থলে অনেকগুলি ডিম ও একটী পোকার স্থলে অনেকগুলি পোকা জন্মিয়া যায়। এইরূপে অনেক পোকা আশ্চর্য্য রূপ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ফসলে পোকা দেখা দিবা মাত্র উহা মারিয়া ফেলা উচিত; নতুবা পরে একটী পোকার স্থলে শত শত পোকা জন্মিয়া শস্য এককালে ধ্বংস করিতে পারে।

কোন ফসল উঠিয়া গেলে উহার কোন গাছ বা ডাঁটা (যাহাতে পোকা থাকিবার সম্ভাবনা) ক্ষেতে ফেলিয়া রাখা উচিত নহে। বেগুনের মাজেরা পোকার কথা বলিয়াছি। বেগুন উঠিয়া গেলে, সমস্ত গাছ উপ্‌ড়াইয়া ফেলিলে ভাল হয়, কারণ তাহা হইলে উহার ভিতর যে কোন পোকা থাকে সমস্তই মরিয়া যাইবে ও উহার বংশবৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

অনেক রকম পলুর স্বভাব, তাহারা এক স্থানের গাছ খাওয়া শেষ হইলে অন্য স্থানে যায়। কোন স্থানে এরূপ পোকা ধরিলে, উহার আক্রমণ হইতে পার্শ্ববর্ত্তী শস্য রক্ষা করিবার একটী উপায় আছে। যে দিক হইতে পোকা আসিবার সম্ভাবনা, সেই দিকে একটী অনতিগভীর নালা কাটিয়া রাখিলে পোকা চলিবার সময় উহার ভিতর পড়িয়া যাইবে। নালার ধার খাড়াভাবে কাটিলে, পোকা আর উপরে উঠিতে পারিবে না।

কুক্কুট পোকার বিশেষ শত্রু। ইহারা পোকা শীকারে নিয়ত ব্যস্ত। পেরু ও গিনিফাউলও পোকার বিশেষ শত্রু। এই সকল পাখী পুষিলে বাগানের শাক সব্জীর পক্ষে বিশেষ উপকার হইতে পারে। শালিক, পেঁচা প্রভৃতি বন্য পাখীতেও বিস্তর পোকা নষ্ট করে। লাঙ্গল বা কোদালি দিয়া মাটি খুঁড়িয়া রাখিলে, যে সমস্ত পলু ও ইষে বাহির হইয়া পড়ে সেগুলি অবিলম্বে পাখীর উদরসাৎ হয়।

অনেক শস্যভুক্ পোকা শস্যের অভাবে আগাছা খাইয়া থাকে ও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ক্ষেতের ভিতর বা নিকট কোনরূপ আগছা হইতে দেওয়া অবৈধ। ক্ষেতের নিকট জঙ্গল থাকিলেও পোকার আশঙ্কা থাকে। ধান ক্ষেতের আলিতেও অনেক পোকার বাসা থাকে। আলির ঘাস ও জঙ্গল মধ্যে মধ্যে কাটিয়া যতদূর পারা যায় পরিষ্কার রাখিলে ভাল হয়।

উপরে পোকা নিবারণ করিবার, অর্থাৎ যাহাতে ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি না হয়, তাহার কয়েকটী উপায় উল্লেখ করা হইল। শস্যে পোকা ধরিলে, তাহা বিনাশ করিবার কয়েকটী উপায় নীচে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। হাত দিয়া বাছিয়া নষ্ট করা।

২। মুরগী, পেরু প্রভৃতি কীটভুক্ গৃহপালিত পাখী শস্যের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া।

৩। বড় থলে কিম্বা জাল দিয়া পোকা বাছিয়া মারিয়া ফেলা। থলের মুখের চারিদিকে চারিখানি বাঁশ বাঁধিয়া খুলিয়া রাখিতে হয়। দুই পাশের বাঁশ দুখানি ২।৩ ফুট লম্বা; নীচের বাঁশখানি ৮ ফুট; উপরের বাঁশখানি ১০ ফুট; ইহার ভিতর ৮ ফুট থলের মুখে লাগান থাকে, ও দুইদিকে এক ফুট করিয়া দুই ফুট ধরিবার জন্য বাহির হইয়া থাকে। উপরোক্ত ভাবে বাঁশ বাঁধিলে মুখ ৮ ফুট × ৩ ফুট ফাঁক হইয়া থাকিবে। থলেটী অবস্থাভেদে ৩ হইতে ৬ ফুট গভীর হইতে পারে। এরূপ একটী থলে দুইজন লোকে স্বচ্ছন্দে শস্যের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। প্রত্যেকবার টানার পরে থলে ঝাড়িয়া পোকাগুলি একত্র করিয়া মারিয়া ফেলিবে। যে পোকা উড়িতে বা লাফাইতে পারে, সেগুলি থলে মোচড়াইয়া পিষিয়া মারিতে হয়। থলের ভিতর কেরোসিন তেল বা আলকাতরা মাখাইয়া দিলে, পোকা উড়িয়া উহার ভিতর লাগিবামাত্র মরিয়া যায়। থলের পরিবর্ত্তে হাত জালের দ্বারাও পোকা সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

৪। কোন কোন পোকা গাছ ঝাড়া দিলে নীচে পড়িয়া যায়। নীচে কাপড় বিছাইয়া বা পাত্র রাখিয়া এরূপ পোকা নষ্ট করা যাইতে পারে।

৫। যে সকল পোকা অল্প অল্প উড়িয়া বা লাফাইয়া বেড়ায় সেগুলি একখানি কুলার উপর আটা লাগাইয়া উহা দ্বারা গাছের উপর বাতাস করিলে উহার গায়ে লাগিয়া গিয়া মরিয়া যায়।

৬। কয়েক রকম পোকা দিনের বেলায় লুকাইয়া থাকে, ও রাত্রে বাহির হইয়া শাক সব্জীর গাছ কাটিয়া খাইয়া ফেলে। ক্ষেতের মধ্যে স্থানে স্থানে টাট্‌কা শাক সব্জীর পাতা রাখিয়া দিলে পোকাগুলি রাত্রে আসিয়া উহা খায় ও দিনের বেলায় উহার ভিতর লুকাইয়া থাকে, তখন সহজে মারিয়া ফেলা যায়।

৭। ধানের গাঁধি ও উহার ন্যায় যে সকল পোকা শস্যে উড়িয়া আসিয়া পড়ে, সে সকল পোকাকে ধোঁয়া দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

৮। বিষ প্রয়োগ।

৯। শস্য আহরণের পর ক্ষেত্র চষা—ইহাতে পোকার বাসা ভাঙ্গিয়া যায়। পোকার পুত্তলি গুলি মাটির নীচে হইতে বাহির হইয়া পড়ে এবং পক্ষী দ্বারা ভক্ষিত হয়। ধান গাছের লেদা পোকার ইহাতে বিশেষ প্রতিকার হয়।

১০। জমি হইতে জল বাহির করিয়া দেওয়া যে সকল পোকা জলে থাকিতে ভাল বাসে তাহাদের এই প্রকারে প্রতিকার হইতে পারে। এক রকম ধানের পোকা আছে তাহারা জলে ভাসিয়া গিয়া অন্য ধান গাছ আক্রমণ করে। জমির জল বাহির হইয়া গেলে তাহাদের উপদ্রব কমে।

১১। কীট ভুক্ পক্ষীকে আশ্রয় দেওয়া—শালিক, ফিঙে প্রভৃতি কীটভুক্ পক্ষী যাহাতে ক্ষেতে আসিয়া বসিতে পারে তজ্জন্য ক্ষেতের মাঝে গাছের ডাল প্রভৃতি পুতিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

১২। এমন অনেক পোকা আছে যাহারা ফসলের অনিষ্ট করে না বরং অনিষ্টকারী পোকা ধরিয়া খাইয়া উপকার করে তাহাদিগকে মারা উচিত নহে।

(ক) পেটের বিষ—যে সকল পোকা গাছের পত্রাদি খায় তাহারা গাছের উপর বিষ ছিটান হইলে তাহা খাইয়া মরে।

(খ) গায়ের বিষ—ইহা গায়ে লাগিলে পোকা মরে। ছত্রক রোগ নিবারণে এই বিষ বিশেষ কার্য্যকারী। কেরোসিন মিশ্রণ উত্তম গায়ের বিষ।

(গ) ধোঁয়ার বিষ—কোন বিষ দ্বারা বাতাস বিষাক্ত করিতে পারিলে তাহাতে পোকা মরিতে পারে। কার্ব্বণ বাই সলফাইডের ধোঁয়া দিলে গোলাজাত ধান বা কলাইয়ে পোকা ধরা নিবারণ করা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ ভারতের চাষীরা অনেক কারণে ফসলের পোকা ধরিয়া মারা বা ক্ষেত পরিষ্কার রাখা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে পোকার প্রতিকার করিতে পারে না। কারণ পোকা মারার ঔষধাদি ক্রয় করিবার এবং ঔষধ প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত পিচকারি, স্প্রেয়ার প্রভৃতি যে সমুদয় যন্ত্রাদির প্রয়োজন তাহা যোগাড় করিবার সামর্থ তাহাদের নাই। অনেক শস্য আছে যে যাহার প্রতিকার উপায়ে যে পয়সা ব্যয় হয় তাহা খরচ করা লাভজনক নহে। মূল্যবান ফসলের জন্য পোকা প্রতিকারের অধিকাংশ আয়োজন বিশেষ উপযোগী।

পোকার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, নিবারণের উপায় বা প্রতিকার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "ফসলের পোকা" নামক পুস্তকে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। যাঁহাদের চাষাবাদ আছে তাঁহাদের এরূপ পুস্তক নিকটে রাখা আবশ্যক। পুস্তক খানি ভারতীয় কৃষি সমিতির অফিসে পাওয়া যায়।
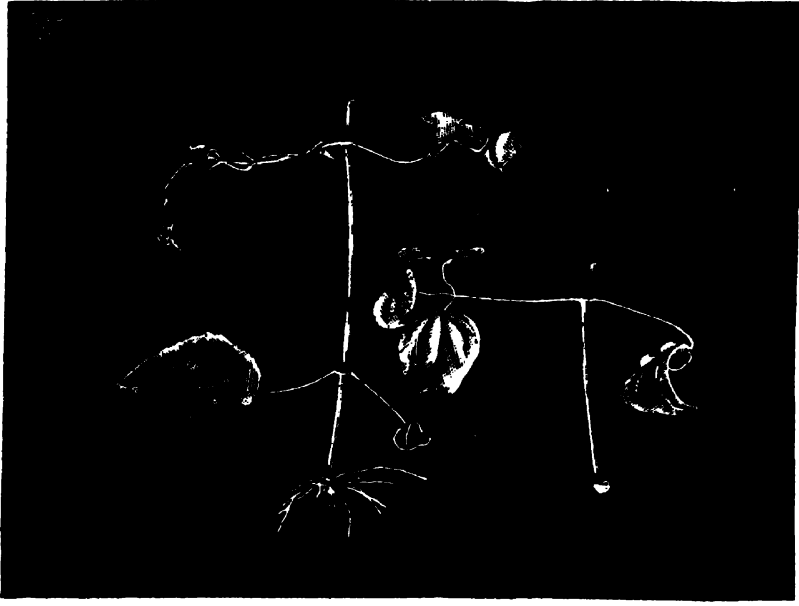
ক্লিমাটিস্ লতার বাম পার্শ্বের চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, পাবের মাঝে কাটিয়া কি রূপ শিকড় বাহির হইতেছে। দক্ষিণ দিকে চিত্রে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, গ্রন্থির নিকট কাটিয়া ক্যালস্ গঠিত হইয়াছে মাত্র কিন্তু ইহা হইতে শিকড় গজাইতে বহু বিলম্ব হইয়া থাকে।
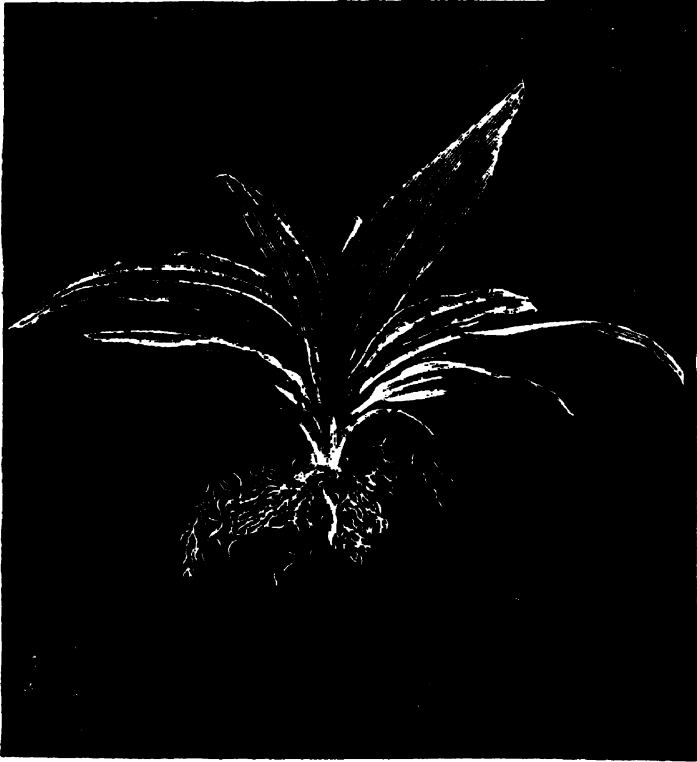
ড্রেসিনা ফ্রেগ্রান্স

ডাল বসাইয়া ক্যালস্ ও শিকড় সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছে।

("উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি" প্রবন্ধ দেখ)
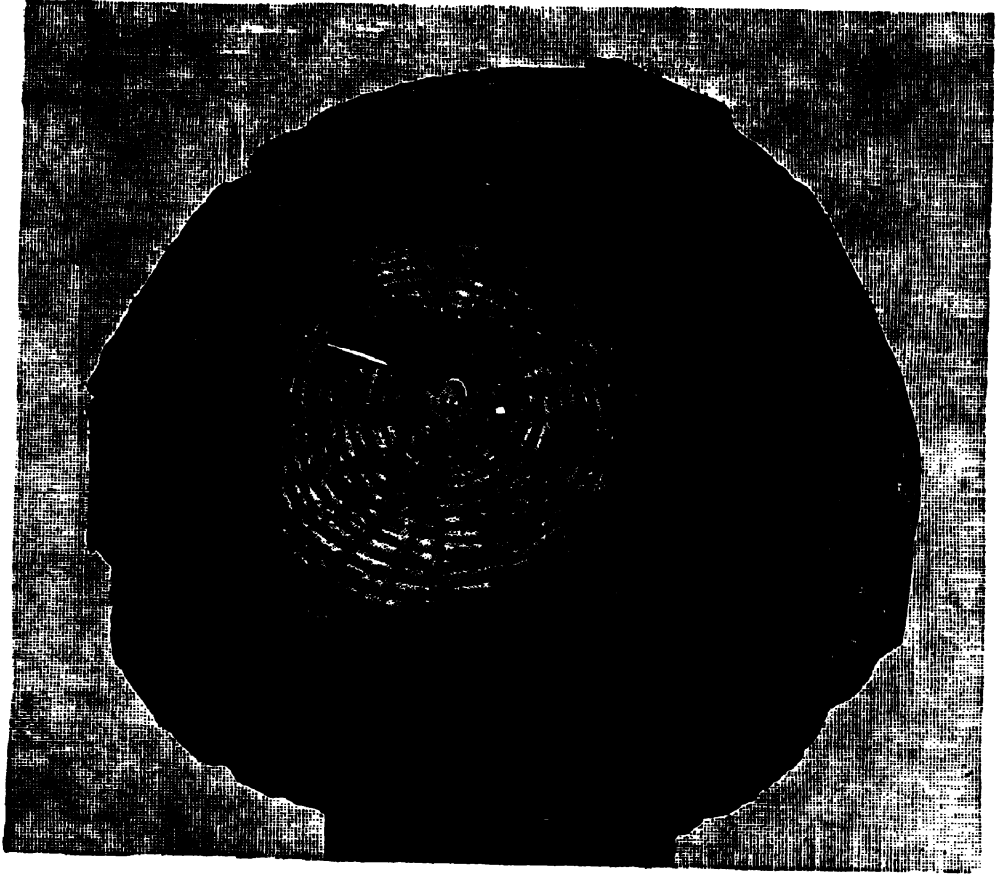
ডালের কর্ত্তিত স্থানে কি প্রকারে ক্যালস্ গঠন হয় চিত্রে তাহা বুঝান হইয়াছে। ক্যালস্ দ্বারা কর্ত্তিতাংশ ক্রমশঃ ঢাকিয়া যাইতেছে।
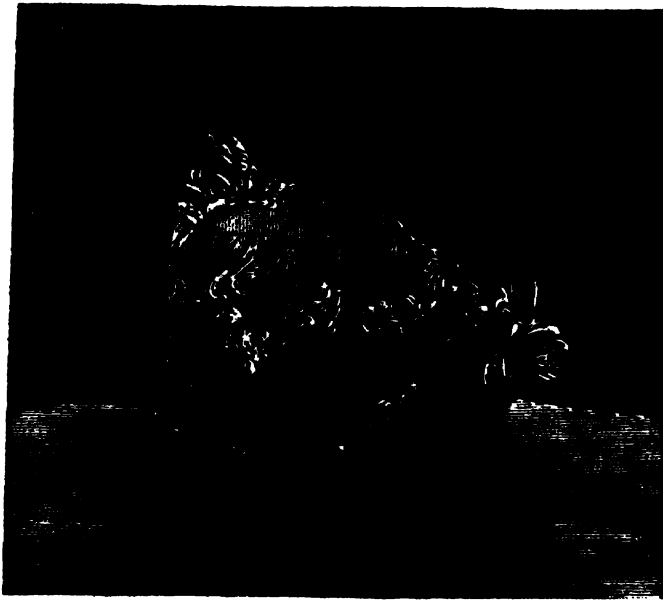
ক্ষতস্থানে ক্যালস্ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পল্লব বাহির হইতেছে।
(“উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি” প্রবন্ধ দেখ)

আষাঢ়, ১৩২১ সাল।

উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি

মনুষ্যাদি জীব মরণশীল—তাহারা মরিবে কিন্তু বৃক্ষ অমর। আমার কথাটা একটু বুঝাইয়া বলিতেছি। দেহ বিশিষ্ট প্রাণী সমূহ এক একটি স্বতন্ত্র জীব। তাহার সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া একটি আকৃতি গঠন হইয়াছে। প্রত্যেক অঙ্গ সজীব হইলেও তাহাদের স্বতন্ত্র কোন ক্ষমতা নাই, তাহাদের কার্য্য বিশেষ ভাবে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু মনুষ্যেতর নিম্ন শ্রেণী বা উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ দেহাংশ হইতে বংশ বৃদ্ধি করার ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন মানুষের হাত, পা ছেদন করিয়া লইয়া একটা মানুষ তৈয়ারি করা যায় না। তাহাদের অঙ্গসমষ্টি সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারে মাত্র। কিন্তু বৃক্ষের প্রত্যেক অঙ্গে সঞ্জীবনী শক্তি আছে। কতকগুলি কোষ সমষ্টি লইয়া বৃক্ষ দেহ নির্ম্মিত হয়। ইহার প্রত্যেক কোষে সঞ্জীবন শক্তি (Protoplasm) নিহিত। ইহারা সঞ্জীবিত হইয়া সপ্রকাশ হইতে সকলেই উন্মুখী। উদ্ভিদদেহের শাখা প্রশাখা বিচ্ছিন্ন করিয়া মৃত্তিকা সংলগ্ন করিলে তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। কখন শাখা হইতে, কখন পত্র হইতে, কখন কখন শিকড় হইতে উদ্ভিদ্ দেহ বাড়িয়া যাইতেছে। এই জন্য উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি নাম না দিয়া উদ্ভিদের দেহ বৃদ্ধি নাম দেওয়া বোধ হয় সঙ্গত।

বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপত্তি হইয়া বৃক্ষ লতাদি জন্মায়। এই সকল উদ্ভিদ জরায়ুজ। মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণী সমূহও জরায়ুজ। কিন্তু উদ্ভিদের অঙ্গ হইতে উদ্ভিদের উৎপত্তি হয় ইহাই উদ্ভিদের বিশেষত্ব। দেহের বিনাশকে যদি এক একটি মরণ ধরিয়া লেওয়া যায় তাহাহইলে মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণী মরে কিন্তু উদ্ভিদ দেহের এক কালে বিনাশ কদাচিত সংঘটিত হয়। বজ্রাহত হইয়া বা জলময় হইয়া উদ্ভিদ মরিতে পারে কিম্বা যদি কোন বৃক্ষের শাখা পল্লবকে

আমরা মৃত্তিকা সংলগ্ন হইতে না দিই তাহারা কালে মরিতে পারে কিন্তু স্বভাবে থাকিলে প্রায়ই তাহারা তাহাদের বৃদ্ধির উপায় দেখিবে।

উদ্ভিদ জগতে এমন গাছ আছে যে তাহাদের বীজ ব্যতীত অন্য উপায়ে বংশ বৃদ্ধি হয় না। যেমন নারিকেল গাছ। ইহার শিকড় হইতে বা কাণ্ড বা পত্র হইতে বংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। মনুষ্যাদির ন্যায় ইহাদের সন্তান সন্ততি জরায়ুজ।

আবার অনেক তাল জাতীয় গাছ আছে যাহাদের অন্তর্ভৌম কাণ্ড হইতে তেউড় ছাড়িয়া বংশ বৃদ্ধি হয়। শুপারির (Areca Catechu) তেউড় হয় না কিন্তু এরেকা লুটিসেন্সের (Areca Lutesens) তেউড় হয়। কেন্টিয়ার তেউড় হয়। কলা গাছের বায়বীয় দেহ (Aerial Stem) বা পাতা হইতে গাছ হয় না কিন্তু উহারা তেউড় ছাড়িয়া আপনাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। বংশও তাহাই করে। বাঁশের 'ছে' কাটিয়া কটিং করিয়া গাছ তৈয়ারি করা যায়। অনেক রকম ঘাস বা বাঁশ আছে, যাহাদের ঐ প্রকারে বাড়াইয়া লওয়া যায়। ঘাস ও বাঁশ এক জাতীয়। যদি চীনা বাঁশের কটিং হয় তবে সাধারণ বাঙলার বাঁশের কটিং না হইবার কোন কারণ দেখা যায় না; একটু যত্ন করিলেই হইতে পারে।

আম কাঁঠাল বা তেঁতুলের কটিং হয় না। শাখা প্রশাখা হইতে ইহাদের গাছ তৈয়ারি করিবার উপায় নাই। ইহাদের গাছ বীজ হইতেই উৎপন্ন হয়। দুই এক শ্রেণীর আম গাছের গুলকলম হয়।

কেন সকল গাছের কটিং করা চলে না, এইটী বিচার করিয়া দেখিবার জিনিস। যে সকল উদ্ভিদের কোমল কাণ্ড তাহাদের কটিং সহজে হয়, কঠিন কাণ্ড বৃক্ষের তাহা হয় না। জল বা রস লইয়া কথা। কঠিন কাণ্ড উদ্ভিদের শাখা প্রশাখায় জলীয় ভাগ কম কিন্তু কোমল কাণ্ডে জল অধিক। যে সকল গাছে আঠা অধিক, যাহা কাটিলে দুধের মত আঠা বাহির হয় সে সকল গাছের ডাল কাটিয়া বসাইয়া গাছ তৈয়ারি করা যায় না। এই জন্য আম কাঁঠালের ডালে গাছ হয় না। যে সকল গাছে রজনের ভাগ অধিক তাহারও ডালে গাছ হয় না; যেমন শাল, সেগুনের গাছ। শালের তেউড় ছাড়িয়া সংখ্যা বাড়ে। ইহারা মাটির ভিতর দিয়া শিকড় চালে এবং শিকড়ের গাঁটে গাঁটে নূতন গাছ হয়। বেলেরও এই রকমে বংশ বাড়ে তবে কিন্তু শালের মত এত অধিক বৃদ্ধি নহে। ইহাও কিন্তু জানা আবশ্যক যে, আদিম অবস্থায় সমস্ত উদ্ভিদই স্ত্রী পুং সঙ্গমে বা বিশেষ বিশেষ দেহাংশ হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। কালক্রমে ইহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে ও চাষের পদ্ধতি অনুসারে অনেক উদ্ভিদের আদিম লক্ষণ সমূহ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

ডাল কাটিলে কি প্রকারে তাহা হইতে শিকড় বাহির হয় বুঝিয়া রাখিলে ভাল হয়। সকলেই দেখিতে পারেন যে কোন একটা বৃক্ষের শাখা কাটিলে,

তাহার চতুস্পার্শ্বের ছাল গুটাইয়া এবং স্ফীত হইয়া আসিয়া সেই ক্ষত স্থানটি ক্রমশঃ ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে এবং অবশেষে ঢাকিয়াও ফেলে। অনেক গাছের আবার সেই স্ফীত স্থানের সন্নিকট হইতে ছোট ছোট পল্লব বাহির হয়। স্ফীত ভাগটিকে শাস্ত্রীয় ভাষায় ক্যালস্ (Callus) বলে। ডাল কাটিয়া পুতিলেও মাটির নীচে কর্ত্তিত ভাগে প্রথমেই এই প্রকার ক্যালস্ জন্মায়। তাহার পর ক্যালস্ হইতে বা ক্যালসের উপর হইতে শিকড় উৎপন্ন হইয়া মাটিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং মৃত্তিকার উপরাংশস্থিত ডালের প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে শাখা পল্লব বাহির হয়। ঐ সকল গ্রন্থীতে শাখা পল্লবের অঙ্কুর (Shoot-bud) থাকে।

সব বৃক্ষ হইতে কটিং করিলে সহজে শিকড় জন্মায় না। শিকড় জন্মিবার পুর্ব্বেই সেগুলি শুকাইতে আরম্ভ করে। তাহাদের ডাল বাঁকাইয়া মাটিদ্বারা চাপিয়া রাখিতে হয় এবং মৃত্তিকা সংলগ্ন স্থানের ছুরী দ্বারা ছাল তুলিয়া দিতে হয়। ছাল তুলিয়া না দিলে ক্যালস্ গঠন হইবে না, সেই জন্য ছাল তোলা এবং রস যোগানের জন্য মূল গাছের সহিত যোগরাখা। শিকড় বাহির হইলেই ডালটি কাটিয়া মূল গাছ হইতে পৃথক করা যায়। এই প্রথাকে Layering বলে। কাগজী, পাতী প্রভৃতি শ্রেণীর লেবু গাছের এই রকমে মাটি চাপা দিয়া কলম করিতে হয়।

কোন কোন বৃক্ষের ডাল মৃত্তিকা সংলগ্ন হইলেই তাহা হইতে শিকড় বাহির হয় এবং এক একটি স্বতন্ত্র গাছ উৎপন্ন করে। এক শ্রেণীর ক্রোটন গাছ এই রকম স্বভাবাপন্ন দেখা যায়।

অনেক গাছের ডালে গাছ হয় ইহাও স্থির। কিন্তু ডাল কটিং বসাইবার নিয়ম আছে। সচরাচর গ্রন্থী বা গাঁটের নীচেই কাটা হয় ইহাতে ক্যালস্ গঠনের সুবিধা হয়। সব কিন্তু এক নিয়মে চলে না, কোন কোন বৃক্ষ, লতা আবার দুইটি গাঁটের মাঝখানে না কাটিলে বাঁচান যায় না। সকল উদ্যান পালকই জানেন যে ক্লিমাটিসের (এক প্রকার লতা বিশেষ) কলম করা শক্ত। ইহার জন্য জোড় কলম বা অন্য উপায় অবলম্বনে কলম করিতে হয়। ক্রমশঃ এই লতাটি লইয়া নাড়া চাড়া করিতে করিতে বুঝা গিয়াছে যে, ইহার গ্রন্থীদ্বয়ের মাঝে কাটিলে মাটিতে সহজে শিকড় ছাড়ে এমন কি ১৫ দিনের মধ্যে চারা তৈয়ারি হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষ লতার এই বৈষম্য কেন তাহা বিশেষ আলোচনার বিষয়। উদ্যান পালকগণের এখানে আর একটা খট্কা ঠেকে,—গ্রন্থীর গোড়ায় পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মাটিতে বসাইবে না পাতাগুলি রাখিয়া দিবে। যতদুর দেখা গিয়াছে পাতাগুলি থাকিলে লাভ আছে, না থাকিলে বিশেষ কিছু ক্ষতি নাই।

সুবিধা—

(ক) পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ক্ষত স্থান নাই বা বাড়ান হইল।

(খ) পাতাগুলি মাটিতে সংলগ্ন হইয়া হয়ত শিকড় উৎপন্ন করিতে পারে সুতরাং অধিক রস যোগান হইবে।

(গ) পাতাগুলি পচিয়া সারের কাজ করিবে।

অসুবিধা—

(ক) যে সকল চারা ওয়ালাকে অল্প স্থানে অধিক কটিং বসাইতে হইবে তাহাদের পক্ষে পাতাগুলি বিড়ম্বনা।

(খ) পাতা ভাঙ্গার ক্ষত হইতেও ক্যালস্ গঠন হইয়া শিকড় নির্গমের সুবিধা হইতে পারে, সুতরাং পাতা থাকিলে অসুবিধা আছে।

বৃক্ষ কাণ্ড হইতে বৃক্ষ উৎপত্তির কালে প্রধান জিনিস হইতেছে ক্যালস্ গঠন। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ক্ষত স্থানটি পুরাইয়া তোলা ও শোধরাইয়া লওয়ার জন্যই এই চেষ্টা। ক্ষত স্থানটি পরিপুরিত হইলে রসের যোগান জন্য শিকড়ের উৎপত্তি হয়। কঠিন কাণ্ড বৃক্ষ লতাদির ক্ষতস্থান পুরিতে বিলম্ব হয় এবং শিকড় বাহির হইতে আরও বেশী বিলম্ব হইতে পারে ইতিমধ্যে রসাভাবে বৃক্ষ কাণ্ড মরিয়া যায়। যদি তাহাদিগকে কোন প্রকারে বাঁচাইয়া রাখা যায়, তবে হয় ত এক বৎসর বা দুই বৎসর পরে তাহা হইতে শিকড় বাহির হইতে পারে। উদ্যান পালকগণ এত বিলম্ব ও আয়াস সহ্য করিতে পারে না। এমন দেখা যায় যে, ক্যালস্ গঠনের পর ছুরিকা দ্বারা স্ফীত অংশ চাঁচিয়া দিলে শিকড় উদ্গমের সহায়তা হয়। একবারে না হইলে একাধিক বার এই কার্য্য করিতে হয়। এই প্রকারের কার্য্য পরীক্ষাগারে করাই ভাল। ব্যবহারিক কার্য্যে এত জটিলতায় অনেক অসুবিধা আছে।

ইহাও দেখা যায় যে সমুদয় বৃক্ষ লতা দ্বিদল বীজ হইতে উৎপন্ন হয় তাহাদেরই কটিং হইতে চারা করা সহজ। নারিকেল বা তাল জাতীয় বৃক্ষের কাণ্ড হইতে চারা করা যায় না। শতমূলী একদল বীজ উৎপন্ন। দ্বিদলের যেমন দুইটী দলের মধ্যদেশে অঙ্কুর থাকে, এক দলের তেমন থাকে না, তাহাদের পার্শ্ব হইতে অঙ্কুর উদ্গম হয়। দ্বিদলের কটিং বসাইলে অগ্রভাগস্থিত অঙ্কুর বাড়িতে থাকে, একদলে তাহা হয় না। একদল বৃক্ষ, লতাদির কটিং বসাইলে তাহাতে ক্যালস্ গঠন কমই হয়। ক্ষত স্থানটি ছালে ঢাকা হয় মাত্র এবং এই অংশ হইতে শিকড় বাহির হয় না বরং মৃত্তিকার উপরিভাগস্থিত গ্রন্থী হইতে শিকড় বাহির হয়। মৃত্তিকা মধ্যস্থ অংশ ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়। শতমূলী লতার এই প্রকার হইতে দেখা গিয়াছে।

কোন শ্রেণী ক্রোটনের পাতা কিম্বা পাথর কুচী শ্রেণীর গাছের পাতা মৃত্তিকা সংলগ্ন হইলে নূতন বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। ইহা উদ্যান চর্চ্চায় নিযুক্ত ব্যক্তি মাত্রেই লক্ষ্য করিয়াছেন। পাথর কুচী শ্রেণীর গাছের পাতায় রসাধিক্য বশতঃ এই রূপ হইয়া থাকে। একপ্রকার বন্য দ্রাক্ষালতা আছে; ইহা মাটির ভিতর দিয়া শিকড় চালিয়া বহুদুর চলিয়া যায় এবং অন্তর্ভৌম কাণ্ড হইতে অনন্ত নূতন চারা উৎপন্ন করে। বাঙলায় এই লতা অতি বিস্তর, যেন বাঙলা মুল্লুকটা ছাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছে। সব সময় কিন্তু উদ্যান পালকের উদ্ভিদ সংখ্যা বৃদ্ধির এই রূপ সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। আগে লেবু প্রভৃতি কলম পাতা হইতে হইত, এখন আর হয় না। তাহা কষ্ট সাধ্য বলিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। অদ্যাপিও বেগোনিয়ার কলম পাতা হইতে হয়। ইহা সহজ কাজ।

পাতা হইতে চারা উৎপন্ন করার একটা অন্তরায় আছে। পাতা হইতে পাতার উৎপত্তি সহজে হয়। পাতার ক্ষত স্থানে ক্যালস্ গঠন হইল, ক্রমে সেখান হইতে শিকড় উদ্গমের উপক্রম হইল বটে, কিন্তু অঙ্কুর সম সময়ে দেখা দিল না। তাহা না হইলে বটপাতার, ক্যামেলিয়ার, দধিলতার পাতা হইতে গাছ হইত। ঐ পত্রগুলির কোষে প্রচুর খাদ্য সংস্থান সত্বেও তাহাদের অঙ্কুর হয় না।

বাঙলা দেশে বর্ষাকালই কটিং করিবার উপযুক্ত সময়। যেখানে কাচের ঘরের ভিতর কাজ হয় সেখানে যখন ইচ্ছা তখন কটিং বসান যাইতে পারে। একটা সঙ্কেত মনে করিয়া রাখা মন্দ নহে। যখন বৃক্ষ লতাদির কোষ গুলি সম্পূর্ণ সজীব থাকে তখনই তাহাদের কটিং অনায়াসে হয়। এই জন্য দারুণ শীতে কিম্বা গ্রীষ্মে খোলা জায়গায় কটিং করা চলে না। ছায়াযুক্ত সরস স্থান না হইলে কটিং বসান উচিত নহে। গাছ ঘরের মধ্যে উষ্ণতা বা আর্দ্রতার তারতম্য করা যায় বলিয়া সময়ের এদিক ওদিক হইলে ক্ষতি হয় না। কটিং বসাইতে হইলে বাতাস, উত্তাপ, এবং জল এই তিনটি উপাদানের সমতা রক্ষা করাই কৌশল।

কটিং বসাইবার চৌকায় রস থাকিবে অথচ জল বসিবে না, মাটি ঝর ঝরে থাকিবে, হাওয়া পাইবে। সুতরাং কাঠের গুঁড়া, বালি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করা ব্যতীত আর উপায় কি আছে? ডালের কটিংএ হাওয়া পাওয়া যে কত আবশ্যক তাহা একটি কটিং বেশী মাটির নীচে বসাইলেই বুঝা যায়। হাওয়া না পাইয়া কটিং পচিতে আরম্ভ করে। কটিংটি যতটুকু মাটির নীচে বসাইলে পড়িয়া না যায় ততটুকু মাটিই পর্য্যাপ্ত। বাক্সে কিম্বা ঘরের মধ্যে কটিং করিতে হইলেও মাটি প্রভৃতি ঐ নিয়মে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। ঘরের মধ্যে বাতাস, উত্তাপ, রস নিয়মিত করা বরং সহজ।

খুব তেজস্কর ডালের কটিং ভাল হয় না। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, সেই ডালটি সতেজ রাখিতে তাহার যাবতীয় রস, খাদ্য ব্যয়িত হয়, ক্যালস্ ও শিকড়

গঠনে উহাদের অভাব পড়িয়া যায়। এই জন্য আমাদের দেশের মালিরা গাছের ডাল কাটিয়া দুই এক দিন রাখিয়া তাহার রস কিছু মরিয়া আসিলে তবে মাটিতে বসায়। কটিং কত বড় হইবে তাহা নিদ্ধারিত করিয়া বলা যায় না। কিন্তু উদ্যানপালককে তাহা নিজেই ঠিক করিয়া লইতে হয়।

যখন ঘরের মধ্যে বাক্সে কটিং বসান হয়, তখন নিম্ন হইতে জল প্রয়োগের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য কিন্তু খোলা স্থানে উপর হইতে জল সিঞ্চনে ক্ষতি হয় না। বাক্সের তলায় ছিদ্র রাখিয়া সেই বাক্সটি একটি জলযুক্ত গামলায় বসাইয়া দিলে মাটি নীচে হইতে ভিজিয়া ক্রমশঃ সমস্ত বাক্সের মাটি সরস হয়। গামলার তলায় সামান্য জল থাকিবে, বাক্সের তলাটি জলের সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকিবে মাত্র, কোন অংশ জলে নিমজ্জিত থাকিবে না। বাষ্প দ্বারা মাটি সরস করিতে হইলে বাক্সটি জলে ঠেকিবারও আবশ্যকতা দেখা যায় না। একটি ঈষদুষ্ণ জলপাত্রের উপর একটা কাঠের ফ্রেম স্থাপন করিয়া, তাহার উপর বাক্সটি বসাইয়া রাখিলেই চলে, অথবা নল সংযোগে বাষ্প আসিয়া মাটি ভিজাইয়া দিতে পারে। বীজ হইতে চারা বাহির করিতে হইলে কিম্বা কটিং হইতে শিকড় বাহির করিতে হইলে কিঞ্চিৎ উত্তাপের প্রয়োজন। বাষ্প প্রয়োগে মাটি সরস করিয়া লইলে সেই উত্তাপ সহজে পাওয়া যায়।

ডালকাটি বা কটিং হইতে সহজে চারা প্রস্তুত করিতে হইলে, বাক্সে কটিং বসান সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। বাক্সের তলাটি সছিদ্র হইবে। বাক্সটি বালি ও পচাপাতা সারে পূর্ণ থাকিবে। বালির পরিবর্ত্তে কাঠের গুঁড়া ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয়। ঘরের মধ্যে চারা তৈয়ারি করিতে হইলে ঘরের ভিতর গরম জলের নল চালাইয়া ঘরটি ইচ্ছামত গরম করা যায়। গ্রীষ্ম প্রধান দেশের জন্য এসব কিছু আবশ্যক হয় না।

খোলা জায়গায় রৌদ্রে কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে অনেক গাছের কটিঙে অতিশীঘ্র শিকড় আসে। দিনে তিন চারি বারের অধিক জল দিতে হয়, কারণ মাটি সর্ব্বদাই সরস থাকা আবশ্যক। কিন্তু কোমলকাণ্ড উদ্ভিদের কটিং হইতে এ প্রকারে চারা তৈয়ারি করা সহজ নহে। সূর্য্যের উত্তাপে এই সকল ডাল স্বভাবতঃ আতড়াইয়া যায় এবং শিকড় বাহির হইবার পূর্ব্বেই রস শুকাইয়া যায়। কোমল-কাণ্ড উদ্ভিদের ডাল হইতে চারা তৈয়ারি করিতে হইলে ঘরের ভিতর বা ছায়াযুক্ত স্থানেই করাই ভাল। সর্ব্বদাই উত্তাপের সমতা রক্ষা করিতে পারিলে শিকড় বাহির হইবার পক্ষে বিশেষ আনুকূল্য হয়।

শেষ কথা আমরা এই বলিতে চাই যে উদ্ভিদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা বেশ বুঝিলাম যে রস ও উত্তাপের সমতা রক্ষা করিতে পারিলে এবং প্রকৃতির অনুকূল সাহায্য পাইলে উদ্ভিদ দেহ হইতে উদ্ভিদের উৎপত্তি সহজেই

হয়। যাঁহারা গাছ পালার ব্যবসা বা চাষ আবাদ করেন তাঁহাদের বৃক্ষোৎপত্তির সহজ উপায়গুলি জানা নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ তিনি দেখেন যে পেঁয়াজ বা আখের বীজ হইতে পেঁয়াজের বা আখের আবাদ করিতে হইলে তিন বৎসরে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়, সেই জন্য তিনি পেঁয়াজ হইতে পেঁয়াজের আবাদ করেন এবং আখের টুকরা কাটিয়া আখের গাছ তৈয়ারী করেন। আমের জামের আঁটি বা বীজ পুতিয়া গাছ করিতে সময় অধিক এবং ফলভোগ দশ, বার বৎসরে হয়, সেই জন্য আম জামের কলম করাই তাঁহারা সুযুক্তি মনে করেন। বাঁশের বীজ হইতে বাঁশের ঝাড় বা কলার বীজ হইতে কলার ঝাড় তৈয়ারি করা লোকে এই কারণে ভুলিয়াই গিয়াছে।

আমরা পৌরাণিক আখ্যায়িকায় পড়ি যে মানুষের রক্ত বিন্দু হইতে হাজার হাজার মানুষ তৈয়ারি হইতেছে, স্বেদ হইতে প্রাণী জন্মিতেছে কিন্তু তাহা কদাচিৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উদ্ভিদজীবনে তাহা সর্ব্বদাই দেখিতেছি। উদ্ভিদ তাহার ছাল, পাতা, ডাল হইতে উদ্ভিদ উৎপন্ন করিতেছে—উহারা যেন মরিতে জানে না, একটা উদ্ভিদকে সবংশে নিধন করা রাবণ বংশ নিধনের ন্যায় কঠিন, বুঝি বা শ্রীরামচন্দ্র না আসিলে পারেন না। যাঁহারা চাষী তাঁহারা জমির ঘাস মারা যে কত আয়াস সাধ্য তাহা বিশেষ জানেন। একটা ঘাসের শিকড় ২।৩ রসি লম্বা হইয়া চলিতেছে এবং প্রত্যেক গ্রন্থিতে শিকড় উৎপন্ন করিয়া একটা স্বতন্ত্র শীষ মাথা তুলিয়া জমি ফুঁড়িয়া উঠিতেছে, আবার দিগ দিগন্তে বীজ ছড়াইয়া একটা ঘাস বহু হইয়া বহুত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। একবার ভারতের বট বৃক্ষের দিকে চাহিয়া দেখ, একটা বৃক্ষ যেন শত যোজন ব্যাপিয়া তাহার অঙ্গ বিস্তার করিবার মানস করিয়াছে, ডাল যেখানে বাঁকিয়া উঠিতেছে সেই স্থান হইতে শিকড়ের ঝুরি নামিয়া মাটি স্পর্শ করিবামাত্র সেই ডালটিকে একটি স্বতন্ত্র বৃক্ষে পরিণত করিতেছে। যুগ যুগান্তর ধরিয়া কত ঝড় ঝঞ্ঝাবাত তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেলেও গাছটিকে সমূলে, সবংশে কখনই মারিয়া ফেলিতে পারে না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মানিতে হয় বৃক্ষ লতাদি অমর। মানুষ, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গাদি জরায়ুজ প্রাণীগণ মরণশীল, কিন্তু উদ্ভিদ অমর।

পত্রাদি

কলাগাছে পোকা—শ্রীধনকৃষ্ণ বিশ্বাস, বেনারস্ সিটি।

আপনার চৈত্র মাসের কৃষকে ধানের "উফরা" পোকার বিষয় পড়িয়া আমার বোধ হইতেছে ঐরূপ কোন পোকা গাছকেও আক্রমণ করে। আমার বাগানে দুইটী চাঁপা কলার ঝাড়ে বোধ হয় ঐ রোগ লাগিয়াছে। প্রথম দেখি একবার একটী ঝাড়ের কলার মোচা বাহির হইবার আগে একটী যে ছোট পাতা বাহির হয়, তাহা বাহির হইয়া আর মোচা বাহির হয় না, পরে কিছু দিন পরে দেখি গাছের ডগার এক অংশ স্ফীত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া দেখায় জানিলাম মোচা সোজা বাহির হইতে না পারিয়া মোচড় খাইয়া ঐ স্থান হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে, ছুরি দিয়া ঐ অংশ চিরিয়া দিলে পর ঐ মোচা বাহির হইয়া কলা হইল কিন্তু কলা বড় হইল না। দ্বিতীয় বারও ঐ রূপে আর একটী গাছ ভেদ করিয়া মোচা বাহির হয়। তৎপরে ঝাড়ে যতবার প্রতি গাছে ছোট পাতা বাহির হয় ততবার মোচা না বাহির হইয়া ঐ পাতাটি শুকাইয়া যায়, ঐ ভাবে একটি গাছ ৫ ৬ মাস থাকিয়া পরে পচিয়া যায়—এই বারে একটী ঐ রূপ হওয়ায় একমাস মধ্যেই ঐ গাছটি কাটিয়া পরীক্ষা করি, মাথায় কাটিতে মোচা পাইলাম না, মধ্যে কাটিয়া বেশ মোটা থোড় দেখিতে পাইলাম। পরে উহার উপরের অংশের বাস্না ছাড়াইতে ছাড়াইতে দেখি যে উপরে মোচাটি রহিয়াছে ও তাহার উপরে একটী পাতা কাপড়ে চুনাট করিলে যেরূপভাবে কোঁচকাইয়া থাকে সেই ভাবে কোঁচকাইয়া বদরং হইয়া শুকাইবার মত হইয়াছে। বুঝিলাম ঐ পাতাটি কোন রোগাক্রান্ত হইয়া ঐরূপ হওয়ায় কোন ক্রমে মোচা আর বাহির হইতে পারিতেছে না। ঐ ঝাড়ের গাছগুলি রুগ্ন হইলেও খুব মোটা ও বড় হয়। যে মোচা, গাছ ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছিল তাহা এইরূপে হয় অর্থাৎ মোচার ডগ অগ্রে বাহির না হইয়া তাহার গোড়া বাহির হয়। প্রবাদ আছে ঐরূপ হইলে গাছ রাখিতে নাই ও কলাও খাইতে নাই। পরীক্ষার জন্য আর একটি গাছের মাথা কাটিয়া দিয়াছি দেখি কি হয়। দ্বিতীয় ঝাড়ের গাছ হইতে খুব ছোট পাতাও বাহির না হইয়া গাছ মরিয়া যাওয়ায়, ঐ ঝাড়ের একটী গাছ অন্যত্র রোপণ করিয়াছি দেখি কি হয়, এবং আর দুইটী ছোট চারা ঐখানে রাখিয়া তাহাদের মাথা কাটিয়া দিয়াছি, গাছ দুইটী বাড়িতেছে। কিন্তু প্রথম ঝাড়ের যে বড় গাছের মাথা কাটিয়াছিলাম তাহা মরিয়া যাইতেছে। যদি ইহার কোন প্রতীকার থাকে ত লিখিয়া বাধিত করিবেন।

[ঐ সকল গাছে আক্রান্ত পোকা বা পোকাসমেত পোকাক্রান্ত গাছ পাঠাইলে প্রতীকার ব্যবস্থা করা যাইবে। ইত্যবসরে পোকাক্রান্ত সমুদয় গাছ উঠাইয়া

ফেলা ও পুঁতিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ভাল নিরোগ তেউড় লইয়া স্বতন্ত্র স্থানে বসাইয়া সার প্রয়োগ দ্বারা সতেজ গাছ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গাছ বলবান হইলে পোকায় সহজে তাহার ক্ষতি করিতে পারে না।] কৃ সঃ

সার-সংগ্রহ

শিল্প-বাণিজ্যে ভারতের উদ্ভাবনী শক্তি

ভারত কারিকরের দেশ হইলেও এক্ষণে অধিকাংশ লোকে বেতনভোগী হইবার বা চাকুরি করিবার জন্য লালায়িত ও সাতিশয় অনুরক্ত হওয়ায় এখানকার লোকের উদ্ভাবনী শক্তির হ্রাস পাইতেছে। জগতের মধ্যে মার্কিণ সর্ব্বাপেক্ষা উদ্ভাবনপটু, জাপানও উদ্ভাবন বিষয়ে খুব অগ্রসর। জাপান ও জার্ম্মানি কত সুন্দর কমদামী খেলনা, পুতুল বেচিয়া কতপয়সা রোজগার করিতেছে। ইউরোপে আমেরিকায়, জার্ম্মানিতে নিত্য কত নূতন কলকজা, কত ঔষধাদি ব্যবসায়ীর আবশ্যক কত রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হইতেছে। জন সংখ্যার অনুপাতে ভারতের উদ্ভাবনীশক্তি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের তুলনায় ৯০০ শত গুণ ও গ্রেট ব্রিটেন অপেক্ষা ৭০০ গুণ কম। জগতের মধ্যে আমেরিকা সর্ব্বাপেক্ষা উদ্ভাবন পটু এবং ভারত সর্ব্ব নিকৃষ্ট।

কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে আমাদের দেশের বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন জাতিগণ সহস্রাধিক বৎসর শিল্প চর্চ্চা ত্যাগ করিয়াছেন এবং শিল্পের ভার অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধি ও অর্দ্ধশিক্ষিত জাতির মধ্যে নিবদ্ধ হইয়াছে। কারু শিল্পের প্রতিভা আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে এবং কারিকর শ্রেণীর দক্ষতা ও স্বতন্ত্রতার মধ্যে আমরা তাহার আভাস পাই।

বর্ণভেদে ব্যবসায় ভেদ হেতু এ দেশে শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বিলাতে যাহাকে শিক্ষানবিসী বলে, এ দেশে তাহাই নিয়ম ছিল। কর্ম্মকারের পুত্র বাল্যকাল হইতেই কর্ম্মকারের কার্য্যে ও কুম্ভকারের পুত্র বাল্যকাল হইতেই কুম্ভকারের কার্য্যে শিক্ষিত হইত। সে ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করিত। এ বিষয়ে আর কোন দেশে ভারতের মত সুব্যবস্থা ছিল না। এই জন্য তাহারা স্ব স্ব কার্য্য সৌকর্য্যার্থে ছোট খাট কত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিত। এ দেশের সূত্রবস্ত্র ব্যবসায়ী তাঁতীগণ কাপড়ের এমন একটি মাড় দিতে জানে ও সূতার পাট করিতে জানে, তেমনটি আর কেহ জানে না বলিলেও বলা যায়। ভারতের প্রধান পণ্যদ্রব্য কাঁচামাল। আমাদের দেশে পূর্ব্বাপরই প্রচলন ও উন্নতি হইয়াছিল এখনো সেই জন্য সকলের ঝোঁক সেই দিকে যায়। নূতন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ে

সকল শক্তি কার্য্য নির্ব্বাহে ব্যয়িত না হইয়া সেই ব্যবসায়ের কারিকরগণের নব নব উদ্ভাবনের প্রতি দৃষ্টি ও চেষ্টা থাকে ইহাই সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়।

আমাদের ছাত্রগণ ক্রমশঃ শ্রমবিমুখ হইয়া পড়িলেই প্রথম হইতে হাতে হাতিয়ারে কাজে অভ্যস্ত হইলে শিক্ষার্থীর আরও একটা ত্রুটি সংশোধিত হইবে। কারীগরী-শিক্ষাবিষয়ক অনুসন্ধান-সমিতি বলিয়াছেন—ভারতীয় ছাত্রের শ্রম-বিমুখতাই আজকাল কারীগরী-শিক্ষায় তাহার অসাফল্যের প্রধান কারণ। ইহার জন্য শিক্ষা-নবিশী ব্যতীত ছাড়পত্র দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে—অলস ও শ্রমবিমুখ ছাত্রগণকে শিক্ষার্থ বিদেশে পাঠান কিম্বা দেশে শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োগ করা উচিত নহে, প্রথম হইতে হাতের কাজ অভ্যস্ত হইলে ছাত্রগণ আর শ্রমবিমুখ হইবে না। নিজে হাতে কাজ করিতে করিতে কাজের কৌশল খুঁজিতে ইচ্ছা হয়। কর্ম্মঠ কারিকরগণই উদ্ভাবন পটু। ঘটকের ধান ও চাউলছাঁটা কল তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

বাগানের মাসিক কার্য্য

শ্রাবণ মাস

সব্জীবাগান।—এই সময় শাকাদি সীম, ঝিঙ্গে, লঙ্কা, শসা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া, পুঁই, বরবটী, বেগুন, শাঁকালু, টেঁপারি প্রভৃতি, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই সালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালম শাক ও টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতী সব্জী বীজ—বাধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি বপনের এখনও সময় হয় নাই।

এ বৎসর বর্ষা জলদি তথাপি মোকাই (ছোট) এবং দে-ধান চাষে এখনও সময় যায় নাই।

ফুল বাগিচা।—দোপাটী, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা), এমারন্থাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম, (Sun-flower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুল বীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া তাহা হইতে দুই একটী গাছ লইয়া অন্যত্র রোপণ করিয়া নূতন ঝাড় তৈয়ারি করা যায়।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কলম অর্থাৎ ডাল, কটিং করিয়া পুতিয়া চারা তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ক্যানা, লিলি প্রভৃতির পট বা গাম্‌লা বদ্‌লাইবার সময় বর্ষারম্ভ, কেহ কেহ সময় না পাইলে আষাঢ় শ্রাবণ পর্য্যন্ত এই কার্য্য শেষ করেন। মূলজ ফুল গাছের মূল

বর্ষায় বসাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। কতকগুলির মুল বর্ষাকালে গামলায় তুলিয়া না রাখিলে জল বসিয়া পচিয়া যায়। ডালিয়া এই শ্রেণীভুক্ত।

কলিয়স, ক্রোটন, আমারাস্থাস, একালিফা প্রভৃতির ডাল কাটিয়া পুতিয়া এই সময় বাড়াইতে পারা যায়।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘন ঘন বৃষ্টি হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া গাছ মারা না যায়। আম, লিচু, কুল, পীচ ও নানাপ্রকার লেবু গাছের গুলকলম করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের গাছের ফেঁকড়িগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

ভরা বর্ষাতেই পেঁপে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু চারা তৈয়ারি করিয়া ভাদ্রমাসের আগেই চারা নাড়িয়া না পুতিলে ভাদ্রের রৌদ্রে চারা বাঁচান দায় এবং জমিতে ঘাস পাতা পচানি হেতু জমি অম্লাক্ত হওয়ায় তখন চারার অনিষ্ট হয়। চারাগুলি তিন চারি পাতা হইলে, যখন বৃষ্টি হইতে থাকে তখন নাড়িয়া বসান উচিত।

যাঁহারা বেড়ার বীজের দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তরমত গজাইতে পারে।

শস্যক্ষেত্র।—কৃষকের এখন বড় মরসুম। বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। বাঙলার দক্ষিণাংশে পাট নাবি হয়। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যাইবে। আষাঢ় মাসে বীজধান্য বপনের উপযুক্ত সময়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি বিচালিত করা কর্ত্তব্য। সুপারি গাছের গোড়ায় এই সময় গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময় ঐ সকল

গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ কাঁচা গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। ফলের গাছে হাড়ের গুঁড়া এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেতের পয়নালা ঠিক করিয়া রাখা এই সময় বিশেষ আবশ্যক।

যদি দেখিতে পাও, কোন লতা গুল্মের গোড়ায় অনবরত অত্যধিক জল বসিয়া ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া দিয়া এরূপে নালা কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়া যায়। কলার তেউড় এ মাসে পুতিলেও হইতে পারে। বেগুন, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে। আখের গাছের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে। গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে তখন নিকটস্থ চারি গাছা আখ একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে চাষ দেওয়া জমিতে সারি করিয়া লঙ্কার চারা পুতিবে। এই মাসের প্রথম পনর দিনের মধ্যে লঙ্কা পুতিতেই হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কার ঝাল হয় না। যে দোয়াঁস মাটিতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া ঐ দাঁড়ার উপর আধ হাত অন্তর দুইটী করিয়া শাঁকআলুর বীজ পুতিবে। শাঁকআলুর ক্ষেত সর্ব্বদা আল্গা ও পরিষ্কার রাখিবে। এই মাসের শেষ কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আউশ ধান কাটে।

বাগানের বেড়া—আষাঢ় মাসে বৃষ্টি আরম্ভ হইলেই ক্ষেতের বা বাগানের চারিদিকে বেড়ার বীজ বপন করিয়া বেড়া প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক। লোকে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র ঘিরিয়া রাখিতে পারে না। ক্ষেতে যখন ফসল থাকে তখন সকল চাষীই গরু বাছুর আটক করিতে চেষ্টা করে এবং গৃহস্থ গো মহিষাদি চরিতে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্য করে। কিন্তু সকলকেই বাগান ঘিরিতে হইবে নতুবা গো মহিষ ছাগলের উৎপাত হইতে রক্ষা হইবার কোন উপায়ান্তর নাই। চিরস্থায়ী বেড়ার জন্য অনেকে ডুরোন্টা বা মেহদী, ত্রিপত্রা বা চিতার বেড়া দেন। ডাল পুতিয়া হউক বা বীজ ছড়াইয়া হউক বেড়া প্রস্তুত করিতে হইলে বর্ষাকালই উপযুক্ত সময়। জ্যৈষ্ঠ হইতে এই বিষয়ে যত্নবান হইতে হয়, শ্রাবণ পর্য্যন্ত চেষ্টায় বিরত হইতে নাই। পচা ভাদ্রে বা নিতান্ত শীত কিম্বা গ্রীষ্মে বেড়া প্রস্তুত করা চলে না।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

পঞ্চদশ খণ্ড,—৪র্থ সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ,

শ্রাবণ, ১৩২১।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকের" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶৵ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

KRISHAK

Under the Patronage of the Governments of Bengal and E. B. and Assam.

THE ONLY POPULAR PAPER OF BENGAL

Devoted to Gardening and Agriculture. Subscribed by Agriculturists, Amateur-gardeners, Native and Government States and has the largest circulation. It reaches 1000 such people who have ample money to buy goods.

Rates of Advertising.

1 Full page Rs. 3-8. 1 Column Rs. 2.

½ Column Rs. 1-8

MANAGER—"KRISHAK."

162, Bowbazar Street, Calcutta.

কৃষক

সূচীপত্র।

শ্রাবণ, ১৩২১ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ খণ্ড। | শ্রাবণ, ১৩২১ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

কাঁটাল

ইহার বাঙলা নাম কাঁটাল, ইংরাজীতে ইহাকে Jack-Fruit Tree বলে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম পণস, কণ্টকি ফল, বৃহৎ ফল। "পণসঃ কণ্টকি ফলঃ, পণসোতি বৃহৎ ফলঃ।" ইতি শব্দ নির্ঘণ্ট। এতদ্ব্যতীত কাঁটালের আকৃতি ও গুণ পরিচায়ক অনেক নাম আছে, যথা রসাল, মৃদঙ্গফল, প্রভৃতি। হিন্দি ভাষায়ও ইহাকে কাঁথাল, কাঁটাহার বলে। কণ্টকি ফল হইতেই কাঁটাল কথার সৃষ্টি হইয়াছে। গায়ে কাঁটা আছে বলিয়া এই নামের প্রসিদ্ধি। ইহার শাস্ত্রীয় নাম Artocarpus Integrifolia।

এই জাতীয় অনেক প্রকার গাছ আছে। ইহাদের দুধের মত শাদা আঠা বাহির হয়। পাতাগুলি ছাড়া ছাড়া হয়। এই জাতীয় গাছ সর্ব্বদাই সবুজ বর্ণ ধারণ করিয়া আছে দৃষ্ট হয়। ইহার পাতা এক কালে সব পড়িয়া যায় না বা হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে না। এইজন্য ইহা ইংরাজের নিকট এভারগ্রীণ (Evergreen) শ্রেণীভুক্ত, দক্ষিণ সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জের রুটি বৃক্ষ (The Bread-Fruit Tree) এই জাতীর অন্তর্গত। রুটি বৃক্ষ, দক্ষিণ ভারতে, সিংহলে ও ব্রহ্মদেশে জন্মিতেছে।

ভারতের অধিকাংশ স্থলে ও ব্রহ্মদেশে যেখানে সেখানে কাঁটাল গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ৪০০০ হাজার ফিট উচ্চ পাহাড়েও কাঁটাল আছে। ঘাট পর্ব্বতের বনে, জঙ্গলে, সিংভূমের বনে বন্য অবস্থায় কাঁটাল বৃক্ষ জন্মিতেছে।

চারা রোপণ—এক একটি গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার কতকাংশ গোময় গোয়ালের আবর্জ্জনা সার দ্বারা পূর্ণ করতঃ তাহার উপর কাঁটাল বীজ রোপণ করিতে হয়। ২।৩টি বীজ এক সঙ্গে রোপণ করিয়া চারা জন্মিলে যে চারাটি বলবান সেইটি রাখিয়া অপর গুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়। কাঁটাল গাছ সাধারণতঃ ৩০।৩৫ ফিট উচ্চ হয়,

এবং ডাল পালা বিস্তার করিয়া তদনুরূপ ঝাড়াল হয়, সুতরাং এক একটি গাছ ৩০।৩৫ ফিট দূরে বসান কর্ত্তব্য। কিন্তু কাঁটালের শাখা প্রশাখা অপেক্ষা গুঁড়িতে অধিক কাঁটাল জন্মে বলিয়া কিছু ঘন রোপণেও ক্ষতি হয় না, কেন না উহাদের ডালা পালা ছাঁটিয়া উহাদিগকে সঙ্কীর্ণায়তন করিলে কাঁটাল বাগানের মধ্যে বেশ হাওয়া ও রৌদ্র আসে। কাঁটাল চারা প্রস্তুতের এই সাধারণ নিয়ম। ইহার বিশেষ বিধিও আছে। কাঁটালের কোষের মধ্যে বীজ থাকে এবং কোষের আশে পাশে কোষাকৃতি পাতা-কুষি থাকে। সেগুলি খুব সারবান। ইহাকে চলিত ভাষায় ভুঁতি বলে। ভুঁতি সমেত কাঁটাল বীজ পুতিলে কাঁটাল চারা সতেজ ও সুপুষ্ট হয়।

একটি সুপক্ক কাঁটাল সম্পূর্ণ মাটির ভিতর পুতিয়া কাঁটালের চারা তৈয়ারি করিবার বিধিও দেখা যায়। কাঁটালটি মাটিতে দুই এক দিন থাকিলে যখন কিঞ্চিৎ গলিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহার ভিতর হইতে বোঁটা সংলগ্ন মধ্যদণ্ডটি টানিয়া লইতে হয়। এই দণ্ডের চারি দিকেই কোষ গুলি সংযুক্ত ও সজ্জিত থাকে। মধ্যদণ্ডটি অপসৃত হইবার পর বীজ অঙ্কুরিত হয় ও কোষ মুখ উন্মুক্ত করিয়া ফুটিয়া অঙ্কুর বাহির হয়। অঙ্কুর গুলি সবই উন্মুক্ত পথে বাহির দিকে আসে, ছোট, বড় অনেক গুলি চারা মাথা তুলিয়া মাটির উপর দাঁড়ায়। উহারা কিঞ্চিৎ বড় হইলে নিতান্ত রুগ্ন চারা গুলি উপড়াইয়া ফেলিয়া বাকী গুলি দড়ি দিয়া এক সঙ্গে বাঁধিয়া দিলে উহারা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ক্রমে একটি বৃক্ষে পরিণত হয়। এই বৃক্ষ খুব বলবান হয় এবং ইহাতে অসংখ্য কাঁটাল ধরে। এই প্রকারে প্রস্তুত গাছের কাঁটাল তাদৃশ বড় হয় না। কাঁটালের সংখ্যাধিক্য হেতু ইহাকে হাজারে কাঁটাল গাছ বলা হয়।

বাঁশের চোঙায় বীজ পুতিয়া কাঁটালের চারা তৈয়ারি করা আর একটি উপায়। তিন হাত লম্বা একটি বংশ খণ্ড লইয়া তাহাকে দুই চেলা করা হয়। অতঃপর ভিতরে গাঁটের সংযোগ স্থান গুলি কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়। মোট কথা তিন হাত লম্বা একটা ফাঁপা নলের আবশ্যক। ধাতু নল হইলে চলিবে না, কারণ তাহা শীঘ্র তাতিয়া যাইবে এই জন্য বাঁশের নল। সেই দুই খণ্ড বাঁশের তলায় সার মাটি দিয়া বীজটি স্থাপন পূর্ব্বক দুইটি চেলা দড়ি দ্বারা বাঁধিয়া দিলে বীজ হইতে চারা অঙ্কুরিত হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকিবে এবং চারাটি লম্বা হইয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া পল্লবিত হইবে। এই সময় নলটি খুলিয়া গাছটিকে চক্রাকারে ঘুরাইয়া মাটিতে স্থাপন করিবে এবং কেবলমাত্র গাছের শিরোভাগ উপরে রাখিয়া মাটি চাপা দিবে। অতঃপর গাছটি বাড়িতে থাকে এবং চক্রাকার কাণ্ডটিও ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে। এই প্রকারে প্রস্তুত গাছ ৫ বৎসর মধ্যেই ফল

প্রদান করে এবং কুণ্ডলিকৃত কাণ্ডে যে ফল জন্মে তাহা মিষ্ট হয়। এই গাছে ফলের সংখ্যাও অধিক হয়।

কাঁটাল গাছের স্থান নির্দ্দেশ—উচ্চ বাগান জমিতে কাঁটাল বাগান করা কর্ত্তব্য, জল বসা জমিতে বরং আম গাছ দশদিন বাঁচিয়া থাকে, কাঁটাল অচিরে মরিয়া যায়। অল্প ছায়াযুক্ত স্থানে কাঁটাল গাছ সহজে জন্মিতে ও তাহাতে ফল হইতেও দেখা যায়। খুব রৌদ্র পিঠে জায়গায় কাঁটাল গাছ ঈষৎ খর্ব্বাকৃতি হয়। কাঁটালের ফলন উভয়ত্র সমান বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ছায়াযুক্ত জায়গার গাছে-কিছু বেশী বেশী পোকা ধরে। আম, লিচু গাছ বাগানের মধ্যে বসাইয়া কাঁটাল, বাগানের পগার বা খানার ধারে ধারে বসান নিতান্ত মন্দ পরামর্শ নহে।

সার ও ডাল ছাঁটা—পুষ্করিণীর পুরাতন পাঁক মাটি কাঁটালের বেশ ভাল সার। শ্রাবণ, ভাদ্রে, কাঁটালের ফল শেষ হইয়া গেলে কাঁটাল গাছের গোড়ার মাটি সরাইয়া শিকড় গুলি বাহির করিয়া দিতে হয় এবং গাছের চারিধারে আইল বাঁধিয়া জল খাওয়াইতে হয়। গাছ ৪।৫ বৎসরের বড় না হইলে শিকড়ের মাটি সরান তাদৃশ শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয় না। বর্ষা শেষেই উহার গুঁড়ির পাশাপাশি ডাল ছাঁটিয়া দিতে হয়। গুঁড়িতে আব বা গাঁইট জন্মিলে তাহাও চাঁচিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। দুই একটি ডাল ছাঁটা এবং গুঁড়িতে কয়েক স্থানে ক্ষত করিয়া আঠা নির্গত করিয়া দিলে কাঁটালের ফলনের সহায়তা হয়। কাঁটালের ডাল পালা যতদূর বিস্তৃত হয়, ততদূর পর্য্যন্ত গোড়া কোপাইয়া, নূতন মাটি ফেলিয়া আশ্বিন কার্ত্তিকে গোড়া বাঁধিয়া দিতে হয় এবং কোপান জায়গার প্রান্তভাগে গাছের চারিদিকে বৃত্তাকারে একটা খাত খনন করিয়া সেই খাতটি পচা খড় কুটি, অশ্বশালার মলমূত্র ঘাস খড় প্রভৃতি মিশ্রসার দ্বারা প্রায় অর্দ্ধেক পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হয়। ইহার সহিত কিছু সোরা মিশ্রিত করিলে জল পাইয়া সার পচিয়া মাটির রসের সহিত মিশিলে গাছকে খুব সতেজ করে ও ফল প্রদানে উন্মুখী করে। হাড়ের চূর্ণ ও সোরা একত্রে মিশাইয়া কাঁটাল গাছে দিলেও খুব ফল পাওয়া যায়। প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক গাছের পক্ষে ১০ পাউণ্ড বা /৫ পাঁচ সের অস্থিচূর্ণ এবং পাঁচ পোয়া সোরা পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হয়। তবে যদি দেখা যায় যে, গাছের খুব তেজ আছে তবে সার না দেওয়াই ভাল। তাহাতে আরও সার দিলে ফলে রসাধিক্য বশতঃ কাঁটাল ফাটিয়া যায়।

বীজ নির্ব্বাচন—পূর্ণ বয়স্ক গাছের আগার, সরু ডালের কাঁটাল হইতে বীজ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। অনেকের বিশ্বাস, যেমন সরু ডালের কাঁটাল বীজ লইয়া গাছ করিবে, গাছটি সেই রকম মোটা ও বড় হইলেই তাহাতে ফল ফলিবে

প্রকৃত পক্ষে এই রকমে বীজ সংগ্রহ করিলে কাঁটাল গাছ ৪।৫ বৎসরে ফল ধারণ করে। মানুষের হাতের মত সরু গাছে বৃহৎ কাঁটাল ফলিয়া আছে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। সুপক্ক কাঁটালের মধ্যস্থলের বীজ লইয়া চারা উৎপাদন করিলে তবে ভাল গাছ হয়। কাঁটাল বীজ কোষ হইতে বাহির করিয়াই রোপণ করিবে। শুকাইয়া গেলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না বা চারা ভাল হয় না।

কাঁটাল, গাছের কাণ্ডে, শাখা প্রশাখার গাত্রে ধরিয়া থাকে। পল্লবের অন্তমুকুলে যদি বা কখন ফল ধরে সে ফল থাকে না, ঝরিয়া যায়। বৃক্ষের গাত্রে এবং শাখা প্রশাখায় যে ফল হয় তাহাই খুব বড় হয়। কখন বা গাছের মৃত্তিকা সংলগ্ন কাণ্ড হইতে কাঁটাল ফলিতে দেখা যায় এবং এরূপ অবস্থায় গোড়ার মাটি সরাইয়া কাঁটালের বৃদ্ধির সহায়তা করিতে হয়।

কাঁটালের ব্যবহার—কাঁটাল মুচী অবস্থা হইতে তরকারীতে ব্যবহার হয়। নূতন হচোড়ের ব্যঞ্জন বিশেষ উপাদেয়। যতদিন না কাঁটাল পুষ্ট হইয়া পাকিবার উপযুক্ত হয় তত দিন রাঁধিয়া ইহার তরকারী খাওয়া চলে। পাকিলে কোয়া খায়। প্রকারভেদে আমরা নেয়ো বা গিলা এবং খাজা কাঁটাল দেখিতে পাই। খাজা কোয়া আস্ত চিবাইয়া খাওয়া যায়। খাইতে সুমিষ্ট ও সুঘ্রাণ এবং ক্ষীর সংযোগে খাইলে আরও মধুর বোধ হয়। শক্ত খাজা কোষ অপেক্ষা অল্প গিলা রস খাজা কোষ খাইতে অধিকতর সুস্বাদু। গিলা কাঁটালের রস করিয়া পান করিতে হয়। কাঁটাল রসের সহিত ক্ষীর মিশাইলে অতি সুপেয় হয়।

কাঁটালের মুচী অনেক ঝরিয়া পড়ে, এই মুচীগুলি শুকাইয়া চূর্ণ করত সোডা বা সাজিমাটির পরিবর্ত্তে কাপড় কাচায় ব্যবহার হইতে পারে। পাতা গুলি বেশ গাঢ় সবুজ বর্ণের, গবাদিতে কাঁটাল পাতা খাইতে ভাল বাসে। ছাগলের ইহা বড় প্রিয় খাদ্য। অন্য তরকারীর সহিত কাঁটাল বীজও মানুষে খাইয়া থাকে। খাইতে বেশ সুস্বাদু, কাঁটাল বীজ ভাজা বিশেষ মুখ রোচক। কাঁটাল বীজ পিষিয়া আটা প্রস্তুত করা যায়। কাঁটাল বীজ শুকাইয়া বালির মধ্যে অসময়ের জন্য রাখা যায়। দুর্ভিক্ষের বাজারে উহার আটা খাইয়াও জীবন নির্ব্বাহ হইতে পারে।

কাঁটাল কাঠের বর্ণ ঈষৎ উজ্জ্বল হরিদ্রা, কাঠ অত্যুৎকৃষ্ট। ইহাতে আলমারি, ডেস্ক, বাক্স প্রভৃতি গৃহ সজ্জার নানা বিধ আসবাব প্রস্তুত হয়। ইহার কাঠে বেশ পালিস উঠে।

কাঁটালের আঠা—কাঁটালের গাত্র হইতে এবং ফলের বোঁটা হইতে যে ক্ষীর নিঃসৃত হয়, তাহা ছিন্ন বস্ত্র খণ্ডে বা কাঠের বা বাঁশের শলাকায় মাখাইয়া রাখিলে জ্বালান যায়। এই আলো বেশ উজ্জ্বল হয়। আঠা শুষ্ক করিয়া বহুদিন রাখিয়া দিলে রজনের মত হইয়া যায়। ইহাতে রবারের গুণও কিয়ৎ পরিমাণে

আছে, ইহা কতকটা চামড়ার মত শক্ত হয়. ইহা টানিলে বাড়ে এবং ছাড়িয়া দিলে যথায়তন প্রাপ্ত হয়. ইহার ভিতর দিয়া জল প্রবেশ করিতে পারে না বা ইহা জল শোষণ করে না, ইহাদ্বারা পেন্‌সিলের দাগও তুলা যায়। এই গুলি সব রবারের গুণ, এই গুণ গুলি ইহার কতক পরিমাণে আছে কিন্তু ব্যবসায়ের উপযোগী আঠা কাঁটাল গাছ হইতে সংগ্রহ হইতে পারিবে কি না সে বিষয়ে খুবই সন্দেহ আছে। ইহার আঠায় জলীয় ভাগ কিছু অধিক।

কাঠে রঙ—ইহার কাঠে বা কাঠের গুঁড়া চূর্ণ করিয়া বেশ হরিদ্রা রঙ হয়। তাহাতে বস্ত্রাদি রঞ্জিত করা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফোড়া বা ফুলায় ইহার আঠা লাগাইয়া দিলে বসিয়া যায়। পাতা চোঙাইয়া ঘি তৈয়ারি করিয়া দিলে খোস চুলকানী ভাল হয়, উহার শিকড় বাটিয়া খাওয়াইলে উদরাময় সারিয়া যায়।

খাদ্য—আয়ুর্ব্বেদমতে পাকা কাঁটাল শীতবীর্য্য, মধুররস, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকারক, পুষ্টিকর, মাংসবর্দ্ধক, রুচিকর, মলরোধক, বলবীর্য্যবর্দ্ধক, শুক্রজনক ও কফবর্দ্ধক। ইহা বায়ু, পিত্ত, ক্ষত ও ব্রণ নাশক এবং দাহ, শ্রম ও শোষরোগে উপকারক। অপক্ক কাঁটাল বা ইচোড় মধুর কষায় রস, বায়ুবর্দ্ধক, শীতল, বলকর, দাহ জনক ও রুচিকর। ইহা কফ ও মেদ ও ধাতু বৃদ্ধি কারক। কাঁটাল বীজ শুক্রবর্দ্ধক, মধুররস ও গুরুপাক, মলরোধক, ঈষৎ কষায় রস, মূত্র বিরেচক, শুক্রবর্দ্ধক। শুনা যায় যে কাঁটাল খাইয়া অজীর্ণ বোধ করিবার সম্ভাবনা থাকিলে একটি কাঁটাল বীজ ভক্ষণে অজীর্ণ দোষ সদ্য নিবারণ হয়। কাঁটালের পাতার রস পান করিলে সিদ্ধি সেবন জনিত মাদকতা বিদূরিত হয়।

কাঁটাল ফল খুব বড় হয়। সর্ব্বাপেক্ষা ছোট তাহাও ওজনে ২।৩ সেরের কম নহে। বড় কাঁটাল ওজনে একমণ, দেড়মণ পর্য্যন্ত হয়, দেখিতে যেন এক একটা মৃদঙ্গের মত। কাঁটাল বাস্তবিক একটি ফল নহে ইহা ফল সমষ্টি মাত্র। এক একটি কোয়াই এক একটি ফল। কাঁটালের ভোঁতার ভিতরে মধ্যদণ্ডের আশে পাশে ফল গুলি সাজান। ভোঁতা পাকিয়া খুব সুমিষ্ট হয়। গবাদিতে উহা খুব আগ্রহ সহকারে ভক্ষণ করে। কাঁটালের রস গাঁজিয়া গেলে অর্থাৎ ফার্ম্মেণ্ট করিলে তাহা চোলাই করিয়া সুরাসার প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

কাঁটাল হইতে আয়—পূর্ণবয়স্ক গাছে বড় কাঁটাল হইলে ন্যূন কল্পে ২০ টা কাঁটাল ফলে, ছোট কাঁটাল ৫০ টা ফলিয়া থাকে। এক একটা বড় কাঁটাল পাইকারী হিসাবে ৵০ দুই আনা মূল্যে বিক্রয় হয়। ছোট কাঁটাল তিন পয়সা চারি পয়সার কম নহে। বড় কাঁটাল প্রতি শত ২০৲ টাকাও বিক্রয় হইয়া থাকে। গাছগুলি ৩০ ফিট অন্তর সম চতুষ্কোণ করিয়া বসাইলে বিঘায় ১৬টি গাছ বসিবে, কিন্তু

ত্রিকোণাকারে বসাইলে প্রত্যেক সারি হইতে সারির অন্তর ২৫ ফিট হইবে এবং গাছ হইতে গাছের অন্তর যে দিক দিয়া মাপ ৩০ ফিটই থাকিবে ইহাতে বিঘায় =১৪৪০০ বর্গ ফিট÷(৩০×২৫) ৭৫০ বর্গ ফিট =১৯ টা গাছ বসিবে। প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক কাঁটাল গাছ হইতে বৎসরে ২॥০ টাকার কম আয় হয় না। একটা কাঁটাল গাছ পূর্ণায়তন পাইতে অন্ততঃ ১২ বৎসর সময় অতিবাহিত হয়। গাছ ফলিতে আরম্ভ হইলেই তাহা হইতে ১৲ টাকা আয় সহজেই হয়। যতদিন গাছগুলি ছোট থাকে তাহার তলায় কড়াই সরিষার চাষ করা চলে। ইহাতে জমির খাজনা ও চাষের খরচ উঠিয়া যায়। গাছ বড় হইলেও তাহার তলদেশে আদা, হলুদ, আনারস, চাষ হইতে পারে। আদা, হলুদ, আনারস হইতে বাগানটি কোপাইবার খরচ উঠিতে পারে। গাছ যত বড় হয় ততই জমির রসের টানাটানি হয়। আদা হলুদের ফলন তত কমে কিন্তু কাঁটাল হইতে আয় বাড়িতে থাকে। গাছে সার দিলে সারের খরচ উঠিয়া নিশ্চয়ই কিছু উপরি লাভ থাকে। মতভে যাহাই হউক এক বিঘা একটা কাঁটাল বাগান হইতে গাছ পিছু ২৲ টাকা হিসাবে ৩৮৲ টাকা লাভের অঙ্কে ফেলিতে পারা যায়। ইহা সত্য সত্যই হয়, যদি গাছ সতেজ ও নিরোগ হয়।

কাঁটালের ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার—কাঁটালের পাতায়, ডালে ছত্রক রোগ ধরিয়া গাছ নিস্তেজ করিয়া ফেলে এবং এক প্রকার কঠিন পক্ষ পতঙ্গ গাছের কাণ্ডে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। ক্ষতস্থান হইতে গুঁড়া ও রস বাহির হইতে থাকে। ইহাতে গাছ নির্জ্জীব হইয়া আসে ও অবশেষে মরিয়া যায়। তামাকের জল, স্যানিটারি ফ্লুইড, কেরোসিন মিশ্রণ গর্ত্তের মধ্যে পিচকারী দ্বারা প্রবেশ করাইয়া কীটগুলি মারিতে পারা যায়। এই সকল আরোক গাছের গায়ে ছিটাইলে ছত্রক রোগ কমিয়া যাইবে। পোকা মারিবার ও প্রতিকার কৌশল শিখিবার জন্য "ফসলের পোকা" নামক পুস্তক আছে। দেখা যায় যে নিস্তেজ গাছেই পোকা বেশী ধরে, ছায়ার গাছেও পোকার উপদ্রব অধিক। সুতরাং গাছগুলি সার প্রয়োগ দ্বারা সতেজ করা এবং যাহাতে গাছে অবাধে আলোক রৌদ্র পায় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হয়। গাছের তলায় হলুদ চাষে ও পোকার উপদ্রব কমে। পোকারা হলুদের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না।

এই সম্বন্ধে আর দুই একটি কথা—কাঁটালের সহিত কাঁটালের কলম হয় কি না তাহা ভারতীয় কৃষি সমিতি চেষ্টা করিতেছেন। কলম হইয়াছে, কলম বাঁচিয়া আছে কিন্তু বীজের চারা অপেক্ষা কত আগে ফল হয় এবং গাছ কত টেঁকসহি হয় তাহাই দেখা আবশ্যক।

"আম টুঁটুয়ে কাঁটাল ভো। গো নারিকেল নেড়ে রো॥"

কাঁটাল সম্বন্ধে এই বাক্য কতদূর সত্য তাহা আমি আজিও কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। অনেক কাঁটাল চারা নাড়িয়া রোপণ করিয়াছি, তাহা ত ফলবান হইয়াছে এবং সেই গাছের কাঁটাল সম্পূর্ণ কোয়ায় ভরা, কোন অংশে ভুয়া বলিতে পারা যায় না। কাঁটালের গন্ধ কাঁটালের মত এই সাধারণতঃ দেখা যায়। শুধু তাহা হইলেই আমরা সব সময়ে সন্তুষ্ট হই না। আমরা যেমন আমে বেলের গন্ধ, ক্ষীরের গন্ধ, কর্পূর গন্ধ, গোলাপের গন্ধ চাই, কাঁটালেও যেন রকমওয়ারি গন্ধ হইলেই মনটা প্রসন্ন হয়। নানা রকম হইবে, নানা বৈচিত্র্য থাকিবে মনুষ্য মনের এ একটা খেয়াল। কাঁটালে আমরা গোলাপ গন্ধ ও এলাচ গন্ধ হইতে দেখিয়াছি। কাঁটাল বীজেতে কিন্তু কাঁটালের গন্ধ নাই। উহা আলু পটল প্রভৃতি সব্জীর মত একটা বিভিন্ন স্বাদগন্ধযুক্ত। কাঁটাল বীজ চূর্ণ করিয়া আটা হয়। খাদ্যাভাব হইলে সেই আটায় জীবন রক্ষা হইতে পারে। এমতাবস্থায় একটা কাঁটাল গাছ হইতে কি পরিমাণ আটা প্রস্তুত হইতে পারে তাহার একটা হিসাব করিয়া রাখা কিছু মন্দ নহে, কেন না আজ কাল আমরা বড় হিসাবী হইয়া পড়িয়াছি। মানুষের অনাটন হইলেই হিসাবের দিকে কড়া নজর পড়ে। ২০টা কাঁটাল হয় ধরিয়া লওয়া গেল। একটা কাঁটালের বীজ হইতে প্রায় ৩০ আউন্স (এক আউন্স ২॥ তোলা) আটা প্রস্তুত হইতে পারে। একটা গাছ = ২০ কাঁটাল = ২০ × ৩০ আউন্স = ৬০০ আউন্স = ৩৭॥ পাউণ্ড = প্রায় ১৯ সের আটা উৎপন্ন হয়। বর্ষাকালেই কাঁটাল ফলে এই সময়ই লোকের খাদ্যাভাব হয় সুতরাং কাঁটাল অসময়ে একটা অবলম্বন। বাঙলায় আম সব বৎসর ফলে না কিন্তু কাঁটালের কোন বৎসর বাদ যায় না।

রাস্না বা অর্কিড

অর্কিড তত্ত্ববিদ্—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে অর্কিডের বাসস্থান সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এই জাতীয় পরাশ্রয়ী গুল্ম কোথায়, কি ভাবে জন্মিয়া থাকে তাহার কতকটা আভাস দিয়াছি। এই গাছগুলিকে পালন করিতে হইলে কি প্রকার যত্নের আবশ্যক, ইহাদের বাসগৃহ নির্ম্মাণেই বা কি কৌশল অবলম্বন করিতে হয় তাহার উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। অতঃপর উহাদের পালন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

আসামের শৈল সঙ্কুল ভূখণ্ড এক অপূর্ব রাজ্য। এখানকার শৈল শিখরগুলি লতাগুল্ম বিরহিত কঠিন প্রস্তরময় নহে। ইহা বৃক্ষ লতাগুল্ম মণ্ডিত ও নানাজাতীয় ফুল ফলে পরিশোভিত, বন সংচর পশুপক্ষী দ্বারা সর্বদাই মুখরিত। এই সকল শৈলমালার সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব, অতি মনোহর, বিচিত্রতায় সর্ব্বদাই নূতন। যে কেহ এই প্রদেশে পরিভ্রমণে আসিয়াছেন তিনি এই বনানির সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুর এদেশে গতিবিধি আছে। আউরঙ্গজেবের সময় বিদেশাগত ব্যক্তিগণকেও এতদ্দেশে পরিভ্রমণে আসিতে শুনা যায়। তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বনমধ্যস্থ বৃক্ষগাত্র সংলগ্ন গুল্ম হইতে বিচিত্র বর্ণের ফুলগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। এই ফুলগুলি দেখিয়া তাঁহারা নয়ন কিছুক্ষণ অন্য দিকে ফিরাইতে পারেন নাই, ইহাদের বিচিত্র বর্ণ ও অদ্ভুত নির্ম্মাণ কৌশল তাঁহাদের প্রাণমন বিমোহিত করিয়াছিল। গাছের গায়ে গাছ, তাহাতে নানা রঙ বেরঙের ফুল, কি যেন একটা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার! আসাম ইন্দ্রজালের দেশ। এদেশের সৌন্দর্য্য মাধুরী মায়ার মায়াবিনী স্ত্রীলোকগণ লোক বশীকরণে পটু। প্রবাদ আছে যে, ভারতের সমতল ভূমিভাগ হইতে এই সকল শৈলমালায় পরিভ্রমণে আসিলে তাঁহারা আর ঘরে ফিরিয়া যাইতেন না। সুন্দরী স্ত্রীগণ তাঁহাদিগকে যাদু করিয়া রাখিত। আমার বিশ্বাস যে, এই অনন্ত বিস্তৃত বনানির অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহারা আত্মহারা হইয়া যাইতেন। ঐ বিচিত্র ফুলের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে করিতেন যে, তাঁহারা কি যেন একটা স্বপ্নরাজ্যে আসিয়াছেন। তাঁহাদের অতিবিস্তৃত সমতল ভূভাগে এমনটিও কখন দেখেন নাই। একি, আশ্চর্য্য অদৃষ্টপূর্ব,—একটা ফুল, একভাবে, অপরিম্লানশ্রী মাসাতীতকাল পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্য সুষমায় বনভূমি আলো করিয়া রহিয়াছে। এ রকম রমণীয় স্থানে স্বভাবতই তাঁহারা আপনা ভুলিয়া যাইতেন। কেবল মনে জাগিতেছে অফুরন্ত সৌন্দর্য্য, তাঁহার ঘর বাড়ি দেশ সবই ভুল হইয়া গিয়াছে। এই ফুলটি যে কি, তাহা আজ আমরা জানিতে পারিয়াছি। তাহার স্বভাব বুঝিতে পারিয়াছি, তাহার নাম করণ করিয়াছি, তাহার শ্রেণী বিভাগ করিয়াছি। জ্ঞানের আলোকে মোহ কাটিয়াছে বটে, কিন্তু শোভা বৈচিত্রে অদ্যাপিও ফুলগুলি প্রাণ মাতাইয়া রাখিয়াছে। ফুলগুলি অর্কিডের ফুল, ইহা লীলাময়ী প্রকৃতির অদ্ভুত সৃষ্টি কৌশলের সাক্ষীভূত। কিছুদিন পুর্ব্বে ইহা কেবল ধনাঢ্যগণের উদ্যানে স্থান পাইত। অর্কিড সংগ্রহে যে অতিবিস্তর খরচ এবং তাহাদের পালন হেতু অত্যধিক ব্যয় তাঁহারাই বহন করিতে পারিতেন। ইতিপূর্ব্বে অর্কিড সংগ্রহকারীগণ নানাস্থান হইতে অত্যধিক আয়াস ও শ্রম স্বীকার করিয়া অর্কিড সংগ্রহ করিয়া আনিত বটে, কিন্তু তখন তাঁহাদের অর্কিড সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান না থাকায় তাঁহারা

শতের মধ্যে একটা অর্কিড বাঁচাইতে পারিতেন এবং যেগুলি বাঁচিত সে গুলিও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে যে রকম হয় সে রকমটি হইত না। অনেকেরই বিচিত্র উদ্ভিদ লতা গুল্মাদি সংগ্রহে আগ্রহাতিশায্য দেখা যায়। তাঁহারা আশ্চর্য্য লতাগুল্মাদির মধ্যে অর্কিডকে স্থান দিতেন এবং অর্কিডও সংগ্রহ করিতেন এবং সেই গুলিকে বাঁচাইতে ও তাহাদের ফুল ফুটাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন কিন্তু অর্কিড সম্বন্ধে স্বল্প জ্ঞান হেতু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইত না। দূর হইতে ফুলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ফুল এবং ফুলগাছ লইবার বাসনা হৃদয়ে জাগিত, কিন্তু সে গুলি এমন নিবিড় বনের মধ্যে থাকিত যে তাঁহারা তথায় যাইবার সাহস করিতেন না। অরণ্যচারীগণের দ্বারা সে গুলি সংগ্রহ হইত। পয়সায় যতদূর হওয়া সম্ভব, তাহা হইত কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শন, অর্কিডগণ স্বভাবে কি রকমে আছে, কি প্রকারে প্রকৃতিরকোলে প্রতিপালিত হইতেছে তাহা দেখিয়া বিচার করিবার অধ্যবসায় ও একাগ্রতা ধনীগণের প্রাণে জাগিয়া উঠে নাই। যাঁহারা প্রকৃতির সকল সৃষ্টি রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটনে আগ্রহান্বিত সে আর এক সম্প্রদায়ের লোক। তাঁহাদের যে জীবনান্ত পণ; তাঁহারা সকল বৃক্ষ লতাদিকে তত্বতঃ জানিতে যাহা কিছু কষ্ট সহ্য করিতে হয় তাহা করিতেছেন এবং জন সাধারণে সেই তত্ব প্রচার করিয়া তাঁহাদের সৌন্দর্য্য উপভোগাকাঙ্খার তৃপ্তি সাধন করিতেছেন। জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সে কালের অর্কিড পালনে এবং একালে অর্কিড পালনে অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে। কেবল গ্রীষ্মাধিক্য হইলেই অর্কিড বাঁচে এ ধারণা সকলেরই মন হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে।

অন্যান্য গাছ পালার ন্যায় এ গাছ গুলিও মানুষের অশেষ প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদির ন্যায় সহিষ্ণু কে? ইহারা কত ঝড়, ঝঞ্ঝাবাত, তুষারপাত, করকাপাত, কত দৈবী আপদ মাথায় পাতিয়া লয়। কাটা, ছেঁড়া, দলা, মুড়ান প্রভৃতি জীব জন্তুকৃত কত উৎপাত সহ্য করে, তবু তাহারা মরিতে চায় না; মরিতে চায় না, মানুষেরই জন্য, জীবজন্তুরই জন্য, তাহাদেরই সুখ সম্ভোগের জন্য। বাঁচিয়া তাহাদের নিজের স্বার্থ কি তাহা আমরা বুঝি না—পরার্থে জীবন উৎসর্গ করার এমন দৃষ্টান্ত আর একটি নাই, পরার্থে বাঁচিয়া থাকিবার এত সহস্র চেষ্টা আর বুঝি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সংগ্রহকালে অর্কিড গাছ গুলির উপর কতই না অত্যাচার হয়, পথে আসিবার কালে খাদ্য পানীয় অভাবে কতই না অভাব সহ্য করে, কত প্রকারেই না দলিত, কর্ত্তিত, ছিন্ন হয়, তবুও বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের যে সহস্র প্রাণ। তাই আজ আমরা কত শত উদ্যানে সহস্র সহস্র অর্কিড ফুটিয়া আছে দেখিতে পাই। অর্কিডের আবাস ভূমি উষ্ণ প্রদেশে, তাহারা আর্দ্র জল হাওয়ায় বর্দ্ধিত হয়।

এই আর্দ্রতা ও উষ্ণতার সমতা রক্ষা করিতে পারিলেই তাহাদিগকে বাঁচিবার মত অবস্থায় আনা হইল।

এক্ষণে ইংলণ্ড এমন কি সমগ্র ইউরোপের লোকের অর্কিড পালনের দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িয়াছে। ঐ সকল দেশের লোক আমাদের দেশের মত নহে, তাহারা পাঁটাকাটা কতক কতক শিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না। তাহারা যাহা কিছু করিবে তাহার চূড়ান্ত করিতে চায়। তাহাদেরই প্রযত্নে আজ কাল অর্কিড পালনের বহুতর উন্নতি বিধান হইয়াছে এবং ক্রমশঃ অর্কিড পালনের ঠিক ঠিক কৌশল গুলি লোকে জানিতে পারিতেছে। বিভিন্ন অর্কিডের জন্মস্থানের সঠিক ইতিবৃত্ত লোকে জানিতেছে। কি প্রকার পদার্থের উপর জন্মিয়া তাহারা ঈদৃশ ফুল প্রসব করিতেছে তাহার সবিশেষ খবর পাইতেছে। উহাদের গোড়া দিয়া জলপ্রবাহ চলিবে অথচ গোড়ায় জল বসিবে না, স্থানটি ছায়াযুক্ত হইবে, আবহাওয়া গরম অথচ আর্দ্র হইবে। এই কয়টি অবস্থার কোন ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহারা যেন বাঁচিতে নারাজ হয়। তাহারা যে ছায়ার গাছ, ছায়ায় জন্মিতে, ছায়ায় বর্দ্ধিত হইতে ভাল বাসে। আর্দ্রতা তাহাদের প্রাণ। দেখ না আসাম ও নেপালের বিজন অরণ্যে তাহারা কেমন ফুল সাজে সজ্জিত হইয়া বড় বড় বৃক্ষগাত্র আলিঙ্গন করিয়া সগর্ব্বে অবস্থান করিতেছে। মানুষ সেখানে কদাচিৎ যায়, সে যে অতি নিভৃত প্রদেশ। সূর্য্য রশ্মি অতিকষ্টে সে বনের ভিতর প্রবেশ করে। মধ্যাহ্ন সূর্য্যকর বায়ু সাহায্যে কোন গাছের মাথা নোঙাইয়া, কোনটির ডাল সরাইয়া, কোন লতাকে দোলাইয়া অতি সাবধানে সে রাজ্যে প্রবেশ করে। সে বুঝি গন্ধর্ব্ব, কিন্নরের রাজ্য, তাহাদের লীলাভূমি, তাহাদেরই জন্য বৃক্ষ লতার এত সাজসজ্জা, এত পুষ্প মেলা। দেখনা, সলিল কণা সম্পৃক্ত বাতাস তাহাদের কেমন প্রিয়। যে গাছটি জলের ধারে জন্মিয়াছে, যেটি জলের ধারে, নির্ঝরিণী বা পার্ব্বতীয় স্রোতস্বিনীর বা হ্রদেরধারে হেলিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে সেই গাছেই তাহারা আশ্রয় লইতে ভালবাসে। অর্কিড জীবন যখন গরম ও আর্দ্রতাতিশয্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে তখন আমরা হিমালয়ের তরাই, আসাম, বঙ্গদেশ, মালয় এবং পূর্ব্ব-ভারত দ্বীপপুঞ্জের জঙ্গল ভিন্ন পৃথিবীর কোথায় আর অর্কিড দেখিতে পাইব? এই সকল জায়গার আবহাওয়া অর্কিডের মনের মত গরম অথচ শৈত্যে ও আর্দ্রতায় তাহার প্রাণারাম দায়ক। হিমালয়ের অনুচ্চগাত্রে, নাতি উন্নত শৈলমালায় মেঘের সহিত অর্কিডগণ একত্র বসতি করে এবং মেঘের অহরহ জলীয় বাষ্প সংস্পর্শে তাহারা সতেজে সোৎসাহে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও ইরাবতী নদীর শৈল শাখা সমূহের ধারে কত শত শত অর্কিড তাহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া আছে, কেন না এই সকল ভূভাগ গরম অথচ আর্দ্র। ভারতের

সমতল ভূভাগে অর্কিড নাই বলিলেই হয় ; কি করিয়া তাহারা এখানে থাকিতে পারে তাহারা এখানে গরম পায় ত আর্দ্রতা পায় না। তাহাদের সমকালে গরম ও আর্দ্রতা দুই যে চাই। গ্রীষ্ম প্রধান স্থানে আর্দ্রতার অভাব হইলে কিম্বা আর্দ্র শীত-প্রধান স্থান এই দুই তাহাদের বাসের অযোগ্য। তাহাদের স্বভাব জানা গেলেই তাহাদের অভাব মোচনের একটা কৌশল করিয়া লওয়া যায়। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমি অর্কিড পালন, তাহাদিগকে গামলায় বসান, তাহাতে জল সেক, তাহাতে সার প্রদান প্রভৃতি পালন বিধির পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

সরকারী কৃষি সংবাদ

বঙ্গে পাটের আবাদ—১৯১৪—

প্রথম বিবরণী—বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসাম সর্ব্বত্রই পাটের আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। এক্ষণে আর পাট চাষের জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য পুলিস্ কর্ম্মচারীগণের উপর নির্ভর করা হয় না। চৌকিদারী ইউনিয়নের পঞ্চায়েতগণের দ্বারা পাটের আবাদী জমির হিসাব সংগ্রহ করা হইতেছে। তাঁহাদের আনুমানিক হিসাব স্থানীয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষগণ দ্বারা বিশেষ ভাবে যাচাই করা হইবে।

বঙ্গদেশে পাটের আবাদী জমি বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ২·৯, বিহার ও উড়িষ্যায় ৩·৫, আসামে ৫·৫। আসামে পাট চাষ খুব বাড়িতেছে। নিম্নলিখিত তালিকায় বিগত দুই বৎসরের তুলনায় ফল দেখান হইল—আবাদী জমির পরিমাণ কত একর বাড়িয়াছে তাহা বুঝা যাইতেছে।

	১৯১৩	১৯১৪	বৃদ্ধি
বঙ্গদেশ ...	২,৭৬৬,১৬৬	২,৮৪৬,৩৬১	৮০,১৯৫
বিহার ও উড়িষ্যা ...	৩১৮,৪০০	৩২৯,৬০০	১১,২০০
আসাম ...	৯৬,৯৯০	১০২,৩১৪	৫,৩২৫
	৩,১৮১,৫৫৬	৩,২৭৮,২৭৬	৯৬,৭২০

বিগত বৎসরের পুরাতন পাট অতি অল্প মাত্রই মজুত আছে।

এক্ষণকার অনুমান মত ১১০ লক্ষ হইতে ১১৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে।

পাটের আবাদী জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, পুলিশকে পাটের জমীর খবর যে চৌকিদারগণ যোগাইত এক্ষণে পঞ্চায়তগণকে

তাহারাই হিসাব যোগাইবে। সুতরাং খবর তখনও যেমন অনিশ্চিত এখনও তদ্রুপই হইবে। নানা কাজে জড়িত অবৈতনিক পঞ্চায়েতগণ কর্ত্তৃক চৌকিদার গণের খবর পরতাল করা কখন সম্ভবপর নহে। সেই জন্য যে কোন আবাদী জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা এবং তাহাদের প্রদত্ত গণনার উপর নির্ভর করা অনেক সময় সুবিবেচনার পরিচায়ক নহে।

আবহাওয়া ও শস্যের অবস্থা—

১৫ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত যে খবর পাওয়া গিয়াছে :—

বঙ্গদেশ—

উচ্চ জমির সব্জী লরিয়া ধুন্দুল, বেগুন, ঢেঁড়স, পটল, কুমড়া, লাউ আদি ভালই জন্মিতেছে, পাট চাষের অবস্থা ভাল। আমন ধান রোপণ চলিতেছে এবং যাহা অগ্রে রোপিত হইয়াছে তাহা ভাল রকমই বাড়িতেছে।

আশুধান্য কাটা আরম্ভ হইয়াছে। নদীয়া ও যশোহরে ফসলে পোকার উপদ্রবের খবর পাওয়া যাইতেছে।

স্থানে স্থানে পাট তৈয়ারি হইয়া কাটিবার উপযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু খালে বিলে বেশী জল সঞ্চিত না হওয়া প্রযুক্ত পচাইবার অসুবিধা হেতু পাটকাটা বন্ধ আছে।

১২টি জেলা হইতে পশুরোগের কথা শুনা যাইতেছে।

চাউলের দর সামান্য বাড়িয়াছে।

উড়িষ্যা ও বিহারের—

সমগ্র দেশে বর্ষণ মন্দ হয় নাই।

ভাদুই শস্য পাকিয়া উঠিয়াছে এবং আহরণের সময় আসিয়াছে।

হৈমন্তিক ফসল আমন ধান রোয়া চলিতেছে। কেবল, পালামোউ, ভাগলপুরের কতক অংশে, গয়া এবং আঙ্গুলে জলাভাবে রোয়া কার্য্য সুচারু রূপে চলিতেছে না।

ক্ষেত্রস্থ শস্যের অবস্থা ভাল। চাউলের দর সামান্য চড়িয়াছে। গবাদির খাদ্যের ও পানীয় জলের কোথাও অভাব নাই। কিন্তু এ প্রদেশেও ১২টি জেলা হইতে গবাদির রোগের খবর পাওয়া যাইতেছে।

উড়িষ্যা করদ রাজ্যের চাষের খবর ভাল।

আসাম—

শ্রাবণ মাসের প্রথম পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়ায় ও অত্যন্ত গরম হেতু চাষের কার্য্যের ব্যাঘাত হইতেছিল। এখন বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে, কৃষির উন্নতি দেখা যাইতেছে। আমন ধানের ও চায়ের জন্য আরোও বৃষ্টির আবশ্যক।

আখের জন্ম পাইট হইতেছে। আমন ধান রোয়া চলিতেছে। আশুধান্ত কাটা এবং চার পাতা তোলা ও তৈয়ারি কার্য্য অগ্রসর হইতেছে।

গোয়ালপাড়া, সিলেট ও গাঁরোপর্ব্বতে পাট কাটা হইতেছে। ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে পাটে পোকা লাগিয়াছে, তাহাতে পাটের কিছু ক্ষতি হইবে।

চা চাষের অবস্থা এখন ভাল, আশুধান্য মন্দ জন্মায় নাই। চাউলের দাম কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে। পাঁচটি জেলা হইতে গবাদির রোগের কথা শুনা যাইতেছে।

দার্জ্জিলিঙ কলোনিয়াল হোম কালিম্পং ক্ষেত্রে মকাই—

এই ক্ষেত্রে মকাই (Maize) চাষের ক্রমশঃ উন্নতি দেখা যাইতেছে। ফলন উত্তরোত্তর বাড়িতেছে।

ফলন একর প্রতি

১৯০৯।১০	...	২১ মণ ২১ সের।	১৯১১।১২	...	৩০ মণ ৯ সের
১৯১০।১১	...	২৭ ,, ২৫ ,, ।	১৯১২।১৩	...	৩৩ ,, ৮ ,,

বীজ নির্ব্বাচন হেতু এত ভাল হইতেছে।

এখানে মার্চ মাসের ২০শের মধ্যে মকাই বোনা হয়, সেপ্টেম্বর মাসের মাঝা মাঝি ফসল আহরণ হয়।

একর প্রতি ২৫ সের বীজ বপন করা হইয়া থাকে। বীজের পরিমাণ কিছু অধিক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এত অধিক বীজ বোনা হয় তাহা বুঝিলে কোন দোষ ধরা যায় না। ক্ষেতে চারা বাহির হইলে প্রথমবার নিড়ানি করিবার সময় সতেজ চারা গুলি রাখিয়া রুগ্ন চারা গুলি উঠাইয়া ফেলা হয়।

কালিমপং ক্ষেত্রে ধান—

বিগতবর্ষে ১৯১২-১৩ সালে উক্ত ক্ষেত্রে মকাইয়ের ন্যায় ধান চাষও হইয়াছিল। তৌলি, দাসানী, মানসারী, কৃষ্ণভোগ, রাতোমারসী, রামতুলসী এই কয় প্রকার ধানের আবাদ হইয়াছিল। কৃষ্ণভোগ খুব মিহিধান, ইহার চাউল বড় লোকের খাইবার উপযুক্ত (Table rice)। ইহার ফলন ধান ৮ মণ ৩২ সের মাত্র কিন্তু খড় অন্য ধান অপেক্ষা অধিক হয় একরে প্রায় ৫০ মণ; তৌলির ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক একরে ধান ১৬ মণ ৩২ সের কিন্তু খড় ৩৩ মণ মাত্র। নিম্ন প্রদেশ অপেক্ষা ধানের ফলন কম বলিতে হইবে। একরে ৫০ মণ হিসাবে গোয়ালের সার প্রদান করিয়া কোন কোন ধানের উন্নতি হইয়াছে, আবার দুই একটি ধানের বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। তবে মোটের উপর তুলনা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে একর প্রতি ১ মণ ৪ সের ধান এবং

৩ মণ ৩০ সের খড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ফলন বৃদ্ধির সহিত লাভ সমানুপাত দৃষ্ট হয় না। সার ছড়াইতে খরচ হইয়াছে ৩৵ আনা, বৃদ্ধি ধান ও খড়ের মূল্য ৩৶১০ পয়সা, উদ্বৃত্ত ৴১০ পয়সা মাত্র লাভ।

কালিমপঙে ফলের বাগান—

বিলাতী ফলের গাছ যথা আপেল, আপ্রিকট, নেকটারিন, চেরী, কুল, পিচ, ওয়ালনট, কুরান্ট, গুজবেরী, সস্‌বেরী, ফিগ, আঙুর, পিয়ার প্রভৃতি বৃক্ষ ইংলণ্ড হইতে আনাইয়া রোপণ করিয়া দেখা হইয়াছে যে চেরী ও ওয়ালনট ছাড়া কোনটিই এখানকার জলহাওয়া সহনে সমর্থ নহে।

কমলা এখানে ভাল হয়। অষ্ট্রেলিয়া হইতে ১২টা কমলা গাছ আনিয়া রোপণ করা হইতেছে, সেগুলি বেশ বাড়িতেছে। আনারস এখানে সুন্দর হয়। কলা, লেবু, পেঁপেও বেশ জন্মায়, দেশী ন্যাসপাতি ও পীচ জন্মে বটে কিন্তু নিম্ন প্রদেশের মত ফল ভাল হয় না।

তৈল শস্যে মাটবাদাম—

মাটবাদামের চাষ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা হইতেছিল। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের দৃষ্টি পড়াতে মাটবাদাম চাষের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯১২-১৩ সালে ভারত হইতে মাটবাদামের রপ্তানি শতকরা ২৭ ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। অন্যান্য তৈল শস্যের আমদানী বরং কমিয়াছে। আমেরিকা হইতে তিসি ও তুলা বীজ বা তৈল প্রচুর রপ্তানি আরম্ভ হওয়ায় ভারতের রপ্তানি কমিয়াছে।

অন্য তৈল শস্যের রপ্তানির তুলনায় মাটবাদাম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে ভালজাতীয় মাটবাদামের চাষের প্রবর্ত্তন হওয়ায় ইহার চাষের প্রসার বাড়িয়াছে। বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ এবং যুক্ত প্রদেশে এখন ইহার চাষ রীতিমত আরম্ভ হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে ইহার তৈল, ঘৃতের পরিবর্ত্তে ব্যবহার হইতেছে। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ডিরেক্টারের রিপোর্টে জানা যায় যে, বিগত ৫ বৎসরের মধ্যে মাটবাদাম চাষের এত বিস্তার হইয়াছে। চাষীরা ইহার মূল্য বুঝিয়া ইহার চাষে আগ্রহান্বিত হইয়াছে।

মাটবাদাম চাষে আর একটি শুভলক্ষণ এই যে, দ্বিদল শস্য হিসাবে ইহার চাষে জমির উর্ব্বরতা বাড়ে এবং ইহারা জমিতে নাইট্রোজেনের মাত্রাবৃদ্ধি করে। বোম্বাই প্রদেশের সাতারা জেলায় ও মহিসুরে মাটবাদামের ক্ষেতে তৎপরবর্ত্তী শস্যের ফলাফল দেখিয়া তাহা নিসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রাবণ, ১৩২১ সাল।

যৌথ ঋণদান সমিতি

আধুনিক সময়ে পাশ্চত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের শাসনকর্ত্তা এবং জন নায়কগণ যে সমুদয় সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তন্মধ্যে যৌথ ঋণদান সমিতির ন্যায় কোনটিই এত সুফল প্রসব করে নাই। কিন্তু ভাবিতে গেলে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের পূর্ব্বে জর্ম্মনি, সুইজরলণ্ড, ইতালি, আয়রলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের গ্রাম্য সমাজের মধ্যে যৌথ ঋণদান সমিতি বিশেষ পরিচিত অনুষ্ঠান হইলেও ভারতবর্ষে ইহার প্রবর্ত্তন অধিক দিন হয় নাই। যে সময়ে লর্ডরিপণ এতদ্দেশের রাজ প্রতিনিধি ছিলেন, তৎকালে সার উইলিয়াম্ ওয়েডারবর্ণ ভারতীয় কৃষক সমূহের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য কৃষি-ব্যাঙ্ক বিষয়ক একটি প্রস্তাব ভারত গভর্ণমেণ্টে পেশ করেন। তাহা ভারত গভর্ণমেণ্ট দ্বারা অনুমোদিত হইলেও ষ্টেট সেক্রেটারি মঞ্জুর করেন নাই। তৎপরে কতিপয় বৎসর এসম্বন্ধে আর বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। প্রায় ১৫ বৎসর এইরূপে চলিয়া যাওয়ার পর মান্দ্রাজের গভর্ণর লর্ড ওয়েনলক্ মিঃ নিকল্‌সনকে (এক্ষণে স্যর ফ্রেডেরিক নিকল্‌সন্) কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য নিয়োগ করেন। অনেক তথ্য সংগ্রহের পর নিকল্‌সন্ সাহেব সুবৃহৎ বিবরণীতে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে যৌথ ঋণদান সমিতি প্রবর্ত্তন ভিন্ন ভারতীয় কৃষককে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিবার অন্য কোন উপায় নাই।

লর্ড কার্জ্জনের অপর যাহাই দোষ থাকুক না কেন ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, তিনি কখন দীর্ঘ সূত্রতার প্রশ্রয় দাতা ছিলেন না। যখন লর্ড কার্জ্জনের মনে ইহা ধারণা হইয়াছিল যে ভারতীয় কৃষকবৃন্দের সাধারণ অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা অত্যাবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে তিনি তখনই তদ্বিষয়ে

কোন না কোন ব্যবস্থা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ইহার ফলে ১৯০১ সালে দুর্ভিক্ষ নিবারণের এবং দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইতে রায়তগণকে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। কমিশন স্পষ্টতঃ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে কৃষক সমাজের মধ্যে যৌথ চেষ্টা একান্ত আবশ্যক এবং যতদিন সম্মিলিত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে কৃষকের নৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন না হয় তত দিন তাহার আর্থিক অবস্থার উন্নতির কোন স্থায়ী সম্ভাবনা নাই। ইহার পরেই আবার স্যার ফ্রেডরিক নিকল্‌সনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত কমিটির পরামর্শ অনুসারে ১৯০৪ সালে যৌথ ঋণদান সমিতি বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয়। আট বৎসর এই আইন অনুসারে কার্য্য হইবার পর জনসাধারণ এবং শাসনকর্ত্তাগণ বুঝিতে পারেন যে, উক্ত আইনে এমন কতকগুলি ধারা আছে যাহা যৌথ কারবারের পক্ষে দেশকাল ও পাত্র হিসাবে অনুকূল নহে। সুতরাং ১৯১২ সালে ১৯০৪ সালের আইনের পরিবর্ত্তে আর একটি নূতন আইন জারি হয়। এই আইনই বর্ত্তমান সময় চলিতেছে।

সংক্ষেপতঃ এতদ্দেশে যৌথ ঋণদান সমিতির ইতিহাস এইরূপ। ঋণদান সমিতি গঠনের প্রথা, "রেফিসিন্" "সুলজ্ ডেলিজস্," "লুজাটি" প্রভৃতি বিভিন্ন আদর্শের সমিতির বিভিন্নতা, কিম্বা ঋণদান বিষয়ক আইনের সমালোচনা আমরা এস্থলে করিব না। মূলতঃ এই যৌথ উদ্যমের ফলে সাধারণ কৃষক সমাজের কি পরিমাণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহাই আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য।

দশ বৎসর পূর্ব্বে বহুদূর ব্যবধানে মোটে ২।৪ টি ঋণদান সমিতি ছিল। বর্ত্তমান সময়ে সমিতি সমূহের সংখ্যা প্রায় বার হাজার, সভ্যের সংখ্যা ছয় লক্ষ এবং মূলধনের পরিমাণ ৫ কোটির অধিক টাকা। ভাবিয়া দেখিতে গেলে ইহা বড় সামান্য ব্যাপার নহে। যে দেশের ব্যক্তি ভাবে ধরিলে কৃষক একবারেই নিঃস্ব বলিলেই হয় সে দেশে কৃষি অথবা কৃষি সম্পর্কীয় কার্য্যের জন্য এত মূলধন সংগৃহীত হওয়া সহজ বিষয় নহে। ইহা কেবল সম্মিলিত উদ্যম ও দায়ীত্ব স্বীকারের ফল। আমাদের দেশের কৃষক নিঃস্ব কেন? এবং কৃষি-কার্য্যে গ্রাসাচ্ছাদন ভিন্ন কৃষকের আর কোনও বিষয়ে সংকুলান হয় না কেন? ইহার মূলে প্রধানতঃ দুইটি কারণ নিহিত আছে (১) মূলধনের এবং (২) সঞ্চয় শীলতার অভাব।

অনেকস্থলে সাধারণ কৃষক বংশানুক্রমে ঋণের পর ঋণ করিয়া মহাজনের নিকট এরূপ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার আর ঋণ হইতে মুক্ত হইবার কোন আশা নাই। জমিত তাহার হস্ত হইতে অনেক দিবস চলিয়া গিয়াছে এবং

এক্ষণে জমির আয় প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে কেবল মজুরি মাত্র। যে স্থলে কৃষক এতদূর শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয় নাই সেরূপ স্থলেও তাহার সংসার সচ্ছল নয়। কারণ ফসলের আয় হইতে খাজনা প্রভৃতি দিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে সাধারণ কৃষক জানে না। হয় পূজা পার্ব্বণ, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে, কিম্বা অনাবশ্যকীয় সাজ সজ্জায় অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ফেলিয়া কৃষক আবার সেই পূর্ব্বকার ঋণ জড়িত অবস্থায় ফিরিয়া আইসে। ঋণ সাধারণতঃ মানুষের নৈতিক আদর্শকে হীন করিয়া দেয়। যাহার মনে ধারণা হইয়া গিয়াছে যে ২৪ টাকা সঞ্চয় করিলে তাহার ঋণের সামান্য অংশও শোধ হইবে না এবং সমস্ত ঋণ যে জীবনে শোধ করিবার আশা রাখেনা তাহার আর ঋণ মুক্ত হইবার ইচ্ছা আসে না। শতকরা ৩৩৲ টাকা সুদে টাকা ধার করিয়া সাধারণ কৃষি-কার্য্যের আয় হইতে সংসার নির্ব্বাহের পর মহাজনকে দেওয়ার টাকা থাকা সম্ভবপর নহে। যৌথ ঋণদান সমিতির অনুষ্ঠানে আর কিছু হউক আর না হউক অন্ততঃ কৃষকের প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, সে সঞ্চয়শীল হইলে কালক্রমে স্বাধীন হইতে পারিবে। ইহাও অনেক। এই আশাতে অনুপ্রাণিত হইয়া সে দ্বিগুণ উদ্যমে কার্য্য করিতে পারিবে।

ভারত গভর্ণমেন্ট যৌথ ঋণদান সমিতি সম্বন্ধে সম্প্রতি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে অল্পদিনের মধ্যে হইলেও এতদ্দেশে যৌথ সমিতির ভিত্তি স্থায়ীভাবে স্থাপিত হইয়াছে। নূতন সমিতি গঠনের জন্য আবেদনের বিরাম নাই এবং সমিতি গঠনের প্রস্তাব হইলেই দলে দলে লোক আসিয়া সভ্য হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই অল্প বিস্তর পরিমাণে সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং দেশীয় রাজ্য সমূহেও বিশেষতঃ মহীশূর ও বরদা এতদ্বিষয়ে অনেক পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে। অবশ্য ভারতের জন সংখ্যা হিসাবে ধরিতে গেলে বৃটিশ শাসিত ভারতে ৬ লক্ষ সভ্য কিছুই নয়, কিন্তু ইহাও ভাবিতে হইবে যে এত অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ লোকে যৌথ সমিতিতে যে এতটা আগ্রহ প্রকাশ করিবে তাহাও আশাতীত। সভ্যের সংখ্যা মোট ৬ লক্ষ হইতে পারে, কিন্তু যে পরিমাণ লোক এই সমুদয় সমিতি দ্বারা উপকৃত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা অনেক অধিক হইবে। সভ্যগণের পরিবার মণ্ডলী এবং সভ্য ব্যতীত অপর যে সমুদয় ব্যক্তি টাকার সুদের হার কম হওয়ার জন্য অধিকতর সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে সমুদয়ের হিসাব করিতে গেলে উপকার প্রাপ্ত ব্যক্তি বর্গের সংখ্যা ৬০ লক্ষের কম হইবে না। পাশ্চাত্য জগতের সুসভ্য দেশ সমূহের সহিত তুলনা করিতে গেলেও উন্নতি সামান্য বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশে প্রত্যেক বিশ হাজার কৃষি-জীবির মধ্যে একটি সমিতি

হইয়াছে। ইতালী এবং জর্ম্মণিতে ইহার অনুপাত যথাক্রমে ১৮ এবং ১২। পক্ষান্তরে আমাদের দেশে ইহা দশ বৎসরের ফল এবং অন্যান্য দেশে এতটা উন্নতি হইতে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী লাগিয়াছে।

সাধারণতঃ কৃষক যে হারে টাকা ধার পায় অর্থাৎ শতকরা ৩৩৲ এবং যে হারে সমিতির সভ্যগণ ঋণ পাইয়া থাকে অর্থাৎ শতকরা ৬৲ হইতে ১২৲ টাকা, এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য হিসাব করিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, কৃষক মণ্ডলী এমনই শুধু সুদের হারে বিশ লক্ষ টাকা বাঁচাইতেছে। কালক্রমে সম্মিলনের ফলে এবং যৌথ দায়িত্ব স্বীকারের প্রসারে যে এইরূপ লাভের মাত্রা বহু গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে তাহা বলা বাহুল্য। ইহাত গেল কেবল সুদের কথা। মূলধনের সচ্ছলতার হিসাবে কৃষক অধিকতর পরিমাণে উপকৃত হইয়াছে। ভাল চাষ, অবশ্য ভাল বীজ, সার, পাইট প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। সমস্তগুলিই অর্থ সাপেক্ষ। সময়ে অর্থাভাবে কিম্বা প্রয়োজন মত অর্থ না পাইয়া কৃষক আগে এই সমস্ত কার্য্য ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া কোন প্রকারে সম্পন্ন করিত মাত্র। এক্ষণে মূলধন সহজ লভ্য হওয়ায় সে সকল বিষয়েই ইচ্ছামত নির্ব্বাচন করিতে পারে। সরকারী কৃষি-বিভাগ সমূহকে আর এখন কৃষক সমাজে ভাল বীজ, কৃষিযন্ত্র, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইল না বলিয়া দুঃখ করিতে হইবে না। এই সমুদয় বিষয়ের প্রবর্ত্তনের প্রধান অন্তরায় ছিল কৃষকের অর্থাভাব। কৃষক সতন্ত্র ভাবে একা যাহা ব্যবহার করিতে পারিত না, যৌথ সমিতির অনুষ্ঠানে এখন পাঁচ জনে মিলিত হইয়া তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে। কেবল কৃষি-বিভাগ সমূহ যে সমুদয় সংস্কার সাধন করিতে চান সেগুলি অর্থকর হইলেই হইল। বস্তুতঃ প্রকৃত পক্ষে উত্তম জিনিষ কৃষক কখনই অবহেলা করে নাই। অনেক যৌথ সমিতি ইতিমধ্যেই সুলভ অথচ তেজস্কর সার, উন্নত কৃষি-যন্ত্র, উৎকৃষ্ট জাতীয় ষাঁড়, অধিক ফল দায়ী বীজ প্রভৃতি সভ্যগণের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতীয় কৃষির উন্নতির পথ বিস্তার করিতেছেন। ইহা হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে। যে দেশে তিন ভাগের মধ্যে দুইভাগ লোক কৃষিজীবি সে দেশে যৌথ সমিতির প্রসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে কৃষি-বিষয়ক উন্নতি যে অবশ্যম্ভাবী তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

যৌথ সমিতির প্রবর্ত্তনে যে শুধু কৃষকই উপকৃত হইয়াছে এমন নহে শ্রমজীবিগণ, মধ্য বিত্ত ভদ্রলোক সমূহ এবং সাধারণ ব্যবসায়ীগণও ইহা হইতে অনেক পরিমাণে উপকৃত হইয়াছেন অথবা হইতে পারেন। ১৯০৪ সালের আইনে প্রধানতঃ সুবিধাজনক হারে ঋণ সংগ্রহের জন্যই বিধান সমূহ গঠিত হইয়াছিল। ১৯১২ সালের আইনে যৌথ সম্মিলনের পরিসর অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত

হইয়াছে। সুতরাং শ্রম শিল্প উৎপাদন অথবা সাধারণ পণ্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য এখন যৌথ প্রথা অনুসারে সমিতি স্থাপিত হইতে পারে। সাধারণ যৌথ সমিতি যে সকল সত্ব ও সুবিধার অধিকারী এই সমুদয় সমিতিও তাহা পাইবে। অবশ্য সাধারণে এখনও পর্য্যন্ত এই নূতন বিধি অনুসারে অধিক সমিতি গঠন করিবার জন্য অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা যৌথ সমিতির প্রথায় অনুষ্ঠিত কয়েকটি কার্য্যের উল্লেখ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ১৯১২-১৩ সালে এতদ্দেশে ৯টি দ্রব্যাদির ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ৭টি মান্দ্রাজে ইহাদের মূলধন প্রায় ১ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা এবং সভ্যের সংখ্যা ৩২৫৫। অবশিষ্ট ২টি যুক্তপ্রদেশে। কলের কাপড়ের প্রভাবে আমাদের দেশে যে তাঁতের কাপড়ের ব্যবসায় লুপ্ত প্রায় হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। যৌথ প্রথায় সুত্র ক্রয় এবং উৎপাদিত বস্ত্রাদি বিক্রয়ের জন্য কুড়িটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অর্দ্ধেক বোম্বাই অঞ্চলে এবং অবশিষ্ট সমস্ত ভারতে। দুগ্ধ সরবরাহে, বস্ত্রাদি রঞ্জিত করার কার্য্যে, বাঁশ বেত্রাদির গৃহসজ্জা ও পিত্তলের বাসন প্রস্তুতে, চামড়ার কাজে, গৃহ নির্ম্মাণে, তৈল উৎপাদনে, শর্করা প্রস্তুতে এবং এমন কি জমিদারী পরিচালনেও যৌথ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে যৌথ প্রথা আরও অভিনব উদ্দেশ্য প্রযুক্ত হইতেছে। উক্ত দেশে ধান্য ও কাষ্ঠ বিক্রয় এবং পশ্বাদির জীবন বীমা বিষয়ক যৌথ সমিতিও দেখা দিয়াছে। সুতরাং যৌথ প্রথা অবলম্বনে যে কেবল কৃষকেরই উন্নতি হইয়াছে তাহা নহে। দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরই উপকারের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কিন্তু যৌথ প্রথার চরম হিত—লোক শিক্ষা। ঋণগ্রস্ত, অশিক্ষিত, পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণরত সাধারণ জনমণ্ডলী ইহার প্রভাবে ঋণমুক্ত, শিক্ষানুরাগী এবং সহানুভূতিশীল হইয়া উঠিতেছে। যে স্থলে সমিতির সভ্যগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ঋণের জন্য দায়ী সে স্থলে সকলেই মিতব্যয়ী এবং সঞ্চয়-শীল হইতে চেষ্টা করেন। সমিতির উদ্বৃত্ত লভ্যাংশ সভ্যগণের মধ্যে ভাগাভাগি হইবার বন্দোবস্ত না থাকায় কেহই স্বীয় উদর পূরণের অবসর পান না। বরং এই উপায়ে সঞ্চিত অর্থ সাধারণের উপকারের জন্যই ব্যয় হয়। ইহার মধ্যেই অনেক স্থলে যৌথ সমিতির উদ্যমে শিক্ষাবিস্তারের পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে যে অশিক্ষিত প্রৌঢ় ব্যক্তিগণ সমিতির কার্য্যে পূর্ণরূপে যোগদান করিবার জন্য এবং কাগজ পত্রাদি সহি করিতে সক্ষম হইবার মানসে জীবনের মধ্যাবস্থায়ও লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে পরিমাণ উন্নতি হইয়াছে তাহা কেবল ভবিষ্যতের অধিকতর উন্নতির সূচনা করিতেছে। যদি সমিতি বিস্তারের মাত্রা বিগত দশ বৎসরে যেরূপ

দাঁড়াইয়াছে যদি সেই হিসাবে ভবিষ্যতে চলিতে থাকে তাহা হইলে ইহা স্থির নিশ্চয় যে, আর অল্প সময়ের মধ্যেই কৃষক ও কৃষক সমাজের অনেক উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষিপ্রথা ও কৃষিকার্য্য হইতে লাভের মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। যে সমুদয় আর্থিক কারণে ভারতীয় কৃষক বিশেষ বিশেষ কৃষিজাত পণ্যে জগতের অন্যান্য উন্নতিশীল অর্থশালী জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পরাভূত হইতেছে, সে সমুদয় কারণ ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে থাকিবে এবং তখন বোধ হয় ভারতের শর্করা ভারতের তুলা প্রভৃতি দেশের অভাব মোচন করিয়া বিদেশীয় বাজারেও রপ্তানি হইতে পারিবে।

কৃষি-অবলম্বনে-স্বাধীন জীবিকা—দুই একর জমি হইতে কয়েক মাসে ৮০০ ডলার (২৪০০৲ শত টাকা) আয়—এক আমেরিকান বালকের বিদ্যোপার্জ্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। বালকের বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। সে বড়ই অধ্যবসায়ী। সে প্রথমে খবরের কাগজ বেচিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল, অবশেষে এক টুক্‌রা জমি কিনিল। জমিতে পেঁয়াজ ও অন্যান্য সজ্জী চাষ করিয়া কিছু পয়সা জমাইতে পারিল।

তখন তাহার কলেজে পড়িবার মত অর্থ সংগ্রহে বড়ই আগ্রহ জন্মিল। সে সহর হইতে ১০ মাইল দূরে দুই এক খণ্ড জমি পাইল। জমির দাম লাগিল ৫০০ ডলার (১৫০০ শত টাকা)। বালক সেই জমিতে চাষাবাদ আরম্ভ করিল। জমি হইতে বৎসরে একটি ফসল উঠাইলে চলিবে না, তাহাতে সে কত লাভ করিবে? জমি বিলি করিয়া দিলে তাহার লাভ কি হইবে? সে জমিতে যাইয়া তাঁবু খাটাইয়া বাস করিল, সেখানে থাকে, রাঁধে, খায়, আর সারাদিন যতক্ষণ না অন্ধকার হয় কাজ করে। বেশীর ভাগ জায়গাটায়ই সে পেঁয়াজ রোপণ করিল। কতকটা জায়গায় তরমুজ, খরমুজাদি, কিয়ৎপরিমাণ স্থানে আলু ও ভুট্টা চাষ করিল। পেঁয়াজ নিড়াইয়া পাতলা করিয়া দিবার সময় কিছু পরিমাণ পেঁয়াজ উঠাইয়া বেচিল। তাহাতে তাহার ৬০ ডলার (১৮০৲ টাকা) লাভ হইল। সময়ে জমিতে ৬০০ বুসেল পেঁয়াজ জন্মিল। বেশ ভাল পেঁয়াজই জন্মিয়াছিল। বাজারে সেই পেঁয়াজের বেশ আদর হইল। সে ১ বুসেল ২৲ টাকায় বেচিল। তরমুজ, খরমুজ, আলু, ভুট্টা হইতেও লাভ হইল।

পর বৎসর চাষ করিয়া তাহার কলেজে পড়িবার মত টাকারও অধিক সে পাইল। সহর বাজারের নিকট সজ্জী চাষ করিলে কি হইতে পারে ইহা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের দেশেও দুই শত বিঘা জমি লইয়া চাষ করিলে, যে কোন ব্যক্তি একটা মাঝারি রকম সংসার অনায়াসে প্রতি-

পালন করিতে পারেন। জমির অধিকাংশই উচ্চ সব্জী চাষের উপযুক্ত হওয়া চাই। বড় জোর ইহার ভিতর ১৫ বিঘা ধান জমি থাকিবে। ধান জমিতে ধান ছাড়া পাট কিম্বা কড়াই হইতে পারিবে। শসা চাষ ও ধান এক জমিতে সম্ভব। একা ৪।৫ খানা হাল ৫।৬ জোড়া বলদ না রাখিয়া চাষীদের সঙ্গে লইয়া চাষ করিলে আরও সুবিধা হয়। ৩০ বিঘা নিজের চাষের জন্য রাখা হউক, আর বাকী জমি চাষীদিগকে বিলি করা হউক। তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে; তাহাদিগকে সুবীজ যোগাইতে হইবে; ফসল হইতে তাহাদের লওয়া টাকার উপর যৎকিঞ্চিৎ লইয়া ঋণশোধ করিয়া লইতে হইবে; তাহাদের ক্ষেত হইতে সুবীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। হাজা শুকার জন্য কিছু শস্য ও অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ প্রথায় চাষ করিলে একটি ভদ্র পরিবারত প্রতিপালিত হইবেই, তৎসঙ্গে ৭।৮টি চাষী পরিবারেরও ভরণ পোষণ হইবে এবং চাষাবাদের জন্য কখনও জন মজুরের অভাব হইবে না। এখনকার দিনে পয়সা দিলেও মজুর মিলে না। মজুর সমস্যা সমাধান করার ইহা একটি বিশিষ্ট উপায় বলিয়া মনে করা উচিত।

পত্রাদি

কৃষি-পরীক্ষালয় ও কৃষিজ্ঞান বিস্তার—শ্রীনির্ম্মলকান্ত রায়, বেনারস সিটি।

কৃষক সম্পাদক মহাশয়,

মহাশয় আপনার ইতি পূর্ব্ব সংখ্যায় কৃষকে "কৃষিশিক্ষা, কৃষি-পরীক্ষালয় ও কৃষিজ্ঞান বিস্তার" প্রবন্ধ পড়িয়া যাহা আমার বক্তব্য তাহা নিম্নে লিখিতেছি,—

১। কৃষি বিশেষজ্ঞের এখানে উপকার না থাকার কয়টি কারণ আছে, বিলাতের শিক্ষা আমাদের উপযোগী হয় না, কারণ বিলাতে চাষ আবাদ কলে হয়, কাজেই বেশী জমীর আবাদ সম্ভবপর হয়, ভারতে তত জমি, তত মূলধন তত কলও এক সঙ্গে চলিত নাই কাজেই বিলাতের শিক্ষা এখানে কেবল পুঁথি গত বিদ্যা রূপে পরিণত হয়। আর যাহারা ঐ সমস্ত না বিবেচনা করিয়া বেশী জমির আবাদ করিতে জান তাহারা কেবল লোকসানের ভাগী হন। এই জন্য শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র দে মহাশয় যে আমাদের পক্ষে ২০ বিঘা জমির আবাদ যে (Extensive cultivation) বিস্তৃত আবাদ বলিয়া লিখিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সঙ্গত ও উপকারী। ঐরূপ আবাদে অভ্যস্ত হইলেও লোক জনের যোগাড় হইলে বেশী আবাদ করা উচিত, নতুবা না। কৃষিবিশেষজ্ঞেরা চাষাদের সঙ্গে মেশেন না। বাবুরা তাহাদের প্রয়োজন বুঝেন না।

২। সরকারী যে সকল কৃষি-শালা আছে তাহা এক স্থানে বদ্ধ থাকায়, এবং সরকারী কাজের সহিত প্রজাগণের সহানুভূতি না থাকায় ঐ সকল কৃষি-কার্য্য কেবল রিপোর্টের উপযুক্ত হয়, কার্য্যকারী হয় না। উহাদিগকে কার্য্যকারী করিতে হইলে, কৃষকদের জমির মধ্যে মধ্যে দুই চার বিঘা করিয়া সরকারী জমি রাখিয়া তথায় নানা রকম ফসল করিলে তবে প্রজারা উহার ফল দেখিয়া তাহার অনুকরণ করিতে পারে নতুবা কে সরকারী কৃষি-শালায় যাইয়া অত খবর লয়, আর খবর লইলেই বা কে পরীক্ষা করিতে চায়? কাজেই সরকারকে কৃষকের শাসনে ঐ পরীক্ষা করিতে হইবে। নতুবা সব চেষ্টা বিফল।

আমি প্রায় এখানকার কৃষিশালায় যাই কিন্তু দেখি কেহই বড় খবর রাখে না, বড় লোকেরা এক আধবার সখের জন্য জান, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখি না, আমাদের এখানে সমস্তই পুঁথিগত কার্য্য (Theoretical), হাতে হাতিয়ারে (Practical) অতি অল্প, তাই এত দুর্দ্দশা।

৩। আপনি পুস্তক প্রচার করিতে বলিয়াছেন—কিন্তু কয়জন পড়েন এবং কয় জনের পঠিত জ্ঞান কার্য্যে আসে? সকলেরই চাকরের উপর নির্ভর, চাকরেরা মামুলি স্বভাব ছাড়িতে চায় না। যথা একটী ভদ্রলোক সরকারি কৃষিশালায় দেখিয়া মেষ্টন লাঙ্গল (Mestons plough) খরিদ করিলেন—কিন্তু তাহার মালি নানা ওজর করায় তাহা কার্য্যে আসিল না। সেই দেখিয়া আমিও একটী খরিদ করিলাম, ছোট গরু দিয়া চালাইলাম—বেশ চলিল ও চলিতেছে, জমি ইহাতে এক চাষে যাহা হয় দেশী লাঙ্গলে ২ চাষে তাহা হয় না এই দেখিয়া যে ব্যক্তি আমার ক্ষেত্র চষিত সে ঐ রকম একটী লাঙ্গল খরিদ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল কিন্তু কার্য্যে হইল না। আমার জমির পাশে যাহারা চাষ করে তাহারা উহার উপকার উপলব্ধি করে। ক্রমাগত প্রচারের জন্য সাধারণের সম্মুখে প্রমাণ (Demonstration) করা চাই তাহাতে বেশি খরচ হইলেও ক্ষতি নাই।

৪। নৈশশ্রেণী খোলার বিষয় লিখিয়াছেন কিন্তু আপনি কি জানেন না যে আমাদের বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষা পুঁথিগত (Theoretical)—কেহ গা ঘামাইয়া হাতে হাতিয়ারে (Practical) কার্য্য শিখিতে চায় না। আজ কাল পাঠশালায় চাষের বই পড়ান হয়, তাহাতে ফসলের নাম, বপনের সময় আদি শিখান হয়, কিন্তু কয় জন গুরু মহাশয় ছেলেকে জমিতে লইয়া যাইয়া তাহা শিখান? কাজেই এখানে যে বিষয়েরই শিক্ষা দেওয়া হউক না কেন তাহা পুঁথিগতই থাকে ও কণ্ঠস্থ থাকে। অনেক বিএ ক্লাসের ছেলে কাঁটাল গাছ চেনে না। দোষ আমাদের শিক্ষার, আমাদের শিক্ষকের ও আমাদের স্বভাবের। ঐ স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে গেলে এইরূপে কার্য্য করা চাই।

(ক) পাঠশালা হইতে স্কুল অবধি সকল বিদ্যালয়ে যেমন পুস্তকালয় সংযুক্ত থাকে, সেই রূপ কৃষি ক্ষেত্র ও উদ্যান সংযুক্ত থাকা উচিত।

(খ) যেমন ছেলেদের ইংরাজি ব্যায়াম বা Gymnastic ও Drill শিখান হয় সেইরূপ সপ্তাহে এক দিন কি দুই দিন করিয়া কৃষি-ক্ষেত্রেও উদ্যান কার্য্য করান উচিত।

(গ) পরীক্ষার সময় ফুল পাতা, গাছ আনাইয়া পরীক্ষা করা উচিত।

যাহারা দেশে প্রকৃত ভাবে কৃষির উন্নতি ইচ্ছা করেন তাহাদের এই ভাবে সংবাদ পত্রে আলোচনা করা উচিত নতুবা সরকারের নজর পড়িবে না। বিদেশীয় গভর্ণমেণ্টকে নাড়াচাড়া না দিলে আমাদের অভাব না বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা আমাদের উপযোগী শিক্ষা দিবেন না। তাঁহারা তাঁহাদের দেশের মতনই সব ব্যবহার করিতে চান অতএব আমাদের দেশের যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহাদের ঐ বিষয়ে সাহায্য করা উচিত।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সকল শিক্ষাই Theoretical, Practical শিক্ষা অতি অল্প বা পরে হয়, কিন্তু ঐ দুই শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে যাইলে যেমন উপকার হয় তেমন পৃথক ভাবে হয় না। যেমন সাধারণ জ্ঞান উপার্জ্জন, নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা হইতে পৃথক হওয়া উচিত নয়, সেইরূপ সাংসারিক বিদ্যাশিক্ষা এবং কৃষিশিক্ষা পৃথক হওয়া উচিত নয়।

বিদ্যারম্ভের সঙ্গে ঐ সকল যত সঙ্গে সঙ্গে শিখান যায় তত ভাল, কারণ ছেলেদের হাতে কলমের শিক্ষা যত সহজ ও হৃদয়গ্রাহী হয়, মুখস্থ বিদ্যা তত হয় না।

পূর্ব্বে আমাদের গুরু গৃহে সকল শিক্ষাই এক সঙ্গে হইত। এখনকার টোলে কেবল পুঁথিগত বিদ্যা শিখান হয় বলিয়া আমাদের এখনকার টোলের ছাত্রগণ সেরূপ প্রখর বুদ্ধি হন না।

লেখক যে রকম শিক্ষা চান গবর্ণমেণ্ট স্কুল কলেজে এই কয়েক শিক্ষার উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে, যদি গভর্ণমেণ্টের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় তবে ভালই হইবে। কৃঃ সঃ

চাষের জমি—শ্রীগুণাভিরাম পাঠক, কল্যাণ।

মহাশয়,

বহরমপুরে যে জমীর কথা লিখিয়াছেন তাহা অনেকদিন বিলি হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় সেই জমিদারের এক মোক্তার ছিলেন তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা ধার্য্য হইয়া কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে।

মুর্গাছা—বোধ হয় মুর্গা, "মুর্গেছা" কথার অর্থ যামিনী বাবুর নিকট হইতে জানিয়া আপনাকে জানান যাইবে।

ধান ও ইক্ষুর সার—শ্রীআমেদ হোসেন গাণুটিয়া।

মহাশয়!

আমি নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি জানিতে বাসনা করি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আ গাম মাসের কৃষকে বাহির (প্রচার) করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি

১। ধান্য এবং ইক্ষু জমিতে প্রতি একরে হাড় এবং খইল কি হিসাবে মিশ্রিত করিয়া কত দেওয়া যাইতে পারে?

২। আদা এবং হলুদ বপনের পর কত দিন জমিতে রাখিলে ভাল হয়? তার পর গাছ শুকাইয়া আসিলে মাঘ ফাল্গুনে তোলা কর্ত্তব্য কি না?

ধান ও আখে সার—

উত্তর—ধানের জমিতে একর প্রতি ৩ মণ (ক) হাড়ের গুঁড়া ও ১০ সের সোরা কিম্বা (খ) ৬ মণ রেঢ়ীর খৈল সাররূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইক্ষু ক্ষেতেও (ক) ও (খ) দুই প্রকার সারই সম পরিমাণে প্রয়োগ বিধি। তবে জমির অবস্থা বুঝিয়া সকল সময়ই ব্যবস্থা করিতে হয়, জমি খুব তেজস্কর হইলে কিম্বা তাহাতে নূতন মাটি ছড়ান থাকিলে অল্প সারেও সমান ফলন দাঁড়াইতে পারে।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠে আদা বসাইতে হয়। মাঘ, ফাল্গুন মাসে গাছ শুকাইয়া আসিলে আদা, হলুদ ক্ষেত হইতে উত্তোলন করা কর্ত্তব্য।

ধানের নমুনা—শ্রীফণীভূষণ মজুমদার, ঝিনাদহ, যশোহর।

আপনাদের জানিত যে সমস্ত উৎকৃষ্ট চিকণ ও ভাল ধান্য (আউশ এবং আমন) আছে, তাহার প্রত্যেকের ½ তোলা পরিমাণ ধান্য অনুগ্রহপূর্ব্বক নমুনা স্বরূপ পাঠাইয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

এজন্য যদি কিছু মূল্য দেওয়ার দরকার হয় আমি তাহাও দিতে প্রস্তুত আছি। নমুনা স্বরূপ ধান্য পাঠাইয়া সেই সঙ্গে মূল্যের কথা লিখিলে আমি পত্রের মধ্যে ডাক টিকিট পাঠাইয়া দিব।

ভরসা করি ফেরত ডাকেই ধান্যের নমুনা পাঠাইয়া দিবেন। ইতি

৺নৃত্যগোপাল বাবুর পুস্তকে নিম্নলিখিত ধান্যগুলির বিবরণ দেখিলাম যদি এই ধান্যগুলি আপনাদের থাকে তবে তাহাও পাঠাইতে চেষ্টা করিবেন। বীজগুলি যাহাতে ভাল এবং তাজা হয় তাহা দেখিয়া দিবেন।

১। কাটারি ভোগ। ২। বাদসা পছন্দ। ৩। কর্পূর কাত। ৪। রাণী পাগল। ৫। রাঁধুনী পাগল। ৬। কেলে-জিরে।

মহাশয়,

আপনি যে সকল ধানের নমুনা চাহিয়াছেন তাহার অধিকাংশের চাষ এতদঞ্চলে হয় না। ডায়মণ্ড হারবারের নিটবর্ত্তী স্থানে হইয়া থাকে। কেলে জিরে, রাঁধুনি পাগল, কর্পূরকাত ও কাটারি ভোগ ধানের বীজের নমুনা পাওয়া যাইতে পারে। ½ তোলা, ধান-বীজের নমুনা হয় না। অন্ততঃ অর্দ্ধ পোয়া হিসাবে প্রত্যেক নমুনা সংগ্রহ না করিলে বালকের খেলার মত আধ তোলা লইয়া কোন লাভ দেখা যায় না। বীজ জন্মাইয়া তাহা হইতে ভাল বীজ বাছাই করিয়া লইয়া রোপণ করিলে কিছু অধিক বীজ লইয়া পরীক্ষা আবশ্যক। নতুবা পরীক্ষার ফলাফল স্থির হওয়া অসম্ভব।

নূতন উঠিত জমি—পঞ্জাবের কৃষিবিভাগের ডিরেক্টার খালের ধারে নূতন উঠিত জমিতে ত্রিবিধ পরীক্ষার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, নিম্নবারি দোয়াব খালের তীরভূমিতে কেবল উৎকৃষ্ট আমেরিকার তুলার বীজ বুনিয়া দেখা যাউক—কেমন তুলা জন্মে—ফসল কেমন হয়। এ দেশে কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে লম্বা আঁশ তুলার সাদর বাড়িতেছে—বিদেশ হইতে তুলার আমদানী করিতে হইতেছে। তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে কাজ হইলে অনেক তুলা উৎপন্ন হইত। কিন্তু ভারত-সরকার এ প্রস্তাবে সম্মতি দেন নাই। বোধ হয়, সরকার ভাবিয়াছেন—যাহারা এই সব জমি উঠিত করিবে, তাহাদিগকে কোন এক প্রকার চাষে বাধ্য করা সঙ্গত হইবে না; বিশেষ এ ক্ষেত্রে এই চাষের ফল অনিশ্চিত। ডিরেক্টারের দ্বিতীয় প্রস্তাব—সুবিধামত স্থান দেখিয়া ৫০ হাজার একার জমিতে ইক্ষুর চাষের ব্যবস্থা করা হউক। কৃষকদিগকে এইরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হইবে যে, সরকার হইতে চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদিগকে বিশেষ ব্যবস্থায় সেই কলে ইক্ষু দিতে হইবে। ইহাতে একটি বড় বা অনেকগুলি ছোট ছোট কল চলিতে পারে। এই প্রস্তাব রাজস্ব কমিশনার মঞ্জুর করিয়াছেন। ডিরেক্টার মহাশয়ের তৃতীয় প্রস্তাবটি সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য। তিনি বলেন, এই সকল বাসোপযোগী উঠিত জমির এক-পঞ্চমাংশ গোচর করিয়া রাখা হউক। তাহা হইলে নূতন রায়তেরা কৃষিকার্য্যের উপযোগী গবাদি পশু সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিবে, আর সঙ্গে সঙ্গে গো-চরের সুবিধা ও সরকারের সাহায্য পাইলে তাহাদিগের যত্নে গবাদি পশুর বিশেষ উন্নতি হইবে। বর্ত্তমানে এই সকল পশুর অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে ডিরেক্টার মহাশয়ের এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে বিশেষ উপকার হইবে।

মাখন সংরক্ষণ—যাঁহাদের গো-শালা আছে তাঁহাদের জানিতে হইবে যে, কিসে মাখন বা দুগ্ধ অধিক কাল অবিকৃত রাখা যায়। সাধারণতঃ গ্রীষ্মঋতুতে প্রচুর পরিমাণে মাখন পাওয়া যায় এবং শীতকালে অল্প হয়। এজন্য গ্রীষ্মঋতুতে উৎপন্ন মাখন শীতকালে ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। যদি মাখন প্রস্তুত কালে কোনরূপ দোষ না হয় এবং মাখন বেশ বিশুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে এই সঞ্চিত ও পরিরক্ষিত মাখনের গুণের কোন ব্যত্যয় হয় না; কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় এই সঞ্চিত মাখনের অধিকাংশ হইতেই কয়েক মাস পরে একরূপ অস্বাভাবিক গন্ধ নিঃসৃত হয়। ইহাতে ইহার গুণ ও মূল্য বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়া থাকে। টাট্‌কা অবস্থায় মাখন হইতে আদৌ কোনরূপ গন্ধ নিঃসৃত হয় না। এমন কি

সভজাত মাখন অতিশয় অবিশুদ্ধ হইলেও তাহা হইতে সুগন্ধই নিঃসৃত হয়, কিন্তু ৩ ৪ মাস পরে এরূপ বিশ্রী গন্ধ বাহির হয় যে, তাহা বাজারে কিছুতেই বিক্রীত হইতে পারে না। লবণ মিশ্রিত করিয়া রাখিলে কিম্বা মাখন হইতে যন্ত্র সাহায্যে জলীয় ভাগ দিয়া জমাইয়া লইতে পারিলে মাখন অধিক দিন রাখা যায়।

পঞ্জাবে তুলার চাষ—ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলার চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অনেকে অনুমান করেন যে রীতিমত যত্ন ও চেষ্টা করিলে অল্পদিনের মধ্যেই ভারত হইতে ১ কোটি গাঁইট আন্দাজ তুলা উৎপাদিত হইতে পারিবে। আন্তর্জাতিক তুলা ব্যবসায়ীগণের সম্মিলনী এতদ্দেশে কার্পাস চাষের পরিসর বৃদ্ধির মানসে সম্প্রতি পঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ২২৫০০ বিঘা পরিমাণ জমি গ্রহণ করিয়াছেন। জমি বারিদোয়াব নামক স্থানে অবস্থিত এবং কোম্পানি উহা ২০ বৎসরের জন্য জমা লইয়াছেন। অপরাপর প্রজাগণ যে হিসাবে কর দিয়া থাকে, কোম্পানিকেও সেই হিষাবে কর দিতে হইবে, তবে কোম্পানির সহিত বিশেষ সর্ত্ত এই যে ২০ বৎসর পরে উক্ত জমি তাঁহাদিগকে আর বিলি করা না হইলে গভর্ণমেণ্ট কোম্পানি দ্বারা প্রস্তুত ইমারতাদি সমস্ত উচিত মূল্যে ক্রয় করিয়া লইবেন।

এই বিস্তৃত তুলাক্ষেত্র বিলাত হইতে আনীত প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং ৯ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটি বিশেষ কোম্পানি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। কেবল মার্কিণ জাতীয় তুলারই এস্থলে চাষ হইবে এবং যাহাতে অন্য কোন জাতীয় তুলা ইহার সহিত মিশ্রিত না হয় তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে। এ জাতীয় তুলা এখনও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে চাষ হয় কিন্তু তাহার মাত্রা খুব কম। প্রস্তাবিত ক্ষেত্র পূর্ণরূপে কর্ষিত হইলে উৎপাদিত তুলার পরিমাণ আটশত হইতে এক হাজার গাঁইট হইবে এবং মূল্যও প্রায় ২ লক্ষ টাকা হইবে। কিন্তু কোম্পানি শুধু লাভের জন্য এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না; তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলা চাষের পদ্ধতি কৃষকবর্গ শিক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তুলা উৎপাদন করিতে থাকিবে। যে জাতীয় তুলা পরীক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহা হইতে যে উত্তম ফল পাওয়া জাইবে তাহা আশা করিতে পারা যায়, কারণ আজ পর্য্যন্ত যে বার জাতি পরিক্ষীত হইয়াছে তন্মধ্যে এই জাতীয় তুলাই অধিকতর রোগ সহিষ্ণু বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যাহা হউক এত মূলধন লইয়া ও এরূপ বিশেষজ্ঞের সাহার্য্যে এতদ্দেশে এ পর্য্যন্ত তুলা চাষ হয় নাই। সুতরাং আমরা আশা করি বর্ত্তমান চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে সফল হইবে।

সার-সংগ্রহ

মধ্য-ভারতে ও মধ্যপ্রদেশে খেজুর গুড়*

"বঙ্গবাসীতে" শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত প্রবন্ধে, মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশে খেজুরগাছ হইতে গুড় চিনির ব্যবসা চলিবার সম্ভাবনা নাই, এই কথা লিখিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যৌথ প্রণালিতে খেজুর গুড়ের কারবার চালাইবার ব্যবস্থা আমিই করিয়াছিলাম। সে কার্য্য ২।৩ বৎসর চলিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। যৌথ কার্য্য বন্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমরা নিজে যে গ্রামেতে চাষবাস করি, সেখানে বিস্তর খেজুর গাছ থাকায়, তাহা হইতে আমরা প্রায় প্রতি বৎসরেই খেজুর গুড় ও কখনও কখনও চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকি। যৌথ কারবার ১৮৯৯ সালে আরম্ভ করা হইয়াছিল। এদেশের ধনবান্ লোক ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিগণ এই নূতন প্রণালীতে গুড় চিনি প্রস্তুত করা সম্ভাবিত নয় মনে করিয়া, ঐ যৌথ কার্য্যে যোগদান করেন নাই। সুতরাং যৌথ কারবার বন্ধ হইয়াছিল। তথাচ, গ্রামে গ্রামে এ কার্য্য প্রচলিত হইলে, এ দেশের কৃষকেরা পূর্ব্ব বাঙ্গালার কৃষকদিগের মত, চাষ ও খেজুর গুড়ের ব্যবসা অবলম্বন করিয়া উন্নতি সাধন করিতে পারিবে বিবেচনা করিয়া, আমি আজ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে ও চিন্তাতে বিশেষ মনোযোগের সহিত নিযুক্ত আছি। মধ্যপ্রদেশ ইংরেজ-শাসনাধীন। সেখানে গ্রামের অধিকারিগণকে মালগুজার বলে। সচরাচর তাহাদের ও কৃষক-দিগের অবস্থা উন্নত নয়, এবং নূতন প্রচলিত কার্য্যে তাহাদের আদৌ শ্রদ্ধা বা মনোযোগ হয় না। সেই জন্য আমি কয়েক বৎসর হইতে মধ্য ভারতে রাজাদের দরবারে এই প্রকার প্রার্থনা করিতেছি যে, দরবার হইতে খরচ করিয়া স্থানে স্থানে প্রদর্শন-ক্ষেত্র স্বরূপ (Demonstration farm) খেজুর গুড় ও চিনি প্রস্তুতের প্রণালী ব্যবস্থাপিত করা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। কেন না, তাহা হইলে এদেশীয় কৃষি ও শ্রমজীবী লোকসকল এই নূতন কার্য্যপ্রণালী দেখিতে দেখিতে শিক্ষিত হইতে থাকিবে। তাহাতে এ দেশের অত্যন্ত মঙ্গল ও গ্রামসমূহের মঙ্গল সাধন হইবে, কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ পর্য্যন্ত মধ্যভারতের রাজকীয় দরবার এ বিষয়ে কোন লক্ষ্য বা ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন না।

---

* খেজুরগুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া তাহার ব্যবসায় চলিতে পারে কি না একথা অনেকে প্রশ্ন করেন। বাঙ্গালা দেশে ও ভারতের অন্যত্র খেজুর গাছ অযত্নে জন্মে তাহাদের পালন করিবার জন্য বিশেষ কোন ব্যয় বা পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না, এই জন্য লোকের খেজুর গুড়, চিনি ব্যবহারের দিকে এত ঝোঁক। আমরা এ স্থলে বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত প্রবন্ধটি অনুসন্ধিৎসুগণের পাঠনীয় বলিয়া পুনঃ প্রকাশিত করিলাম। কৃঃ সঃ

উল্লিখিত ঘটনা সকল হইতে যদ্যপি কেহ এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন যে, এতদ্দেশীয় খেজুর গাছ হইতে রস নির্গত হয় না কিম্বা ভাল গুড়চিনি হয় না, তাহা অত্যন্ত ভ্রম। আমি এ কথা জানিতাম না যে, শীতকালে এদেশের খেজুররস গেঁজে ঘোলা হইয়া যায়; অল্পদিন মাত্র পরিষ্কার থাকে, সুতরাং এদেশে খেজুর-গুড়ের ব্যবসা করিয়া কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই; এ কথাও সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক ও কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া লেখা হইয়াছে। আমি যৌথ কারবার খুলিবার পর ইন্দোর দরবার, এ কার্য্যে প্রকৃত লাভ হইতে পারে কি না দেখিবার জন্য, মোরদ নামক একটি গ্রামে প্রদর্শনক্ষেত্র খুলিয়াছিলেন এবং আমাকেই ঐ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ১৯০২ সালের শীতকালে নদীয়া হইতে ১১ জন শিউলি আনাইয়া আমি ঐ প্রদর্শনক্ষেত্রে যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছিলাম। মোরদ গ্রামে প্রায় ৮।১০ হাজার খেজুরগাছ আছে। তাহা হইতে প্রায় ১২০০ গাছের মহলে আমি কার্য্য চালাইয়াছিলাম। ঐ সমস্ত খেজুর বন জঙ্গল ও ঘাসে পরি-বেষ্টিত। গাছের তলায় জমিতে কখনও চাষ দেওয়া হয় না। পূর্ব বাঙ্গালায় কৃষকেরা এবং জমিদারগণ রীতিমত খেজুর চারা বপন করিয়া খেজুরের মহল প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু এদেশে স্বভাবজ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যে সকল খেজুরবন গ্রামে গ্রামে বিদ্যমান আছে এদেশের লোক তাহার উপযোগিতা না জানায় ঐ খেজুরবনসমূহের কোনও আদর নাই ও রক্ষণাবেক্ষণ নাই; এবং জমি চাষ করা দূরে থাক, গর্ম্মিকালে খেজুর গাছ সকল হইতে লোকে পাতা কাটিয়া লইয়া থাকে, সেজন্য খেজুরগাছ বলহীন হইয়া যায়। তথাচ এই প্রকার গাছ হইতে আমি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রস নির্গত করিয়া গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিয়াছি। তাহা বাঙ্গালা প্রদেশ অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়। ইহা শীতপ্রধান দেশ। বরং বাঙ্গালাতে কখন কখন শীতকালে গরম হাওয়া চলিলে, বা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে, খেজুররস খারাপ হইয়া যায়, কিন্তু সে অবস্থা এখানে কম দেখিতে পাই এবং এই সকল পাহাড়ী দেশে খেজুর রস বাঙ্গালা অপেক্ষা অধিক মধুর। আমি দেখিয়াছি যে, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ১০।১১ সের রস হইতে ১ সের গুড় প্রস্তুত হয়, কিন্তু এদেশে ৭ সের রস হইতে ততই গুড় হয়, তাহা বাঙ্গালার খেজুরগুড় অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট এবং ঐ গুড়ে চিনির পরিমাণ অধিক। মিঃ আনেট সাহেব (Mr. H. E. Annelt of Pusa) সম্প্রতি যশোহরের ও মধ্যভারতের গুড় দেখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, এদেশের খেজুরগুড়ে চিনির পরিমাণ বেশী।

ইন্দোরের সরকারি রিপোর্টে (Indore State Administration Report of 1903) মোরদের কার্য্য সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"বাঙ্গালা প্রদেশ হইতে ১১ জন শিউলি আনাইয়া মোরদ গ্রামে গত বৎসর খেজুরবাগান হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এই কার্য্যের জন্য সরকার পক্ষ হইতে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রায় ১০০০৲ টাকা ব্যয় ও গুড় চিনিতে ৮০০০৲ টাকা আমদানী হইয়াছিল। এ সওয়ায়, অনেক কড়াই ইত্যাদি মাল মশলা মজুত ছিল। এদেশের লোকেরা নুতন কার্য্য প্রণালী শিখিবার জন্য চেষ্টা বা ইচ্ছা করে না। কিন্তু শিখিলে, কার্য্য হইতে লাভ করিতে পারিবে। প্রায় ১৮০ মণ গুড় ও ৫০ মণ চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল ইত্যাদি।"

উল্লিখিত হিসাবে চিটের পরিমাণ ধরা হয় নাই। প্রায় ৭০৮০ মণ চিটে নির্গত না হইলে ৫০ মণ চিনি প্রস্তুত হয় না। সুতরাং গুড়, চিটে ও চিনি মিলাইয়া ১ জন শিউলী প্রায় অনুমান ৩০ মণ খেজুরগুড় প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহা হইলে প্রত্যেক গাছী প্রায় ২৮ মণ, অর্থাৎ ১ টন গুড় প্রস্তুত করিয়াছিল। ১৯০৮।৯ সালে নাগপুরের শিল্প ও কৃষি সম্বন্ধীয় যে প্রদর্শনী (Exhibition) হইয়াছিল, সেই সময় আমি নাগপুরে সরকারী বাগানে (Agricultural farm) খেজুর গাছ হইতে ৩ জন শিউলি নিযুক্ত করিয়া রস, গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। প্রত্যহ সকালে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নাগপুর সহরে রস বিক্রয় হইত। আদরের সহিত লোক সমস্ত গুড়ও ক্রয় করিত। প্রদর্শনীক্ষেত্রে ঘূর্ণিত চক্র-যন্ত্রে (centrifugal) গুড় হইতে চিনি করিয়া দেখান হইয়াছিল। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষেরা সেই জন্য আমাকে বিশেষ আদরের সহিত প্রশংসাপত্র ও পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

উল্লিখিত কথাগুলি আমার কাল্পনিক নহে, প্রকৃত ঘটনা গুলি বিবরণ করিলাম। যদ্যপি ত্রৈলক্যনাথ বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, অথবা এদেশে একবার তিনি আসিয়া তদন্ত অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে আমার এতাবৎ চেষ্টা ও কার্য্য "বালকের ক্রীড়া" মনে করিবেন না। সম্প্রতি আমার বয়ক্রম ৬২ বৎসর। আমার পৌত্রগণ ও দৌহিত্রগণ বালকের মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু ঐ সকল বালকবৃন্দ যেমন তাহাদের পুতুল ও ক্রীড়ার সামগ্রী লইয়া যত্নের ও আনন্দের সহিত তন্ময়ভাবে দিনযাপন করে, সেইরূপ সম্প্রতি আমি, চির-পরিচালিত ওকালতি ব্যবসা প্রায় পরিত্যাগ করিয়া, খেজুরের গুড় চিনির ক্রীড়াতে তন্ময় হইয়া আছি এবং বালকদিগের ক্রীড়া দেখিয়া অপর লোক নিন্দা বা অগ্রাহ্য করিলে যেমন তাহাদের মন বিচলিত হয় না, বরং কতক পরিমাণে আগ্রহান্বিত হইয়া ক্রীড়াতে অধিকতর মনোনিবেশ করে, সেইরূপ ত্রৈলক্য বাবুর কথায় আমিও কিছু আনন্দলাভ করিলাম। অবশেষে সানুনয় নিবেদন এই যে, বহুকাল এদেশে বাস করিয়া আমি জীবনের শেষভাগে এই বাঞ্ছনীয় কার্য্য সম্বন্ধে যতটুকু চেষ্টা করিতেছি

ও করিয়াছি তাহাতে আপনারা এ বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া আমার কার্য্যে যোগদান করিলে বাধিত হইব। কেননা, বালকের অরণ্যে রোদনের মত আমার কথায় লোকে কর্ণপাত করিতেছে না। অথচ কোন কোন দুরদর্শী ও জ্ঞানী লোকেরা আমার কার্য্যে উপহাস করিয়া থাকেন। কেবল এইমাত্র ভরসা ও ইচ্ছা যে, কল্পিত উদ্যোগ ও কার্য্য সম্বন্ধে আমার জীবনে সফলতা লাভ হউক বা না হউক আপনাদের এ বিষয়ে সহানুভূতি হইলে স্থানে স্থানে এই প্রস্তাবটি প্রতিধ্বনিত হইতে পারে : এবং আপনাদের ন্যায় সুলেখক মহাশয়েরা এই কার্য্যের প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া যথার্থ কথার আন্দোলন করিলে আমি সার্থক এদেশে আসিয়াছিলাম বোধ করিব। শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়। ইন্দোর, মধ্যভারত।

তুলার চাষ—ভারতে তুলার চাষ লইয়া অনুসন্ধান চলিতেছে। ভারতে তুলার চাষের উপযুক্ত জমি অনেক আছে ; কৃষকদলও শ্রমশীল ; রেলপথও বিস্তৃত। সরকারও এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। প্রধানতঃ সরকারের চেষ্টায় তুলার চাষে যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার ফলে বর্ত্তমান বর্ষে ভারতের প্রায় ২৪ কোটি টাকা আয় বাড়িবে। সরকার নূতন নূতন তুলার প্রবর্ত্তনও করিয়াছেন—তাহাতে সুফলও ফলিয়াছে। এই কথা উপলক্ষ্য করিয়া বোম্বাইয়ের 'বোম্বাই ক্রনিকেল' লিখিয়াছেন—ব্রিটিশ কটন গ্রোইং এসোসিয়েসন ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্, সায়েরালিয়ন, গোল্ডকোষ্ট, মধ্য-আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে এত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন নাই ; অথচ ভারতবর্ষ জগতের একটি প্রধান তুলা উৎপন্নকারী দেশে পরিণত হইতে পারে। কথাটা যেমন আশার তেমনি ভয়েরও বটে। বিলাতী এসোসিয়েসনের ধনবল ও জনবল উভয়ই অধিক। সেরূপ প্রবল এসোসিয়েসন যদি ভারতের তুলার চাষের উন্নতির জন্যও ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন এবং চাষীরা উদাসীন থাকে, তবে ভারতের দরিদ্র কৃষক তুলা ক্ষেত্র হইতে ক্রমশঃ বিতাড়িত হইবে। সে আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন কৃষক হইতে অচিরে পরমুখাপেক্ষী কুলীতে পরিণত হইবে। আমরা কি সময় থাকিতে আপনারা সচেষ্ট হইতে পারি না? বর্ত্তমান সময়ে যৌথ ঋণদান সমিতি দ্বারা অনেক সাহায্যের আশা করা যায়।

বাগানের মাসিক কার্য্য

ভাদ্র মাস

কৃষিক্ষেত্র—যে সকল জমিতে শীতকালের ফসল করিতে হইবে, তাহাতে এই মাসে গোময়াদি সার প্রয়োগ করিয়া চষিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

সার মিশ্রিত গামলা বা কাঠের বাক্সে কপি বীজ বপন করিয়া এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। মৃত্তিকার সমপরিমাণ পাতাসার মিশ্রিত করিতে পারিলে ভাল হয়। জলদি ফসলের জন্য ইতি পূর্ব্বেই চারা প্রস্তুত হওয়া উচিত। আর একটি কথা এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অধিক জমিতে চাষ করিতে গেলে বাক্সে বা গামলায় বীজ বপন করিয়া পোষায় না। উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল বাঁধিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বীজতলা আবশ্যক মত হোগলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে

হয়। কোন কোন সুনিপুণ চাষী খেঁতো বাঁশের মাচান করিয়া তাহার উপর ৬৮ ইঞ্চি পুরু মাটি ছড়াইয়া বীজ বপন করে।

অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট বোমা বা বিচালি গুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা বীজক্ষেত্রে জল ছিটাইতে হয়।

আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে যাহাতে আলু বসাইবে, সে সকল জমিতেও এই সময় উত্তমরূপ চাষ দিতে হইবে ও সার ছিটাইতে হইবে।

শীতকালের জন্য লাউ, কুমড়া বীজ এই সময় বসাইবে। লাউ, কুমড়া বীজ ৩ ৪ দিন হুকার জলে ভিজাইয়া বপন করিলে বীজগুলি পোকায় নষ্ট করিতে পারে না।

ওল ও মানকচু তুলিবার এই সময়। এই সময় তাহারা খাইবার উপযুক্ত হয়।

এই মাসের প্রথমেই, উত্তর-পশ্চিম, বেহার প্রভৃতি স্থানে কপির চারা ক্ষেতে বসান শেষ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা প্রদেশে এই মাসের শেষে কার্য্য আরম্ভ হইবে। পাটনাই ফুলকপির চারা ক্ষেতে বসান এতদিন হইয়া যাওয়া উচিত।

সেলেরী (Celery), এসপারেগস (Asparagus) ও দুই এক জাতীয় টমাটোর (Tomato) চাষ এই সময় হওয়া উচিত।

লাউ, কুমড়া, শাঁকালু, বীট, পাটনাই শালগম ও গাজর, পালম, নটে প্রভৃতি নানাপ্রকার শাক সব্জী, শসা প্রভৃতি দেশী সব্জী তৈয়ার করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

মূলা, মটর প্রভৃতির জন্য জমিতে গোবর সার দিয়া ভাল করিয়া চষিয়া তৈয়ারি করিয়া রাখিতে হইবে।

ফলের বাগান—লিচু, লেবু প্রভৃতি ফলগাছের যাহাদের গুল কলম করিতে হইবে তাহাদের গুল কলম করা শেষ হইয়াছে, কিন্তু আম প্রভৃতির জোড়কলম বাঁধা এখনও চলিতেছে।

বীজ নারিকেল হইতে চারা করিবার জন্য এই সময় মাটিতে বসাইতে হইবে।

যে সকল নারিকেল গাছ হইতে পাকিয়া ও শুকাইয়া আপনি পড়ে, তাহাদিগকে পতন নারিকেল কহে। একটী শীতল স্থানে কাদা করিয়া তাহাতে পতন নারিকেল এক পাশে হেলাইয়া বোঁটার দিক উপরে রাখিয়া বসাইতে হয় ও আবশ্যক মত জল সিঞ্চন করিতে হয়।

ফুলের বাগান—বালসম (Balsam), জিনিয়া (Zinnia), কনভলভিউলাস মেজর (Convolvulus Major), আইপোমিয়া (Ipomœa) প্রভৃতি ফুল গাছ তৈয়ার করিবার এই সময়। কতকগুলি জাপানী লিলি আছে সেগুলি জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে বসান উচিত, কারণ সেগুলির বর্ষাতেই ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই সময় প্যান্সী এষ্টার, মিগ্নোনেট বীজ প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বপন করা উচিত।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

পঞ্চদশ খণ্ড,—৫ম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্

ভাদ্র, ১৩২১।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

KRISHAK

Under the Patronage of the Governments of Bengal and E. B. and Assam.

THE ONLY POPULAR PAPER OF BENGAL

Devoted to Gardening and Agriculture. Subscribed by Agriculturists, Amateur-gardeners, Native and Government States and has the largest circulation. It reaches 1000 such people who have ample money to buy goods.

Rates of Advertising.

1 Full page Rs. 3-8. 1 Column Rs. 2.
½ Column Rs. 1-8

MANAGER—"KRISHAK,"
162, Bowbazar Street, Calcutta.

কৃষক।

সূচীপত্র।

ভাদ্র, ১৩২১ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ খণ্ড। } ভাদ্র, ১৩২১ সাল। { ৫ম সংখ্যা।

ধান

শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ধান্য বীজ সংগ্রহ—সব চাষের ন্যায় ধান চাষের প্রধান কার্য্য সুবীজ সঞ্চয়। ভাল বীজ-ধান না মিলিলে কিছুতেই চাষে সুসার হইবে না। চাষী মাত্রেই বীজের ধান আগে হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দেয় এবং সকলেই বুঝে যে বীজের গুণে চাষ, তারপর আর সব আনুসঙ্গিক ব্যাপার। তাহা হইলেও অনুষ্ঠানটি পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। যেমন "কালী, কলম, মন, লেখে তিন জন"; ৩ টির একটি খারাপ হইলে ভাল লেখা কখনই বাহির হইবে না। সেই রকম সুবীজ, উপযুক্ত ক্ষেত্রে এবং উপযুক্ত সময় এই তিনের সমন্বয়ে সুফসল উৎপাদিত হইবে। তিনটির উপরও আর একটির আবশ্যক, সেটি লেখার ব্যাপারে মনের প্রবর্ত্তক এবং চাষের ব্যাপারে উদ্যোগী চাষী। যে চাষী ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিতে পারে, যে চাষী সময়টি ঠিক ধরিতে পারে, সেই কেবল সুচাষী। ভারতবর্ষে, বঙ্গদেশে, জাপানে চাষীরা সকলেই ধান চাষের কৌশল যেমন অবগত আছে এমন আর কোন জায়গার লোকে জানে না।

সুপুষ্ট বাছা ধান গুলি বীজের জন্য সংগ্রহ করা হয়। সদ্য সংগৃহিত বীজ ভাল জন্মায় না এবং পুরাতন বীজও ভাল অঙ্কুরিত হয় না। এ বৎসরের বীজ পরবর্ত্তী বর্ষে ব্যবহার করিতে হয়। বীজগুলি ৮।১০ মাসের পুরাতন হইলেই তাহাই বপনের উপযুক্ত এবং তাহা হইতে সুফসল হয়। আবার দেখ আশু ধানের বীজ লইয়া আমনের আবাদে লাগাইলে বা আমনের বীজ লইয়া আশু ধানের ক্ষেত্রে লাগাইলে পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে। মিশ্রিত ধান এইজন্য বীজরূপে ব্যবহার করা

কদাচ উচিত নহে। তবে পাশাপাশি ক্ষেতের আমনে আমনে মিশিয়া গেলে একজাতীয় বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। আশুতে আমনে মিশ্রণ কখনই শুভফলপ্রদ হইতে পারে না, কিন্তু মোটা বা সরুধান মিশিলেও ক্ষতি হয়। মোটা ধানগুলির গোড়ায় অধিক জল থাকা আবশ্যক, সরুধানের জমিতে রস থাকিলেই হইল তাহার গোড়াতে জল দাঁড়াইয়া থাকিবার আবশ্যক দেখা যায় না। মিশ্রিত ধান সুবীজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

বীজ পরিবর্ত্তন—প্রত্যেক বৎসর এক ক্ষেত্রে একই রকম ধানের চাষ করাতে ক্ষতি হয়। ক্রমে ধান খারাপ হইয়া যায়। যেমন সগোত্রে ক্রমাগত বিবাহ হইলে সন্তান সন্ততি খারাপ হয়, তেমনি স্বক্ষেত্রের বীজে চাষের ফলও খারাপ হয়। এক জেলার বীজ আর এক জেলায়, অভাবে এক মহলের বীজ আর এক মহলে চাষ করিলে ভাল ফল হয়। কিন্তু বীজ পরিবর্ত্তনের সময় তোমাকে সতর্ক হইতে হইবে যে, ঠিক অনুরূপ বীজটি তোমার মিলিয়াছে কি না। সেই বীজ ধান কোন সময় কি প্রকার জমিতে জন্মিয়াছে, তথাকার আবহাওয়া তোমার মহলের আবহাওয়ার মত কি না, কবে বুনিতে হয়, কত দিনে পাকে ইত্যাদি অনেক খবর লইয়া কাজ করিলে তবে কাজে সুবিধা হয়। বিল জমির ধান অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে হইবে না বা বর্ষা প্রধান বাঙলার ধান নিরস প্রদেশে জন্মিবে না। বাঙলা দেশের কেলেজিরে, সিলেট, পাটনাই প্রভৃতি জলপ্লাবনের সময়ও কিছু দিন আত্মরক্ষা করিতে পারে কিন্তু মিহিধান গুলি বন্যার কথা দূরে থাকুক প্রবল বৃষ্টিও সহ্য করিতে পারে না।

বীজ সংগ্রহের সময়—ধান কাটিয়া ঝাড়া মাড়ার সময় বীজ ধান সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ধান সংগ্রহ করিতে গেলে ধানের শীষগুলি বাছাই করিয়া লইয়া সেগুলি স্বতন্ত্র মাড়িয়া ঝাড়িয়া লইতে হইবে, নতুবা ঐ বীজের সহিত কিছু না কিছু অন্য ধান মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ক্ষেতের মধ্যে যে অংশের ধান গাছগুলি খুব তেজস্কর হইয়া উঠিয়াছে সেই গাছগুলি হইতে শীষ সংগ্রহ করিতে হয়। সাধারণতঃ চাষীরা এত যত্ন করিয়া শীষ সংগ্রহ করে না, সেইজন্য বাঙলায় মিশ্রিত ধানের চাষই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। মিশ্রিত বীজ ব্যবহার অভ্যাসটা আলস্য বশতঃই হইয়াছে। এরূপ প্রকার আলস্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

বীজ ধান রক্ষার ব্যবস্থা—সাধরণতঃ গোলাতে ধান রাখা হয়। ধান্য-রক্ষার গোলা মাটি হইতে ১॥।২ ফিট উচ্চ মাচানের উপর অবস্থিত। মাটির সহিত সংলগ্ন থাকিলে পাছে মাটির আর্দ্রতা পাইয়া বীজ ধান নষ্ট হয় এইজন্য এত সতর্কতা। সারা বৎসরের খোরাকী বা বিক্রয়ের ধান্যও ঐ ভাবে রাখা হয়।

রসা মাটির সংযোগে ধানগুলি রসিয়া উঠিলে বা জলো হাওয়া লাগিয়া রসিলে ধানে পোকা লাগার অধিকতর সম্ভাবনা। পোকা লাগিলে অনেক শস্য নষ্ট করিয়া ফেলে এবং লোকসান হইয়া যায়। ধানের গোলা এইজন্য চতুর্দ্দিকে বেড় বাঁধিয়া রক্ষিত। বেড়ের উপর যেখানে আচ্ছাদন চালের সংযোগ সে স্থান দিয়া পাছে ইন্দুর প্রবেশ করে, সেইজন্য সেই অংশ কেয়াপাতা দিয়া আটকান। এখন তারের জাল ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইন্দুরে না পারে কাটিতে এমন ভাবে বেড় খুব যত্ন করিয়া নির্ম্মিত হয়। চারি দিকের বেড়ে মাটি ও গোময়ের লেপ দিয়া বেশ সুপরিষ্কৃত করিয়া লওয়া হয়। গোলার মধ্যে দিনের বেলা মাঝে মাঝে হাওয়া খাওয়ান হয় এবং অনেকের বিশ্বাস সন্ধ্যাকালে ধুনার ধোঁয়া দিয়া ও কিছু ক্ষণ প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিলে গোলার ধানে পোকা লাগে না। পুঁড়া বাঁধিয়াও বীজ ধান রাখার পদ্ধতি অনেক জায়গায় আছে। এ নিয়ম আরও ভাল। খড়ের কাছি পাকাইয়া ক্রমশঃ তাহার বেড় দিয়া ছোট বড় আধার নির্ম্মাণ করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধ্যে ধান ভরিয়া পুঁড়াটি একেবারে নিরেট করিয়া ফেলা হয়। ভিতরটিতে আর তিল ধারণের জায়গা থাকে না এবং বেশ আঁট শাঁট বায়ুবদ্ধ হইয়া থাকে। পোকারা এত আঁটা আঁটির ভিতর তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। বীজ ধানের সহিত ছাই, লেবু পাতা বা লঙ্কা মিশাইয়া রাখিলে তাহাতে পোকা লাগে না। বড় জালা প্রভৃতিতে বীজ রাখিয়া তাহার মুখে ছাই দিয়া ঢাকিয়া জালার মুখটা ভাল করিয়া আঁটিয়া রাখিলে তাহাতে পোকা প্রায় ধরে না। ন্যাপথালিন্ দিয়া রাখিলেও উপকার হয়। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "ফসলের পোকা" নামক পুস্তকে "গোলাজাত শস্যে পোকা" নামক অধ্যায়ের গোলাজাত শস্যের পোকা নিবারণের নানা কৌশল বলিয়া দেওয়া আছে সুতরাং সে গুলির অধিক আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি না। বীজ ধান খারাপ হইতেছে কি না সতর্ক থাকিতে হইবে কিন্তু বপনের সময় ব্যতীত বীজাধারে সহজে হাত দেওয়া হয় না। কারণ খোলা দেওয়ার ফাঁকে যদি তাহাতে পোকা প্রবেশ করে বা তাহাতে ঠাণ্ডা লাগে। চাষীরা এইজন্য নিজে ব্যবহার না করিয়া কাহাকেও বীজ দেয় না বা তাহা হইতে লইয়া বিক্রয় করে না। এই কারণে সময়মত বীজ সংগ্রহ করা না থাকিলে নিজের জমির 'যো' হইলেও বীজ অভাবে তাহাকে অন্য চাষীর মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। এ দেশে যাহারা চাষী তাহাদের নিজে নিজেই বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখা ছাড়া আর উপায় নাই। বিলাতী বীজ লইয়া অনেকে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু দেশী বীজের উন্নতি করিতে এবং প্রকৃত পক্ষে ভাল দেশী বীজের ব্যবসা চালাইতে কাহাকেও দেখা যায় না। ভারতীয় কৃষি-সমিতি প্রভৃতি দুই এক সম্প্রদায়ের দেশী বীজের উন্নতি চেষ্টা

সমুদ্রে জলবিম্ব মত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখন বিক্রয়ার্থ ভাল বীজের খটি হওয়া আবশ্যক হইয়াছে, কেন না এখন ভদ্র গৃহস্থকে এবং অনন্য উপায় অনেক ভদ্র যুবককে চাষে লিপ্ত হইতে হইয়াছে সুতরাং চাষের কার্য্যের প্রসার হওয়ার সঙ্গে বীজের কারবার ফেলাও হইবে ইহা নিশ্চিত। প্রত্যেক শস্যের বীজ রক্ষার জন্য যে আয়াস স্বীকার করিতে হয় তাহা হইতে রেহাই পাইলে প্রত্যেক চাষীই ভাল বীজের ন্যায্য মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। নানা রকম গুণের বীজও পাওয়া যাইবে। আয়র্লণ্ড বাসীগণের প্রধান খাদ্য আলুর বীজ নির্ব্বাচন হেতু কতই সুবিধা হইয়াছে। তাঁহারা এমন আলু জন্মাইয়াছেন যে তাহাতে ফলন অধিক হয়, এমন আলু বীজ আছে যাহার চাষে আলু ক্ষেতে পোকা লাগে না। তেমনি যত্ন করিলে আমরা ধানেরও উন্নতি করিতে পারি। জল প্লাবনে মরিবে না, অনাবৃষ্টি সহ হইবে, এক গুণের পরিবর্ত্তে দশগুণ ফলন দাঁড়াইবে এমন বীজ ধান তৈয়ারি করা যায়। বীজের গুণে চাষ সফল হওয়া সম্ভব। কিন্তু যে চাষী তাহার আবাদ লইয়া ব্যস্ত, তাহাকে যদি সুবীজ উৎপাদন জন্য এত মনোযোগ দিতে হয়, তাহা হইলে তাহার একদিকে অবহেলা হইতে পারে। যদি উৎপাদনকারী ও সাধারণ চাষী তাহাদের কার্য্য বিভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে কাজের সুবিধা হয়। ভারতবর্ষে বহু প্রকারের ধান জন্মে এবং একই ধান বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে কিম্বা হয়ত স্থান বিশেষে পড়িয়া কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে। এ দেশে ধান বীজ সংগ্রহের কাজে যে হাত দিবে, তাহার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার হইবে না। কয়েকটি প্রধান ধান্য তাহাকে বাছাই করিয়া লইতে হইবে এবং মিহি মোটা হিসাবে তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করিতে হইবে। কোন জেলাতে কোন ধান ভাল হয়, কোন ধানের পক্ষে কি প্রকার জমি কি প্রকার আবহাওয়া প্রয়োজন, তাহা বিচার করিয়া ঠিক করিয়া না রাখিলে তাহারা চাষীগণের আবশ্যক মত বীজ সরবরাহ করিতে পারিবে না। অনেকের বীজ একত্র থাকা হেতু অল্প খরচে অতি সুপ্রথায় বীজ রক্ষিত হইতে পারিবে। বীজের মিশ্রত্ব ঘুচিয়া পৃথক প্রকারের বীজ পৃথক পাওয়া যাইবে। ভাল ধান বীজ ১ পালি ওজনে দুই সের হইবে। কিন্তু চিটা কিম্বা ভুয়া ধান মিশান থাকিলে তাহার ওজন খুবই কম হয়। ভাল ধান বীজ জলে ফেলিলে যে গুলি পুষ্ট দানা তাহা জলে ডুবিয়া যাইবে, চিটা ও ভুয়া ধান ভাসিয়া উঠিবে। পয়সা দিয়া লোকে চিটা ও ভুয়া ধান কখনই কিনিতে ইচ্ছা করে না।

একর প্রতি বীজ ধানের পরিমাণ—যে ক্ষেতে ধান বোনা হয় তাহাতে ছড়াইবার জন্য প্রায় বাঙলার চাষীরা প্রতি একরে (৩ বিঘায়) ৩০ সের ধান বুনিয়া থাকে। সিংহলে এক একরে ২ বুসেলের কম ধান বোনা হয় না।

১ বুসেল প্রায় এক মণ, ইহা অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে হয়। ধান খুব ঘন বোনা হইলে গাছের তেজ হয় না এবং ফলন কমিয়া যায়। জমি বৃথা পড়িয়া না থাকে অথচ গাছ খুব ঘন না হয় এইটা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। বেশী ধান বুনিয়া তাহা নিড়াইয়া দিবার সময় রুগ্ন চারা গুলি উঠাইয়া ফেলিতে হয়, এই কারণে আবশ্যক অপেক্ষা কিছু অধিক ধান বোনা হয় তথাপি পরিমাণ উপযুক্ত মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতে দেওয়া উচিত নহে।

যে ক্ষেতে ধান রোয়া হয় তাহার জন্য একর প্রতি ৸০ ত্রিশ সের ধানের আবশ্যক নাই। ।৫ হইতে ॥০ বিশ সের ধানের বীজ তৈয়ারি করিলে এক একর ক্ষেত রোয়া চলিবে। ইহাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অপেক্ষা বেশী তবে এ রকম বেশীকে অপচয় বলা যায় না, কারণ বীজের মধ্যে বাছাই করিয়া তেজস্কর চারা গুলিই লইতে হইবে। তার উপর আবার হাজা শুকা আছে, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে একবার রোয়া ধান নষ্ট হইলে যদি সময় থাকে তবে দ্বিতীয় বার রোয়া চলে এমন আয়োজন চাষীরা রাখিয়া থাকে। তাহারা ভাবে যে বীজ কিঞ্চিৎ অপচয় হওয়া বরং ভাল তথাপি বীজ ধানের অভাবে জমি আবাদ করা বন্ধ না হয়। অসময়ে আবাদ হইলে যদি ষোল আনার স্থলে অর্দ্ধেক বা ছয় আনা ফসল হয় তাহাতে খোরাকী ধান এবং গরুর জন্য বিচালী সংগ্রহ হইবে।

বীজ বপন প্রণালী—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সতেজ গাছ হইতে সুপুষ্ট বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। সেই বীজ লইয়া আবাদ করিতে হইবে। ধান বীজ দুই কিম্বা তিন দিন জলে ভিজাইয়া রাখা হয়। প্রত্যহ জল বদলান প্রয়োজন, টাট্‌কা জল না হইলে বাসী জলে ধান পচিয়া যাইবে। দুই কিম্বা তিন দিনের পর—ঠিক সময়টা ধরিতে ভাল চাষীতেই পারে—ধান গুলি জল হইতে তুলিয়া মাটিতে ৬ইঞ্চ পুরু করিয়া বিছাইয়া তাহার উপর মাদুর, ঝেঁতলা বা থলে দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হয়। মাদুর বা থলের অভাবে চাষীরা কলার পাতা বা সুপারির খোলা চাপা দিয়া রাখে। মাদুর প্রভৃতির উপর কাঠ, পাথর, ইট প্রভৃতি ভারও চাপান হয়, কারণ বীজ গুলি যত বায়ুবদ্ধ হইবে তত শীঘ্র গরম হইয়া অঙ্কুরিত হইবে। তিন চারি দিন বাদে কাঠ পাথর প্রভৃতি ভার গুলি সরাইয়া জল ছিটাইয়া ধান পুনরায় সরস করিয়া লইতে হয় এবং পুনরায় ১ ফুট পুরু করিয়া মাটিতে বিছাইয়া থলে প্রভৃতি দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হয়, এবার কিন্তু ভার চাপান হয় না। এক বা দুই দিন এই ভাবে রাখিয়া ধান গুলি হস্তদ্বারা দলিয়া লইলেই বপনের উপযুক্ত হইল। দলিবার উদ্দেশ্য এই যে ধানের গায়ে যে সেঁওলা ধরে সে গুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া। ধীর হাতে এই কার্য্য সম্পাদন করা উচিত নতুবা অঙ্কুর নষ্ট হইতে পারে। বিল জমিতে চাষ করিতে হইলে এই পদ্ধতিতে বীজ

তৈয়ারি করিয়া লওয়া হয় কিন্তু শুষ্ক জমিতে বীজ বপনের সময় এত কষ্ট করিতে হয় না। জমিটি ভাল রূপে চষিয়া তাহাতে ধান বীজ হাতে ছড়াইয়া বোনা হয়। ধান বুনিয়া বীজ ক্ষেত্রটি বিদে দ্বারা চষিয়া মইদ্বারা সমান করিয়া দিলে ধান মাটি চাপা পড়িবে। অতঃপর দুই পসলা বৃষ্টি হইলে ধান বীজ অঙ্কুরিত হইবে এবং বাড়িতে থাকিবে। বীজতলাটী স্বভাবতঃ সারবান হইবে কারণ বীজের উপর চাষের সমধিক পরিমাণে ফলাফল নির্ভর করে। যাহাতে বীজ ধান বেশ তেজাল হয় এবং শীঘ্র তৈয়ারি হইয়া উঠে, সে বিষয়ে নজর রাখা সুচাষীর কর্ত্তব্য। যে সকল স্থানে অধিক বারিপাত হয় সেখানে বীজ প্রস্তুতের জন্য শুষ্ক জমি পাওয়া যায় না, এই হেতু প্রথমোক্ত উপায় অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নাই। শুষ্ক জমিতে চাষের জন্য বা পাহাড়ের গায়ে ধানের আবাদ জন্য দ্বিতীয় নিয়ম প্রচলিত। ক্রমশঃ

বাঙলায় কয়েক প্রকার ধান

উদ্যান তত্ত্ববিদ্ শ্রীশীতল প্রসাদ ঘোষ লিখিত

কয়েক প্রকার ধান্য—ভারতবর্ষে বহুতর ধান্যের চাষ প্রচলিত আছে। এক ধানের ভিন্ন জেলায় ভিন্ন নাম আছে। এক ধান স্বতন্ত্র স্থানে চাষ করিলে তাহাদের পরস্পরের সহিত তুলনায় একটু পৃথকত্বও দেখা যায়। ঠিক কতগুলি স্বতন্ত্র জাতীয় ধান আছে তাহা বলা নিতান্ত সহজ নহে। আমরা কৃষি-কার্য্যে নূতন ব্রতীগণকে কয়েকটি প্রধান প্রধান নাম বলিয়া দিতে চাই।

পাটনাই—ইহা খুব সরু নহে খুব মোটা নহে। ধান ক্ষেতে ৬ ইঞ্চ জল থাকিলে ভাল হয়। ২৪ পরগণার দক্ষিণভাগে জলাভূমিতে ইহার আবাদ যথেষ্ট, মোটামুটি চাষে এক একরে (তিন বিঘায়) ২৪ মণ ধান জন্মে। সার প্রয়োগ করিয়া উত্তম রূপে চাষ করিতে পারিলে ৪০ মণ ফসল হইতে পারে। ইহা আমন জাতীয় ধান্য, শ্রাবণ, ভাদ্রে ধান রোপণ করা হয়, অগ্রহায়ণে ধান পাকে। ইহার চাউল তাদৃশ মিহি নহে কিন্তু ভাত বেশ নরম ও খাইতে সুস্বাদু।

সিলেট—ইহাও পাটনাই ধানের মত বরং কিছু মিহি বলিতে হইবে। ভাত পাটনাই অপেক্ষা নরম হয়। তিন বা চারি ইঞ্চি জল ইহার গোড়ায় থাকিলেই চলে ইহাও আমন ধান্য। বহুপূর্ব্বে সিলেট হইতে বাঙলায় আসিয়া থাকিবে, কিন্তু বাঙলার দক্ষিণ দেশে পাহাড়ে দেশ হইতে নামিয়া আসিয়া এই

ধানটি যেন হাতপা ছড়াইয়া বাঁচিয়াছে। ফলনে পাটনাই অপেক্ষা কম নহে বরং কখন অধিক হয়।

দাদখানি—ইহাও বাঙলা দেশের ধান। জ্যৈষ্ঠমাসে বীজ বপন করা হয়, শ্রাবণে বীজধান তৈয়ারি হইয়া যায়। তখন ইহা ক্ষেতে রোপণ করিবার সময়। অগ্রহায়ণ মাসে ধান পাকে। ইহাতে বেশ ভাল সিদ্ধ চাউল তৈয়ারি হয়, চাউল মিহি, ভাত নরম হয়। ধনাঢ্যদিগের আহারের যোগ্য, ইহা অতিশয় লঘুপাক এবং ইহার পুরাতন চাউল রোগীর পথ্য। দানা দীর্ঘাকৃতি এই জন্য টেব্‌ল রাইস্ (সাহেবগণের টেব্‌লে) ব্যবহার যোগ্য। বিঘা প্রতি ভালজমিতে ৬ মণের অধিক ফলে না।

বাঁক তুলসী—বাঙলার এক জাতীয় আমন ধান্য। ধান বেশ মিহি, চাউল সরু হয়। মেদনীপুর, বর্দ্ধমান, মুর্শীদাবাদ, সুন্দরবন সর্ব্বত্র ভালরূপ জন্মে। ফলন দাদখানির মত; ভাল জমিতে কিছু অধিক ফলিতে পারে। দাদখানি, বাঁকতুলসী প্রভৃতি সরুধানের অপেক্ষাকৃত উচ্চজমিতে আবাদ হইয়া থাকে। আবাদের সময় ক্ষেতে দুই কিম্বা তিন ইঞ্চি জল থাকিলেই পর্য্যাপ্ত হয়। দাদখানির সম সময়েই বাঁকতুলসী চাষ হয়

বাদসা ভোগ—ইহা আমন ধানের জাতি। ইহার চাষ বর্দ্ধমানে অধিক। যশোহর ও মুর্শীদাবাদেও ইহার চাষ হয়। চাউল মিহি হয়। চাউলে সুগন্ধ আছে। ভাত খুব শাদা হয়, নরম ও খাইতে সুস্বাদু, খুব অল্পজলে হয়, ফলন দাদখানির সমানই বলা যায়। দাদখানি ও বাঁকতুলসীর চাষ যখন হয় ইহার চাষ সেই সময় হইয়া থাকে।

কালী আউশ—মোটা আউশ ধান। উচ্চ জমিতে বৈশাখে ইহার বীজ বপন করা হয়, শ্রাবণে ইহার ধান পাকে। বিঘায় ৮ মণ ফলে। চাউল মোটা, খর্ব্বাকৃতি, রঙ লাল। ত্রিহুতে আউশ ধানের চাষ খুব বেশী। বীরভূমে প্রায় ৬৬ রকম মোটা আউশের আবাদ আছে, মেদিনীপুরে ১৬ রকম, ২৪ পরগণায় প্রায় ৩০ রকম আউশের আবাদ হয়। দিনাজপুর, বাখরগঞ্জ, আসাম গোয়ালপাড়া প্রভৃতি বহুতর স্থানে আউশ ধানের চাষ আছে। বিভিন্ন স্থানে নানা জাতীয় আউশের চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বাগ্রে ধান পাকে বলিয়া এই জাতীয় ধানের আশু বা আউশ নাম হইয়াছে।

সরু আউশ—সরু আউশ ধান। ধান খুব সরু, চাউল মিহি এবং রঙ সাদা, ভাত আমন ধানেরই মত হয়, খাইতেও সুস্বাদু। ইহা মধ্য প্রদেশের ধান। কিন্তু শিবপুর ক্ষেত্রে পরীক্ষার পর হইতে বাঙলার চতুর্দ্দিকে ইহার চাষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ফলন খুবকম হয় বিঘায় ৪ কিম্বা ৫ মণের অধিক হয় না। এই

ধান বোনা অল্প রসা ও অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূমিতে রোপণ করিলে ইহার ফলন ভাল হয়। ধান একটু মোটা হয় মাত্র। শ্রাবণে ধান পাকে, কিন্তু রোপণ করিলে ভাদ্রে পাকে।

বাঁকচুর—ইহা বর্দ্ধমানের একটি আমন ধান। জ্যৈষ্ঠমাসে বীজ ধান তৈয়ারির বন্দোবস্ত করিতে হয়। শ্রাবণমাসে রোপণ করা হয়। অধিক জলে হয় সুতরাং ইহার চাষের জন্য খুব নিচু জলা জমির আবশ্যক। ২৪ পরগণায়ও ইহার চাষ আছে। ক্ষেতে ৪।৫ ফিট জল থাকা আবশ্যক। ২৪ পরগণায় শ্রাবণ হইতে ভাদ্রের শেষ পর্য্যন্ত ইহার রোপণ কার্য্য চলে এবং পৌষের শেষে ধান কাটা হয়। ধান অপেক্ষাকৃত মোটা।

বাঁশমতি—ইহা পঞ্জাব প্রদেশের সরু আমন ধান। চাউল সরু হয়, আকৃতি দীর্ঘ। ফিলিবিট ধান যাহার সরু ধান বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে এবং যাহার চাউল ইউরোপীয়গণের ব্যবহারের জন্য বিদেশে যায় ইহাও সেই ধানের জাতি বিশেষ। চাউলে সুগন্ধ আছে। শাদা ও লাল দুই রকম বাঁশমতি আছে। উভয়ের চাউল শাদা। ২৪ পরগণায় নিম্নজমিতে ইহার চাষ হয়, ভারি বর্ষা হইলে ইহার ফলন ভাল হয়। মানভূম, বীরভূম, আসাম, দার্জ্জিলিঙ উপত্যকাভাগে ইহার চাষ হইতেছে।

কামিনী সরু—বাঙলার একটি সুগন্ধী ধান, বাঁকতুলসীর সমসময়ে চাষ হয়। নিচুজমিতে জন্মায়। ফলন খুব অধিক নহে। ইহার চাউলে পরমান্ন প্রস্তুত হয়।

রাঙ্গি—২৪ পরগণার এক রকম মোটা ধান। ধান রাঙা, চাউলও মোটা এবং খুব শাদা নহে। ভাগলপুরেও ইহার চাষ আছে। মেদিনীপুরে এক প্রকার রাঙ্গি আছে। বাঙলার রাঙ্গির সহিত কিছু তফাৎ আছে। মুর্শীদাবাদেও রাঙ্গির আবাদ আছে। অগ্রহায়ণ, পৌষে ধান পাকে। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশেও রাঙ্গির চাষ হয়।

পেশোয়ারি সোয়াতি—ইহা পঞ্জাবের ধান। এখন কিন্তু উড়িষ্যায় যাইয়া পড়িয়াছে। পঞ্জাব অপেক্ষা উড়িষ্যা ধান সরু হইতেছে। ২৪ পরগণায় নিচু জমিতে ইহার চাষ হইতেছে। শিবপুর ক্ষেতে ইহার পরীক্ষা হইয়াছিল। ফলন খুব অধিক নহে। চাউলে বেশ সুগন্ধ আছে। শিবপুর ক্ষেতে পরীক্ষিত ধানের নাম পেশোয়ারি সোয়াতি। ইহা আরও অনেক প্রকারের আছে।

জটাকল্‌মা—ববারবাট প্রভৃতি কয়েক জাতীয় খুব মোটা ধানের চাষ ২৪ পরগণায় হয়। ধানের গাছ গুলি প্রায় ৬ ফিট বাড়ে। ক্ষেতে জল, গাছের গলায় গলায় থাকিলে ভাল হয়। শ্রাবণ, ভাদ্রে রোপণ করিতে হয়। অগ্রহায়ণ, পৌষে কাটা হয়। বিঘায় ১০ মণ বা ১২ মণ ফলে। মুর্শীদাবাদে বাঁশমুগুর নামে এক প্রকার আউশধান আছে তাহাও বড় মোটা।

বোরো—বোরো ধান চম্পারণেই বেশী হয়। নিচু জমিতেই ইহার চাষ হয়। পৌষমাসে ধান কাটা হয়, বেশী জলের আবশ্যক। পাটনাতে, বাখরগঞ্জে ইহার হৈমন্তিক ধানের মত চাষ হয়। নোয়াখালি ও বাখরগঞ্জের পলিপড়া নদীর চরে ইহা উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে। ত্রিপুরাতে আউশ ধানের মত ইহার আবাদ হয়। সেখানে শীতের শেষে নদীর চরে ইহার আবাদ হয় এবং চৈত্র, বৈশাখে ধান কাটা হয়। চাউল খুব মোটা, দরিদ্র লোকেই ইহার চাউল ব্যবহার করে।

বালাম—একটি প্রসিদ্ধ আমন ধান। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়ে বীজের জন্য তলা ফেলা হয়। শ্রাবণে বীজ-ধান তৈয়ারি হয়। শ্রাবণের শেষে রোপণ শেষ হয়। অগ্রহায়ণে ধান কাটা শেষ হয়। ফলন বিঘা প্রতি ৬ মণ হইতে ৮ মণ। পূর্ব্ববঙ্গে পলিপড়া জমিতে ১০ মণ ১২ মণ ফলন হইতে পারে। ধান সরু, চাউল মিহি হয়। ভাত খুব নরম। চাউল সিদ্ধ হইয়া খুব বাড়ে, এই জন্য লোকে বলে বালাম চাউল খুব ভাতে বাড়ে। অন্যান্য সিদ্ধ চাউলের ধান বেশ রীতিমত সিদ্ধ করিলে তবে ধানের তুঁষ ছাড়ে, কিন্তু বালাম ধানের খুব অল্প গরমজলের ভাপে তুঁষ ছাড়িয়া যায়। এমন কি ধান মেলিয়া দিয়া তাহার উপর গরম জল ছিটাইয়া দিলে ধান হইতে তুঁষ আল্‌গা হইয়া পড়ে। খুব অল্প জলে ইহার চাষ হয়। গয়াতে বালাম ধান অপেক্ষাকৃত মোটা। যশোহর, মুর্শিদাবাদে ইহার চাষ হইয়া থাকে। পুর্ণিয়ার বালামও মোটা. তথায় শ্রাবণ, ভাদ্রে ইহার বীজ রোয়া ও পৌষ মাসে কাটা হয়। এই ধানের ক্ষেতে ১৷৷০ হইতে ২ ফিট জলের আবশ্যক। ফরিদপুরে ইহার চাষ প্রচুর। তথায় ইহার ফলন সমধিক। নোয়াখালিতে আউশ ধানের মত উচ্চ ও শুষ্ক জমিতে ইহার চাষ হয়। বৈশাখে ধান বোনা ও শ্রাবণ ভাদ্রে কাটা হয়।

ধলী—বাঙলার এক জাতীয় সরু ধান। আউশের পরই এই ধান কাটা হয়। কয়েক প্রকারের ধলী ধান আছে। চাউল খুব মিহি না হউক সরু বটে। না উঁচু না নিচু এই রকম মাঝারি জমিতে হয়। অধিক জলের আবশ্যক নাই। পাকিবার সময় আউশ ও আমনের মাঝামাঝি। ফলন বিঘা প্রতি ৭৷৮ মণ।

ভুট্টা

ভারতীয় কৃষি-সমিতির উদ্যান তত্ত্বাবধায়ক

শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত

ভুট্টা—উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ, খাদ্য হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা এবং ইহার ব্যবহার।

সমগ্র পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই গমের ময়দা ব্যবহার করিতে ভালবাসে বিশেষতঃ ইংলণ্ডের লোকের গমের ময়দার রুটী না হইলে চলে না। এই কারণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীতে যত প্রকার খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে গমের পরিমাণই অধিক, গমের নীচেই ভুট্টা। ভুট্টার পরিমাণ বড় কম নহে—১৯১৩-১৪ সালে সমস্ত পৃথিবীতে ১,৭৩৩,১০৯,৫১৭ হন্দর ভুট্টা জন্মিয়াছে, গম জন্মিয়াছে ২,০৫৩,৩৪৫,৭২৭ হন্দর। এমনও দেখা যায় যে কোন বৎসর গম অপেক্ষা ভুট্টা অধিক জন্মিয়া থাকে।

গমের সহিত ভুট্টা যে সর্ব্বতোভাবে পাল্‌টাপাল্‌টি ব্যবহার করা যায় তাহা নহে, তবে গমের অভাব হইলে তাহার স্থান ভুট্টা, যব, যৈ দ্বারা পূরণ হইতে পারে। খাদ্য হিসাবে গমেতে যে গুণ আছে ভুট্টাতেও প্রায় অনুরূপ গুণই দেখা যায়। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, খাদ্য হিসাবে গমের উপাদানে ও ভুট্টার উপাদানে সামান্য কিছু কম বেশী আছে। ভুট্টা অপেক্ষা গমের মূল্য অধিক, মূল্য হিসাবে ভুট্টাই সাধারণের নিকট আদৃত হওয়া উচিত, মুল্যের কথা বাদ দিলে গম ভুট্টা অপেক্ষা অধিক বলকারক। গমে অধিক মাত্রায় প্রটিড্ আছে কিন্তু ভুট্টাতে গম অপেক্ষা অধিক মাত্রায় শ্বেতসার ও শর্করা পাওয়া যায়। ভুট্টাতে চাউল অপেক্ষা অধিক মাত্রায় প্রটিড ও তৈল পদার্থ আছে কিন্তু শ্বেতসারের ভাগ তদপেক্ষা কম। চাউল, গম, ভুট্টা, রাই, যব এবং যৈ এই কয়টি খাদ্য শস্য তুলনা করিয়া দেখান হইল—

প্রত্যেক শস্যে শতকরা কত ভাগ গ্রহণীয় উপাদান তাহাই প্রদত্ত হইল—

	প্রটিড	শ্বেতসার ও শর্করা	তৈল পদার্থ	মোট
গম	১০·২	৬৯·২	১·৭	৮১·১
ভুট্টা	৭·৯	৬৬·৭	৪·৩	৮৭·৯
রাই	৯·৯	৬৭·৬	১·১	৭৮·৬
চাউল	৪·৮	৭২·২	০·৩	৭৭·৩
যব	৮·৭	৬৫·৬	১·৬	৭৫·৯
যৈ	৯·২	৪৭·৩	৪·২	৬০·৭

প্রোফেসার বর্থ-ডেভী যিনি সম্প্রতি ভুট্টা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তিনি বলেন যে ভুট্টা যেরূপ দামে সস্তা এবং ইহাতে যে সকল শরীর পোষণকারী উপাদান আছে তাহাতে অনুমান করা যায় পৃথিবীময় এই খাদ্য শস্যের বহুল ব্যবহার হইবে। তবে ইহা ব্যবহারে যে অত্যধিক আগ্রহ দেখা যায় না তাহার কারণ যে ইহার আটা বা ময়দায় ততটা লাস বা আঠা নাই, সেইজন্য ইহাদের রুটী বা পাঁউরুটী সুবিধামত হয় না এবং আর একটি অসুবিধা এই যে, ইহাতে তৈল পদার্থ অধিক মাত্রায় থাকায় ইহা গুঁড়াইয়া ময়দা বা আটা করিবার কিছু কাল পরেই ইহাতে একপ্রকার টক্ গন্ধ হয়, টাট্কা ভিন্ন ইহার ব্যবহার চলে না।

গমের ময়দা ও ভুট্টার ময়দার রুটীর গুণাগুণ তুলনা করিয়া দেখ—

	গমের রুটী	ভুট্টার রুটী
জল ...	৪০·০ ...	৩৮·০
প্রোটিড ...	৬·৫ ...	৮·৫
তৈল পদার্থ ...	১·০ ...	২·৭
শ্বেতসার বা শর্করা	৫১·২ ...	৪৭·৩
সেলুলোজ ...	·৩ ...	——
ছাই ...	১·০ ...	৩৫
	১০০·০	১০০ ০

ভুট্টা অনেক রকমে খাওয়া যায়। ভুট্টা দানা গুঁড়াইয়া ময়দার মত না করিয়া আধ ভাঙ্গা করিয়া তাহা সিদ্ধ করিয়া তরকারীর মত খাওয়া যায় ইহার সহিত লবণ সংযোগ করিতে হয়। আলু ও দাইল সিদ্ধ ভাত যেমন খায় ইহাও সেই রকমে খায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় তদ্দেশবাসীগণ ইহা সিদ্ধ করিয়া দুধ চিনির সহিত আহার করে এবং ইহাদ্বারা পুডিং, পিষ্টক, মেঠাই প্রস্তুত করে।

আয়রল্যাণ্ডে, আমেরিকা যুক্ত-প্রদেশেও এই প্রকার পুডিং ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইটালিয়ানগণ ভুট্টার ময়দার সহিত পনির মিশাইয়া খাইয়া থাকে। কোথাও বা ভুট্টার ফলগুলি আগুণের আঁচে ঝলসাইয়া বা পুড়াইয়া লইয়া সেই অর্দ্ধদগ্ধ দানা গুলি চিনির রসে পাক করিয়া লাড্ডু পাকান হয়। ইহা অনেকের বড় প্রিয় খাদ্য। টারটারিক অম্লে বা ভিনিগারে ফেলিয়া ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য ভুট্টার চাট্নিও প্রস্তুত করিয়া রাখা হয় কিম্বা লবণ জলে ফেলিয়া রক্ষা করা হয়।

ভুট্টা হইতে চিনি প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা হইতে রস, সারগুড় ও চিনি এই কয় রকমই হইতে পারে। ইহা হইতে যে মাত গুড় হয় তাহার মিষ্টতা কম এবং গন্ধও তাদৃশ লোভনীয় নহে। এই মাতগুড়ের সহিত ইক্ষুর মাত শর্করা ১০ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে বেশ ভাল জিনিষ হয় এবং বাজারে

তাহাই বিক্রয় হয়। যুক্তপ্রদেশে ও জার্ম্মানিতে সমধিক পরিমাণে ভুট্টার গুড় তৈয়ারি হয়। ম্যানচেষ্টারেও সম্প্রতি ভুট্টা গুড় ও চিনি প্রস্তুতের কারখানা হইয়াছে। মেক্সিকোবাসীগণ ভুট্টার ডাঁটাও বাদ দেয় না—তাহারও রসে চিনি পাওয়া যাইতেছে। এখানে ভুট্টার খুব প্রকাণ্ড গাছ হয়। মদের কারখানায় ভুট্টার ব্যবহার খুব। যুক্তপ্রদেশে ভুট্টামদের কারখানা খুব ফেলাও। বিগত বর্ষে কম বেশ ৩০,০০০,০০০ গ্যালন ব্রিটিস্ জিন ও হুইস্কী ভুট্টা হইতে প্রস্তুত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে কিছু পরিমাণ মল্‌ট জমিয়াছে। আমেরিকার বুরবন হুইস্কী ভুট্টা হইতেই প্রস্তুত। ২০,০০০,০০০ বুসেল ভুট্টা যুক্তরাজ্যে ভাটিখানাতে খরচ হয়। অনেক ভাঁটিখানাতেই ভুট্টা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার হয়। এক বুসেল ওজনে প্রায় একমণ।

গবাদির খাদ্য হিসাবে ভুট্টা খুবই মূল্যবান। ভুট্টা খাওয়াইলে গো-মহিষাদির দুধ বাড়ে। ভেড়া, শুকর, ছাগল প্রভৃতিকে হৃষ্ট, পুষ্ট করিতে হইলে ভুট্টা খাওয়ান ভাল। ভুট্টা খাইতে পাইলে বলদ খুব বলবান হয়। গবাদিতে ভুট্টাদানা খাইতে বড় ভালবাসে। ইহাতে তৈলাক্ত পদার্থ বেশী পরিমাণে থাকায় ইহা তাহাদের অধিকতর মুখরোচক, ইহাতে শ্বেতসার ও শর্করা এবং তৈল পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় ইহাদ্বারা অধিক চর্ব্বি উৎপন্ন হয়। গবাদি পশুকে মোটা করিতে ইহার মত আর কোন শস্য নাই। মাংসদায়ী পশুগণকে খাওয়াইলে তাহাদের মাংস যদিও গুণে, স্বাদে ততভাল হয় না কিন্তু ইহা ব্যবহারে ওজন খুব বাড়ে বলিয়া ভুট্টা তাহাদিগকে এত কদর করিয়া খাওয়ান হয়।

আমেরিকাতে যে শুকরের আবাদ আছে তথায় তাহাদের খাদ্যের জন্য ভুট্টাচূর্ণ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হয়। গমচুর্ণের সহিত ইহা প্রায় তুল্য। কিন্তু যদি গমচুর্ণের সহিত মিশাইয়া ইহা খাওয়ান যায় তাহা হইলে কথাই নাই। খাদ্য হিসাবে তখন ইহার গুণ কেবল গমচুর্ণ অপেক্ষাও অধিক এবং শত করা ৩ ভাগ খাদ্য শস্য কমও ব্যবহার করিতে পারা যায়। সেটা কিছু কম লাভ নহে। তার পর গমের মূল্য অপেক্ষা ভুট্টা মূল্য কত কম তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ভুট্টা ব্যবহার করায় কত লাভ। আমেরিকাতে ঘোড়াকেও ভুট্টা খাওয়ায় কিন্তু ঘোড়ার পক্ষে যৈ এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইহা স্বাকার করিতেই হইবে। কিন্তু দামের তুলনায় ভুট্টার প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ভুট্টা ডাঁটা অসময়ের জন্য জাঁত দিয়া রাখিয়া দিলে পশু খাদ্যে ব্যবহার হইতে পারে। তৈল বাহির করিয়া লইয়া ভুট্টার খৈল গবাদিকে খাওয়ান যায়, মদের ও চিনির কারখানার কাট বা পরিত্যক্ত মাত বা চিটা বা ভুষা গবাদিকে খাওয়াইলে তাহারা হৃষ্ট পুষ্ট হয়। এই কারণে খাদ্য হিসাবে ভুট্টাকে শ্রেষ্ঠতর বলিতে পারা যায়।

সরকারী কৃষি সংবাদ

ধানের "উফ্‌রা" রোগ

(ইম্পিরিয়াল মাইকলজিষ্ট ডাক্তার ই, জে বাট্‌লার. এম, বি, এফ, এল, এস, লিখিত, ইংরাজী* হইতে অনুবাদ)।

সৌভাগ্যক্রমে ধানের রোগ ভারতবর্ষে সাধারণতঃ কম। যব, গম ইত্যাদিও ধান্তজাতীয় শস্য, কিন্তু ইহাদের তুলনায় ধানের গাছের তেমন কোন বিশেষ হানিকর ছাতা ধরা রোগ নাই বলিলেই হয়। প্রধানতঃ এই জাতীয় শস্যের দুইটী ছাতা রোগ হয়; মরিচা ধরা রোগ (বা রাষ্ট) ও কাল গুঁড়া রোগ (বা স্মট), যাহাকে কোথাও কোথাও "ধানের গু" বা "লক্ষীর গু" বলে। প্রথম রোগ এ পর্য্যন্ত ধানে পাওয়া যায় নাই, দ্বিতীয় রোগও অতি বিরল। ধানের অনিষ্টকারী পোকার সংখ্যা অনেক। সাধারণতঃ তাহারা মাঠের মাঝে মাঝে এক একটী ধান গাছকে আক্রমণ করে। মোটের উপর পোকায় ধানের অনেক ক্ষতি করে বটে, কিন্তু ফসলের সমস্তটাই নষ্ট করে না। কৃষক যাহা পায় তাহাই তাহার পরিশ্রমের ফল

* গভর্ণমেণ্ট কৃষি বিভাগ হইতে প্রকাশিত।

বলিয়া মনে করে এবং সেই জন্য পোকার অনিষ্ট নিবারণ করিতে তেমন বিশেষভাবে মনোযোগ দেয় না।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গোপসাগরের উত্তরে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায় ধান গাছের এক নূতন রকমের উৎকট রোগের সংবাদ পাওয়া যায়। অনেকদিন হইতে এ রোগ বর্ত্তমান ছিল কিন্তু বিগত কয়েক বর্ষ হইতে ইহা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ঐ সকল স্থানের সংবাদদাতাদিগের মতে কৃষকেরা ইহাদ্বারা সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে। কৃষকেরা এই রোগকে "উপরা" বলে। তাহারা মনে করে বর্ষাকালে মেঘ গর্জ্জন হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয়; মাথার উপরে অর্থাৎ মেঘে যত গর্জ্জন হইতে থাকিবে তত ধানে "উপ্‌রা" হইবে। উপরের মেঘ গর্জ্জন হইতে ইহার নাম "উপ্‌রা" বা "উফ্‌রা"।

আরও অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে ঢাকা জেলাতেও এই রোগ আছে। এই তিন জেলা ব্যতীত এ পর্য্যন্ত অন্য কোথাও ইহা হইতে শুনা যায় নাই; কিন্তু ক্রমে এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে অনতিবিলম্বে নিকটবর্ত্তী অপর জেলাসমূহেও ইহা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

লক্ষণ সকল দ্বারা "উফ্‌রা" সহজেই চিনিতে পারা যায় এবং ইহার প্রথম অবস্থাতেও কৃষকেরা বুঝিতে পারে যে তাহাদের ফসলে রোগ দেখা দিয়াছে। অনভ্যস্ত লোকে এসব চিহ্ন লক্ষ্য করিতে না পারিয়া প্রথম অবস্থায় ইহাকে সহজে না ধরি'তও পারে। ফসল লাগানর চারি পাঁচ মাস পরে রোগ দেখা দেয় এবং ধান গাছের পাতার অগ্রভাগ শুকাইতে আরম্ভ করে ও কচি ডগগুলি বিবর্ণ হইয়া যায় এবং শিথিল হইয়া পড়ে। ক্রমে লাল্‌চে রঙের দাগসমূহ উপরের পত্রাবরণে দেখা দেয়। এ ভিন্ন ধানের শীস্ বাহির হওয়া পর্য্যন্ত আর বিশেষ কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় না। সেই সময় অধিকাংশ গাছের অগ্রভাগ ফুলিয়া উঠে এবং উহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে পাতার পেটোর মধ্যে অপরিপুষ্ট শীস্ বা থোড়টি রহিয়াছে। অনেক সময় শীস্‌টি বাহির না হইয়া আবদ্ধ অবস্থাতেই ধান কাটার সময় পর্য্যন্ত থাকিয়া যায় এবং সেই সময় দেখা যায় যে উহাতে ছাতা ধরিয়াছে এবং ইহা পচিতেছে। রোগের এই অবস্থার নাম "থোড় উফ্‌রা"। শীস্‌টি সময় সময় সম্পূর্ণভাবে, কখনও বা আংশিকভাবে বাহির হয়; তবুও নীচের ধানগুলি প্রায় পরিপক্ব হয় না এবং উপরের ধানগুলিও শুকাইয়া চিম্‌সে হইয়া যায়। এই অবস্থার নাম 'পাকা' বা পরিপক্ব উফ্‌রা। থোড়ের আবরণটি ক্রমেই শুকাইয়া যায় এবং ইহাতে লাল্‌চে রঙের দাগ দেখা দেয় (চিত্রপট হইতে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে)। পত্রাবরণগুলি খুলিয়া ফেলিলে দেখা যায় যে ডাঁটার ডগের দিকের গিরা সকলের ঠিক উপরেই প্রায় এক ইঞ্চি কাল ও সরু (ছিনে) হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ শীসের গোড়া এবং তাহারই নীচের পাব্‌টির গোড়ার

এই অবস্থা হয়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সামান্য লক্ষণও সময় সময় বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু উপরি উক্ত চিহ্নগুলি এই রোগের বাহ্যিক বিশেষ লক্ষণ।

বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ হওয়ার পরেও কিছুদিন যাবৎ উফ্‌রা রোগের কারণ অপরিজ্ঞাত ছিল। কিছুদিন হইল ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে অতি ক্ষুদ্র কেঁচোর মত এক জাতীয় কৃমির আক্রমণই এই রোগের কারণ। এই ক্ষুদ্র কৃমির অনেকেই উদ্ভিদ্‌ এবং জীব জন্তুর দেহে উৎপন্ন হইয়া পরবাসীরূপে থাকে। যে কৃমি এই উফ্‌রা রোগ জন্মায় উহা টাইলেনকাস্‌ শ্রেণীর অন্তর্ভূ'ত এবং ইতিপূর্ব্বে অজানিত ছিল। ধান জাতীয় শস্যের বিশেষ অনিষ্টকারী আরও দুইটি কৃমি এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। এক প্রকার কৃমি (টাইলেনকাস্‌ টি্টিসাই) গমের শীসে কোকড়ান রোগ জন্মায়। পঞ্জাবে ও ইউরোপে ইহা সাধারণতঃ দেখা যায়। আর এক প্রকার কৃমি (টাইলেনকাস্‌ ডিপ্‌সৈচি) অনেক শস্যের ডাঁটার ভিতরে দেখা যায় এবং পিয়াজ, আলু ইত্যাদিতেও হয়। উফ্‌রার কৃমি এই শেষোক্ত কৃমির অনুরূপ কিন্তু তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং ইহা ঐ কৃমির ন্যায় ডাঁটা বা পাতার পেশীর ভিতর প্রবেশ করে না, পেশীর বাহিরেই থাকে।

আক্রমণের প্রথম অবস্থায় কৃমিগুলিকে উপরের কচি ডগার নিকটবর্ত্তী স্থানে নরম পাতার ভিতরে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। "থোড় উফ্‌রায়" ডাঁটার কাল দাগবিশিষ্ট ছিনে অংশে এবং শীসের নিম্নভাগে উহারা একত্রিত হয়। সময় সময় শীসের ভিতরেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। শীসে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা বীজগুলিকে ঢাকিয়া রাখে বীজ বড় হইবার পূর্ব্বে ইহারা সেই সকল বীজাবরণ পত্রের ভিতর লুকাইয়া থাকে। পাকা উফ্‌রায় ও ঠিক ঐ সব জায়গায় ইহাদিগকে দেখা যায় উপরন্তু শীসের মধ্যে ইহারা অত্যধিক জন্মে। বীজ বড় হইলেও ইহারা বীজাবরণ পত্রের ভিতরেই বীজের চারিধারে থাকে।

প্রত্যেক কৃমি এত সূক্ষ্ম যে সচরাচর ইহারা লম্বে এক ইঞ্চির পঁচিশ ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও কম এবং ইহাদের পরিসর এক ইঞ্চির পনর শত ভাগের এক অংশ হইতে পারে; অতএব ইহারা সহজ চক্ষুর অগোচর। যখন অনেকগুলি এক জায়গায় জমা হয় তখন কতকটা শাদা তুলার ন্যায় দৃষ্ট হয়। পূর্ণবয়স্ক পুং ও স্ত্রী জাতীয় কৃমি, অপূর্ণবয়স্ক কৃমি এবং ডিম সকলই সচরাচর একত্রে মিশিয়া থাকে। এই শ্রেণীর অন্যান্য কৃমির ন্যায় ইহাদের মুখে একটি ক্ষুদ্র শুঙ্গ আছে এবং খাইবার সময় ইহা বাহির করিতে ও ঢুকাইয়া লইতে পারে। গলনালীতে মাংসপেশী সমন্বিত একটী গোলাকার স্থলী (থলী) আছে। ইহারই সঞ্চালনে গাছের পশীগুলি শুঙ্গর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রস চুষিয়া লয় ক্রমশঃ

বঙ্গদেশ সরকারী শস্য সংবাদ—

ভাদ্রের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিঙ প্রভৃতি জেলা সমূহে উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইয়াছে। অন্যত্রও বৃষ্টি হইতেছে কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে অতিসত্বর আরও বৃষ্টির আবশ্যক। বৃষ্টির অল্পতাহেতু পাট কাটা ও হৈমন্তিক ধান রোয়ার ব্যাঘাত হইতেছে সমস্ত বাঙলা জুড়িয়া আউশ ধান ও পাট আহরণ কার্য্য চলিতেছে। ক্ষেত্রস্থ শস্যের অবস্থা মোটের উপর ভাল। কোন কোন জেলায় গবাদি পশুর রোগের কথা শুনা যাইতেছে। এমন সময় চাউলের দর কিঞ্চিৎ চড়ে কিন্তু এ বৎসর চাউলের রপ্তানি বন্ধ বলিয়া চাউলের দর নামিতেছে।

বিহার ও উড়িষ্যা—

হৈমন্তিক ধান্য রোয়া চলিতেছে। পাটনা, সারণ, দ্বারবঙ্গ, পুর্ণিয়া এবং মজঃফরপুর ও হাজারিবাগের স্থানে স্থানে বৃষ্টির অল্পতা হেতু কাজের ব্যাঘাত হইতেছে।

পূর্ণিয়া ও কটকে পাট কাটা হইতেছে কিন্তু পাট পচাইবার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল নাই।

ভাদুই ফসল ভালরূপ জন্মিতেছে। কেবলমাত্র ভাগলপুর ও কটকে নদীর জল বাড়িয়া শস্যের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। পুরীতেও নদীর জল বাড়িয়া প্লাবিত পশুখাদ্য তাহাদের পানীয় জলের অভাব নাই, তথাপি এতদঞ্চলের ১৩টি জেলায় পশুগণ রোগাক্রান্ত হইতেছে। উড়িষ্যার করদরাজ্য সমূহে শস্যের অবস্থা ভাল।

আসাম—

সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইয়াছে, আমন ধান রোয়া চলিতেছে। চা পাতা তোলা চা তৈয়ারি হইতেছে। পাট কাটা ও আশু ধান্য কাটা হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে অনুমান করা যায় যে আশু ধান্য ও চা পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যাইবে। দ্বারবঙ্গে শস্যে পোকা লাগিয়াছে।

ভাদ্র, ১৩২১ সাল।

ছোট এলাচের চাষ

পূর্ব্ববঙ্গ সীমান্তে ও আসাম প্রদেশের কোন কোন স্থানে ছোটএলাচের চাষ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা কয়েক বৎসর হইতে চলিতেছে, তন্মধ্যে দুই একটি স্থলে বর্ত্তমান সময়ে উৎপাদিত ফসলের অবস্থা বিবেচনা করিলে এলাচ চাষের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এতদ্দেশে ছোট এলাচ উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র মালাবার উপকুল ও সিংহলদ্বীপ। এই সমুদয় অঞ্চলে চাষের পদ্ধতি কিরূপ তাহা জানা থাকিলে এলাচ উৎপাদনোচ্ছুক ব্যক্তিবর্গের অনেক পরিমাণে সহায়তা হইতে পারে; বর্ত্তমান প্রবন্ধ অবতারণার মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাই—

সংস্কৃত ভাষায় ছোট এলাচের কতিপয় নাম দৃষ্ট হয়; যথা পৃথ্বীক, চন্দ্রবলা, এলা প্রভৃতি, এলাচের উল্লেখ সুশ্রুতের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে বহু পুরাকাল হইতে ভারতে এলাচের প্রচলন ছিল। কালক্রমে গোলমরিচ ও আদার ন্যায় এলাচও এতদ্দেশ হইতে ইউরোপে প্রেরিত হয়। ভারতবর্ষ ব্যতীত চীন, শ্যাম, মলয়দ্বীপপুঞ্জ, ম্যাডাগাস্কর ও পশ্চিম আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও এলাচ উৎপাদিত হয়। কিন্তু পৃথিবীর ব্যবসায়ের হিসাবে ভারত ও সিংহলই উৎপাদনের প্রধান স্থান। ইংরাজীতে কার্ডেমম্ (Cardamom) বলিতে সাধারণতঃ ছোট এলাচই বুঝায়, বড় এলাচ Bengal Cardamom, Nepal Cardamom প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহার বিদেশে তেমন রপ্তানি নাই। ছোট এলাচ যে গাছ হইতে উৎপাদিত হয় উদ্ভিদ শাস্ত্রে তাহার নাম Elletari Cardamomum। ইহা বন্য অবস্থাতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৎসরে ভারত সাম্রাজ্যে প্রায় অর্দ্ধ কোটি সের ছোট এলাচ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ছোট এলাচ ফলের আকৃতি ও গাছের প্রকৃতি ভেদে 'মালাবার' ও 'মহীশুর' এই দুই নামে আখ্যাত হয়। 'মালাবার' জাতির আবার ছোট, বড় ফল হিসাবে

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুইটি প্রকার আছে। 'মহীসুর' জাতি হইতেই উৎকৃষ্টতর এলাচ পাওয়া যায় এবং ইহার গাছও অধিকতর উন্মুক্ত স্থান সহিষ্ণু। এই দুই জাতির অন্যান্য লক্ষণ সমূহের মধ্যে ইহা জ্ঞাতব্য যে মহীসুর জাতির পুষ্পদণ্ড ঠিক সোজা হইয়া উঠে এবং 'মালাবার' জাতির পুষ্পদণ্ড পার্শ্বিক ভাবে জমির উপর পরিবর্দ্ধিত হয়।

'মালাবার' উপকূলের পর্ব্বতমালার পশ্চিম গাত্রে সরস স্থান সমূহই ছোট এলাচের জন্মভূমি। কানাড়া, কোচিন, ব্রহ্মদেশের টেনাসেরিম কেন্দ্রে, মান্দ্রাজের মদুরা অঞ্চলে ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সুশীতল গিরি প্রদেশে বন্য এলাচ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বন্য এলাচের পুষ্পদণ্ড ছোট হয় এবং তজ্জন্য স্থানীয় লোকেরা পার্শ্বস্থ বন জঙ্গলাদি জ্বালাইয়া এলাচ গাছের অধিকতর পরিপুষ্টির স্থান করিয়া দেয়। অন্যত্র ইহার চাষের জন্য সমধিক যত্ন ও পরিশ্রম করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুর্গদেশের প্রথার উল্লেখ করিতে পারা যায়।

কুর্গদেশে বনবিভাগ এলাচ চাষের জন্য ১৪ হইতে ২০ বৎসরের নিমিত্ত জমি বিলি করিয়া থাকেন। ফাল্গুন মাসে কৃষকেরা ছায়াযুক্ত বন অথবা পর্ব্বত গাত্র নির্ব্বাচন করিয়া প্রায় এক এক বিঘা চৌকা জমি হইতে লতাগুল্ম প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া ফেলে। এইরূপ দুই খণ্ড পরিষ্কৃত জমির মধ্যে প্রায় ৫০।৬০ হাত অকর্ষিত জমি স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবধানে রাখা হয়। অবশ্য যে স্থানে এলাচের চারা বন্য অবস্থায় জন্মিয়াছে, সেই স্থানই উত্তম বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু এতদ্ভিন্ন যে স্থলে আবলুস্, গোল মরিচ অথবা জায়ফলের গাছ দেখা যায়, সে স্থলগুলিও উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া ধরা হয়। দশ জন লোকে গড়ে প্রত্যেক দিবস প্রায় ৫টি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারে এবং বৎসরে প্রায় ১০০ ক্ষেত্র বিরচিত হইয়া থাকে। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে সারযুক্ত সরস দোয়াঁস জমিই এলাচের পক্ষে উৎকৃষ্ট। কাদা এঁটেল জমিতে গাছ বেশ ভাল হয় বটে কিন্তু ফলন তেমন হয় না। ক্ষেত্রগুলি খুব ঘন সন্নিবিষ্ট হইলে জমির সরসতার পরিমাণ কমিয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে প্রথম বারিপাত হইলেই জমি পরিষ্কার করিবার সময় যে সকল গাছের গুঁড়ি কিম্বা মূল প্রভৃতি থাকিয়া গিয়াছে, তাহাদের নিকটবর্ত্তী স্থানেই অঙ্কুর প্রথম উৎপাদিত হয়। প্রথম বৎসরে গাছ প্রায় ২ ফিট পর্য্যন্ত বাড়ে। ঐ সময়েই নিড়ান আরম্ভ হয় এবং প্রত্যেকে গাছের চতুষ্পার্শ্বে ৬ বর্গ ফিট আন্দাজ জমি পরিষ্কার করিয়া অপেক্ষাকৃত হীনতেজ গাছ সকল তুলিয়া ফেলা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বৎসর হইতে সামান্য নিড়ানই আবশ্যক হয়, কারণ এলাচ গাছের ছাওয়ায় অন্য কোন গাছ জন্মায় না, প্রায় ৩ তিন বৎসরের শেষে প্রথম ফসল হয় এবং তাহার কিয়দংশ দেবপূজার জন্য দেওয়া হয়। এই সময়ে প্রত্যেক কন্দ

হইতে প্রায় আটটি কাণ্ড উৎপাদিত হয়। চতুর্থ বর্ষ অপেক্ষাকৃত অধিক ফসল এবং তাহার পর ৬।৭ বৎসর পূরা ফসল পাওয়া যায়।

দশম একাদশ বৎসরের পর গাছগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। তখন আবার নূতন ক্ষেত্র রচনা করিবার জন্য গাছ কাটা হয়। গাছ কাটিয়া ক্ষেতে ফেলিলে অরণ্যে অনেক এলাচগাছ মরিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে চাষীর সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা হয় না, কারণ প্রত্যেক মৃত এলাচগাছের অন্তর্ভৌম কাণ্ড হইতে আবার সতেজ নূতন চারা উৎপাদিত হয় এবং তাহা হইতে পুনরায় এক পর্য্যায় এলাচ ফসল জন্মাইয়া থাকে। মহীশুর রাজ্যে বিশেষ একটি সরকারী বিভাগদ্বারা এলাচ চাষের বন্দোবস্ত করা হয়। এই স্থানে দুইটী ক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহ বাদ দেওয়া হয় না। কোন কোন এলাচ-কর সাহেব তলা ফেলিয়া চারা উৎপাদন করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় গাছের মধ্যে ৭ ফিট ব্যবধান রাখা হয়। কানাড়া অঞ্চলে সুপারি অথবা গোলমরিচ বাগানে এলাচ চাষ হয় এবং বীজ, কন্দ ও কটিং তিন প্রকার উপায়েই গাছ উৎপাদিত হয়। স্থানে স্থানে সুপারির সহিত পর্য্যায় ক্রমে এলাচ বসাইবার প্রথাও দৃষ্ট হয়।

সিংহল দ্বীপেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এলাচ চাষ হয়, মাতালি, মেদমহনবর ও হেওয়া হাতাই ইহার প্রধান কেন্দ্র। পর্ব্বতের উপত্যকার কোন অংশে অথবা অধিত্যকায় ছায়াযুক্ত কোন নিম্নতল স্থানে অধিকাংশ লতাগুল্ম কাটিয়া ফেলিয়া ছায়ার জন্য কিয়ৎ সংখ্যক গুল্ম রাখিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে বর্ষা হইলে মূল প্রভৃতি তুলিয়া ফেলা হইয়া থাকে। জল নিকাশের বন্দোবস্ত অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু যদি কোথাও আবশ্যক হয় তাহা হইলে অন্ততঃ ২ ফিট গভীর ও প্রস্থ নালা প্রস্তুত করাই নিয়ম। ইহার সমদূরবর্ত্তী শ্রেণীতে ৭ ফিট অন্তর ১½-২ ফিট প্রস্থ ও ১২-১৫ ইঞ্চি গভীর গর্ত্ত করিয়া উহা বনজ সার দ্বারা পুরণ করা হয়। সিংহলের চাষীরা কাণ্ড বসাইবার পূর্ব্বে মূল লম্বা থাকিলে ছাঁটিয়া দেয় ও বসাইবার সময় মূলগুলি বেশ করিয়া ছড়াইয়া দিয়া এরূপ ভাবে রোপণ করে যে বায়ব্য কাণ্ড অনাবৃত থাকে, অঙ্কুরিত যুগ্ম কন্দ পাইলে তাহাই বীজ উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। সম্প্রতি কন্দের পরিবর্ত্তে বীজের অধিক প্রচলন হইয়াছে। সুপক্ক বীজ অল্পক্ষণ রৌদ্রে শুকাইয়া কয়েক ঘন্টা জলে ভিজাইয়া রাখা হয়। তৎপরে বালি ও উদ্ভিজ্জ সারযুক্ত বীজ তলায় পাতলা করিয়া রোপিত হইয়া থাকে। তাহার উপর ছায়ার জন্য আচ্ছাদন দেওয়া হয়। বৃষ্টি হইলেই কিম্বা অনাবৃষ্টির ভয় না থাকিলে উক্ত চারা তুলিয়া ক্ষেত্রে বসাইতে পারা যায়। সিংহলে একর প্রতি ১০০ হইতে ১১০ সের এলাচ উৎপাদিত হয়। ১৯১০ সালে এলাচের জমির পরিমাণ ৭,৪২৩ একর ছিল। উৎপাদিত ফসলের মূল্য ৪৬,৭৮,৩৮০৲ টাকা। সিংহলে প্রায়

বৎসরের সকল সময়েই এলাচের ফুল হয়, কিন্তু জানুয়ারি হইতে মে মাস পর্য্যন্ত অধিক ফুল হইয়া থাকে। আগষ্ট হইতে এপ্রেল মাস পর্য্যন্ত অনেকে ফুল তুলিয়া থাকে, কিন্তু অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অধিক ফল পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে সমস্ত পুষ্পদণ্ডটী ভাঙ্গিয়া লওয়া হয়। ইহাতে ফলগুলি ফাটিয়া যায়, সিংহলে কাঁচি দ্বারা প্রায় পুষ্ট ফল কাটিয়া লওয়াই পদ্ধতি। যেমন পুষ্পদণ্ড ভাঙ্গিয়া লইলে ফল ফাটিয়া যায়, অতি পক্ক ফল তুলিলেও সেইরূপ হইয়া থাকে। মধ্যম আকারের ক্ষেত্রে প্রত্যহ প্রায় ৫ সের আন্দাজ ফল সংগৃহীত হয়, ফল সমূহ তুলিয়া তৎপরে গরমের সময় সকালে ৩ তিন ঘণ্টা ও বৈকালে ২ ঘণ্টা রৌদ্র দিতে হয়। অধিক উত্তাপে ফল ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা সুতরাং যত ধীরে অল্প উত্তাপে শুষ্ক হয় ততই ফল কম ফাটে, ক্রমাগত বর্ষা হইলে অবশ্য কৃত্রিম তাপ প্রয়োজন, এতদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই, কিন্তু তাহাতে ফল বাদামি বর্ণ হইয়া যায়—এবং মূল্য কম হয়। পূর্ব্বে জল ছিটাইয়া ফল আর্দ্র করিয়া লইলে রৌদ্রে রং অনেকটা ভাল হয় বটে কিন্তু তাহাতেও ফাটিবার আশঙ্কা। ভারতে কোন কোন স্থলে শুকাইবার আগে রিটার জলে ফলগুলি ধুইয়া লওয়া হয়।

শুষ্ক করার পর ফল সমুদয় ছাঁটা ও বাছাই করা আবশ্যক, ফলের নিম্নে বোঁটা ও উপরে বৃতিদল তখন পর্য্যন্তও বর্ত্তমান থাকে; এইগুলি ছাঁটিয়া বাদ দিতে হয়। পূর্ব্বে ইহা হাতে হইত, এখন কল দ্বারা হয়। এতদ্ভিন্ন বর্ণ হিসাবে ও বাছাই আকার হিসাবে তিন প্রকারের ছোট চালুনি দ্বারা হয়। এতদ্ভিন্ন বর্ণ হিসাবেও বাছাই হয়, বাছাই করিয়া ফাটাফল (শত করা ১০—১৫ ভাগ ফাটাফল বাহির হয়) খোসা ও ভাঙ্গা বীজ স্বতন্ত্র করা হইয়া থাকে। বাছাই ফল লম্বা, মধ্যমাকৃতি, হ্রস্ব ও ক্ষুদ্র এই কয় শ্রেণীতে ব্যবসায়ীরা ভাগ করেন। বাছায়ের পর ফল সমূহে গন্ধকের ধূম প্রয়োগ একটা আবশ্যকীয় কার্য্য। আকার, বর্ণ, খোসার মসৃণতা, স্থূলতা ও সরসতার হিসাবে এলাচের মূল্যের তারতম্য হয়। বিলাতে, সিংহল দেশে উৎপাদিত সরস ও স্থূল মহীশূর জাতির আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পক্ষান্তরে এতদ্দেশে, হরিতাভ ফলের আদর অধিক, গন্ধক-ধূম প্রযুক্ত শ্বেতাভ ফল অপেক্ষা ইহার গন্ধ ও স্বাদ উৎকৃষ্টতর; কিন্তু ইহা সরবরাহ করিতে সিংহলের এলাচকরদিগকে কিছু বেগ পাইতে হয়, কারণ ইহা সাবধানের সহিত কৃত্রিম তাপে শুকান আবশ্যক। শুষ্ক হইলে অনতিবিলম্বে চালান দেওয়া প্রয়োজনীয়, কিছু দিন রাখিলেই ফল শাদা হইয়া যাইবে এবং ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিতে পশ্চাতপদ হইবে। কিন্তু এ সকল অসুবিধাসত্বেও ইহাতে লাভ আছে, প্রথমতঃ এই শ্রেণীর ফলের স্থানীয় ক্রেতা যথেষ্ট; বিলাতে পাঠাইবার কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না এবং দ্বিতীয়তঃ অধিক আমদানি না থাকায় বিলাতী দরও সুবিধাজনক থাকে।

এলাচের প্রধান ব্যবহার মসলা বলিয়া ; এতদ্ভিন্ন কতক পরিমাণ এলাচ মদ্যে ও ঔষধে ব্যবহৃত হয়। রুসিয়া, সুইডেন, নরওয়ে ও জর্ম্মানির কতিপয় স্থানেই মসলার অধিক প্রচলন, সুতরাং বিলাত ভিন্ন ঐ সকল স্থানেও এলাচের যথেষ্ট কাটতি।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ এলাচের দর ছিল, উৎপাদন বাহুল্যতার জন্য এখন আর সেরূপ নাই। সিংহলের এলাচ চাষ ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে, ইহার স্থলে রবার চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। এতদ্দেশ হইতে যে সমুদয় স্থানে সাধারণতঃ এলাচ রপ্তানি হয়, তৎসমুদয়ের নাম বৃটিশ যুক্তরাজ্য, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, জর্ম্মানি, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ইটালি, রুসিয়া, স্কাণ্ডিনেভিয়া, তুরস্ক, মিশর, আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ আফ্রিকা, চীন, ষ্ট্রেটসেট্‌ল-মেণ্টস্‌, এডেন, আরব, পারস্য ও লোহিতসাগর এবং পারস্য উপসাগরের বন্দর সমূহ। যে পরিমাণ এলাচ ভারত হইতে রপ্তানি হয় তাহার মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ এলাচ বিলাতে যায়। লণ্ডনে নিলামে যে এলাচ বিক্রয় হয়, তাহার কিয়দংশ আবার ইউরোপ খণ্ডে ও আমেরিকায় চলিয়া যায়, কিন্তু সম্প্রতি এই সমুদয় নিলামে অপেক্ষাকৃত সামান্য পরিমাণ এলাচ বিক্রীত হইয়াছে, বস্তুতঃ মধ্যে এরূপ সময় চলিয়া গিয়াছে যে সিংহল এলাচের জন্য ভারতীয় এলাচ বিক্রয় হইত না। তখন চা-কর সাহেবেরা অধিক লাভের জন্য এলাচ চাষ করিতেন, তৎপরে অধিক উৎপাদনের জন্য যখন এলাচ চাষে লাভ কমিয়া যাইতে আরম্ভ হইল, তখন সিংহলের এলাচ-কর সাহেবেরা বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাইয়া এলাচ ব্যবসায়ের পরিসর বৃদ্ধির চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ ফলোদয় হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। এই সমস্ত কারণে এলাচের পরিবর্ত্তে রবার চাষ অনেকস্থলে আরম্ভ হইয়াছে এবং এলাচের জন্য অতি সামান্য নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে, পক্ষান্তরে পুরাতন ক্ষেত্রগুলি ক্রমশঃ ক্রমশঃ হীনবল হইয়া আসিতেছে। এইরূপে এলাচ চাষে ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহল দ্বীপ ভগ্নোদ্যম হইয়া সরিয়া যাইতেছেন। এক্ষণে ভারতের পালা, বর্ত্তমান সময়ে আবার যত্নের সহিত উৎকৃষ্ট জাতীয় এলাচ চাষ করিতে পারিলে তাহা কাট্‌তির অভাব হইবে না। উৎপাদন সীমাবদ্ধ হইলে অবশ্য মূল্যের হার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে সিংহল যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিল, সেই উৎপাদন বাহুল্যতা দূরে রাখিয়া যদি যুক্তিযুক্ত মতে এলাচ চাষে অগ্রসর হওয়া যায় তাহা হইলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না।

বাণিজ্য ব্যাপারে ভারত কতদূর পরমুখাপেক্ষী—ইউরোপে যে মহাসমরের অনুষ্ঠান হইতেছে তাহাতে ভারতের বহির্বাণিজ্য এককালে

বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সময় আমরা হাতে হাতে বুঝিতেছি ভারত কতটা পরমুখাপেক্ষী। ভারতের স্বাধীন ভাব, স্বাধীন চিন্তা, আত্মনির্ভর, স্বাধীন চেষ্টা লুপ্ত প্রায়। তাই আজ বাণিজ্য বিপ্লবে ভারত এত বিকল ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শুধু ভারত কেন, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিতেছে যে, এই মহাসমরানল যে বিপ্লব উপস্থিত করিতেছে তাহা হইতে কোন ব্যবসা বাণিজ্যের পরিত্রাণ নাই। জিনিষের দর উঠিতেছে পড়িতেছে। সকলকেই বিশেষ ভাবে বিড়ম্বিত হইতে হইতেছে তন্মধ্যে ভারতের দুর্দ্দশার সীমা নাই। কারণ ভারতের লোক যে, বহুদিন আত্মনির্ভর ভুলিয়া গিয়াছে। পরের সহিত তাহার বাধ্য বাধকতা প্রগাঢ়, তাহাদের আপনার শুইবার স্থান নাই কিন্তু শঙ্করকে ডাকিতে তাহারা দুঃখিত নয়। জর্ম্মানি ও অষ্ট্রিয়া হইতে কত টাকার মালই না ভারতে আইসে। আজ ইংরাজের সহিত জর্ম্মানির ও অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ বাধিয়াছে। জর্ম্মানি ও অষ্ট্রিয়ার সহিত পণ্যের আদান প্রদান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই কেন, কোন বাণিজ্যপোত আজকাল মাল লইয়া ইউরোপে যাইতে বা আসিতে পারিতেছে না, এমন কি জাভা পোর্ট হইতেও জাহাজ আসা ভার। আমরা জর্ম্মানি ও অষ্ট্রিয়া হইতে ঔষধাদি, তুলা ও পশমী বস্ত্র, লোহার জিনিষ, ছুরি, কাঁচি ও নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি, তামা, লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি ধাতু, কাগজ, লবণ, বিট চিনি ও মদ্য আমদানী করি।

আমাদের দেশে আখের চিনি জন্মায় কিন্তু তাহা বিটচিনির সহিত প্রতি-যোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না বলিয়া জর্ম্মান চিনি আমাদের হাটে বিকায়, ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার দুই চারিটা কারখানা এদেশে হইয়াছে কিন্তু এখানকার প্রস্তুত ঔষধে আমাদের দেশের অভাব পূরণ হয় না, তাই আমরা এ দেশ হইতে গাছ গাছড়া বিদেশে পাঠাই এবং সেই সকল উপকরণে বিদেশের প্রস্তুত সস্তা ঔষধ আবার ক্রয় করি। জর্ম্মান রসায়নাগার গুলি এক একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার; তাহারা পণ্যদ্রব্য সস্তায় কি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয় তাহা জানে, সমবেত চেষ্টার ফল কি, তাহারা তাহা বেশ বুঝিয়াছে। আমাদের দেশে সবেমাত্র একটি টাটার লোহার কারখানা তাহাও জর্ম্মান ইঞ্জিনিয়ারগণের সাহায্যে পরিচালিত এবং তাহার উৎপাদিকা শক্তিই বা কত? ধাতু চাদর এখনও এখানে প্রস্তুত হয় না। তাহার জন্য আমরা জর্ম্মনির মুখ চাহিয়া থাকি। কত টাকারই গ্যালভানাইজড্ লোহালক্কড়ের জিনিষ এদেশে আমদানী হয়। এদেশে ঐ কার্য্য অনায়াসে হইতে পারে। সম্প্রতি পি, এন, দত্ত কোম্পানি মস্‌জিদ বাটী ষ্ট্রীটে উহার একটী কারখানা খুলিয়াছেন এবং তাঁহারা বেশ কাজ করিতেছেন। তাঁহারা জেসপ কোম্পানি, মার্শ্যাল সন্স প্রভৃতি বিলাতী ফার্ম্মেরও কাজ পাইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের একার

ক্ষুদ্র চেষ্টাতে ভারতের এই অভাবটা সম্পূর্ণ ঘুচিবে না, সমবেত চেষ্টার আবশ্যক। ভারতের অরণ্যানি কাষ্ঠ শূন্য হইয়া পড়িতেছে সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয়া লোহার ব্যবহার করিতে হইতেছে। লোহার কড়ি, লোহার বরগা, লোহার থাম, লোহার পুল, বেড়াতে লোহার খুঁটি, লোহার দড়ি ব্যবহার করিতে হইতেছে। গ্যালভানাইজড না করিলে লোহা জল বাতাসে টীকে না সুতরাং এ কাজটাও কম কাজ নহে।

অষ্ট্রিয়া জর্ম্মানি ব্যতীত অন্যত্র হইতেও নানা পণ্য এখানে আসে। কেহই এখন বাণিজ্য পোত অবাধে লইয়া আসিতে বা লইয়া যাইতে পারিতেছে না। সুতরাং বাণিজ্যের হাট বাজার প্রায় বন্ধ। যাঁহারা ধনী তাঁহারা যুঝিতে পারেন, ঘা খাইয়াও টীকিয়া যাইতে পারেন কারণ তাঁহারা যে অনেক ধন সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক টাকার মানুষ কিন্তু এই যাহারা দিন মজুরী করে, তাহাদের যে কাল খাইবার সংস্থান নাই; তাহাদের হাত পা দেহ মাত্র সম্বল। তাহারা বিদেশীয় বণিকগণের হাতে যন্ত্রবৎ; ভারতের এই রকম লোকই যে অনেক, তাহাদের কথা ভাবিলে হাত পা ভাঙ্গিয়া আসে। রাজ্যরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রক্ষার উপায় চিন্তা অগ্রে আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের কোন্ মতিমান তাহাদের জন্য যথা সর্ব্বস্ব দান করার কথা ভাবেন কিন্তু তাহারা মরিলে ভারত শ্মশান হইয়া যাইবে এবং সমাজ বন্ধন ছিন্ন হইবে। ভারতে যে পাট জন্মায়, তাহা বিদেশে রপ্তানি হয়, তথায় ইহা সিল্কের ও পশমের সহিত মিশ্রিত হইয়া এ দেশে আসে এবং সোণার দরে বিকায়। ভারতে তুলা জন্মায়, তুলা রপ্তানি হইয়া বিদেশে যায়, তথায় কাপড় তৈয়ারি হইয়া এদেশে আসিলে তবে আমাদের লজ্জা নিবারণ হয় কিম্বা সুতা তৈয়ারি হইয়া আসিলে তবে এদেশে যে দুই চারিটা কল আছে, তাহা চলে। এমন কি অশেষ প্রকার শাক্ সব্জী শস্য উৎপাদনের জায়গা যে ভারত ভূমি, সেখানেও জর্ম্মানি, অষ্ট্রিয়া ও আমেরিকা হইতে অনেক বীজ আনাইয়া শস্যোৎপাদন করিতে হয়। গঙ্গার ধারে দেখ দুই দিকেই পাটের কলের ধোঁয়া উঠিতেছে, তথায় বিদেশীয়ের টাকা ও বুদ্ধি খাটিতেছে আর আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক মজুরী করিতেছে। একটা বলিতে কল কি এদেশের লোকের হইতে নাই! বিদেশীয়েরা এখানে পাটের বাজার খুলিয়া বসিয়া আছে, বিদেশী দালাল তাহাদের জন্য পাট কিনিতেছে, আমাদের দেশের আড়তদারগণ বলে যে, সাহেব দালালরা ভাল, তাদের হাতে ভিন্ন পাট বেচিব না। ইহা অপেক্ষা অধঃপতন আর কি হইতে পারে। পাটের বাজারে বিদেশী মহাজন, বিদেশী দালাল, বিদেশী পাটের দাদন দিতেছে, এখন বিদেশী চাষ ধরিলেই সব গোল মিটিয়া

যাইবে। আমরা আমাদের জাতভাইয়ের মুখের দিকে চাই না, আমরা আমাদের নিজস্বটা ভুলিয়া যাই।

এখানে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে এরূপ বহুতর জিনিষ আছে, কাগজের কলও দুইটা পাঁচটা আছে কিন্তু কাগজ প্রস্তুতের মসলা যোগায় বিদেশীয়েরা, বিদেশীয়েরাই এখানে কারখানা খুলিয়াছে। এই কয়টা কলে বা কত কাগজ হইবে? জর্ম্মানি আমাদের অধিকাংশ কাগজ সরবরাহ করে। জর্ম্মান কাগজ আসা বন্ধ হইয়াছে এবং আমাদের অতিশয় সংবাদ পত্রগুলির আকার ছোট হইয়াছে। বাজে খবর লইয়া যাহারা গলা বাজী করেন, তাঁহাদের আতঙ্কে প্রাণ শুকাইতেছে, সেই সঙ্গে ভাল লোকও মারা যাইতে বসিয়াছে, কেন না বিদেশীয় কাগজ ছাড়া যে গতি নাই।

সামান্য সমান্য জিনিষের জন্য আমরা পরের উপর নির্ভর করিয়া চলি আমাদের সাবানটি, দেশলাই বাক্স, মাথার চিরুণী, কাঁটাটি, পিনটি, ফিতাটি বিদেশ হইতে আসে। দেশে দেশলাই কল ও সাবানের কারখানা হইয়াছে তাঁহারা কি এই সময় উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন এবং দেশের এক আধটা ছোট অভাবও পুরণ করিতে পারিবেন? হয়ত তাঁহাদের অনেক উপাদান বিদেশ হইতে আনাইতে হয়। অনেক সুগন্ধি জল, এসেন্সের কারখানা এদেশে হইয়াছে কিন্তু আমরা কি রকম আত্মপ্রতারক, কি প্রকার আত্মঘাতী! যে সমুদয়ের অধিকাংশরই নলচে খোল সবই বিলাতী। এ দেশের খালি, বিলাতী কাগজে বিলাতী কালীতে ছাপা লেবেলটি, সেইটি এ দেশী লোকদ্বারা আঁটা। যে দেশের টাট্কা ফুলের গন্ধে দিক সকল আমোদিত হয়, সেই দেশে কি না সিন্‌থেটিক গন্ধের এত পসার। মানুষ দীন হীন হইলে কি এত নীচাশয় হয়!

জর্ম্মানির কাঁচের বাসনে আমাদের হাট বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে, ভারতে নাকি কাঁচের কারখানা হইতেই পারে না, ভারতের অদৃষ্টের দোষ কিম্বা চেষ্টার কোন খানে খুঁত আছে তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিবে!

ভারত হইতে ৯ কোটী টাকার চামড়া বিদেশে যায়, সেখান হইতে চামড়া সংস্কৃত হইয়া আসিয়া এ দেশে বিকায়, আর এ দেশের লোকেরা এক জোড়া চটীজুতা ২৷৷০ টাকায়, একজোড়া সু ৭৲।৮৲ টাকায় খরিদ করে।

ভারত হইতে প্রায় ৩০ কোটী টাকার চাউল ইউরোপে যায়, জর্ম্মানির তাহার মধ্যে বড় খরিদ্দার। দেশের লোকে বহু কষ্ট সহিয়া চাউল তৈয়ারি করে কিন্তু আপনাদের অসময়ে খাইবার জন্য কিছু মাত্র সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে না, এ দেশে হাটে চাউল ৫৲। ৬৲। ৭৲ টাকা মণ বিকায়। দেশের লোকও যে দরে কিনে, বিদেশের লোকও সেই দরে কিনে বরং বিদেশীয়েরা সস্তায় পায় কারণ

তাহারা যে টাকা ছড়াইয়া চাষীগণকে বাধ্য করে, আর দেশের লোক উদাসীন। ভারত হইতে বৎসরে এতদ্ব্যতীত ১৪।১৫ কোটী টাকার গম, ৩০ কোটী টাকার তুলা, ২৪।২৫ কোটী টাকার পাট, ৫০।৫২ কোটী টাকার তিসি, তিল, কলাই আদি, তুলাজাত দ্রব্য ৭।৮ কোটী, পাট জাত থলে, হেসিয়ান প্রভৃতি ১৫ কোটী টাকার রপ্তানি হয়। এই রপ্তানির বাজার বন্ধ হইয়াছে বলিয়া অনেকের সমূহ ক্ষতি হইতেছে, রপ্তানি ব্যাপারে লিপ্ত অধিকাংশ লোকেরই জীবিকা উচ্ছেদ হইতে বসিয়াছে। আমদানী বাজারে যদিও আমরা ইউরোপীয় মাল পাইব না কিন্তু আমেরিকা বা জাপান বোধ হয় এই সুযোগ ছাড়িবে না, তাহারা তাহাদের জিনিষ লইয়া অনতি বিলম্বে উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের বাণিজ্য প্রভাব বিস্তার করিবে। ব্রিটিশ জিনিষ ভারতের বাজারে কম বিকায়। ব্রিটিশ জিনিষ সর্ব্বরকমে ভাল, বেশ টেঁকসহি, কিন্তু দামে বেশী। ভারতের মত গরীব দেশে সস্তার আদর খুব। ভারতে টাকা নাই, কিন্তু ব্রিটিশের টাকা না খাটিয়া পড়িয়া থাকে। ব্রিটিশ ও ভারত মিলিয়া মিশিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলে সস্তায় অনেক ভাল জিনিষ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে ভারতের ও ব্রিটনের অভাব ত ঘুচিবেই, এমন কি ভারতের পণ্য অন্যত্র প্রতিদ্বন্দ্বীতায় দাঁড়াইতে পারিবে। তাঁহাদের এই সময় সচেষ্ট হওয়া উচিত এবং এমন দুর্দ্দিনেও আমরা আপনাদের অবস্থা বুঝিয়া মরণান্ত পণ করিয়া দেশের শিল্পোদ্ধারের চেষ্টা করিব না! আশা সুদূর পরাহত, কারণ আমাদের আত্ম প্রত্যয় এবং স্বাবলম্বন স্পৃহা অনেক দিন লুপ্ত হইয়াছে। ভারতের লোক আজ মন্দমতি, তাহাদের ধন, মান, লজ্জা সব গিয়াছে, তাহারা পৃথিবীর কোন কাজেই লাগিতেছে না, কেবল তাহার ভার বৃদ্ধি করিতেছে।

ভারতের কলা—বাঙলা দেশে কলার আবাদের আরও অনেকাংশ বাড়াইতে পারা যায় কিন্তু আমাদের দেশের লোক তাদৃশ উদ্যোগী নহে বলিয়া তাহারা মামুলী রকম চাষ লইয়াই ব্যস্ত। বাঙলার কলা যদি ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সর্ব্বত্র বিক্রয়ের জন্য পাঠান যাইত তবে কত টাকারই কলা বিক্রয় হইত এবং এত অল্প কলার আবাদ করিয়া বোধ হয় কুলাইত না। এ দেশে ফলের ব্যবসায়ের একটা বিশেষ অন্তরায় আছে। সেটা—রেলে মাল নষ্ট হওয়া। রেলে তছরূপ হয় ও চুরী যায়, রেল কোম্পানিগণ সদাগরী কাঁচা মাল ঠিক ঠিক পৌঁছিয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। এই কারণে ব্যবসায়ীগণ কমদরে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করাই যুক্তিযুক্ত মনে করে। আমেরিকাতে কলার চাষ বিস্তর এবং ব্যবসায়েরও প্রসার খুব। তথায় কলা ব্যবসায় হইতে ২২ কোটী টাকা আসিতেছে।

১০ বৎসরে এতটা বাড়িয়া উঠিয়াছে এই সময়ের মধ্যে কলা হইতে অর্থাগম প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। অনেক টাকার কলা ইংলণ্ডে আমদানী হইয়া থাকে। কেনেরী দ্বীপপুঞ্জ হইতে এই কলা আসে। জার্ম্মাণিতেও গ্রেটবিটনের মত কলার খরচ এবং ওলন্দাজেরাও রটারডামে জাহাজে করিয়া কলা আমদানী করিতেছেন। এই সকল দেশে কোটী কোটী টাকার কলা বিক্রয় হইতেছে। ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি মেক্সিকো হইতে প্রত্যেক সপ্তাহে রটারডামে কলা বোঝাই একখানি করিয়া জাহাজ পাঠাইতেছেন এবং ওলন্দাজদিগের আটল্যাণ্টিক ফ্রুট কোম্পানি বলিয়া একটা নিজস্ব ব্যবসা আছে। ভারতের লোকে কিন্তু ব্যবসায়ার্থ ফল উৎপাদনে এখনও বহুপশ্চাতে পড়িয়া আছে অথচ দেখা যায় যে, ভারতের মত ফল ব্যবসায়ের সুবিধা অন্যত্র নাই।

জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়া হইতে আমদানী দ্রব্যের তালিকা

১৯১৩ (এপ্রিল) হইতে ১৯১৪ (মার্চ্চ) পর্য্যন্ত।

	জার্ম্মাণি		অষ্ট্রিয়া।
পরিধেয় চিকন কালর, টুপি বনেট বর্ষাতি সমেত	১৫,৬০,৪১৩	...	৮,২২,৭৩৮
রঙ	৮১,১২,২০৫	...	
কাঁচ ও কাঁচের দ্রব্য	২৮,৫৮,৬৫১	...	৮৭,৩৮,১৫১
লৌহ ইস্পাত প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য ...	৬৪,০৮,২৯৮	...	৭২,৭০,২৭২
মদ্য	১৫,৯১,৪৩৮	...	
স্পিরিট	৬,৬০,৪০৯	...	
কল, কারখানার দ্রব্য চাউলকল, তৈলকল, সেলাইকল, কাপড়কল, চা প্রস্তত যন্ত্র ইত্যাদি	৪৩,১৭,৫৮৮	...	
দেশেলাই	২,৫০,৫৮১	...	৯,৬৬,১৯৩
ধাতু ও খনিজ দ্রব্য, এলুমিনিয়ম, পিত্তল, তামা	১,২৯,০২,৮২৭	...	
জার্ম্মাণ সিলভার	২২,১৫,৭২৯	...	
লোহা ও ইস্পাত	২৩,৫৭,৯০৬	...	
পেরেক, যন্ত্র, বল্টু, ওয়াসার ...	৯,৮১,৭৮২	...	
লোহা ও ইস্পাতের চাদর ও প্লেট গ্যালভানাইজড্ কিম্বা টিন কলাই নহে	৪৭,৫২,৮৯৫	...	
লোহা ও ইস্পাত পাইপ ও তাহার সাজ ...	৭,২৬,৮৪১	...	
ইস্পাত কোণাচা স্প্রীং	৮০,৫৮,৫৭৩	...	

ফলান রঙ	...	...	৪,৩০,৭০২	...	
ছাপিবার কাগজ	...	...	৯,৮১,৮৫৭	...	৪,২৯,২১১
হাতে লেখার কাগজ ও খাম		...	৩,৭৬,৮৭১	...	৫,৭৬,৫৬৬
লবণ	...	...	৯,৭১,৪৩৮	...	
রঙ্গীন, ছাপা বা ছোপান কাপড়		...	৩৬,৫৮,৬৯১	...	
চিনি	...	...	১,২৪,৩১১	...	১,৩৭,৬৭,০৯৮
মিশ্রিত রেশম বস্ত্রাদি	...	...	২১,১৫,৯৪৬	...	
পশমী শীত বস্ত্র	...	...	৩৯,৮৭,৬৪১	...	
পশমী শাল	...	...	৪৪,১২,২১০	...	২,০৫,৮৩৫

জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়াতে ভারত হইতে রপ্তানি মাল

১৯১৩ (এপ্রিল) হইতে ১৯১৪ (মার্চ্চ) পর্য্যন্ত।

			জার্ম্মাণি		অষ্ট্রিয়া
কফি	...	...	৬,৭২,১৫৫	...	৭,৩০,৪৫৫
নারিকেল ছোবড়ার ম্যাটিং দড়ি		...	২৩,৩২.৫৯৯	...	
নীল	...	...	৮,৮৮৯	...	৩,২৪,৯৯২
মাইরাবোলান	...	...	১৩,৪৭,২১৪	...	
গবাদির খাদ্য ভুষি, খৈল ইত্যাদি		...	১৪,৩৯,৩৪৯	...	
ছাঁটা চাউল	...	...	১,৮৭,৮৬,৫৮৯	...	১,৬৭,৬৭,৯৫১
গম	...	...	২৮,০৬,৬৩০	...	
বার্লি	...	...	১,০২,২৪৫	...	
ছোলা	...	...	৬,১২,৯৭৬	...	
জোয়ার, বাজ্রা	...	...	৮৬,৪০,৬১৫	...	
ভুট্টা	...	...	২,০৯,৫৩০	...	
কলাই	...	...	৫,৭৪,৪৭৪	...	
কাঁচা চামড়া	...	...	৩,০৬,২৯,,৭৫৮	...	১,৮৪,৪০,৯৮৩
কাঁচা ছাল	...	...	১১,৬০,১৩৯	...	
লাক্ষা	...	...	২,১২,৬০১	...	
সেল	...	...	২৩,০৭,১১০	...	৩৬,১৫,৩০০
পাকা চামড়া ও ছাল	...	...	৪,৫৭,২২২	...	
হাড় (সারের জন্য)	...	...	৮,৯৭,৩২৭	...	
নারিকেল	...	...	৩,৪২,৮৫৬	...	
তৈল খৈল	...	...	১৫,০০,১২৬	...	

রেড়ী দানা	...	...	১৪,৭৯,২৭০	...	
নারিকেল শাঁস	...	...	৯৮,৬৪,৪২৬	...	
মাট বাদাম	...	...		...	১৬,৭৫,৯৪১
তিসি	...	...	৮০,৫৫,১৩৬	...	১০,৯৯,৫৮১
পোস্ত দানা	...	...	৮,০১,৯৬১	...	
রাই	...	...	৯০,৪৫,৩৭৯	...	৯,৮৪,৯৭১
তিল, জিঞ্জিলি	...	...	৬০,৪৭,৩১১	...	৪৬,৫৪,৩৫৩
মসালা	...	...	১১,৭৫,৬৭৫	...	
চা	...	...	৩,৭৬,৯৮০	...	
তুলা	...	...	৫,৯৮,১১,৩৫৫	...	২,৯২,৩৪,০২০
পাট	...	...	৬,৭৪,৮৬,৬৭২	...	১,৯৭,৯০,৮৮৭
পাটের থলে	...	...	১৭,১৩,৯৯২	...	
„ থান	...	...	১৩,০৯,৫৮৩	...	
কাষ্ঠ	...	...	১১,১৩,৬৩৩	...	

পত্রাদি

ধান—শ্রীফণীভূষণ মজুমদার, ঝিনাইদহ, যশোহর।

কাটারিভোগ, কর্পূরকাত, রাঁধুনী পাগল, রাণী পাগল, কেলেজিরে ধান সম্বন্ধে জানিতে চান এবং প্রত্যেকের আধ তোলা নমুনা চান।

উপরে লিখিত সকল ধানগুলিই মিহিধান। মাঝ কিতা জমিতে (অর্থাৎ যাহাতে ৩।৪ ইঞ্চের অধিক জল দাঁড়ায় না) ইহার চাষ হয়। অধিক জলা জমিতে চাষ করিলে ইহার ধান মোটা হইয়া যায় এবং চাউলের গন্ধ থাকে না। সবগুলিই সুগন্ধী চাউল। খুব ভাল জমিতে ইহার ফলন ৪।৫ মণের অধিক হয় না। ফলন কম হইলেও দামে পোষাইয়া যায়। মোটা ধানের দর যখন ৩৲ টাকা মণ তখন এই সকল ধান্য ৫৲ টাকা বিক্রয় হয়। আধ তোলা হিসাবে নমুনা লইয়া কোন ফল নাই। পরীক্ষার জন্য চাষ করিতে গেলে অন্ততঃ প্রত্যেক ধান আধসের হিসাবে লইয়া চাষ করিতে হয়। তবে গামলায় পরীক্ষা করিবার বাসনা থাকিলে আধ কিম্বা এক তোলা ধান্যেই কাজ চলিতে পারে।

চীনা বাঁধাকপি (China Cabbage)—হরেন্দ্রকৃষ্ণ দাস, মেদিনীপুর।

মহাশয়, "কৃষক" পাঠে অবগত হইলাম যে চীনা বাঁধাকপি উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। ইহা মানুষের খাদ্য নহে কি? চাষ প্রণালী কিরূপ?

উত্তর।—ইহা মানুষেরও খাদ্য এবং খাইতে খুব সুস্বাদু। ইহার পাতা সিদ্ধ করিয়া লবণ ও সরিষার গুঁড়া সংযোগে খাইতে বেশ মুখরোচক। চীনবাসীদের ইহা প্রিয় খাদ্য। অন্য বাঁধাকপি অপেক্ষা ইহার পাতা কোমল। ইহা আকারে ক্ষুদ্র এবং অন্য বাঁধাকপির মত নিরেট হইয়া বাঁধে না। চাষ বাঁধাকপি কিম্বা লেটুসের মত। যদি কেহ এই কপি বাঁধিবার আশায় অধিক দিন ক্ষেতে রাখেন তিনি ঠকিয়া যান, কারণ ইহা বাঁধেও না বরং পাতা শক্ত হইয়া পশুখাদ্য ভিন্ন আর মানুষের খাদ্যোপযুক্ত থাকিবে না। এক আউন্স বীজে এক বিঘা জমির উপযোগী চারা উৎপন্ন হয়। সারবান জমি হইলে বিঘায় ১৫০ মণ চীনা কপি জন্মিতে পারে, সাধারণতঃ বিঘায় ফলন ১০০ মণের কম নহে। জমিতে খৈল ও পাঁকমাটি চূর্ণ সার দিলে খুব অধিক ফলে। চাষের ব্যবস্থা ড্রমহেড বা নারিকেলী বাঁধাকপির অনুরূপ। চীনা বাঁধাকপি অপেক্ষাকৃত ঘন বসান যাইতে পারে। এক একরে ৫০০০ হাজার অন্য বাঁধাকপি জন্মান যায়, চীনা বাঁধাকপি সেই স্থলে ৬০০০ হাজার জন্মিবে।

ধানের সার—ডাঃ আশুতোষ পাল, মোহিনী কুটির, বোলপুর, ই, আই, আর,

ধান ক্ষেতে কি সার দিবেন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—তদুত্তরে আপনাকে জানান যায় যে, গোময় সার যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না পান তবে যতটা গোময় সংগ্রহ হয় দিবেন এবং ঐ সঙ্গে ১ মণ হাড়ের গুঁড়া ও ১০সের সোরা মিশাইয়া ব্যবহার করিবেন। হাড়ের গুঁড়াপচিতে বিলম্ব হয় সেইজন্য ধান রোপণের ১৷৷। ২ মাস পূর্ব্বে জমিতে ছড়াইতে হয়। রোপণ কালে ছড়াইলে পুরা ফল পাওয়া যায় না। রেড়ীর খৈল দিবেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইহাও মন্দ সার নহে কিন্তু হাড়ের গুঁড়া ও সোরা ব্যবহারেই ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, জমিতে পূর্ব্বে কিছু গোময় দেওয়া থাকিলে সর্ব্বাংশে ভাল হয়। গোময়ে জমির মাটি বেশ আর্দ্র রাখে অথচ ইহা বেশ তেজস্কর সার। গোময়ের তেজ সদ্য বৎসরেই খরচ হইয়া যায় কিন্তু হাড়ের গুঁড়ার তেজ দুই বৎসর বুঝা যায়।

সার-সংগ্রহ

শিরীষ

শিরীষ জিলেটিন নামক রাসায়নিক পদার্থসম্ভূত শুষ্ক বস্তু বিশেষ। বিশুদ্ধ জিলেটিন প্রস্তুত অতীব ব্যয় ও শ্রমসাপেক্ষ। কার্ব্বণ, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই তিনটী মুল পদার্থই জিলেটিনের প্রধান উপাদান। জিলেটিনের শতকরা ৪৭·৮৮ কার্ব্বণ, ৭·৯১ হাইড্রোজেন ও ২৭·২১ অক্সিজেন আছে। আইসিংগ্ল্যাস নামক পদার্থে শতকরা ৮৬ হইতে ৯৬ ভাগ জিলেটিন আছে। জিলেটিনের আঠা অতি দৃঢ়, কাষ্ঠাদি ইহাতে অতি সুন্দর ভাবে জুড়িয়া যায়। ফুটন্ত জলে জিলেটিন গলিয়া থাকে; কিন্তু শীতল জলে কদাপি দ্রব হয় না। এল্‌কোহল ট্যানিন জিলেটিনকে দ্রব করিয়া অধঃপাতিত করিয়া দেয়। সল্‌ফিউরিক এসিড সংযুক্ত ফুটন্ত তাপে জিলেটিন শর্করায় পরিণত হয়। জান্তব পদার্থ হইতেই জিলেটিনের উৎপত্তি এবং এই জিলেটিনই শিরীষের সার। জান্তব পদার্থ হইতে যেরূপ জিলেটিন, উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে সেইরূপ গ্লুটেন নামক আর এক প্রকার আঠা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাগজ জুড়িবার কাই গ্লুটেন ভিন্ন আর কিছুই নয়। শিরীষে জিলেটিনের ভাগ যতই অধিক থাকিবে উহা ততই উত্তম হইবে। শিরীষ সূত্রধর ও অন্যান্য সন্ধিকারকগণের এক বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু। শিরীষ দ্বারা কাষ্ঠখণ্ড জুড়িলে সন্ধিস্থলে কোনরূপ ফাঁক থাকে না।

শিরীষের বিস্তৃত ব্যবসা অনেক দেশেই আছে। এ ব্যবসায়ে লাভও সমধিক হইয়া থাকে। শিরীষের উপাদন প্রায় সকল দেশেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গিয়া থাকে। যে সমুদায় দ্রব্য মানবের পরিত্যক্ত তাহা হইতেই শিরীষ প্রস্তত হয়, সুতরাং উপাদানগুলির মূল্য নাই অথবা অতি সামান্য। যাহা কিছু ব্যয় ও শ্রম তাহা কেবল সংগ্রহের নিমিত্ত। বাজারে শিরীষের কাট্‌তিও বেশ আছে। কিঞ্চিৎ শ্রম ও ব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক উপাদানগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে অতি স্বল্প মূলধনে এক লাভের ব্যবসা হইতে পারে। উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিলে সর্ব্বত্রই ইহার আদর হইবে। কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থাকিলেই প্রস্তুত দ্রব্য উৎকৃষ্ট হইবে। আমাদের দেশে শিরীষের আঠা ভাল হয় না ও সেরূপ স্থায়ী হয় না। প্রস্তুতকারকের অজ্ঞতাই ইহার কারণ।

শিরীষের উপাদান সকলেই বিদিত আছেন। প্রাণীগণের অস্থি হইতে উপরের চর্ম্ম অবধি সমুদায় ভাগেই অল্প বিস্তর শিরীষ প্রস্তুতোপযোগী পদার্থ আছে। প্রাণীর অভাব পৃথিবীতে কোথায়? প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকরতপ্ত মরু হইতে

প্রখর শীতল তুষারময় মেরু সন্নিহিত প্রদেশ পর্য্যন্ত সমুদয় স্থলই প্রাণীবৃন্দ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ; সুতরাং সকল দেশে সর্ব্বকালে শিরীষের উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিঞ্চিৎ ব্যয় ও শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক একস্থলে অনেক সংগ্রহ করিতে পারিলেই শিরীষের ব্যবসায় চিরকাল সমভাবে চলে। আর প্রস্তুত-প্রক্রিয়াও অতি সরল ; অন্যান্য পদার্থের ন্যায় দুরূহ ও জটিল নহে। ইহার সহিত অভিজ্ঞতা, সতর্কতা ও কার্য্যকুশলতার সমন্বয় হইলে উৎপন্ন দ্রব্যও উৎকৃষ্ট হইবে ; উৎকৃষ্ট হইলে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় কারিকরগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে ; তদ্বারা কাট্‌তি হইতে থাকিবে, ফলে লাভও বেশ সন্তোষজনক হইবে। কেবল জিনিষ করিতে পারিলে হয় না, ভাল করিতে হইবে।

পশু-চর্ম্ম সকলভাবেই শিরীষ প্রস্তুতোপযোগী। গোমেষাদির ক্ষুর, শৃঙ্গ, চর্ম্ম, নালী, পেশী ইত্যাদি হইতেই সচরাচর শিরীষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ দেশে ভাগাড়ে মৃত পশু-দেহ নিক্ষিপ্ত হইলে মুচিরা ছালটি ছাড়াইবার পর শকুনিরা খাইয়া ফেলে, অস্থিগুলি সংগৃহীত হইয়া চূর্ণ হইবার জন্য কলে প্রেরিত হয়। অবশিষ্ট ভাগ সংগ্রহ করিতে পারিলে শিরীষের কাজে অনায়াসে লাগিয়া যাইতে পারে। কসাইখানায় (Slaughter House) প্রতিদিন মানবের দগ্ধোদর কণ্ডুয়ন নিবৃত্ত করিবার জন্য কত পশু পশুলীলা সংবরণ করিয়া থাকে। চর্ম্ম ও মাংস ব্যতিরেকে অন্যান্য পরিত্যক্ত পশুদেহাবশেষ প্রভূত পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে। চর্ম্মবিক্রেতার আড়তের অনাবশ্যকীয় চর্ম্মখণ্ড সকল সংগ্রহকরা কিছু প্রভূত ব্যয় সাপেক্ষ নহে। অব্যবহার্য্য চর্ম্মখণ্ড ও চর্ম্মনির্ম্মিত পদার্থের ছিন্নাবশেষ সংগ্রহ করা অতীব দুঃসাধ্যও নহে। যানাদি বহনক্ষম পশুগণের ক্ষুরের ছাঁট ইত্যাদিও কার্য্যে লাগিতে পারে। পাদুকা প্রস্তুত কালে চর্ম্মকারগণ অনাবশ্যকীয় যে সকল কর্ত্তিত চর্ম্মখণ্ড ফেলিয়া দেয় কিঞ্চিৎ শ্রম বা ব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক সেগুলির সংগ্রহ বিশেষ দুরূহ নহে। অব্যবহার্য্য পুরাতন চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্য নিচয়ও কার্য্যে লাগিতে পারে। ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড সকল ডোম প্রভৃতি ইতর জাতিগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া যেরূপ কাগজ নির্ম্মাণে সহায়তা করে, সেইরূপ পুরাতন জীর্ণ চর্ম্মখণ্ড সকল সংগৃহীত হইয়া অনায়াসে শিরীষ প্রস্তুতের জন্য ব্যয়িত হইতে পারে। লাভের লোভ থাকিলে এরূপ সংগ্রহকারকের ও অভাব হইবে না। ক্রমশঃ

বাগানের মাসিক কার্য্য

আশ্বিন মাস

সব্জীবাগান।—এই সময় শীতের আবাদ ভরপুর আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বেই জলদি জাতীয় কপি, টমাটো, বিলাতি লঙ্কা প্রভৃতি বপন করা হইয়া চারা তৈয়ারী

হইয়াছে। এই সময় নাবীজাতীয় বীজ বপন করিতে হয়। মূলজ সজীর চাষ এই সময় হইতে আরম্ভ। মূলা, সালগম, বীটের এই সময় চাষ আরম্ভ করিবে। বেগুন চারা ইতিপূর্ব্বেই ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে, সেগুলি এক্ষণে দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সীম, মটর বীজ এই সময় বপন করিতে হইবে। জলদি কপিচারা যাহা ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাতেও এই সময় মাটি দিতে হইবে ও পাকা পাতা গুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আলুও এই সময় বসাইবে, পিঁয়াজ চাষেরও এই সময়।

ফুলের বাগান।—এই সময় এষ্টার, প্যান্সি, ভার্ব্বিনা, ডালিয়া, ক্লিয়াস্থাস, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে আরম্ভ করিবে।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় বেগোনিয়া, জেরিনিয়ম প্রভৃতি কোমল গাছগুলির বিশেষ পাট করিতে হয়। এই সকলের কাটিং বসাইতে পারা যায়, কিন্তু পাহাড়ে অত্যন্ত অধিক বৃষ্টি হয়—সুতরাং সাসি দ্বারা আবৃত স্থানে সে সকল কাটিং পোতা উচিত। গোলাপের কলম (Budding) এখন করা যাইতে পারে—বিশেষতঃ হাইব্রীড পারপেচুয়াল জাতীয় গোলাপের বডিং হইবে। চীনা, টি, বুরবন জাতীয় গোলাপের কাটিংও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এখন করা যাইতে পারে। বৃষ্টির সম্পূর্ণ অবসান না হইলে পার্ব্বত্যপ্রদেশে সজী তৈয়ারী করা হইয়া উঠে না। তবে আচ্ছাদনের ভিতর যত্ন করিয়া করিলে কিছু কিছু হইতে পারে। পর্ব্বতে দ্রাক্ষালতার এই সময় বড় বাড় হয়। সেগুলি কাটিয়া, ছাঁটিয়া, গোড়া খুঁড়িয়া, একটু বাড় কমাইতে হইবে।

পশ্চিম ভারতে যেখানে বৃষ্টির আতিশয্য আদৌ নাই, তথায় গোলপ হাপর হইতে নাড়িয়া বসাইতে পারা যায়। এই সময় উক্ত প্রদেশে ফুলকপি চারা ক্ষেতে বসাইতেছে। আশ্বিন মাসের শেষে কার্ত্তিকের প্রথমেই তথায় ফুলকপি তৈয়ারী হইয়া উঠিবে।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

পঞ্চদশ খণ্ড,—৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস।

আশ্বিন, ১৩২১।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶৹ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

কৃষক।

সূচীপত্র।

আশ্বিন, ১৩২১ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ খণ্ড। | আশ্বিন, ১৩২১ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সুপুষ্টবীজ সংগ্রহ

শ্রীশীতলদাস রায় লিখিত

কৃষি বিষয়ক পত্রিকায়, গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের সমালোচনা মন্তব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে সুপুষ্টবীজ নির্ব্বাচনের অভাব দেশের কৃষির অবনতি ঘটিবার অন্যতম কারণ। আমার পল্লীগ্রামে বাস। চাষীরা যে বীজ নির্ব্বাচনে আদৌ যত্ন করে না ইহা আমি নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। যে জমির ধান্য বা অন্য ফসল বেশ সুপুষ্ট হইয়াছে সেই ফসল খামারে পৃথক্ করিয়া রাখিয়া তন্মধ্য হইতে বীজ সংগ্রহ করিবার প্রথা চাষীদের মধ্যে আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহারা এইমাত্র দেখে, যে ধান্য তাহারা বীজের জন্য রাখিবে তাহা অপর জাতীয় ধান্য মিশ্রিত না হয়। সেই সমস্ত বীজ পুষ্ট কি অপুষ্ট তৎপ্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখে না। ইহার ফল যে শোচনীয় হইতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষকের অজ্ঞতা ও পরিশ্রম কাতরতাই ইহার কারণ নির্দ্দেশিত হইতে পারে। বীজ সংগ্রহের জন্য পৃথক্ জমি নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক সার প্রদানে উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া তদুৎপন্ন শস্য যে বীজের জন্য রাখা দরকার সেই জ্ঞান চাষীদের মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুপুষ্ট বীজ নির্ব্বাচনের অভাবে যে ফসল কম উৎপন্ন হইতেছে ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। দেশের অজ্ঞ লোক প্রকৃত রোগের নিদান নির্ণয় করিতে অক্ষম হইয়া পৃথিবী শস্য হরণ করিতেছেন বলিয়া কেবল হা হুতাশ করিয়া থাকে। কিন্তু জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রদান, সুপুষ্টবীজ বপন ও যথা সময়ে চাষের পাইট ও তদ্বির আদি দ্বারা চাষ আবাদ করিতে পারিলে মাতা পৃথিবী যে শস্য হরণ করেন না তাহা স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হইবে।

সুপুষ্টবীজ সংগ্রহ সম্বন্ধে চাষীদের অমনোযোগ ও অক্ষমতার প্রতিকারের উপায় একদিকে সরকারের, অন্যদিকে শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন দেশের লোকের উপর নির্ভর করে। সেই উপায় সম্বন্ধে আমি যাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি তাহাই নিম্নে আলোচিত হইবে।

কৃষি-বিষয়ক পত্রিকায় এবং সরকারের কৃষি-বিভাগের রিপোর্ট ও মন্তব্যে এই সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া থাকে দেখিতে পাই। কিন্তু যাহাদের উপকারের জন্য অত আলোচনা ও গবেষণা হইয়া থাকে সেই সমস্ত বিষয় প্রকৃত চাষীদের জ্ঞান গোচরে আসিয়া থাকে কি? সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে তাহা আদৌ হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে সরকারের পরীক্ষাক্ষেত্রে বা অন্যস্থানে চাষ আবাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত পরীক্ষা করা হইত, বঙ্গভাষায় তাহা প্রকাশিত হইয়া জেলার কৃষি-সমিতির সভ্যগণের সাহায্যে চাষীদের মধ্যে বিতরিত হইত। এক্ষণে সেই প্রথা রহিত করা হইয়াছে কেন? এক্ষণে যদিও উক্ত সমিতির সভ্যদিগকে কৃষক পত্রিকা বিনামূল্যে প্রদত্ত হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বপ্রথারও অনুসরণ করা দরকার।

একদিকে যেমন কৃষি বিষয়ক উন্নতিকর নব নব সংবাদ কৃষকদের গোচরে আনিতে হইবে, অন্যদিকে নূতন নূতন ফসলের চাষ করিবার জন্য সেই শস্যের বীজ ও নবাবিষ্কৃত তেজস্কর সার যথা—হাড়ের চূর্ণ, সোরা ইত্যাদি যাহাতে অতি সহজে ও সুলভ মূল্যে কৃষকদের হস্তগত হয় তাহারও উপায় অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক। কাগজে পড়িলাম বা উপদেশ পাইলাম যে বর্দ্ধমান কৃষি-ক্ষেত্রে কোন এক জাতীয় ধান্যের চাষ করিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে যে উহার ফসল অন্যান্য ধান্য অপেক্ষা অধিক। কিন্তু বর্দ্ধমান হইতে সেই ধান্যের বীজ সংগ্রহ করা একজন চাষী কেন একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির পক্ষেও সহজ সাধ্য নয়। আর সরকারের কৃষি-বিভাগের সহায়তায়ও আনাইবার উপায় অতিব জটীল ও অসুবিধাজনক। তাঁহারা যে বীজ অযাচিত ভাবে বিনামূল্যেই আনাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন তাহা কখনই যথাসময়ে দিতে পারেন না, এমন সময়ে আমদানি করিয়া দেন যখন সেই শস্যের বপন কার্য্য বহুদিন পূর্ব্বে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের দীর্ঘসূত্রতার একটী দৃষ্টান্ত এইস্থলে প্রদর্শিত হইল। আমি মেদিনীপুর জেলা কৃষি-সমিতির অন্যতম সভ্য বিধায় নানাবিধ ফসলের বীজ সরবরাহ করা হইবে বলিয়া সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে মধ্যে মধ্যে চিঠি পাইয়া থাকি। গত ১৯১৩ সালের ৭ই জুন তারিখে ৩৭৫ নং চিঠির দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়াছিলাম যে বিভিন্নজাতীয় পাটের বীজের মধ্যে আবশ্যকমত বীজ সেই সনের নভেম্বর মাসে প্রদান করা হইবে। আমি ময়মনসিংহজাত পাটের বীজ চাহিয়াছিলাম, শুনিয়া

আশ্চর্য্য হইবেন যে সেই বীজ ১৯১৪ সালের গত মে মাসের ৩০ শে তারিখে আমার হস্তগত হইয়াছে। ঐ সময়ের বহুপূর্ব্বে আমাদের অঞ্চলে পাট বপন কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল এবং চারা প্রায় ১ ফুট বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুতরাং অসময়ে বীজ হস্তগত ও তাহার পূর্ব্ব হইতে অকাল বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় আমরা আর উক্তবীজ বপন করিবার অবসর পাই নাই। অন্যান্য বীজ সম্বন্ধেও প্রায় প্রতিবর্ষেই ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। সরকার আশা করেন যে বিতরিত বীজ দ্বারা সমিতির সভ্যগণ পরীক্ষা স্বরূপ ফসল জন্মাইয়া নিজেদের ও কৃষকদের জ্ঞানবৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু বীজ বিতরিত হইবার দোষে সভ্যগণ সরকারের শুভ উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিতেছেন না। কাজেই সরকার এক্ষণে যে প্রণালীতে বীজ বিতরণ বা বিক্রয় করেন তাহার পরিবর্ত্তন না করিলে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এতদ্বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে।

প্রতি জেলায় একটি কৃষি-সমিতি (District Agricultural Association) বিরাজ করিতেছে। উহার অস্তিত্ব অন্য লোক কেন মধ্যে মধ্যে ২।১ খানা চিঠি পত্র না পাইলে সভ্যগণও জানিতে পারিত না। এক্ষণে যে নিয়মে উক্ত সমিতির সভ্য মনোনীত হয় তাহা সমীচীন নহে। আর কেবলমাত্র সুদূর জেলার উপরে একমাত্র সমিতির দ্বারা কোন কার্য্যও হইতেছে না ও হইবে না। মফঃস্বলের প্রকৃত চাষীদের সহিত উহার ঘনিষ্ট সংশ্রব ঘটাইতে না পারিলে কি উপকার হইবে? ঐরূপ করিতে হইলে পল্লী কৃষি-সমিতি ও মহকুমা কৃষি-সমিতি স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ৮।১০ খানি গ্রাম লইয়া এক একটী পল্লী-সমিতি, পল্লী-সমিতির সভ্যগণের মধ্য হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত করিয়া মহকুমা-সমিতি এবং উক্ত সমিতির সভ্যগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত ও সরকারের মনোনীত সভ্য লইয়া জেলা-সমিতি গঠন করিলে তবে সমিতি স্থাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইবে। পল্লী-সমিতি মাসে ১ বা ততোধিক বার, মহকুমা-সমিতি মাসে একবার এবং জেলা-সমিতি দ্বিমাস অন্তর বৈঠক করিয়া সভ্যগণ চাষ আবাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে সুফলের আশা করিতে পারা যায়। মহকুমা এবং জেলা-সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হইতে হইলে সভ্যগণের পাথেয় ব্যয় দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। এই সমস্ত সভ্যগণের উপর পুস্তকাদি ও সুপুষ্ট বীজ বিতরণ বা বিক্রয় করিবার ও চাষীদিগকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সার রক্ষা ও প্রস্তুত, বীজ রক্ষা ও চাষ প্রণালী শিক্ষা দিবার ভার প্রদত্ত হইবে। নিজে চাষী অথচ শিক্ষিত ও ক্ষমতাশালী এরূপ অবস্থাপন্ন ভদ্র ব্যক্তিই পল্লী-সমিতির সভ্য মনোনীত হয়েন তৎপ্রতি যেন সরকারের দৃষ্টি থাকে। উপযুক্ত সভ্য মনোনয়নের উপরেই কৃষি-সমিতির উদ্দেশ্যের সফলতা নির্ভর করে। সরকারের কৃষি-বিভাগ সময়ে সময়ে কৃষিবিদ্যাবিদ্ লোক পাঠাইয়া পল্লী-সমিতির সভ্যগণের সাহচর্য্যে কৃষকদিগকে

উপদেশ ও হাতে কলমে নব নব চাষপ্রণালী ও উন্নত কৃষি-যন্ত্রাদি ব্যবহারের শিক্ষাদিবার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। এরূপ লোক প্রেরিত হইবেন যিনি জলকাদা ভাঙ্গিয়া মাঠে মাঠে ঘুরিয়া কৃষকের চাষ আবাদ প্রণালী লক্ষ্য করিবেন এবং ভুল ক্রটী দেখিলে সংশোধন করিবার জন্য উপদেশ দিবেন। চাষীদের সহিত চাষী হইয়া মিশিতে না পারিলে, তাহাদের প্রকৃত বন্ধু হইয়া তাহাদের বিশ্বাসভাজন না হইতে পারিলে কেবল সাধুভাষায় মৌখিক উপদেশ দিলে অতিরক্ষণশীল স্বভাব কৃষক, উপদেষ্টার কথানুসারে কাজ করিতে আদৌ ইচ্ছুক হইবে না।

এক একটী বিষয় লইয়া কৃষকদিগকে পরীক্ষা করিতে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। সেই বিষয়ে সুফল দেখিলে আলোচ্য বিষয় অবলম্বন করিতে তাহারা স্বতঃই প্রবৃত্ত হইবে। প্রথমতঃ সুপুষ্ট ও অপুষ্ট বীজ বপন করিয়া উহাদের উৎপন্ন ফসলের তারতম্য দেখাইতে হইবে। শেষোক্ত হইতে প্রথমোক্ত বীজ বপন দ্বারা যদি তাহারা দেখিতে পায় যে, কিঞ্চিদধিক শস্যও তাহারা জন্মাইতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা হইলে সুপুষ্ট বীজবপনের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া ঐ প্রণালীমত চাষ করিতে তাহারা কদাপি পরাঙ্মুখ হইবে না এবং কেবল বীজ উৎপন্ন করিবার জন্য পৃথক্ জমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে এবং তাহাতে অসমর্থ হইলে সুপুষ্ট বীজ খরিদ করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইবে না।

পানামা প্রদর্শনী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত—বার্কলে, কালিফর্ণিয়া, ইউনাইটেডষ্টেট্স, আমেরিকা।

বহুদিন বহুচেষ্টা ও উদ্‌যোগের পর ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌স্ ১৯০৪ খৃঃ অঃ ৪ঠা মে হইতে পানামা-খাল খনন আরম্ভ করে। বাণিজ্যের উন্নতি ও সুবিধা করা এই খাল খনন করার প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো (San-Francisco) হইতে মাল-জাহাজ নিউইয়র্ক বা ইউরোপে যাইতে বহু সময় লাগিত এবং দেশের অভ্যন্তরে অনেক সময়ে বহু ব্যয়ে রেলযোগে মাল পাঠাইতে হইত। আমেরিকার পূর্ব্ব উপকূলের যে কোন স্থানে যাইতে হইলে, মাল জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরিয়া যাইত ; ইহাতে দেড়মাস সময় লাগিত। ইহাতে আমেরিকার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্য ব্যবসায়ে অনেক ব্যাঘাত হইত। এতদ্ব্যতীত ইউরোপ এবং নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থান হইতে এসিয়াস্থিত প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে (চীন, জাপান ইত্যাদি স্থানে) বাণিজ্যেরও বিশেষ সুবিধা ছিল না ; কারণ রেল-সংযোগে

নিউইয়র্ক হইতে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সহরে মাল আনাইতে বা সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো হইতে নিউইয়র্কে মাল পাঠাইতে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী খরচ পড়ে। এখন খাল খনন দ্বারা যাতায়াত সহজসাধ্য ও অল্প-সময়-সাপেক্ষ হওয়াতে ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যপ্রভাব এসিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার উপর পূর্ণ-মাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে। সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো পূর্ব্বে বাণিজ্যে বিশেষ উচ্চস্থান পায় নাই, কিন্তু এই পানামা-খাল খনন করার পর ইহা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র স্বরূপ হইল। বিশেষতঃ এই খাল খনন করা উপলক্ষে আগামী ১৯১৫ খৃঃ অব্দে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সহরে যে জগদ্বিখ্যাত প্রদর্শনী হইবে তাহা হইতে উহার ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে ইহা পূর্ব্ব কেহই ভাবিতে পারে নাই।

আগামী ১৯১৫ খৃঃ অঃ ১লা জানুয়ারী পানামা-খালের খনন-কার্য্য সমাপ্ত হইবে। এতদিন আট্‌লাণ্টিক্ (Atlantic Ocean) ও প্রশান্ত মহাসাগর পরস্পর বহুদূরে ছিল, কিন্তু আজ ইহারা উভয়ে অতি নিকটে ও এক হইতে চলিল। পূর্ব্বে সুয়েজ-খালের কথা শুনিয়া বা দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইত; কিন্তু আজ পানামা-খাল তাহাকেও পরাস্ত করিয়াছে। যে অত্যাশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে এই পানামা-খাল খনন করা হইয়াছে তাহা আমেরিকার জাতীয় উন্নতি ও শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। জগতের উন্নতি সাধনে পানামা-খাল, সুয়েজ খালের অপেক্ষা কোন অংশে কম ফলপ্রদ হইবে না।

সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সহরেই ১৯১৫ সালে অভূতপূর্ব্ব প্রদর্শনী হইবে।

প্রদর্শনীর অট্টালিকাগুলি অতি সুন্দর ভাবে নানা প্রকার কারুকার্য্যে ভূষিত হইতেছে। কোন কোন প্রাসাদের স্তম্ভশ্রেণী নানা প্রকার মূর্ত্তি দ্বারা অতি সুসজ্জিত করা হইয়াছে। কোন কোন প্রাসাদের প্রত্যেক মূর্ত্তির শিরোদেশে অনেকগুলি নক্ষত্র অতি সুন্দর ভাবে বসান হইয়াছে এবং সেগুলিকে বহুমূল্যবান পাথর দ্বারা সুসজ্জিত করা হইবে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের উপর নানা বর্ণে রঞ্জিত বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া হইবে। কতকগুলি প্রাসাদ ইতালী দেশীয় নীল, সিন্দুর, লাল, কমলা ইত্যাদি নানাবিধ অতি সুন্দর সুন্দর রঙ দ্বারা চিত্রিত করা হইবে। কোন প্রাসাদ গজদন্তের ন্যায় শুভ্র স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা শোভিত হইবে। আটটী বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদ কনষ্টান্‌টিনোপল্, দামস্কস্ ও কাইরো প্রভৃতি নগরের বাজারের আকারে প্রাকৃত সৌন্দর্য্যোচ্ছ্বাসে ভূষিত করিয়া অতি সুন্দর ভাবে নির্ম্মাণ করা হইবে। প্রাসাদের কার্ণিশগুলি সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি দ্বারা সজ্জিত করা হইবে। ইহার বুরুজ ও চূড়া (tower and minaret) লাল, পীত এবং কমলা রঙ্গে রঞ্জিত হইবে ও ইহার গম্বুজগুলি স্বর্ণ এবং তাম্র দ্বারা অতি সুচারুরূপে সুসজ্জিত করা হইবে। এই প্রাসাদগুলির শিখরদেশে সহস্র সহস্র বিবিধ বর্ণের পতাকা প্রশান্ত মহাসাগরের

বীর বাতাসে যখন নৃত্য করিতে থাকিবে তখন কতই সুন্দর দেখাইবে। আর একটী প্রাসাদের চারিধারে এমন সুন্দর ভাবে জল রাখা হইবে, যে, দেখিলে একটী প্রকৃত জলাশয় বলিয়া ভ্রম হইবে। জলের মধ্যে যখন বিভিন্ন স্বাধীন জাতির সুরম্য অট্টালিকার সুন্দর স্তম্ভ, দেয়াল, পতাকা ও অপরাপর কারুকার্য্যময় অট্টালিকার প্রতিবিম্ব পড়িবে, তখন বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে উহার সৌন্দর্য্য অতুলনীয় হইবে। যখন এই প্রদর্শনীর প্রাসাদ-সমূহের কথা মনে হয় তখন ভারতের অতীত গৌরব এবং ইন্দ্রপ্রস্থের ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদ সমূহের ও সেই রাজসূয় মহাযজ্ঞের কথা স্বতঃই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। বিশেষতঃ অতীত ভারতের কীর্ত্তি ও বর্ত্তমান ভারতের দৈন্য দুঃখ, আর তত্তুলনায় এই সমৃদ্ধিসম্পন্ন মহান্ জাতীয় মর্য্যাদার যাহাদের অভিমান আছে, তাহারা আজ এই সার্ব্বজাতিক বিরাট উৎসবের সংবাদ শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং আনন্দে ও আগ্রহে জাতীয় শক্তি, কারুকৌশল ও সভ্যতা ইত্যাদি নানা বিষয় প্রদর্শনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। ভারতবাসী আমরা, এখন এস্থলে আমাদের কি কর্ত্তব্য ? আমরা কি জাগ্রত না নিদ্রিত ? আমরা কি আজ আমাদের জাতীয় সম্মান সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হইতে পারি না ? জগতকে দেখাইবার মত আমাদের কি এমন কিছুই নাই ? ভারত-ভাণ্ডারে কি এমন কোন রত্ন মাণিক্যও নাই যাহা দেখাইয়া আমরা আজ জগতের সম্মুখে অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া মস্তক উত্তোলন করিতে পারি ?

মহামেলার স্থানটী ৬৩৫ একর বা প্রায় দুই হাজার বিঘা জমি অধিকার করিয়াছে। স্থানটী দেখিতে অতি সুন্দর ; প্রদর্শনীর প্রাসাদের নক্সাগুলি পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারিকর দ্বারা তৈয়ারী করা হইয়াছে। প্রাসাদের ছবিগুলি ভালরূপে দেখিলে ভাবুক মাত্রেই অনায়াসে তৎসৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং আমেরিকা শিল্পে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে ও প্রদর্শনীর জন্য কত অগাধ অর্থ ব্যয় করিতেছে তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রধান এগারটী প্রাসাদ নিম্নলিখিত বিভাগ অনুসারে নির্ম্মিত হইয়াছে :—১। ললিতকলা, (Fine art), ২। শিক্ষা (Education), ৩। সামাজিক মিতব্যয়িতা, (Social economy), ৪। বিবিধ শিল্প-কারখানা, (Manufactures and Varied Industries), ৫। কৃষিবিদ্যা, (Agriculture), ৬। গৃহপালিত পশু (Live-Stock), ৭। ফলচাষ (Horticulture), ৮। খনি এবং ধাতু-বিদ্যা, (Mines and Metallurgy), ৯। যন্ত্র-কৌশল, (Machinery), ১০। চালানি ব্যবসা, (Transportation), ১১। উদার শিল্প (Liberal art)। এই সমস্ত বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগের যে সমস্ত বিষয় প্রদর্শিত হইবে তাহার বিবরণ উল্লেখ করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব, কাজেই সব উল্লেখ না করিয়া কয়েকটী মোটামুটী নাম নিয়ে উল্লেখ করা গেল :—

নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষা, মধ্যপ্রাথমিক শিক্ষা, কলেজী শিক্ষা, শিক্ষাবিস্তার-প্রণালী, বাণিজ্যশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, খঞ্জ, অন্ধ, মূক, বধির প্রভৃতির শিক্ষা, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষা ও জাতীয় স্বাস্থ্যবিধান, বিভিন্ন দেশের আয়-ব্যয়-প্রণালী মাদক দ্রব্য ব্যবহারের ফল, মানচিত্র প্রস্তুত করণ, রসায়ন ও ভৈষজ্য বিদ্যা, যৌথ কারবার, ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্য বিদ্যা, মুদ্রা ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্ম্মাণ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাবলী, সঙ্গীতবিদ্যা, সর্বপ্রকারের ইঞ্জিনিয়ারিং, কাচ নির্ম্মাণ, কার্পেট নির্ম্মাণ, বয়নবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, গ্যাসের আলো, কাপড় রঙ করা (Dyeing), রেশম প্রস্তুত করণ, সর্বপ্রকারের পরিধেয় বস্ত্র নির্ম্মাণ, ফল রক্ষণ (Fruit preserving) ইত্যাদি বিষয় বিশেষ রূপে প্রদর্শিত হইবে।

প্রদর্শনীতে নিম্নলিখিত দেশগুলি সামরিক মিলনার্থে আপন আপন সেনাদল পাঠাইবেন :—যথা,

ইংলণ্ড, জার্ম্মানি, ফ্রান্স, রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, ডেনমার্ক, ইতালী, বেলজীয়ম্, পর্ত্তুগাল, স্পেন, সুইডেন, নরওয়ে, সুইজারল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর আর কোথায়ও এরূপ সামরিক মিলন হয় নাই। এই নানা দেশের সেনাদলের মধ্যে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেট্ হইতে তিনটী পদাতিক সৈন্যদল ও অন্যান্য কতকগুলি জাতীয় রক্ষক সৈন্যদল যোগদান করিবে। প্রত্যেক সেনাদল আপন আপন গুণ দেখাইয়া যশ, গৌরব ও মান লাভ করিতে বিশেষ যত্নবান হইবে। ভারতের অতীত শৌর্য্য বীর্য্যের কথা যেন এখন কাহিনী বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু আজও শিখ্, গুরখা, রাজপুত, পাঠান সৈন্যের বীরত্বের কথা সভ্যজগতে অজ্ঞাত নহে। এই সার্ব্বজাতীয় সামরিক সম্মিলনে ভারতীয় সৈন্য আসিলে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি হইত।

নিম্নলিখিত দেশগুলি প্রদর্শনী-ভূমিতে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার জন্য, আপন আপন দেশের নানাপ্রকারের জিনিষ দেখাইবার জন্য ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে :—

আর্জেন্টাইন্, চীন, জাপান, বোলিভিয়া, ব্রাজিল, ক্যানাডা, চিলি, কষ্টারিকা, কিউবা, ডেনমার্ক, ডমিনিকান্-রিপাব্লিক্, ইকুয়াডর্, ফ্রান্স, গুয়াটেমালা, হেইটী হল্যাণ্ড, হনডুরাস, লাইবেরিয়া, মেক্সিকো, নিকারোগোয়া, পানামা, পেরু, পর্ত্তুগাল, সালভাডর, সুইডেন্, উরুগোয়ে, ভেনেজুয়েলা। ইহাদের মধ্যে জাপান ইতিপূর্ব্বেই তাহার সর্ত্ত প্রকাশ করিয়াছে যে প্রদর্শনী শেষ হইবার পর তাহারা প্রাসাদ ও প্রদর্শিত বস্তুসমূহ জাতীয় বন্ধুতাস্বরূপ ক্যালিফোর্ণিয়াকে দান করিবে।

নিম্নলিখিত ষ্টেট্‌স্ এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের অধিকারভুক্ত কয়েকটী দ্বীপ প্রদর্শনার জন্য নানাবিধ জিনিষ যোগাড় করিয়াছেন এবং অট্টালিকাসমূহ

(Statebuldings) সুসজ্জিত করিবার জন্য বিবিধ প্রকারের সুন্দর সুন্দর মূল্যবান জিনিষ সরবরাহ করিয়াছেন। কেবল সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো নগরে জনসাধারণ হইতে প্রদর্শনীর জন্য পঁচাত্তর লক্ষ ডলার চাঁদা উঠিয়াছে। (এক ডলার তিন টাকা দুই আনা।)

এই জগদ্বিখ্যাত প্রদর্শনীতে অন্ততঃ দুইশত কংগ্রেস বসিবে। এই সব কংগ্রেসের জন্য একটী প্রকাণ্ড সভাগৃহ নির্ম্মাণ করা হইবে; ইহাতে দশ লক্ষ ডলার ব্যয় হইবে। এই সভা-মন্দিরে দশ হাজার লোকের বসিবার স্থান হইবে।

সূর্য্য ও নক্ষত্র (Court of the Sun and Stars) নামক প্রাসাদের উপরিভাগে একটী বৃহৎ ভারতীয় হস্তীমূর্ত্তি অতি সুসজ্জিতভাবে রাখা হইবে এবং তাহার উপরিস্থ হাওদার ভিতর বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি অতি সুন্দররূপে সংস্থাপিত হইবে। প্রাসাদের শিরোদেশে নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিত হইবে।

Unto Nirbana. He is one with life
Yet lives not, He is blest ceasing
To be, Om Manipadme Om. The
Dewdrop slips into the shining sea.

সাজাহানের সময়কার ভারত-প্রস্তুত একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ এই প্রদর্শনীতে আনা হইবে। বর্ত্তমান সময়ে জাহাজ খানি নিউইয়র্কের বন্দরে আছে। জাহাজটী দেখিতে অতীব সুন্দর। ভারতের শিল্প ভারত হইতে বিলুপ্ত হইলেও বিদেশীর হাত হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

এই বিশ্বপ্রদর্শনীতে পৃথিবীর সকল দেশ হইতেই প্রতিনিধিগণ আসিবেন এবং নিজ নিজ দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি যাবতীয় বস্তু প্রদর্শন করাইবেন। এতদ্ব্যতীত প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দেশের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার ইত্যাদি সকল বিষয়েই আলোচনা করিয়া আপন দেশকে অন্যান্য উন্নত ও শিক্ষিত দেশের সঙ্গে চিরসখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ করিবেন। একটু ভাবিলে, সহজেই বুঝা যাইবে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে এই প্রদর্শনীতে এত অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহারা কেন আসিতেছেন এবং কেনই বা প্রদর্শনী ভূমিতে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছেন। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর লোক শান্তি চায়; অনেক কাল ধরিয়া একদেশে অন্য দেশের সঙ্গে অশান্তির আগুন জ্বালিয়া পরস্পরকে ধ্বংস বিধ্বংস করিয়াছে; কিন্তু মানুষ এখন তাহা চাহে না। মানুষ এখন সুখ শান্তি চায়, তাই একটা সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছে। এই প্রদর্শনী-ভূমিতে সর্ব্বজাতিক শান্তি (Universal peace) স্থাপনের এক প্রশস্ত পথ উদ্‌ঘাটিত হইবে, তাই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এত লোক আসিতেছে।

ভারতীয় বণিক-সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলে এই জগদ্বিখ্যাত প্রদর্শনীতে ভারত হইতে শাল, বনাত, গজদন্ত, হীরা, পান্না, মুক্তা, প্রভৃতি মূল্যবান জিনিষ লইয়া আসিতে পারেন। প্রদর্শনীর সময় এখানে জিনিষ আনিতে কোনরূপ শুল্ক লাগিবে না, অথচ তাঁহারা তদ্বিনিময়ে অগাধ অর্থরাশি উপার্জ্জন করিতে পারিবেন! ভারতীয় রাজন্যবর্গ, শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও বণিক-সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলে ভারত হইতে প্রতিনিধি এবং শিল্প ও বাণিজ্যপদার্থ ও অন্যান্য বহুমূল্যবান জিনিষ অনায়াসে এখানকার প্রদর্শনীতে পাঠাইতে পারেন। যদি ভারতের এই তিন শ্রেণীর লোকদের কেহই এ বিষয়ে অগ্রসর না হন তবে আর কে হইবে? কিন্তু ভারতবাসী যদি ভারতের প্রাচীন ও বর্ত্তমান শিল্প, বাণিজ্যপণ্য ও বহুমূল্যবান জিনিষ নিজেরা প্রদর্শনীতে না আনেন তবে অন্য কেহ এখানে আনিবেন এবং তাঁহারা ভারতের নামে যশোলাভ করিবেন, কিন্তু ইহাতে ভারতবাসীদের কোন নাম কিম্বা যশ হইবে না। বিদেশী বণিকেরা পূর্ব্বে অনেকস্থলে ভারতীয় শিল্প ইত্যাদি প্রদর্শন করিয়া নিজেরা যশস্বী হইয়াছেন, এক্ষেত্রেও তাহাই হইতে চলিল; কারণ সাধারণতঃ সংগ্রহকারকেরই নাম-যশ হইয়া থাকে।—প্রবাসী

সরকারী কৃষি সংবাদ

ধানের উফ্‌রা রোগ

উফ্‌রা ক্রিমির স্বভাব পর্য্যালোচনা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উফ্‌রার স্ত্রী কৃমিগুলি কি পরিমাণ ডিম পাড়ে, এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ ৫০টি হইতে ১০০টি পর্য্যন্ত হইবে। গমের কৃমি টাইলেনকাস্ ট্রিটিসাই প্রায় ২,০০০ হাজার ডিম পাড়ে। উফ্‌রার কৃমি যদ্যপি ১০০টি করিয়াও ডিম পাড়ে এবং ঐ সকল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া অর্দ্ধেক পুং ও অর্দ্ধেক স্ত্রী কৃমি হয়, তবে তিন পুরুষেই এক জোড়া কৃমির বংশ প্রায় আড়াই লক্ষ হয়। অতএব দেখা যায় ইহাদের উৎপাদিকা শক্তি অসীম।

অধুনা এ রোগ কেবল ধান গাছেরই পাওয়া গিয়াছে। ধানের জমির কিনারায় এক রকম বন্য ঘাস দেখা যায়; তাহাতেও এ রোগ ধরে বলিয়া একবার প্রকাশ পায় কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা ইহা এপর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। ধান গাছের যে অংশ মাটীর উপরে থাকে, কৃমিগুলিকে কেবল সেই অংশেই দেখা গিয়াছে। ইহারা পাতার পেটোর ভিতরে থাকিয়া গুটান পাতার কিনারা দিয়া থোড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ধান গাছের শিকড়ে, মৃত্তিকায় বা ধান্য ক্ষেত্রোৎপন্ন আগাছা

সকলে এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। এরূপ অনুসন্ধান বড়ই কঠিন এবং মাটিতে ইহারা যে পাওয়া যাইবে না, ইহা এখনও সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। যে ক্ষেত্রে রোগ জন্মিয়াছিল, সেই ক্ষেতের শুষ্ক ধানের গোড়ায় ইহারা সাধারণতঃ দেখা যায় এবং পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে শুষ্ক স্থানেও কখনও কখনও ইহারা পনর মাস পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। গমের কৃমি টাইলেনকাস্ ট্রিটিসাই এ সম্বন্ধে অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং দেখা গিয়াছে যে শুষ্ক ব্লটিং কাগজে ২৭ বৎসরের পরেও ইহারা জীবিত থাকে। সম্পূর্ণরূপে জলে ডুবাইয়া রাখিলে ইহারা বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না এবং জল বেশ পরিষ্কার না হইলে ৪ মাসের পর একটীও বাঁচিয়াথাকে না।

* জুলাই মাস হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত কৃমিগুলি গতিশীলাথাকে এবং মোচড়ান পাক দিয়া শরীর কুঞ্চিত করিয়া জলে দ্রুত চলাচল করিতে থাকে। ডিসেম্বর মাসে ইহাদের গতিশক্তি হ্রাস পায় এবং তখন কুণ্ডলী হইয়া ধানের শীষে এবং ধান কাটা হইলে ধানের গোড়ায় বাস করে। বর্ষাকালে এবং নদী বাড়িয়া মাঠ পুনরায় জলমগ্ন না হইলে ইহাদের চলাচল সম্ভবপর হয় না। অতএব কেবল বৎসরের শেষভাগেই উফ্‌রা রোগ শীঘ্র শীঘ্র ছড়াইয়া পড়িতে পারে। এই সময়ের মধ্যে কতবার ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয়, তাহা এপর্য্যন্ত ঠিক জানা যায় নাই, কিন্তু বোধ হয় তিন বারের কম নয়।

অনুসন্ধানদ্বারা যতদূর জানা গিয়াছে এই অনিষ্টকারী কৃমি কেবল সজীব ধান গাছ ছাড়া অন্য কিছু হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। ধান যখন জন্মে না তখন ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয় না এবং ইহারা আহার করে না। ধান পাকিবার পর ইহারা কুণ্ডলী হইয়া নিদ্রিত অবস্থায় থাকে। রোগের সংক্রামক অবস্থায় ইহারা নিশ্চয় জলের মধ্য দিয়া এক গাছ হইতে অন্য গাছে যায় এবং আমরা পরীক্ষাদ্বারা দেখিয়াছি যে যদি কৃমিগুলিকে ধান গাছের গোড়ায় জলে রাখা হয়, তাহা হইলে ইহারা জল হইতে গাছ বহিয়া উঠিয়া যায় এবং ডগের পত্র কোরকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কিন্তু ধান গাছ ভিন্ন অন্য কোথায়ও ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করিতে বা বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে না এবং কেবল জলে রাখিলে শীঘ্রই নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই সম্বন্ধে পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই, কারণ ধানক্ষেতের যে সকল স্বাভাবিক অবস্থায় কৃমিরা বাস করে ও জীবন কাটায় সেই সকল স্বাভাবিক অবস্থা পরীক্ষাগারে সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করা কঠিন।

উফ্‌রার কৃমি ধান গাছের যে অংশের ত্বক্ পুরু ও শক্ত হইয়া গিয়াছে সে অংশ খাইতে পারে না। যে শুণ্ডদ্বারা ইহারা গাছের ত্বক্ ভেদ করিয়া রস চুষিয়া গ্রহণ করে, তাহা সূক্ষ্ম ও অতি ক্ষুদ্র এবং গাছের শক্ত ও স্থূল আবরণ ভেদ করিতে

* জুলাই—আষাঢ়, শ্রাবণ, নভেম্বর—কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ

সম্পূর্ণ অশক্ত, এই কারণেই বোধ হয় ডাঁটা, শীস্ ও পাতা ইত্যাদির নরম অংশই ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ডগের কয়েকটী গাঁটের ঠিক উপরেই কতকটুকু অংশ ভিন্ন ডাঁটার অপরাংশের ত্বক্ মোটা ও কর্‌করে। এই সব পাতলা ও কোমল ত্বকবিশিষ্ট অংশগুলিই আক্রান্ত হইয়া কাল ও সঙ্কুচিত হইয়া যায় (চিত্রপট দৃষ্টে সবিশেষ জানিতে পারা যাইবে)। কচি শীষ্‌টিও শক্ত আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত নহে, সেই জন্য ইহাতে বহুসংখ্যক কৃমি বর্ত্তমান থাকিয়া খাইতে থাকে। ডগের ভিতরের কচি কচি গুটান পাতার ত্বক্ এবং অন্যান্য পাতার পেটোর ভিতরের দিকের ত্বক্‌ও নরম। সেইজন্য এই সব জায়গাতেও অনেক কৃমি থাকে। রোগের প্রথম অবস্থায় এই সব জায়গাতেই সকল সময় কৃমি দেখা যায়।

কি পরিমাণ অনিষ্ট এই রোগের দ্বারা সংঘটিত হয় এবং কিরূপে ইহাদিগের আক্রমণে বাধা দেওয়া যায়, ইহা বিবেচনা করিতে হইলে যেস্থানে এ রোগ দেখা দিয়াছে তথাকার ধান্য আবাদের আনুসঙ্গিক অবস্থা জানা দরকার।

পূর্ব্বোক্ত তিনটি জেলায় ধান্যই প্রধান শস্য এবং আবাদি ভূমির শতকরা ৭০ ভাগেরও উপর জমিতে ধানের চাষ হইয়া থাকে; প্রায় ত্রিশলক্ষ একর জমিতে প্রতিবৎসর ধান দেওয়া হয়। এই গণনাতে যে জমিতে বৎসরে দুইবার ধান্যের আবাদ হয় তাহা দুইবার ধরা হইয়াছে। তাহা বাদ দিয়া মোট ধান আবাদি জমি সম্ভবতঃ ২৫ হইতে ২৭½ লক্ষ একর হইবে। সর্ব্বসমেত উৎপন্ন ধানের পরিমাণ ১১০০,০০০ টন অর্থাৎ ৩ কোটী মণ হইবে। অতএব স্পষ্ট দেখা যায় যে উফ্‌রা হইতে খুব বেশী ক্ষতির আশঙ্কা।

পূর্ব্ববঙ্গের উপকূলবর্ত্তী জেলাসমূহে সাধারণতঃ বৎসরে তিন রকম ধানের আবাদ হয়; যথা 'আউশ,' 'আমন' এবং 'বোরো' ধান্য। ইহাদের প্রত্যেকটী আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত।

ঋতু ও জমির অবস্থানুসারে আউশ ধান ফেব্রুয়ারী হইতে সুরু করিয়া মে মাসের প্রথম পর্য্যন্ত বুনা হয়। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফসল কাটা হয়। সাধারণতঃ অন্যান্য ধান্যক্ষেত্র অপেক্ষা কিঞ্চিত উচ্চতর জমিতে এ ধান দেয়। জমি কয়েক ইঞ্চি পরিমাণ উচ্চ হইলেই এ ধানের পক্ষে যথেষ্ট এবং এরূপে জমি বাছাই করার উদ্দেশ্য এই যে বর্ষার প্রারম্ভে ইহা যেন গভীর জলে নিমগ্ন না হয়। নোয়াখালীর অনেক জায়গায় আউশ ধান নিম্ন জমিতেও দিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ জলা জমিতে দেয় না। ইহা আমন ধানের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া যতদূর সম্ভব জেঠ করিয়া বুনে এবং যে যখন পাকে কাটিয়া লয়। যে সব আউশ শীঘ্র পাকে এবং যাহা জুলাই অথবা আগষ্টের প্রথমেই কাটিতে পারা যায় তাহারই জন্য এরূপ নিম্নভূমি নির্ব্বাচিত করা হয়। প্রায় সব আউশ ধানই বুনা হয়, অত্যল্পেরই চারা

উঠাইয়া রোপণ করে। মোট জমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশে আউশ ধান লাগান হয়। ইহা আমন অপেক্ষা কম ফলে এবং ইহার চাউলও ভাল জাতীয় আমন অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

আমন ধানকে দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক, লম্বা ডাঁটাবিশিষ্ট যাহা গভীর জলে জন্মে; আবাদি আমনের অধিকাংশই এই শ্রেণীর। মার্চ্চ হইতে মে মাসের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ইহা ক্ষেত্রে একবারেই বুনিয়া দেয়। কোথাও কেবল আমনই বোনা হয় আবার কোথাও (যেমন নোয়াখালীতে) আউশের সহিত মিশ্রিত করিয়া বোনা হয়। আর এক ছোট ডাঁটাবিশিষ্ট যাহাকে 'সাইল' বা 'রোয়াধান' বলে। ইহা মে হইতে জুলাই পর্য্যন্ত বীজতলায় জন্মান হয় এবং আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে চারা উঠাইয়া রোয়া হয়। উভয় রকম আমনই নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কাটা হয়। যাহারা গভীর জলে জন্মে ঐ সব ধান মোটা এবং বন্যার জলে তাহাদের ক্ষতি হয় না। ইহারা ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৯ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বাড়ে বলিয়া শুনা যায় এবং ইহাদের ডাঁটা কখনও ২০ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। যখন আউশের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া জন্মান হয় তখন ইহাদিগকে 'বাজাল' (ভেজাল) কহে। নোয়াখালীতে অর্দ্ধার্দ্ধি অথবা প্রায়ই এক ভাগ আমন ও তিন ভাগ আউশ মিশায়। গভীর জলে জন্মিতে পারে এমন ধান সকলের চেয়ে নীচু জমিতে দেয় এবং যে জমি শীঘ্রই জলে ডুবিয়া যায় তাহাতে ফেব্রুয়ারী মাসেই বুনিতে হয়। জল বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা বড় হইতে থাকে এবং পাকিলে কেবলমাত্র শীষগুলি ১ হইতে ১½ ফুট ডাঁটাসহ কাটা হয়। আর বাকী অংশ অনেক লম্বা নাড়ারূপে থাকিয়া যায়। কখনও কখনও এই সব জমিতে ধান কাটিবার কিছু পূর্ব্বে খেঁসারী কলাই ইত্যাদি ধানের সঙ্গেই বোনা হয়।

চারা উঠাইয়া যে 'আমন' রোপণ করা হয়, কোন কোন জমিতে কেবল সেই ধানই একবার উৎপন্ন করা হয় অথবা ইহার পর মটর কলাই ইত্যাদি রবি ফসল লাগান হয়। আবার কোথাও প্রথমে আউশ অথবা পাট আবাদ করিয়া পরে আমন দেয়। ভাল রকমের আমন ধান উচ্চ জমিতেই জন্মিয়া থাকে। ঐ স্থানের অনেকেই বলে যে নোয়াখালীর পশ্চিমাংশে গত কয়েক বৎসরের পূর্ব্বে রোয়া ধান অত্যল্পই দেওয়া হইত। কিন্তু এখন চৌমুহানির নিকটবর্ত্তী স্থানে চাষের প্রায় শতকরা বিশ ভাগ রোয়া ধান। পাটের চাষ বাড়িয়া যাওয়া ইহার এক কারণ। রোয়া ধান দ্বিতীয় ফসলস্বরূপ পাটের পর দেওয়া হয়। উক্ত বার দ্বারা বোনা ধানের অনিষ্ট আর এক কারণ। আউশ অথবা পাট কাটা যাওয়া পর্য্যন্ত বীজতলায় চারা জন্মে। তারপর চারা উঠাইয়া উচ্চ জমিতে কয়েকবার চাষ দিয়া আগষ্ট অথবা সেপ্টেম্বরের শেষে রোপণ করা হয়।

বোরো ধান অপর দুই ধানের ন্যায় তত প্রসিদ্ধ নয় এবং নোয়াখালীতে ইহা খুব কম লোকেই জানে। অন্য দুই জেলাতেও ইহার চাষ অতি অল্প। ইহা কর্দ্দমাক্ত জমিতে নদী ও খালের ধারে জন্মে। সাধারণতঃ ইহার চারা তুলিয়া রোপণ করে কিন্তু সময় সময় কর্দ্দমাক্ত সমতলক্ষেত্রে একবারেই বোনা হয়। অক্টোবরের শেষে অথবা নবেম্বর মাসে রোয়া বোরোর বীজ বপন করা হয় এবং ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারী মাসে চারা উঠাইয়া রোপণ করে। বিশেষরূপে চাষ দিয়া জমি তেমন তৈয়ারী করিবার দরকার হয় না। যে সব মাঠে জোয়ার ভাঁটার দরুণ জল যায় সে সব ভিন্ন অন্যত্র জল সেচন করিতে হয়। এপ্রিল, মে মাসে ধান পাকে। উৎপন্ন শস্য খুব বেশী পাওয়া যায় কিন্তু চাল্ বড়ই মোটা হয়। বোনা 'বোরোর' বীজ ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারী মাসে বপন করা হয় এবং রোয়া 'বোরোর' সঙ্গেই ইহা কাটা হয়।

অতএব দেখা যায় যে ধান কাটার প্রধান সময় নবেম্বর এবং ডিসেম্বর মাস, বোনা আমনের এবং ভেজাল আমন ও আউশের রাশি রাশি নাড়া বা গোড়া আর্দ্র মাঠ বিছাইয়া থাকিয়া যায়। এ সকল নাড়া গবাদির খাদ্যোপযোগী নয়, তবে গো মহিষাদি এই সব মাঠে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা যাহা পারে আগাছা ও পচা নাড়া খুঁটিয়া খায়। নোয়াখালী জেলার উত্তরাংশে কোন কোন মাঠ পরিষ্কার করিয়া তৃণাদি জড় করে এবং সমস্ত জঞ্জাল জ্বালাইয়া দেয়, কিন্তু পশ্চিমাংশে এরূপ প্রায় করে না। ধান কাটার অব্যবহিত পরে কখনও চাষ দিতে সুরু করে। নোয়াখালীতে কিন্তু সে সময় চাষ না দিয়া বৃষ্টি হইলে ফেব্রুয়ারী মাসেই সাধারণতঃ নিম্ন ভূমিতে চাষ দিতে আরম্ভ করে। এসব জেলার জমির মাটি শক্ত আঁটাল এবং বন্যার জলে প্লাবিত হয়। কৃষকদের দুর্ব্বল গো মহিষাদির দ্বারা চাষ দিবার জন্য, ফেব্রুয়ারী অথবা মার্চ্চ মাসের প্রথমে অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখে বৃষ্টিপাত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন হয়; তাহা না হইলে মাটি নরম হয় না। ধান কাটার পূর্ব্বে যে সকল ক্ষেত্রে শীতকালীন মটর কলাই ইত্যাদি দেওয়া হয় সেই সকল জমিও ফসল না থাকিলে চাষ দেওয়া হয় না। চাষ দেওয়ার পূর্ব্বে নাড়ার তখনও যাহা অবশিষ্ট থাকে জ্বালানির স্বরূপ ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করা হয়। ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ মাসে অথবা অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে তাহার পরেও পাঁচ কিম্বা ছয় বার চাষ দিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ধান্যের জন্য এবং ক্ষেত্রের অবস্থা অনুসারে হালের কার্য্য কমান ও বাড়ান হয়, কিন্তু যতদূর আমি জানিতে পারিয়াছি যে সকল নিম্ন ভূমিতে গভীর জলে 'আমন' ধান্য এবং 'ভেজাল' ধান্য হয় তাহাতে অন্যান্য জমি অপেক্ষা কম চাষ দেওয়া হয়, কেননা বৎসরের নয় দশ মাস যাবত তাহাতে ধান থাকে এবং ধান কাটা হইলে মাসাবধির উপর নাড়া পড়িয়া থাকে।

উফ্‌রা 'আউশ' এবং 'আমন' উভয় ধানেই হইতে দেখা গিয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত 'বোরো' ধানে পাওয়া যায় নাই। নোয়াখালীতে শুধু আউশ ধানের চাষ অল্প। আউশ শুধুই থাকুক বা আমনের সহিত ভেজালরূপেই থাকুক জুন মাসের শেষে থোড় হইবার সময় আউশই প্রথম আক্রান্ত হয়। প্রথম প্রথম মাঠের এখানে ওখানে কতক কতক জায়গায় রোগ দেখা দেয় কিন্তু তেমন শীঘ্র শীঘ্র ছড়াইয়া পড়ে না। যদিও যেস্থানে হয় সেখানের সমস্তই নষ্ট করে তথাপি আউশ ধানের সমূহ ক্ষতি করিতে পারে না কারণ রোগ ছড়াইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই এই ধান পাকিয়া যায়। আগষ্ট মাসের প্রথমে আউশ ধানে উফ্‌রা যখন খুব বৃদ্ধি পায় তখন বোনা আমন ধান প্রায় অর্দ্ধেকও বড় হয় না এবং তাহাতে শীষের কোন চিহ্নও দেখা দেয় না। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে বোনা আমন ধানের এই অবস্থায় রোগের আক্রমণ প্রথম সুরু হয়। আউশ ধানেও জুন মাসের পূর্ব্বেই বোধ হয় রোগের আক্রমণ সুরু হয়। ছোট আউশ পরীক্ষা করিবার সুযোগ এ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। বোনা 'আমন' ধান একাই থাকুক অথবা আউশের সঙ্গে মিশ্রিতই থাকুক আগষ্টের শেষে এবং সেপ্টেম্বরে সমস্ত মাঠই রোগাক্রান্ত হইতে পারে। অতএব বোধ হইতেছে 'আউশ' এবং আউশের সহিত বোনা 'আমনে' রোগ বিশেষ অনিষ্ট করে না। তাহার কারণ আউশ ধান ও ঐ আমন ধান পাকিবার আগে ইহারা বাড়িবার সময় পায় না কিন্তু ইহারা একবার ইহাদের বংশবৃদ্ধি করিয়া লইলে বিশেষ অনিষ্ট করে। (ক্রমশঃ)

আশ্বিন, ১৩২১ সাল।

রন্ধনের উপযুক্ত কন্দ, মূল, ফল

সাধারণতঃ আমরা সকল প্রকার রন্ধনোপযোগী তরকারীকে সজী বা সবুজী বলিয়া থাকি। সজী মাত্রেই আমাদের খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান। যেখানে মানুষ কোন না কোন রকম তরকারী খায় না এমন দেশ বোধ হয় নাই। বাঙলায় তরকারী রন্ধনের প্রথার যেমন পারিপাট্য লক্ষিত হয় এমন আর কোথাও দেখা যায় না। তরকারীর মধ্যে আলু এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে —সারা পৃথিবীময় ইহার ব্যবহার। সবদেশেই প্রায় আলু হয়, ইহা সিদ্ধ না হয় ভাজিয়া বা ব্যঞ্জন রান্ধিয়া খায়। কিন্তু বাঙলার লোকে একটা তরকারী স্বতন্ত্র ব্যবহার প্রায় করে না। দুই তিন, চারিটা তরকারী মিলাইয়া ব্যঞ্জন রাঁধার ইচ্ছা এখানে যত বলবতী অন্যত্র ঐ রকমের আগ্রহ বড় বেশী দেখা যায় না। বাঙলার লোকে ঝোলে ঝালে, অম্বলে আলু ব্যবহার করে। তাহারা মাছের সঙ্গে, মাংসের সঙ্গে আলু রাঁধে।

কন্দের মধ্যে আমরা আমাদের দেশে কচু, ওল, খাম আলু, চুবড়ী আলু প্রভৃতি খাইতে পাই। এই সকল গুলিই আমরা রন্ধন করিয়া খাই। ইহার সহিত আলু, মটর প্রভৃতি সজীর ব্যবহার করিয়া থাকি। এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ প্রভৃতি গন্ধদায়ী মশলা ও হলুদ, লঙ্কা, তৈল, লবণ সংযোগে পরিপাটী রান্নার ব্যবস্থা আমাদের দেশে যেন চরমে উঠিয়াছে। শাঁক আলু ও শকরকন্দ আলুও কন্দ কিন্তু এই সকল কন্দ কাঁচা খাওয়া হইয়া থাকে।

মূলের মধ্যে আমাদের দেশে পেঁয়াজ, মূলাই প্রধান ছিল। এখন আমরা বীট সালগম, গাজর, আর্টিচোক, জেরুজালেমআর্টিচোক, পার্শনিপ, আসপারাগা বা শতমূলী প্রভৃতি কতই বিলাতী মূলজ সজীর চাষ আবাদ করিতে শিখিয়াছি এবং খাইতেও শিখিয়াছি। আমরা শত মূলীর মোরব্বা করিয়া খাই কিন্তু ইহার

তরকারীও বেশ হয়। বিলাতে লোকে সালগম, পার্শনিপ প্রভৃতির সুপ বা সিদ্ধ খায় কিন্তু আমরা সালগম, জেরুজালেম আর্টিচোক প্রভৃতি ঝোলে ঝালে অন্য তরকারীর সহিত ব্যবহার করিতেছি। পেঁয়াজের স্বতন্ত্র তরকারী আমরা খুব কমই খাই কিন্তু মাছ রাঁধিতে, মাংস রাঁধিতে, ভাল করিয়া দাইল রাঁধিতে আমাদের পেঁয়াজ না হলে যেন আর চলে না। আমরা কখন বা আস্ত পেঁয়াজ কখন বা পেঁয়াজ কুচাইয়া কখন বা পেঁয়াজের রস ব্যবহার করি। কিন্তু পেঁয়াজ বড় উত্তেজক যাঁহারা শান্ত এবং সাত্তিক আহারের পক্ষপাতী তাঁহাদের পক্ষে পেঁয়াজ বর্জ্জনীয়।

বিলাতী তরকারী আমরা অনেক সময়ে দেশী প্রথায় রন্ধন করিয়া খাই কিন্তু বিলাতী প্রণালীতে রাঁধিলে এগুলি আরও সুস্বাদু হয়। দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখুন, —জেরুজালেম আর্টিচোক গুলি সরু সরু করিয়া কুচাইয়া লইয়া লেবুর রসে লবণ ও জল সংযোগ করিয়া তাহাতে এক ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিবার পর ছাঁকিয়া লইতে হয়। তার পর সেগুলিকে ঘৃতে বা ভাল চর্ব্বীতে ভাজিয়া লইলে অল্প লবণ চূর্ণ সহযোগে খাইতে অতি উপাদেয় হইয়া থাকে।

গাজর কিম্বা সালগম গুলি জলে ধৌত করত অন্ততঃ ২০ মিনিটকাল লবণ জলে সিদ্ধ করিতে হয়। সিদ্ধ হইয়া নরম হইয়া আসিলে সেগুলিকে ছাঁকিয়া লইয়া মাখনে মৃদুজ্বালে ভাজিতে হয় এবং ইহার সহিত সস্; কিঞ্চিৎ লবণ ও বিস্কুট গুঁড়া সংযুক্ত হইলে খাইতে অতি উপাদেয় ব্যঞ্জন হয়। আমরা ব্যঞ্জনের যে অর্থ বুঝি অন্য দেশের লোকে তাহা বুঝে না। আমাদের দেশে ব্যঞ্জনাদি স্বতন্ত্র খাইবার বিধি নাই। আমরা ঝোল, দাল, চচ্চড়ি সকলই ভাত কিম্বা রুটির সহিত মাখাইয়া খাই, এমন কি আলু, ওল, কচু সিদ্ধটি পর্য্যন্ত ভাতের সঙ্গে খাই। কিন্তু অপর দেশে কোন কিছু সিদ্ধ বল, ভাজাই বল, ঝোল বা অম্বল বল সবগুলিই এক একটি স্বতন্ত্র ডিস্ এবং আলাহিদা ভক্ষিত হয়।

ইউরোপে মাংসের সহিত বীট কিম্বা গাজর রাঁধাও হইয়া থাকে। সময় সময় রান্নাটা আমাদের দেশের মতই সমাপ্ত হয়। কারণ বীট, গাজর ত পড়েই, উপরন্তু পারস্‌লি শাক এবং পেঁয়াজ কুচাইয়া দেওয়া হয়। সবগুলি সামান্য মিশিবে। আমাদের দেশের পাঁচ রকম তরকারী, তাহাতে বাটা মশলা, তৈল, লবণ বা ঘৃত দিয়া নাড়িয়া ঘাঁটিয়া যেমন মিশান হয় সে রকম নহে।

পার্শনিপের ষ্টু—পার্শনিপের ঝোল বা ডালনা যা বলিতে ইচ্ছা হয় বল ইউরোপ —বাসীর বড় রসাল তৃপ্তিকর ব্যঞ্জন। পার্শনিপ গুলি ধুইয়া কুটিয়া সিদ্ধ করিলে এবং তার পর শুকর চর্ব্বিতে ভাজিলে সে গুলির পাটল রঙ হইবে। তৎপরে ইহাতে কিঞ্চিৎ ময়দা গুলিয়া দিতে হয় এবং লবণ, মরিচ বা লঙ্কা গুঁড়া, টমাটো সস্ দিয়া

কিছুক্ষণ মৃদুজালে সিদ্ধ করিলে উপাদেয় ব্যঞ্জন হইল। গরম থাকিতে থাকিতে ডিসে ঢালিয়া তাহাতে আবার সস্ দিয়া খাইতে দিতে হয়। পেঁয়াজ সিদ্ধ, পেঁয়াজের সালাদ, পেঁয়াজের করি ইউরোপবাসীরা সচরাচর খাইয়া থাকে।

আমাদের দেশে মূলা বা সালগমের ডালনা খাইতে অতি উপাদেয় হয়। মূলা বা সালগম কুচাইয়া সিদ্ধ করা হইবে, তার পর মশালা ঘৃতাদি সংযোগে ডালনা প্রস্তুত হইবে। কিন্তু ইহার সহিত আমরা আলু এবং মটর বা ছোলা দিতে ছাড়ি না। কিছু না কিছু মিশান চাই, তাহা না হইলে যেন পরিপাটি রান্না হইবে না এবং স্বাদ গন্ধ ভাল হইবে না। আমরা সেই জন্য মোচার ঘণ্ট রাঁধিয়া ঢালিয়া তাহাতে ডালের বড়ি ভাজা চূর্ণ ও নারিকেল শাঁস কোরা মিশাইয়া দিয়া থাকি। এদেশের দেবভোগ্য রান্না তরকারি সাহেবরা খাইলে কখনও ভুলিতে পারে না। রাঁধিয়া খাইবার মত ফল তরকারীও এদেশে সংখ্যাতীত। তরকারীর মধ্যে যে আলু প্রধান, তাহা ফল নহে ও মূলও নহে। ইহা বস্তুতঃ বিশেষ ভাবে পরিবর্দ্ধিত মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত কাণ্ডের অংশমাত্র। ঐ স্ফীত অংশে ভবিষ্যত গাছের উৎপাদিকাশক্তি ও পোষণ উপাদান নিহিত থাকে। অনেকের ধারণা মাটির ভিতর যাহা হয় তাহাই যেন মূল। সে ধারণা ভুল। তরমুজ মাটির ভিতর হয়, মাট-বাদাম মাটির ভিতর হয় তাহা হইলে এ গুলিকেও মূল বলিতে হয়, ইহারা কিন্তু মূল নহে,—ফল। গাছের মূল ভাগটি বাড়িয়া যাহা খাইবার উপযুক্ত হয় তাহাই মূল। বীট, সালগমের এই হিসাবে মৃত্তিকা মধ্যস্থিত দেহ ভাগের কিয়দংশকে মূল বলা যাইতে পারে। আলু প্রভৃতি গাছের মৃত্তিকাস্থিত কক্ষ হইতে ঝুরি নির্গত হয় এবং তাহাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া আলুতে পরিণত হয়, ইহারা মূল নহে। ইংরাজী ভাষায় ইহাদিগকে টিউবার (Tuber) বলিলে বলা হয়। মিঠা আলু, রাঙা আলুও ফল বা মূল নহে, উহারা কন্দ। বেগুন, পটল, ঝিঙা, উচ্ছে, করলা, ঢেরস, সিম, মটর, লাউ, কুমড়া, ভুরুণ এই সমস্ত ফল তরকারী বা সব্জী নামের উপযুক্ত এবং ব্যঞ্জনের জন্য ব্যবহার হয়। কতকগুলি তরকারী আছে তাহা কাঁচা ও পাকা খাওয়া যায় আবার রাঁধিয়াও খাওয়া হইয়া থাকে। যেমন শসা ফল হিসাবে কাঁচা খায় এবং পক্ক শসার ব্যঞ্জন হয়। লোকে ফুটি কাঁকুড়ের কাঁচা অবস্থায় ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খায়, পাকিলে ফলের মত ব্যবহার করে। কলা পাকা খাওয়া হয় কিন্তু কাঁচাকলা আমরা ব্যঞ্জন রাঁধিতে ব্যবহার করি। পাকা ডুমুর ফল হিসাবে খায় কিন্তু কাঁচা ডুমুর রাঁধিবার তরকারী। কাঁটাল কাঁচা রাঁধিবার তরকারী কিন্তু পাকা কাঁটাল কোয়া সুধু খাইতে উপাদেয়। এইরূপ আমের ঝোল, আমের চাট্‌নি আমরা খাই কিন্তু সুধু খাইতে পাকা আম সর্ব্বপ্রধান ফল। কোথাও কোথাও কোন ফলই অপক্ক ব্যবহার করা হয় না। তাহারা পাকা বেগুণ, পাকা লাউ, পাকা পটল বা

পাইলে রাঁধে না, কাঁচা কাঁটালের বা কলার ব্যঞ্জন রাঁধিতে জানে না। অনেক ফল পাকিতে দিলে তরকারী হিসাবে তাহার গুণ কমিয়া যায়। সে গুলি কাঁচা অবস্থায়ই ব্যঞ্জনে খাওয়া ভাল।

কন্দ, মূল, ফল বাদে আমরা শাক পাত যে কতই খাই তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বনের ও জলের শাক পাত হইতে আরম্ভ করিয়া চাষের শাক পাত পর্য্যন্ত মানুষের অখাদ্য বড় কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। গরু, ছাগল, সজ্জী খাইয়া বড় বেশী রকম আমাদিগকে হারাইতে পারে না।

আমরা তিতকোঁকার ফুল খাই, সজ্‌নার পাতা খাই, মাটের নাট বেনের ডাঁটা ও মূল খাই। কল্‌মি, শুষ্‌নি, পদ্ম বা শালুক ফুলের ডাঁটা, পাতা আমরা কিছুই বাদ দিই না। জলের পিমে ও হেলঞ্চ আমাদের দেশের পরম হিতকারী শাক। পুনর্ণবা ও ব্রাহ্মী শাকের গুণ আয়ুর্ব্বেদে বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। এগুলি ব্যবহার সাতিশয় আবশ্যক মনে করি। তার পর বনের বেত ও বাঁশের কোঁড় বা হোঁকও আমাদের খাদ্য হইতে বাদ যায় না।

বন চ'ড়িয়া না বেড়াইয়া এখন ক্ষেতে আসিয়া দেখ সেখানেও শাকের ছড়াছড়ি—তুমি খাইয়া শেষ করিতে পারিবে না। সবই রাঁধিয়া খাইবার শাক। পবাদিতে কাঁচা খায় কারণ তাদের রাঁধিবার লোক নাই আর আমাদের রাঁধিবার লোক আছে বলিয়া অমরা রাঁধিয়া খাই। কিন্তু আমাদের ঘরের গৃহিনীগণের আজকাল আলস্য ও স্বাধীন ভাব যেরূপ বাড়িতেছে এবং বেতনভোগী পাচকের যেরূপ অভাব হইতেছে তাহাতেবা আমাদিগকেও গো মহিষাদির ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়! অথবা ইকমিক্ কুকারের সাহায্যে কোন রকমে সিদ্ধ পক্ক করিয়া লইতে হইবে। ঝোল, ঝাল চচ্চড়ি, ডাল্‌না প্রভৃতি তারাল, রসাল ব্যঞ্জনের বুঝিবা স্বাদ ভুলিয়া যাইতে হইবে! অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতেই হইবে, সুখে দুঃখে যত দিন যায় যাক্। এখন দেখা যাক্ ক্ষেতে খাবার কি কি শাক আছে। অনেক শাকই আছে, অশেষ প্রকার আছে,—লাউ শাক, কুমড়া শাক, উচ্ছে শাক, পুঁই শাক, ধুঁদুল শাকের লহ লহ ডগা গুলি দেখিলে অনেকেরই মুখ চুলকাইয়া উঠে। তার পর পালম শাক, নটে শাক, রাই শাক, আমাদের ক্ষেত ভরিয়া থাকে। বাঁধা কপি ও লেটুস্, শাকের মধ্যেই পড়িয়াছে। আমাদের দেশে ইহাদের চাষ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় খুব ভাল হইয়াছে একটা সুস্বাদু খাদ্য আমরা পাইয়াছি। ফুলকপির ফুলই প্রধানতঃ আমরা খাই কিন্তু ইহার কচি পাতা গুলি হইতে পবাদিকে বঞ্চিত করিতে ছাড়ি না। সজ্জী ক্ষেত হইতে কৃষি-ক্ষেত্রের দিকে ধাবমান হইলে আমরা তথায় আলু-শাক ও পাট শাক পাইয়া পরম আহ্লাদিত হই এবং সেগুলিকে আমরা যত্ন পূর্ব্বক আমাদের রাঁধিবার তরকারীর তালিকায় ফেলিয়াছি। সংমিশ্রণ বিদ্যাটা আমরা

শিখিয়া ভাল কাজই করিয়াছি। সেই জন্য এমন যে তিত নিম পাতা তাহাতে মিষ্ট আলু, সজিনার খাড়া দিয়া কেমন সুক্ত বানাই। বক ফুলের ডাঁটা ও তাহার ফুলও আমাদের খাদ্য। আমরা যাহা কাঁচা খাইতে পারি না তাহা রাঁধিয়া খাই বা কাঁচায় যাহা রাঁধা যায় না তাহা পাকিলে রাঁধি। কাঁটাল, আম, পেঁপে পাকিলে রাঁধার সুবিধা হয় না তাই কাঁচা বেলা রাঁধি কিন্তু আনারস, কিস্‌মিস্, পিচ, পেয়ারা, লিচু, খর্জ্জুর, আমরা পাকিলে রাঁধি। তেঁতুল পাকা, কাঁচা সর্ব্বদাই আমাদের অম্ল রাঁধিবার উপাদান।

তরকারী স্থানীয় ফলের মধ্যে বেগুন ও শসা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আছে। সব দেশের লোকে উহার চাষ জানে। ইউরোপে শসার সস্ বেশ উপাদেয়। ছাড়ান শসা চাকা চাকা কাটিয়া লইয়া তাহাতে লবণ, শির্কা ও অন্যান্য মশলা সহযোগে এই সস্ প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশের লোকে মাছের সঙ্গে শসার ব্যঞ্জন, শসার নিরামিষ ব্যঞ্জন তাহাতে ফুল বড়ি দেওয়া, সকলেই তাহার আস্বাদ জানে। আমরা এখানে শসার এক রকম সস্ তৈয়ারি করিতে পারি তাহা সাতিশয় উপাদেয়— খাইলে আর ভোলা যায় না। ছাড়ান শসার খুব পাতলা চাকা করিয়া লইতে হয় অথবা বাটিয়া লইলেও চলে। উহা অল্প লবণ সংযুক্ত লেবুর রসে ভিজাইবে এবং উহাতে আদার রস ও পেঁয়াজ অথবা আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা ও কিয়ৎ পরিমাণ চিনি যোগ করিলে অতি উত্তম সস্ বা চাটনি প্রস্তুত হয়। পসন্দ না হইলে পেঁয়াজের রস বা পেঁয়াজ বাটা বাদ দিতেও পারা যায়। আমাদের দেশে বেগুনের যত রকম ব্যবহার আমরা জানি অন্য দেশের লোকে তাহা জানে না। অমরা বেগুন আগুনে পুড়াইয়া লইয়া তাহাতে মাছ সিদ্ধ মিলাইয়া বড়া করিতে পারি, সেই বড়া ভাজা খাইলে বা তাহার ব্যঞ্জন খাইলে অরুচির রুচি হয়। ফলের মধ্যে যেমন বেগুন, শসা, শাকের মধ্যে তেমনি পালম। সবদেশেই ইহা আছে। অন্য দেশে ঝোলে (সুপে) বা সালাদে ইহা ব্যবহার হয়, ভাজাও খায়। আমরা পালম শাক ভাজা খাই, পালমের গোড়া চচ্চড়ি রাঁধিয়া খাই। পালম শাকের ঘণ্ট বোধ হয় আমাদের দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশে রাঁধিতে জানে না।

পানিফল প্রায় সর্ব্ব দেশেই আছে, পানফল সিদ্ধ ও তাহার পালো পৃথিবীর অনেক জায়গায় ভাত, ডাল, ময়দার মত প্রধান খাদ্য। সেই রকম পদ্মের শিকড় উত্তর ভারতে ও হিমালয়ে, অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানের লোকের প্রধান আহার, তাহারা উহাদ্বারা জীবন ধারণ করে।

আমরা অনেক বার সস্, সালাদের নাম করিয়াছি। সস্ বা কি, সালাদ বা কাহাকে বলে তাহা জানিতে অনেকের ইচ্ছা হইতে পারে। নানা গন্ধ তৃণ ও লবঙ্গাদি মশালা সহযোগে যে কোন ফল বা সব্জীর সস্ প্রস্তুত হইতে পারে, যেমন

কুকম্বার (শশা) সস্, টমাটো সস্, পার্শনিপ সস্ ইত্যাদি। সস্ মশালার তরল সার বলিলেও চলে, উহা অল্প অম্লরস যুক্ত। যে কোন ফল বা সজ্জী হইতে তৈয়ারি হয়, উহা সেই ফল বা সজ্জীর তরল সার বলিয়া খ্যাত হয়। সালাদ সতন্ত্র জিনিষ, সালাদ আমাদের দেশের কাসুন্দির মত। ইহাতে ঝোল বা বড় বেশী রস থাকে না। আমাদের দেশের কাসুন্দির মত টক হইবে এমন কোন কথা নাই। যে কোন একটি সজ্জী লইয়া মশালাদি সংযোগে একটা ঘণ্ট বানাইলে যাহা হয় তাহাই সালাদ। সালাদ চাট্‌নিও হইতে পারে আবার মোচার ঘণ্টের মত জিনিষও হইতে পারে।

বিলাতী সজ্জীর সহিত আমরা অনেকগুলি বিলাতী শাকের পরিচয় পাইয়াছি স্পাইনাক্, পার্শলি, সেলেরী প্রভৃতি। এই গুলি পালম শাকের মত ভাজিয়া বা অন্য তরকারীর সহিত খাওয়া যাইতে পারে। তাহার পর গন্ধশাক আছে যেমন থাইম, সেজ, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি। এ গুলি আমাদের মেথী, শুলফা, ধনে শাকের মত। ইহারা ব্যঞ্জনের সাগন্ধ উৎপাদন করে।

ভারতের মত এত খাদ্য শস্য আর কোথাও নাই, এত রকমের শাক সজ্জী আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ফল, ফুল, লতা, পাতা সবগুলিই যেন মানুষের শরীর পোষণের উপযোগী। এ দেশ মনে করিলে পরের মুখাপেক্ষী না হইতে পারে।

কৃষি-শিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ

জ্ঞান লাভ হেতু কৃষি-শিক্ষা কেন, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার প্রয়োজন। জ্ঞান লাভের প্রধান উদ্দেশ্য সর্ব্ববিধ দুঃখের নিবৃত্তি। আধ্যাত্ম জগতে আমাদের সম্যক জ্ঞান আমাদিগকে মোক্ষ পথে লইয়া যায়। ব্যবহারিক জগতে এই জ্ঞান আমাদের আত্মরক্ষার প্রধান অবলম্বন। জ্ঞান অর্জ্জণ করিলে তবে না মানুষ শারীরিক মানসিক দুঃখ হইতে আপনাকে বাঁচাইতে পারে। সংসারে আমরা বহুবিধ অভাবের মধ্যে আসিয়া পড়ি, এই অভাব মোচনের একমাত্র উপায় জ্ঞান অর্জ্জন। অন্নবস্ত্রের সংস্থান, শিক্ষার বা জ্ঞান লাভের মহৎ উদ্দেশ্য না হইলেও ইহা একটি প্রধান উদ্দেশ্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা কি খাইয়া জীবন ধারন করিব, কি পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিব, কি প্রকারে আমরা পুত্র, কন্যা পরিবারের ভরণ পোষণ করিব ইহা আমাদের দৈনিক সমস্যা।

কৃষি ও বাণিজ্য ভিন্ন সাবলম্বনের দ্বিতীয় পন্থা নাই। জমি লইয়া চাষ কর দেখিবে যে, মাটি লইয়া যত নাড়া চাড়া করিবে মাটি হইতে তত রত্ন বাহির হইবে।

রাজ্য সম্রাজ্য লোভীরা বলে যে, বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা,—অনেক রুধির পাত না করিলে বসুন্ধরা লাভ হয় না। আবার অমরা দেখিতে পাই যে. অনেক গায়ের রক্ত জল না করিলে বসুন্ধরা ভোগের উপযুক্ত হয় না, —এখানেও অনেক রক্তপাত, অনেক হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলা। এ রক্তপাতে কিন্তু ভীষণতা নাই, এ রুধীর পাত হিংসা-দ্বেষ-দুষ্ট নহে, এ রক্তধারা নিরবে নিশব্দে বহিয়া যায়, এই রক্তপাতের সময় ঢাক্ ঢোল, তুরি ভেরি, দামামা কাড়া, বাজিয়া উটে না। শস্য ক্ষেত্রে যাহার যত পরিশ্রম, তাহার তত লাভ, যাহার যত অধ্যবসায়, যাহার যত উদ্যোগ আয়োজন তাহার তত জয়াশা।

কৃষির সুবিধা যেমন ভারতে এমন খুব কম দেশেই আছে, এমন উর্ব্বরা শস্য ক্ষেত্র কমই নয়ন গোচর হয়। অন্য দেশের চাষীরা জমি হইতে দুই একটা ফসল লইয়া থাকে কিন্তু ভারতে এমন জায়গা অনেক আছে যাহাতে বৎসরে তিনটা ফসল উঠান যায়। এখানে এত ফসল জন্মায় যে, ভারতের লোক খাইয়া ফুরাইতে পারে না। উদ্বৃত্ত ফসল বেচিয়া ভারতে অর্থাগম হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশের চাষীরা এমন দেশে জন্মিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারে না। তাহাদের কৃষি-লব্ধ অর্থে তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার নাই। তাহারা যে নিঃস্ব, তাহারা যে পরের টাকা লইয়া চাষ করে। ধনী মহাজনগণ, যে তাহাদের সর্ব্বস্ব শোষণ করিতে বসিয়াছে, তাহাদের জমীদারগণ যে তাহাদের মা বাপ নহে। নতুবা তাহারা পাট, তিসি, চাষ করিবার জন্য বিদেশীয়ের দাদন গ্রহণ করিবে কেন? তাহারা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে যে তাহাদের আপনার চেয়ে পর ভাল, তাহারা আপনার লোকের নিকট যে সহানুভুতি না পায় পরের নিকট তাহা পায়। পর তাহাদিগকে বরং এক পয়সার জিনিষটা লইয়া আধ পয়সা দেয় কিন্তু তাহাদের মা বাপ, তাহাদের জমিদার তাহাদিগকে অজন্মার দিনে তাহার খোরাকী ধানগুলি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া জমি হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। অনেক দুঃখে তাহারা পরের হাতে সকল ধনরত্ন তুলিয়া দেয়।

কৃষিই বল, আর বাণিজ্যই বল একা সব কার্য্য হয় না। সমবেত চেষ্টার আবশ্যক। আচ্ছা, তোমার অর্থ আছে, তোমার পরিশ্রমের সামর্থ আছে, আমার জমি আছে এস আমরা তিনজনে একত্রে চাষে লাগিয়া যাই। এস আমরা সকলে এক প্রাণ হইয়া কার্য্য করি এবং অবশেষে কৃষি-লব্ধ শস্যে নিজেদের খোরাক সংগ্রহ করি এবং বিক্রয়-লব্ধ অর্থ সমান অংশে ভাগ করিয়া লই। কেহ কাহাকেও ছোট মনে করিও না, কেহ কাহারও চাকর নহে। সকলে সমান হৃদয় হইয়া সমপ্রাণ হইয়া কার্য্য করিলে দেখিবে আমাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকিবে। বাণিজ্য ব্যাপারেও অনেক লোকের প্রয়োজন, সকলকেই আপনার অংশীদার

মনে করিয়া লও, যে যেমন পরিশ্রম করিবে তাহাকে সেই মত অংশ দাও, সেই মত অর্থ দাও। ছোট বড়, চাকর মনিব জ্ঞান হৃদয়ে পোষণ করিও না। গরীব বলিয়া অবহেলা করিও না, তাহার কাজ দেখ, তাহাকে কাজ শিখাও, সে যে কাজের উপযুক্ত সেই কাজে তাহাকে প্রবৃত্ত কর, দেখিবে তোমার ব্যবসা, ধর্ম্মের ব্যবসা হইবে। একের সুখের জন্য অর্থ সঞ্চয় করা মহাপাপ। সঞ্চয় না করিলে যদি না চলে তবে যাহা কিছু সঞ্চয় করিবে তাহা পরার্থে ব্যয়ের জন্য রাখিয়া দিবে। একা তুমি সব কাজ করিতে পারিবে না, তোমাকে পর লইয়া কার্য্য করিতেই হইবে, তোমার সহৃদয়তা না থাকিলে, লোকজন তোমায় মানিবে না, লোকজন তোমার কল্যান খুঁজিবে না। এই সহৃদয়তার অভাবহেতু, এই পরস্পর নির্ভতার অভাব জন্য এদেশে যৌথ কারবার টীকে না। এদেশের লোক বড় স্বার্থপর, দেখনা, বিদেশীয়েরা এদেশে আসিয়া কত কল কারখানা স্থাপন করিয়াছে, এদেশের লোকের কল কারখানা নাই বলিলেই হয়। এদেশের লোক সেই সকল কল-কারখানায় মাল যোগাইতেছে ও তাহাতে মজুর খাটিতেছে। বিদেশীয়ের কত টাকা এদেশে খাটিতেছে; তাহারা এদেশ হইতে পাট তুলা মাটির দরে কিনিয়া লইয়া যাইতেছে এবং রূপান্তরিত করিয়া আনিয়া সোণার দরে এখানে বেচিতেছে। বলিবে যে রাজ-সহায়তা ভিন্ন কোন কাজ সুসম্পন্ন হওয়া সম্বব নহে, তা সত্য হইতে পারে কিন্তু রাজসাহায্য পাইবার কি তোমরা যোগ্য, তোমাদের যে ঘর ঠিক নাই, ঘরের লোক যে তোমাদের দেখে না, রাজা একা সাহায্য করিয়া কি করিতে পারেন। নিজেরা উদ্যোগী না হইলে, দেবতা সুপ্রসন্ন হন না, দেবদৃষ্টি ব্যতীত তুমি কাহারও চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

চাষাবাদের সঙ্গে ব্যবসায়ের যোগ না থাকিলে চাষের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি হয় না। ঢাকার মস্‌লিনের আদর ছিল এবং তাহার ব্যবসা চলিত বলিয়া এক কালে ক্রমাগতঃ দীর্ঘ ও সুক্ষ্ম তন্তু কার্পাশের আবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আগ্রার দরি ও গালিচার ব্যবসা চলিত বলিয়া তথায় এখন সুন্দর রঙ্গীন সুতী দরিও পশমী গালিচা প্রস্তুত হয়। কাশ্মিরী শালের দেশ বিদেশে এত আদর বলিয়া লোকে পাহাড়ে ভেড়া পুষে, এত যত্ন করিয়া তাহার লোম সংগ্রহ করে, লোমগুলি এত বাছাবাছি, এত পরিষ্কার করা, নতুবা ভেড়ার লোমে অযত্নে কম্বল পর্য্যন্ত হইত, বড় জোর ভাল কম্বল পর্য্যন্ত হইত। ভাল জাতের ভেড়ার লোম কেহ সংগ্রহ করিত না বা ভাল জাতের ভেড়া কেহ পালিত না।

কৃষি শিক্ষাদ্বারা জীবিকার্জ্জণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কৃষি কর্ম্মে লিপ্ত থাকা কালে প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের অবসর যথেষ্টই পাই। বালক বালিকাগণের শিক্ষার সীমা পুস্তক মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন বহুপ্রকারে বাধা প্রাপ্ত হয়। পুস্তক ফেলিয়া

আমরা যখনই তাহাদিগকে লইয়া মাঠ, ময়দানে যাই, পর্ব্বত বা নদীর ধারে গিয়া দেখিতে থাকি, কোথায় আমাদের শস্যক্ষেত্র রচিত হইবে তখনই আমাদের বিপুলতা ও বিশালতার ভাব হৃদয়ে জাগিয়া উঠে এবং বালক বালিকাদিগের চক্ষু ফুটাইয়া দিবার এইখানে আমরা অবসর পাই। প্রকৃতির মূল শক্তি রাশির সহিত প্রকৃত পরিচয় এই কৃষি-বিজ্ঞানের আলোচনাদ্বারা লাভ করিতে পারি এবং বালকগণকে প্রকৃতির সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে পারি। কৃষি-জীবী সহর বাজারের খোঁজ রাখুক আর না রাখুক পল্লী চিত্রে প্রকৃতির হাবভাব, ক্রীড়া, কৌতুক সে ভাল রকম জানিতে পারে। এই প্রকৃতির দিক দিয়া শিক্ষাই ভাল শিক্ষা, আমরা এখানে সহজে বুঝিতে পারি যে, আমাদের কত জিনিষই জানিবার শিখিবার আছে, কতজীবন সাধনা করিলেও বুঝি সে শিক্ষার শেষ হইবে না। সব প্রত্যক্ষ দর্শন করিবে, মানুষের সে শক্তি নাই; যখন মানুষ তাহা বুঝিবে তখন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া অনুমেয় জ্ঞান বিকাশে প্রয়াসী হইবে এবং তখন মানুষ মানুষ হইবে। সেই জন্য আমরা প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রকৃত জ্ঞানের আভাস পাই। সেই জন্য বারবার বলিতে ইচ্ছা হয় যে, কৃষি-শিক্ষা সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান শিক্ষা হওয়া উচিত।

প্রকৃতির ক্রোড়ে শিক্ষা-ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইলে সৌন্দর্য্যবোধ আপনা হইতে বিকশিত হইয়া উঠে। নীলাকাশের কোলে কেমন সবুজ তরুরাজি, কেমন সবুজ হরিৎ রঙের সুন্দর সংমিশ্রণ, তাহার উপর নানা রঙের ফুলের কেমন অপূর্ব্ব শোভা, বায়ুতে লতা পল্লব কেমন হেলিতেছে দুলিতেছে, তার সঙ্গে পাখীর কুজন ও মক্ষিকার গুঞ্জন, বন ভূমিতে ও কৃষকের শস্য ক্ষেত্রে কি এক অপূর্ব্ব মধুরতা বর্ষণ করিতেছে। এই সৌন্দর্য্যের ও মধুরতার রসাস্বাদন করিয়া কৃষক ও কৃষক পরিবারে হৃদয় মধুময় হইয়া উঠে। তাহারা কত স্থির ধীর হয়, কত সহিষ্ণু হয়। ভারতের নিরক্ষর চাষা কত জ্ঞানী, সে কেমন সকল কাজে ঈশ্বরের হস্ত লক্ষ্য করিয়া চলে, অজন্মার দিনে আপন কর্ম্মের দোষ দেয় এবং সুজন্মার দিনে ভগবানের অযাচিত দান বলিয়া আনন্দে অধীর হয়। সে বুঝিতে শিখিয়াছে যে, তাহার শক্তি এতটুকু, তাহার যতটুকু শক্তি আছে তাহার সমস্তটুকু নিয়োগ করিয়া খোলসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বাকীটুকু সর্ব্বনিয়ান্তর হাতে। তাই সে শুভ ফল দেখিয়া চমৎকৃত হয়, আনন্দে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠে, তাহার হৃদয়ের মত হৃদয় যখন আমাদের জমিদারগণের হইবে তখনই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইবে।

ধণী, জমিদার ও কৃষক এক দেহেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। প্রত্যেক অঙ্গ কর্ম্মঠ হওয়া চাই, একটি অঙ্গ বিকল হইলে দেহটি অকেজো হইয়া পড়িয়া থাকে। সমভাবে

নিজ নিজ কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে সব অঙ্গই সমভাবে পুষ্ট হইবে এবং কৃষি-কর্য্যে সকলেরই জীবিকা অর্জ্জন হইবে।

ব্যবহার তত্বের প্রথম উন্মেষ কৃষি-কার্য্য হইতে। মানুষ বৎসরের পর বৎসর যখন এক জমিতে ফসল উৎপাদন করিতে পারিল তখন তাহার জমিতে একটু যত্ন আসিল। সে কতকটা জমি লইয়া চাষ আরম্ভ করিল, তথায় ঘর বাড়ি করিল। তাহারা দলবদ্ধ হইল, সমাজ গঠন করিল। তাই বলিতেছি, কৃষি-কার্য্য অবহেলার জিনিষ নহে। যে পরমাণুবাদ ও জীবাণুতত্ব লইয়া আজ সারা পৃথিবীময় খুব একটা আন্দোলন চলিতেছে, কৃষি-বিজ্ঞান তাহার তত্বালোচনায় ঐ সকল তত্ব তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া দেখাইতেছে। যে দেখিতে জানে সে সকল কাজেই সেই অনন্ত শক্তির বিকাশ দেখিতে পায় নতুবা যাহার চক্ষু নাই তাহাকে রাজ্য পালন করিতে দাও, আর চাষের কার্য্য করিতে দাও সে মামুলী কাজ গুলি করিয়া থালাস, ঘাণি গাছে জোড়া বলদের মত অবিশ্রান্ত চলিতেছে কিন্তু কি উদ্দেশ্যে চলিতেছে, তাহা সে জানে না। রাজার কার্য্য, কৃষি-বল ও গোধন রক্ষা নতুবা তাহার রাজ্য কোন্ ভিত্তির উপর দাড়াইয়া থাকিবে? সুতরাং মোটা কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, রাজারও জীবীকা কৃষি-কার্য্য দ্বারা নির্ব্বাহ হয়।

পল্লী সমাজ—পল্লী সমাজ কৃষক লইয়া গঠিত। পল্লী সমাজ হইতে কৃষকগণকে বাদ দিলে সমাজ অসম্পুর্ণ থাকিয়া যাইবে। বিকলাঙ্গ দেহীর ন্যায় ঐ সমাজ সুশৃঙ্খলে কাজ করিতে পারিবে না এবং পক্ষান্তরে কৃষক-কুলও সমাজের প্রকৃত শিক্ষিত ও মহানুভবগণের সংশ্রবে আসিতে না পাইয়া মার্জ্জিত রুচি হইবে না, তাহাদের স্বাভাবিক সরল ভাবে যেখানে একটু আধটু কঠোরতা বা রুক্ষতা আছে তাহা শোধরাইয়া যাইবে না এবং গতিশীল বহির্জ্জগতের সহিত মিশিতে না পারিয়া অনেকটা একঘেয়ে রকমের হইয়া পড়িবে। এদেশের জমিদারগণ প্রায়ই উদাসীন ও বিলাসী। শিক্ষিতাভিমানী কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তিরা একটা দল বাঁধিয়াছেন। তাঁহারা আপনা আপনিই বড়, তাঁহারা পল্লীর প্রকৃত দুঃখের কোন খোঁজ রাখেন না বা তাহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা করেন না, তাঁহারা তাঁহাদের মন্ত্রণা গবেষণায় পল্লীর কৃষককুলকে আহ্বান করেন না অথচ বলেন যে, তাঁহারা সমাজের ও দেশের নেতা। এই সকল হৃদয়হীন ব্যক্তি সকলকে অতিক্রম করিয়া চাষীরা আজ বিদেশীয়ের দ্বারে উপস্থিত। দেশের দুই চারিজন বড় লোক হইলেও কৃষককুল ক্রমশঃই নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। তাহারা রোগে, শোকে, ঋণদায়ে বিড়ম্বিত হইয়া পড়িতেছে। অনেকেই কৃষি-কর্ম্ম বা সাবলম্বন ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে এবং দিন মজুরী করিতেছে। ক্রমে এমন দিন আসিবে যে দেশের সমস্ত জমি বিদেশীয়েরা চাষ করিবে, আমাদের কৃষি-বল তাহাদের নকরী করিবে।

এখন সময় থাকিতে সকল দিক বুঝিয়া চলিলে কৃষিকার্য্য দ্বারা সকলেরই জীবিকা অর্জ্জন হওয়া অসম্ভব নহে।

প্রথমে কৃষির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে এবং তাহা হইতে অর্থ সঞ্চয় করিয়া একটা যৌথ ভাণ্ডার স্থাপন করিলে, আপনারা যে একটু সমর্থ হইয়াছি, কোন একটা কিছু করিতে পারি, সহজেই মনে আসিবে। তখন সেই টাকা খাটাইবার দিকে দৃষ্টি পড়িবে এবং ক্রমে শিল্পের দিকে লোকের মন যাইবে। এই হইল ক্রম বিকাশ। ভারতে এক কালে শিল্পের চরম উন্নতি হইয়াছিল কিন্তু বিদেশী শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পড়িয়া সেগুলি নষ্ট প্রায়। আজকাল কলকারখানার যুগ আসিয়াছে। আমাদের কৃষি-কার্য্য, মহাজনী ও শিল্পকার্য্য সবই নূতন ছাঁচে ঢালিয়া পুনরায় নূতন করিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে এবং প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। ইহার কোনটিকে অতিক্রম করিয়া গেলে চলিবে না। ইহাই নিয়ম, ইহাই বিধির বিধান।

দোয়াল গাভীর খাদ্য—বাঙলা দেশের গাভীগুলি সাধারণতঃ খর্ব্বাকৃতি। তাহাদের দৈনিক খাদ্য নিম্নলিখিতানুরূপ হইলেই পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হয়,—

সরিষার খৈল	... ...	½	সের
কলাই সিদ্ধ বা খুদসিদ্ধ	... ...	১	,,
চাউলের কুঁড়া বা কলাই বা গমের ভূষী		১	,,
লবণ	... ...	½	ছটাক
খড়	... ...	২০	আটি
কাঁচা ঘাস কিয়ৎ পরিমাণ			

বাঙলায় গাভী প্রায়ই ৩ সেরের অধিক দুধ দেয় না, খুব অল্প সংখ্যক গাভীই ৩ সেরের অধিক দুধ দিয়া থাকে। যে গুলি অধিক দুধ দেয় বা যাহারা আকৃতিতে বড়, তাহাদের খাদ্য ব্যবস্থাও কিছু অধিক হওয়া উচিত। ভাগলপুরী গাই বা পাহাড়িয়া গাই আকৃতিতে বড় এবং দশ, বার সের দুধ দেয় সুতরাং তাহাদের খাদ্য বাঙলার গাভীর দ্বিগুণ হওয়া কর্ত্তব্য। ষাঁড়ের খাদ্য গাভীর খাদ্যের অনুরূপ হওয়া উচিত। তবে ষাঁড়কে কলাই সিদ্ধ বা খুদ সিদ্ধ খাওয়াইবার আবশ্যক নাই। গমের ভুষী বা চাউলের কুঁড়া কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে দিতে হয়। ষাঁড় চরিয়া যত কাঁচা ঘাস খাইতে পারিবে ততই তাহার স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে এবং দেহ বলিষ্ঠ হইবে।

প্রাতে ও সন্ধ্যায় খড়, খৈল, ভুষী দিয়া দুই বার দুই গামলা জাব দিতে হয় এবং বেলা ৪ টার সময় কলাই সিদ্ধ ভাতের মাড় প্রভৃতি খাওয়ান বিধি। প্রথম জাব খাইবার পর বেলা ৯টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত কাঁচা ঘাস প্রভৃতি খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেকে গাই দোহনের পর সকালে একবার দোয়াল গাভীকে মাঠে চরিতে দেয়। সে ব্যবস্থাও মন্দ নহে।

বলদের খাদ্য—

সরিষার খৈল	... ...	১½	সের
গমের ভুষী বা কুঁড়া	... ...	২	,,
ছোলা	... ...	১½	,,
পাহাড়িয়া বলদের পক্ষে ছোলা	...	৩	,,
খড় উপযুক্ত পরিমাণে—			

* কলাই বা খুদের সহিত লাউ বা কাঁটানটে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে ভাতের মাড় মিশাইয়া খাওয়াইলে দুধ বাড়ে।

ষাঁড় কিম্বা বলদের খাদ্যে লবণ ব্যবহারের তাদৃশ আবশ্যকতা দেখা যায় না। তবে গাভী কিম্বা বলদকে মধ্যে মধ্যে বীট লবণ খাওয়াইতে হয়। ইহাতে তাহাদের কোষ্ঠ সাফ্ থাকে। গোয়াল ঘরের এক পার্শ্বে কিম্বা আঙ্গিনার এক ধারে বিট লবণের একটা চাপ রাখিয়া দিলে গাভী, বাছুর, ষাঁড় বা বলদ মধ্যে মধ্যে স্বেচ্ছাক্রমে তাহা চাটে। ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। গাভী, বলদকে মাঝে মাঝে যবের ছাতুর সহিত গুড় মিশাইয়া জলে গুলিয়া খাইতে দেওয়া ভাল। গুড় তাহাদের জোলাপ স্বরূপ এবং খাদ্যও বটে পূর্ণ বয়স্ক গাভী, বলদের অর্দ্ধসের ছাতু এবং ১ পোয়া বা অর্দ্ধপোয়া গুড় পর্য্যাপ্ত।

পত্রাদি

কাপাস ও চীনা বাদামের জমি—শ্রীখগেন্দ্র নাথ রায়, রাঁচী।

আমার জমি দোয়াঁস তাহাতে কাপাস ও চীনা বাদাম হইবে কি না? বুড়ি ও দেব কাপাসের চাষ করিব মনে করিয়াছি এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

উত্তর—দোয়াঁস মাটিতে কাপাস ও চীনা বাদাম দুই ভাল হইবে। উভয় ফসলের জন্য হাল্‌কা দোয়াঁস মাটির আবশ্যক। তুলার জন্য বোদ মাটি প্রশস্ততর। দেব কাপাস ও বুড়ী কাপাস এই উভয়ই বাঙলা দেশে ভাল হয়। কৃঃ সঃ

গুঁড়া চা—শ্রীশিবা প্রসন্ন চৌধুরী, মেহেরপুর।

পানার্থ গুঁড়া চা ব্যবহারে দোষ কি? ইহা অন্য কি প্রকারে ব্যবহার হইতে পারে?

উত্তর—গরম জল সংযোগে গুঁড়া চা হইতে অধিক মাত্রায় ট্যানিন্ (Tannin) রস নির্গত হয়, ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নহে। এই জন্য গুঁড়া চা পান না করিয়া উহাতে কসজল প্রস্তুত করিলে সুতা কিম্বা চামড়ার কস্ দেওয়া যাইতে পারে।

আশু ও আমন ধান এক সঙ্গে চাষ—শ্রীগোপাল কৃষ্ণ দাস, বাসুদেবপুর, গোলাপচক পোঃ।

আমার ইচ্ছা যে হৈমন্তিক ধান্যের সহিত আশু ধান্য এক সঙ্গে মিশাইয়া যাদা যদি দেওয়া হয় তাহাতে আশু ধান্য কাটিয়া লইলে সেই পক্ক বিচালী আবার পচিয়া হৈমন্তিক ধান্যের কতক সারের কাজ করিবে এবং জমিতে এক বারে দুই ধান্য ফসল পাওয়া যায়, যদি তাহাতে ভাল বিবেচনা করেন আপনি দয়া করিয়া সদ্‌যুক্তি দ্বারা মীমাংসা করিয়া দিবেন। জল থাকা সত্বেও এমন কি আশু ধান্য হয়?

উত্তর—এ কল্পনা ঠিক নহে। ইহাতে কোন ধানেরই সম্পূর্ণ ফসল পাওয়া যাইবে না। আশু ও আমন (হৈমন্তিক) ধানের পাইট এক রকম বা এক সময় হইতে পারে না। আশু ধান নিড়াইবার সময় বা কাটিবার সময় আমন ধান বর্দ্ধিত হইবে। যদি বুঝিতাম যে কিছু অতিরিক্ত লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে এরূপ অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বলা যাইত, কিন্তু তাহা যখন নয় তখন এরূপ সঙ্কল্প মনে না আসিতে দেওয়াই ভাল। তবে আশু ও আমন ধানের এক সঙ্গে আবাদ অসম্ভব নহে। কোন কোন স্থানে এপদ্ধতিতে ধানের আবাদ করিতে দেখা যায়।

কপি ও আলুর— শ্রীব্রজলাল মিত্র, বি, এল, রারুলি, কাটিপাড়া, খুলনা।

নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্যগুলির উত্তর দান করিলে কৃতার্থ হইব।

(১) বাঁধাকপি, বিলাতী ফুলকপি এক পক্ষে, অপর পক্ষে গোল আলু—ইহাদের মধ্যে কে কথঞ্চিৎ গরম সহ্য করিতে পারে? (অবশ্য ফাল্গুনের গরম) আমরা ফাল্গুনে গোল আলু করা লাভজনক হইতেছে দেখিতেছি।

(২) বাঁধাকপি ও বিলাতী ফুলকপির বীজ বপন হইতে কয় মাসের মধ্যে ফসল শেষ হয়?

(৩) বাঁধাকপি ও বিলাতী ফুলকপি বীজ বপন হইতে, বড় বেশী কতসময় বীজতলায় রাখা যায়?

(৪) "Sugar Loaf" এবং "Suton's Little Gem" নামক বাঁধাকপি, সচরাচর কত বড় বড় হয়? (কোন দ্রব্যের দৃষ্টান্তে বলিবেন) ইহার বীজ আপনার ওখানে কত শীঘ্র পাইব?

(৫) "Jasey Wakefield" নামক বাঁধাকপি কত বড় সচরাচর হইয়া থাকে?

(৬) সর্ব্বাপেক্ষা মোটা বাঁধাকপির (Early জাতীয়) নাম কি? উহার সচরাচর ওজন কত হয়?

(৭) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ Early ফুলকপির নাম কি?

(৮) কোন বাঁধাকপি নিশ্চিত বাঁধে (Early জাতি)

(৯) Early Cabbage, জল্‌দী জাতীয় বাঁধাকপির ফসল কত আগেতে করা যায়? (আমার উচ্চ, আচ্ছাদনযুক্ত বীজতলা আছে)।

(১০) বিলাতী ফুলকপি, যেমন Snow-ball আদি, কত আগে করা যায়?

(১১) পাটনাই গোল আলুর বীজ কোন সময় হইবে কোন সময় পর্য্যন্ত পাইব? গত বৎসরের আলু আবশ্যক।

উত্তর—১। বাঁধাকপি, ফুলকপি আদৌ গরম সহ্য করিতে পারে না, এই কারণে বাঙলায় পুরা শীত ভিন্ন কপি হয় না। আলু বরং কথঞ্চিৎ গরম সহ্য করিতে পারে কিন্তু ফাল্গুনের হাওয়া লাগিলেই গাছ শুকাইয়া যায়। এক দফা গোড়া হইতে আলু তুলিয়া লইয়া পুনরায় সার দিয়া ও জল সেচন করিয়া তদ্বির করিতে পারিলে হয়ত গাছ ফাল্গুনের শেষ পর্য্যন্ত বাঁচান যায়। আলু তুলিবার সময় অধিক শিকড় না ছেঁড়ে বা গাছে চোট না লাগে সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

২। বীজ বপনের সময় হইতে কপি তৈয়ারি পর্য্যন্ত ৪ মাস সময় লাগে।

৩। কপির চারা তৈয়ারি হইতে ১ মাস সময়ের আবশ্যক। চারি ছয় পাতা চারা নাড়িয়া বসাইতে হয়। ক্ষেত্রে বসাইবার পূর্ব্বে ক্ষুদ্র চারা গুলি দুই এক বার স্বতন্ত্র বীজ তলায় নাড়িয়া বসাইয়া চারাগুলিকে একটু টেঁকসহি করিয়া লওয়া ভাল।

৪। Sugar Leoaf and Sutton's Little Gem, সুগার লোফ ও জেম এই দুইটিই ছোট জাতীয় কপি। একটা মাঝারি বেলের মত হয়, কিন্তু খুব নিরেট। কপি বীজ মাত্রেই July, আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে পাইবেন।

৫। ইহা নারিকেলী বাঁধা কপি। ইহা ওজনে দুই সের আড়াই সের হয়।

৬। আর্লি স্নোবল সর্ব্বাপেক্ষা জলদী ও বড় ফুলকপি। আর্লি ফ্রেঞ্চ তাহার নিম্নে। আর্লি ফুলকপি অগ্রহায়ণ মাসে তৈয়ারি হইতে পারে কিন্তু বিশেষ যত্নের আবশ্যক। বাঁধাকপি হইতে ফুলকপি অপেক্ষা কিছু বিলম্বে হয়।

১১। পাটনাই আলুবীজ আশ্বিন মাসের আগে পাওয়া যায় না। অন্য খবরের জন্য আমাদের মূল্য তালিকা ও মেম্বর হইবার নিয়মাবলি দেখুন। সব্জী চাষ নামক পুস্তক লইলে তাহা হইতে ঐ সমস্ত বিষয় জানিতে পাইবেন।

সার-সংগ্রহ

শিরীষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া উপরে অতি উচ্চ করিয়া উক্ত খণ্ডসকল চুর করিয়া সাজাইতে হয়, তৎপরে নিম্নের চুল্লীদ্বারা সমভাবে মৃদু উত্তাপ দিয়া ফুটাইলে কিয়ৎক্ষণ ফুটিবার পর গলিতে আরম্ভ করে ও উপরের চুরীকৃত চর্ম্মখণ্ড সকল নামিয়া গিয়া দ্রবীভূত হইতে থাকে। এই সময় হাতাদ্বারা বেশ করিয়া নাড়িয়া দিতে হয় ও মাঝে মাঝে সছিদ্র তলের উপরে চাপ দেওয়া আবশ্যক। ফুট যাহাতে সমভাবে হয় তদ্বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। কাষ্ঠ বা পাথুরে কয়লা অপেক্ষা বাষ্পোত্তাপ দিতে পারিলে ভালই হয়; কারণ বাষ্পোত্তাপ সকল সময় সমভাবে অনায়াসে রাখিতে পারা যায়।

গলিতে আরম্ভ করিয়া শিরীষ যেমন তরলাবস্থায় উক্ত তলদ্বয়ের মধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে, অমনি উহা ঢালিয়া লইতে হয়। নিম্নে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া তাহাতে ষ্টপককৃযুক্ত একটী নল লাগাইয়া দিয়া স্বেচ্ছামত ককৃটী ঘুরাইলেই গলিত শিরীষ আসিয়া অন্য পাত্রে রক্ষিত হয়। শিরীষ গলিলেই গড়াইয়া লইতে হয়। উৎপন্ন শিরীষের উৎকর্ষতা এই ক্রমের উপর নির্ভর করে। প্রথমবারে যাহা গালাইয়া পাওয়া যায় উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—দ্বিতীয়বারের উৎপন্ন শিরীষ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট, তৃতীয় বারের শিরীষ তদপেক্ষা আরও নিকৃষ্ট, এইরূপ। ইহার কারণ এই যে ফারেনহিটে ২১২° ডিগ্রী তাপে উৎপন্ন জেলেটিন যদি উক্ত তাপে আরও কিছুক্ষণ থাকে তাহা হইলে উহাতে এক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় ও সেরূপ আঠা বাঁধে না; সুতরাং গলিয়া গেলে যখনই এরূপ তরল দেখা যাইবে যে, শীতলাবস্থায় বসিয়া ঘন হইতে পারে এবং তার দিয়া ঐ প্রকার ঘন শিরীষ পাতের ন্যায় করিয়া কাটিলেও অপেক্ষাকৃত কঠিন থাকিয়া বিচ্ছিন্ন হইবে, তখনই গলিত শিরীষ ঢালিয়া লওয়া উচিত ইহাই শিরীষের পাক। মোদকেরা যেরূপ চিনির পাক হইল কি না পরীক্ষার জন্য অঙ্গুলিতে কিঞ্চিৎ লাগাইয়া সূক্ষ্ম তার কাটাইয়া দেখে, শিরীষের পাকও হইল কি না জানিবার জন্য এক পরীক্ষা আছে। একটী ডিম্বের খোলার অর্দ্ধাংশ বা অতি পাতলা বাটীর ন্যায় কোন কাষ্ঠ পাত্রে গলিত শিরীষদ্বারা পূর্ণ করিয়া বায়ুতে কিয়ৎক্ষণের জন্য শীতল হইতে দিলে যদি দেখা যায় যে দুই চারি মিনিটের মধ্যে উহা সমভাবে জমিয়া যাইতে আরম্ভ করিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে শিরীষের পাক ঠিক হইয়াছে। তাহা না হইলে আর কিছুকাল ফুটাইতে হইবে। পাক ঠিক হইল কি না জানিতে বহুদর্শিতার আবশ্যক। পাক ঠিক হইলে ষ্টপককৃটকে অর্দ্ধেক ঘুরাইয়া দিলে জলবৎ তরলাকার শিরীষ অল্পে অল্পে আসিয়া আর একটী পাত্রে পড়িতে থাকে। এই পাত্রটীর তিন দিক শীতল জল দ্বারা বেষ্টিত বা মুখটী পর্য্যন্ত শীতল জলে ডুবান থাকে। শেষোক্ত পাত্রের তলদেশে পূর্ব্বের ন্যায় একটী ছিদ্রে ষ্টপককৃযুক্ত এক নল আছে। এই পাত্রে আসিলে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া জুড়াইতে দিতে হয়।

বেশ জুড়াইয়া আসিলে ষ্টপকক্ ঘুরাইয়া দিতে হয় এবং এইবার ছাঁচে ঢালিতে পারা যায়। এইবার শিরীষের সহিত সামান্য (পাঁচ শত ভাগের এক ভাগ) ফটকিরি চূর্ণ মিশাইতে হয় এবং একটু নাড়িয়া চাড়িয়া শীতল করিবার জন্য রাখিতে হয়।

প্রথমবার গড়াইয়া লইলে যাহা পাওয়া যায় তাহাই অত্যুৎকৃষ্ট কারণ ইহা অতি তরল ও অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ, উপরে যে প্রকার প্রণালী বিবৃত হইল উহার নাম গ্লাণ্ডার্স বা ডচ্ প্রক্রিয়া। ইংরাজী প্রক্রিয়াও প্রায় এইরূপ। প্রথমবার গালাইয়া তরলীকৃত শিরীষ ঢালিয়া লইয়া অবশিষ্ট উপাদানে জল মিশ্রিত করিয়া পুনরায় ফুটান হয়। এইবার গলিয়া যাইলে যাহা পাওয়া যায়, উহার সহিত আবার নূতন উপাদান সংযোগে গলিত করিয়া লওয়া হয়। তৎপরে তাম্রপাত্রে পাঁচ ঘণ্টাকাল থিতাইতে ও জুড়াইতে দিয়া শেষে ছাঁচে ঢালা হইয়া থাকে।

ছাঁচে ঢালিবার বাক্সগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত ও প্রায় সমচতুরস্কোণ, কেবল তলার দিকটী উপরের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সরু। বাক্সে ছোট ছোট বর্গাকার খুবরি করিতে হয়। বাক্সগুলি সমোচ্চ করিয়া সাজাইয়া, ফুঁ-দিলের মুখে ছাঁকিয়া যাইবার জন্য কাপড় দিয়া কানায় কানায় উক্ত বাক্সগুলি তরল শিরীষদ্বারা পূর্ণ করিতে হয়। যে ঘরে ছাঁচে ঢালা হয় উহার মেজে বেশ পরিষ্কার থাকা আবশ্যক এবং ঘরটি বেশ শীতল ও শুষ্ক হওয়া উচিত, কারণ তাহা হইলে শিরীষ শীঘ্র জমিতে আরম্ভ করে। তৎপরে ১২ হ তে ১৮ ঘণ্টা কাল স্থিরভাবে রাখিলে শিরীষ তখন অনেকটা বসিয়া যায়। যদি সন্ধ্যায় ছাঁচে ঢালা হয় তাহা হইলে প্রাতঃকালে অনেকটা দৃঢ়রূপে জমিয়া যায়। তখন ঐগুলিকে উপরের আর একটী গৃহে লইয়া রাখিতে হয়। এই গৃহের বাতায়নগুলি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া চারিদিক হইতে বায়ু সঞ্চালিত হইতে দিতে হয়। এই বায়ুপূর্ণ গৃহে ছাঁচের বাক্সগুলি উল্টাইয়া একটী আর্দ্র টেবিলের উপর এরূপভাবে রাখিতে হয় যেন শিরীষ টেবিলের উপর লাগিয়া না যায়। বাক্স হইতে শিরীষ ছাড়াইবার জন্য লম্বা ছুরির ফলা জলে ডুবাইয়া তদ্দ্বারা বাক্সের চতুর্দ্দিকে সংলগ্ন শিরীষ আল্গা করিয়া দিতে হয়। এইরূপে শিরীষ বাক্স হইতে ছাড়িয়া আসে। এইবার কাষ্ঠ ফ্রেমে সংলগ্ন টানা পিত্তলের সূক্ষ্ম তার-দ্বারা কাটিয়া থান থান করিতে হয়। প্রস্তুত শিরীষের স্থূলতা যেরূপ অভিলষিত হইবে, উহা তার-দ্বারা সেইরূপে কাটিতে হয়। তৎপরে ছুরির ফলা জলে আর্দ্র করিয়া যে প্রকারের ইচ্ছা সেই প্রকার আকার করা যাইতে পারে। বাজারে সাধারণতঃ লম্বালম্বি চিরিয়া ভাঙ্গিবার জন্য মাঝে মাঝে অল্প কাটিয়া দেওয়া হয়।

এইবার এইগুলিকে কাষ্ঠ ফ্রেমে সংলগ্ন জলের উপর থাকে থাকে সজ্জিত করিয়া দিয়া যাহাতে চতুর্দ্দিকে বাতাস লাগে এরূপভাবে রাখিতে হয়। জলের উপর থাকিবার কালে দিনে তিন চারিবার উল্টাইয়া দেওয়া উচিত।

শিরীষ শুষ্ক করা অতীব কঠিন এবং বিশেষ সতর্কতার আবশ্যক। বেশ সমশীতলে না রাখিতে পারিলে খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। বাহিরের আবহাওয়ার উপর শিরীষের শুষ্কতা অধিক নির্ভর করে। যদি যে গৃহে শিরীষ শুষ্ক হয়, উহার উত্তাপ হঠাৎ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সামান্য গলিতে আরম্ভ করিয়া, হয় পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যাইবে, নয়তো বাক্সের গায়ে লাগিবে, অথবা জলের

সহিত এমন আটকাইয়া যাইবে যে বিচ্ছিন্ন করা সমধিক কঠিন হইবে। এরূপ হইলে আবার গলাইয়া ঠিক করিতে হইবে। যদি কুজ্‌ঝটিকা হয় তাহা হইলেও ভয়ের কারণ আছে, কারণ আর্দ্রতার আধিক্যও ঐ প্রকারে ক্ষতি করিতে পারে। যদি গরম বাতাস লাগে তাহা হইলে সঙ্কোচন কমিয়া গিয়া শিরীষে ফাট ধরিয়া যায়। আবার হাওয়া হঠাৎ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখিলে উক্ত গৃহের বাতায়নাদি একেবারে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলে অনেকটা ক্ষতির হাত হইতে বাঁচিবার সম্ভাবনা। এইজন্য সকল ঋতু শিরীষ প্রস্তুতের জন্য প্রশস্ত নহে। বসন্ত ও শরৎ-কালই শিরীষ প্রস্তুতোপযোগী কাল।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে জালদ্বারা শুকাইলেও শিরীষ বাজারে বিক্রয়োপযোগী হয়। তখন চুল্লীর দ্বারা মৃদু উত্তাপ দেওয়াই বিধি। শীতল ও আর্দ্র দেশেই চুল্লীর প্রয়োজন। আমাদের বাঙলা দেশে সাধারণতঃ চুল্লীর উত্তাপ আবশ্যক হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

এখন প্রস্তুত হইল, ছাঁচে ঢালিয়া আকৃতি বিশিষ্ট হইল, সবই হইল বটে, কিন্তু একটু দেখিতে ভাল না হইলে বাজারে চলিবে কেন? সুতরাং একটু চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে করিতে হইবে। চক্‌চকে করা বিশেষ গুরুতর কিছুই নহে। খণ্ডগুলি এক একটী করিয়া গরম জলে একবার ডুবাইয়া লইয়া একটা বুরুস দ্বারা আস্তে আস্তে ঘষিলেই শিরীষ খণ্ডগুলি বেশ চিক্কণ হইবে, তৎপরে বায়ুতে রাখিয়া একদিন ধরিয়া শুষ্ক করিলে বাজারে বিক্রয়োপযোগী হইবে।

যে শিরীষ ভাঙ্গিলে ভগ্নস্থল অতি উজ্জ্বল দেখায়, এবং বর্ণ ফিকা ও কঠিন বলিয়া বোধ হয় তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চানে বেশ উত্তম শিরীষ প্রস্তুত হয়। বাজারে চাইনিজ গ্লু বা চীনে শিরীষ বলিয়া যাহা বিক্রয়ার্থ থাকে, তাহা প্রায়ই অবিশুদ্ধ, কারণ তাহা বস্তুতঃ চীনের নহে। ভাল শিরীষের আঠা অত্যন্ত অধিক। কাষ্ঠের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সন্ধির জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিরীষ বিশেষ আবশ্যক। সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিরীষ গোচর্ম্মের খণ্ড হইতে বিশুদ্ধভাবে প্রথম গালাই হইতেই হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন কোন কোন কারিকর ঘোর রক্ত কৃষ্ণবর্ণ বা দুর্গন্ধযুক্ত শিরীষ পছন্দ করিয়া থাকে। বর্ণের ঘনত্ব ও দুর্গন্ধ শিরীষের অবিশুদ্ধতার পরিচায়ক। উপাদান খারাপ হইলে ও অধিকক্ষণ ধরিয়া গালাইবার কালে ফুটাইলে শিরীষের বর্ণ কৃষ্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

ফ্রান্স দেশে হাড় হইতে এক প্রকার শিরীষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। হাড় হইতে মিউরিয়েটিক এসিড সংযোগে ফস্ফেট অফ্ লাইম পৃথক করিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই গালাইয়া প্রস্তুত হয়। এই শিরীষ জলে শীঘ্রই দ্রবীভূত হইয়া যায় ও তাহার আঠা অতি অল্প। ভাল শিরীষ জলে কেবল কোমল হয় মাত্র, দ্রবীভূত হয় না এবং ফুলিয়া থাকে। ইহা শিরীষের উৎকর্ষতার এক পরীক্ষা।

শিরীষের আঠা করিতে হইলে খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করত একটু জল মিশাইয়া কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তৎপরে বেশ ভিজিলে, অন্য পাত্রে জল রাখিয়া ফুটাইতে হয়, এবং এই অপর পাত্রস্থ ফুটন্ত জলে শিরীষ পাত্র নিমজ্জিত করিয়া ফুটন্ত জলের তাপে শিরীষ গালাইয়া লইতে হয়। গরম জলে শিরীষ-পাত্র নিমজ্জিত রাখিলে শিরীষ অনেকক্ষণ গরম ও কার্য্যোপযোগী থাকে। উক্ত প্রকারে তাপ না দিয়া শিরীষ একেবারে ফুটাইলে আঠা নষ্ট হইয়া যায়।

এইবার আমরা শিরীষের রাসায়নিক ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শিরীষকে যদি অনেকবার ক্রমাগত উত্তপ্ত ও শীতল করা যায় তাহা হইলে শিরীষের আঠা আর সেরূপ থাকে না, সংযোগশক্তি অত্যধিক পরিমাণে কমিয়া যায়। সাধারণ শিরীষ এল্‌কোহলে দ্রবীভূত হয় না; কিন্তু শিরীষ দ্রব এল্‌কোহলে সংযুক্ত হইলে শ্বেত স্থিতিস্থাপক আঠাযুক্ত শিরীষ অধঃপাতিত হইয়া থাকে। ক্লোরিণ গ্যাস উষ্ণ শিরীষ-দ্রবে সংযুক্ত হইলেও উক্ত প্রকার পদার্থ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া অধঃপাতিত হইয়া থাকে। সলফিউরিক এসিড সংযোগে শিরীষ-দ্রব অত্যদ্ভুত রূপান্তরিত হয়। ইহাদ্বারা জিলেটিন, শর্করা, লিউসাইনের উদ্ভব হয় এবং জান্তব পদার্থ পৃথক হইয়া যায়। নাইট্রিক এসিড, সংযুক্ত করিয়া তাপ দিলে শিরীষ, ম্যালিক এসিড, অক্সালিক এসিড, ট্যানিন ও বসায় বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। এই ট্যানিনদ্বারা চর্ম্ম ট্যান হইয়া থাকে। এসেটিক এসিডে শিরীষ প্রথমে কোমল হয় এবং তৎপরে গলিয়া গিয়া থাকে। গলিত শিরীষে অধিক পরিমাণে চুণ ও চুণের ফস্ফেট দ্রব হইতে পারে। শিরীষে অনেক সময় এইজন্য লাইম ফস্ফেট থাকিয়া যায়। ট্যানিন শিরীষের সহিত বিভিন্ন অনুপাতে সংযুক্ত হইয়া যায় এবং একবার সংযুক্ত হইলে পৃথক করা অতীব দুরূহ।

শিরীষ বিশুদ্ধ করিতে হইলে প্রথমে পরিষ্কার জলদ্বারা কোমল করিয়া কয়েকবার কচলাইয়া লইতে হয় এবং তৎপরে বস্ত্রমধ্যে পুরিয়া ৬০ ডিগ্রী তাপযুক্ত পরিষ্কার জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। এই প্রকারে দ্রবণশীল জান্তব পদার্থ ও অন্যান্য অবিশুদ্ধাংশ নিয়ে পড়িয়া যায় ও বিশুদ্ধ শিরীষ বস্ত্রাভ্যন্তরে থাকে। তৎপরে জল না দিয়া ১২২ ডিগ্রী তাপে বেশ গলিয়া যাইলে ফিল্টার কাগজদ্বারা পরিস্কৃত করিয়া লইলেই শিরীষ বিশুদ্ধ হইয়া যায়। ষ্টার্চ ফুটাইলে যেমন গম ও শর্করার উৎপত্তি হয়, চর্ম্ম গালাইলে সেই প্রকারে শিরীষের উৎপত্তি হয়।

বাগানের মাসিক কার্য্য

কার্ত্তিক মাস

আশ্বিন মাস গত হইল, বিলাতী সব্জী বপন করিতে আর বাকী রাখা উচিত নহে। কপি, সালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মূলা এবং নাবী জাতীয় সীম, সালগম, বীট, গাজর, পিঁয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপনকার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিঁয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলে রবিশস্যের জন্য জমি তৈয়ারী করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মসূরী, মুগ, তিল, খেঁসারী প্রভৃতি রবিশস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবিফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর

দেখা যায় যে, আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। ধনে এই সময় বুনিতে হয়।

সুল্পাদি—সুল্প, মেথি, কালজিরা মৌরী, রাঁধুনি ইত্যাদি এতৎ প্রদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনেরও এই সময়।

কার্পাস গাছ—কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন কর।

তরমুজাদি—তরমুজাদি, বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। তরমুজ মাটি চাপা দিলে বড় হয়। তরমুজ বীজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—৪ ৪ হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩ ৪টার অধিক পুতিবে না। উচ্ছে বীজ এই মাসের মধ্যে বসাও।

পটোল—পটলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুতিবে। পুনঃ পুনঃ খুসিয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট। পটল চাষ এই মাসে আরম্ভ হয়।

পলাণ্ডু—কল সমেত একটী পিঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটির "যো" হইলে খুঁড়িয়া দিবে। এই মাসে পিঁয়াজ বসাইবে।

মটরাদি—শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় ন।

ক্ষেত্রের পাইট—যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদিগের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বপনে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্রওবাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ৪।৫ দিন এইরূপ করিয়া পরে ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে। গাছের গোড়া খোলা থাকাকালে কলিচুণের ছিটা দিলে বিশেষ উপকার হয়। বাঙলাদেশের মাটি বড় রসা এই কারণে এখানে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

পঞ্চদশ খণ্ড,—৭ম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

কার্ত্তিক, ১৩২১।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵৹ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

KRISHAK

Under the Patronage of the Governments of Benga' and E. B. and Assam.

THE ONLY POPULAR PAPER OF BENGAL

Devoted to Gardening and Agriculture. Subscribed by Agriculturists, Amateur-gardeners, Native and Government States and has the largest circulation. It reaches 1000 such people who have ample money to buy goods.

Rates of Advertising.

1 Full page Rs. 3-8. 1 Column Rs. 2.

½ Column Rs. 1-8

MANAGER—"KRISHAK,"

162, Bowbazar Street, Calcutta.

কৃষক।

সূচীপত্র।

কার্ত্তিক, ১৩২১ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার

বৃক্ষ লতা, গুল্মাদিতে পোকা লাগিলে এই যন্ত্রদ্বারা সহজে আরোক ছিটান যায়। ইহা অনায়াসে পৃষ্ঠে বহন করা যায়। আরোক কেমন বাষ্পাকারে বাহির হইতেছে, দেখুন। ইহার সাহায্যে সমস্ত বৃক্ষগাত্র ও পত্রাদি আরোক নিষিক্ত করা বিশেষ সুবিধা জনক। বিলাতী ভাল যন্ত্রের দাম ৪০৲ টাকার কম নহে।

দমকল পিচকারী
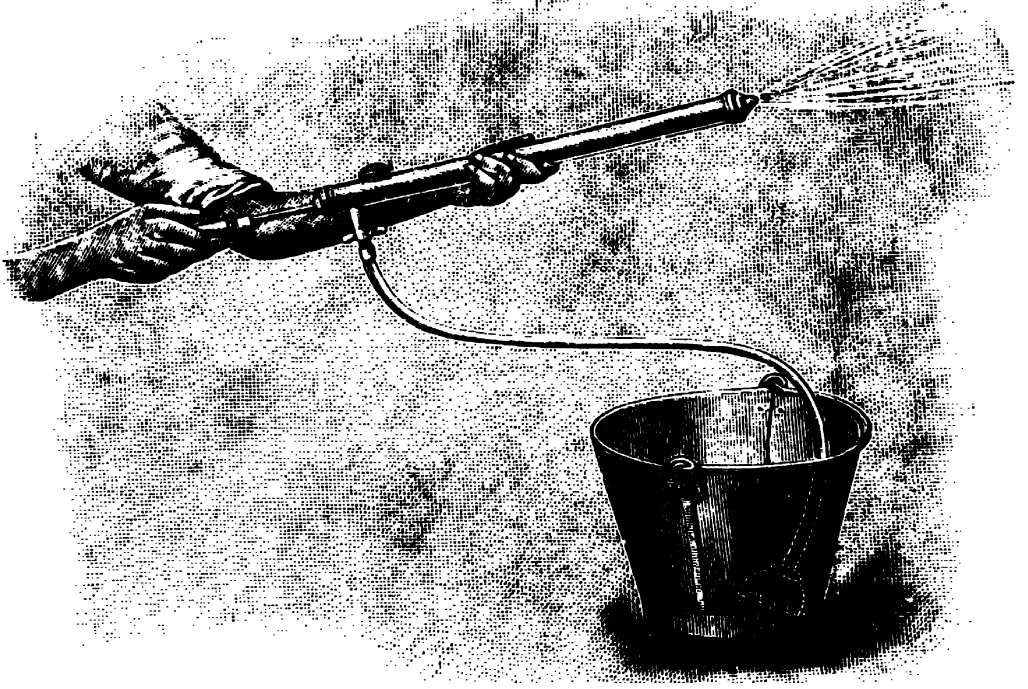
ইহাদ্বারা দুই হাতে পিচকারী চালান যায়। জল বায়ু বেগে নির্গত হয়। বৃক্ষ, লতা গাত্র ধৌত করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। বৃক্ষাদির পত্রের উপর ধুলা সঞ্চিত হইলে বৃক্ষাদির শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে এবং তাহারা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এইরূপ পিচকারী সাহায্যে বৃক্ষ লতাদি ধৌত করিয়া দিতে পারিলে তাহারা অনেক সময় ছত্রক ও কীটাণুর আক্রমন হইতে রক্ষা পায়। পাতাবাহার গাছ ঘর কিম্বা ফার্ণ গৃহ বা গোলাপ ক্ষেতে জল নিষেকের জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আম, লিচু, আঙুর, পিচ, তুঁত প্রভৃতি ইহাদ্বারা ধৌত করা যায়। ভাল পিচকারীর দাম ২০৲ টাকা।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ খণ্ড। | কার্ত্তিক, ১৩২১ সাল। | ৭ম সংখ্যা।

চন্দ্রলোক।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বিশ্বাস লিখিত

শরৎ কালীন নীল আকাশে শুভ্র জ্যোতিষ্ক দর্শনে চিরকালই মানবের হৃদয় আনন্দাপ্লুত হইয়া উঠে। মাতৃক্রোড়ে আধ আধ স্বরে "চি আয়" বলিয়া শিশু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি সঞ্চালন পূর্ব্বক চাঁদের দিকে চাহিয়া যে অস্ফুট আনন্দে বিভোর হইয়া উঠে, তাহা মাতা বুঝেন কি না তিনিই জানেন—আমরা ইহাই বুঝি যে শৈশবের অস্ফুট আনন্দ, বাল্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের প্রতি উদাসীনতা—যেন তাহার প্রত্যেকটীর সহিত মন প্রাণ লয় হইয়া গিয়াছে এবং যৌবনে প্রস্ফুট ভাব সমূহের সহিত হৃদয়ে কোমল কবিতার উৎস—ইহার সকল গুলিই ঐ নীলাকাশে রজত সন্নিভ জ্যোতিষ্কের স্নিগ্ধ কৌমুদী সম্ভূত। ইহা কি? শৈশবে অবাক হইয়া দেখিয়াছি, কি বুঝিয়াছি তাহা যিনি হৃদয়ে "জ্ঞান" রূপে অধিষ্ঠিত তিনিই জানেন। চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে দেখিতে এখন মনে হয় সেই বাসুকী রজ্জু সহকারে সুমেরু মন্থন দণ্ড দ্বারা মথিত মহোদধি হইতে যাহা উদ্ভূত হইয়াছিল ইহা কি তাহাই; ইহাই কি মহাযোগী মহাদেব মস্তকে ধারণ করিয়া চন্দ্রচূড় এবং ইহাই কি সেই যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আদি পুরুষ? না কেবল কবির কল্পনা—বড় সুন্দর তাই কি কবি ইহাকে নানা ভাবে নানা রূপে প্রযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। অথবা ইহাই কি সেই বিশোক জ্যোতিষ্মতী ক্ষুদ্র মানব হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত সূক্ষ্ম জ্যোতির বিরাট মূর্ত্তি—সৌর জগতের হৃদয় স্বরূপ পৃথিবীর এক নিভৃত নিস্তরঙ্গ প্রদেশে অবস্থিত!

সৌর জগতে পৃথিবী একটী গ্রহ এবং চন্দ্র তাহার উপগ্রহ। পৃথিবী চন্দ্র হইতে ২,৩৮,৮৩৩ মাইল দূরে অবস্থিত এবং ব্যাস ২১৬০ মাইল। পৃথিবীর ব্যাস

৮০০০ মাইল সুতরাং ইহার আয়তন পৃথিবীর আয়তন অপেক্ষা প্রায় এক চতুর্থাংশ ন্যূন। পৃথিবীতে যেরূপ পর্ব্বত, আগ্নেয় গিরি, নদী, নির্ঝর, সমুদ্রাদি দৃষ্টিগোচর হয় চন্দ্রলোকে তদ্রূপ কোন দেখা যায় না কিন্তু মনে হয় যে, পুরাকালে এগুলি সমস্তই ছিল, এখন তাহা খাদ, উচ্চ ও নীচ ভূমি মাত্র। চন্দ্রলোকে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত ৩৩০০০ ফুট উচ্চ এবং প্রান্তর ৫০ মাইল বিস্তৃত। চন্দ্র স্বয়ং জ্যোতিগ্রহ নহে, সূর্য্যের আলোকে আলোকিত। পৃথিবী হইতে আমরা প্রতিফলিত আলোক পাইয়া থাকি। গোলাকার বস্তুর জ্যোতি-পদার্থের অভিমুখীন দিকই আলোকিত হইয়া থাকে সেই জন্য চন্দ্রের এক পৃষ্ঠ আলোকিত এবং অপর পৃষ্ঠ অন্ধকারাবৃত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমতে চন্দ্র "dead planet", এখানে বায়ু নাই, জল নাই সুতরাং মেঘও নাই, হিম, শিশির, তুষারও নাই। সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে এক পার্শ্ব উত্তাপিত, অপর পার্শ্ব তীব্র শীত যুক্ত। বৃক্ষ লতাদি পরিশূন্য প্রাণীজীবনের অনুপযোগী অথবা জৈবশক্তি সম্পূর্ণ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যের খর আলোক এবং ঘোর অন্ধকার ইহার মধ্যে প্রত্যুষ বা প্রদোষ অথবা আলোকের কোন ক্রম নাই। বায়ু নাই সুতরাং শব্দও নাই। উচ্চতম পর্ব্বত বিদীর্ণ হইলেও কোন শব্দ শ্রুত হইবে না। সংক্ষেপে ইহা শশ্মানভূমি! ইহাই চন্দ্রলোকের নৈসর্গিক অবস্থা।

এইরূপ একটী উপগ্রহ হইতে আমরা কি উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি? বহুকাল পূর্ব্বে ভগবান তাঁহার সখা ও শিষ্যকে তাঁহার প্রবৃত্তি বুঝাইবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন:—

"পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বা সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ।"

আমিই সোম রূপে যাবতীয় ঔষধীর পুষ্টি সাধন করিয়া থাকি। যে আকর্ষণে পৃথিবীর জলরাশি স্ফীত ও হ্রাস হইয়া ভূমির উর্ব্বরতা সাধন করে এবং যে হিম-কিরণে রৌদ্রক্লিষ্ট ঔষধী সমূহ নবজীবন প্রাপ্ত হয় তাহাই সোম। আকর্ষণেও রস বিকীরণেও রস। একরস মূলে সিঞ্চিত হইয়া বৃদ্ধি করিতেছে এবং আর একটী উপর হইতে বিকীর্ণ হইয়া পরিপোষণ করিতেছে। এক সোম শক্তি দ্বিধা রূপে আধার ও পরিপোষণ কার্য্যে প্রযুক্ত হইতেছে। একই আধারে দুইশক্তি বিরাজিত। নদী সৈকত প্লাবিত করিয়া এই শক্তি ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সম্পাদন করিতেছে। বাণিজ্য, কৃষি এই শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। এই সোম শক্তি রোধ হইলে খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি জীবনের বহুতর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হইবে। ইহার কার্য্যকারীতা উপলব্ধি করিয়া হিন্দু পৌত্তলিক, ইহার জন্য চন্দ্র—দেবতা। পার্থিব জীবনে এই উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া আমরা তাঁহার উপাসনা করি। এইরূপ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া কোন এক দেবতাকে পূজা করিলে তাঁহারই পূজা করা হয়।

পৃথিবী ও সূর্য্যলোকের অন্তবর্ত্তী স্থান চন্দ্রলোক এবং চন্দ্রলোকস্থিত স্থান বিশেষে পিতৃলোক। হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক তর্পণ শ্রাদ্ধাদি ঐ পিতৃলোকস্থিত পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত হয়। ইতিপূর্ব্বে ইহার প্রাকৃতিক বিবরণ যাহা দেওয়া গিয়াছে তদ্বারা তর্পণ শ্রাদ্ধাদি কতই প্রয়োজনীয় তাহা অনুমান করা যায় এবং প্রকৃত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে কার্য্যগুলি সম্পাদিত হইলে তাহা যে ফলপ্রদ (প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং) নহে তাহা কি করিয়া অস্বীকার করিতে পারা যায়। বাসনা বিজড়িত চিত্ত সর্ব্বদাই বিক্ষিপ্ত সুতরাং এ সমস্ত ক্রিয়ার কার্য্যকারীতা ও ফল আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না—পারি না বলিয়া সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই।

এখন বুঝা গেল চন্দ্র আমাদের কত আপনার। সাংসারিক জীবনে অজ্ঞাতসারে আমাদের সম্পূর্ণ আপনার, ধর্ম্মজীবনে ও তোমার আমার ন্যায় মূঢ় ব্যক্তিগণ না জানিলেও আপনার। মানসিক জীবনেও চন্দ্রের প্রভাব নিতান্ত স্বল্প নহে। ভাগবতে ঘোর রূপা ঘোর স্বপ্ন নিষেবিতা। রজনী হইতে আরম্ভ করিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া শরৎ কালীন ফুল্ল মল্লিকাবৎ জ্যোৎস্নালোকে ভগবান রাসক্রীড়া করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন—নিজেই নিজের শক্তিতে আত্মহারা এবং কত শত অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তি সেই মহাপুরুষের পথ অবলম্বন করিয়া কত শত ভাব গোপন করিয়া কত শত ভাব উচ্ছ্বলিত করিয়া কত কি বলিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। যিনি ত্রিভুবনের ভার বহন করিতেছেন সেই দেব দেব মহাযোগী মহাদেব ভাবে বিভোর হইয়া ইঁহাকে মূর্দ্ধায় ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

কিন্তু "কৃষক" পাঠক কি ইহাতে তৃপ্তি লাভ করিবেন? তাঁহার এত শত কথায় বা ভাবে প্রয়োজন কি? বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। যখন ক্ষেত্রের শস্য, পাট ও কার্পাস, বাগানের শাক সব্জী ও ফল পুষ্প সমস্তই "সোম শক্তির" উপর নির্ভর করে তখন এ প্রবন্ধ যে তাঁহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন তাহা বলা যাইতে পারে না। তবে কি শুধু চন্দ্রের আরাধনা করিলেই কৃষকের ফল লাভ হইবে, না তাহা নহে। ভগবান সর্ব্বভূতে সুক্ষ্ম রূপে আছেন, তোমার জন্য সকলই দিয়াছেন তুমি কর্ম্ম দ্বারা পরিশ্রম দ্বারা তাহার ফল লাভ কর, এবং সকল বিষয় সম্যক জ্ঞাত হইয়া কায়-মন-বাক্যদ্বারা কর্ম্মে রত হও।

হাজারিবাগে কলা ও পেঁপের চাষ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী লিখিত

বাঙ্গালাদেশে লোক সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং পাটের চাষের আধিক্য হেতু কৃষকেরা অন্যান্য সমুদায় চাষ তুলিয়া দিয়া, কেবল পাট চাষেই মনোনিবেশ করিয়া, দেশে অন্যান্য যাবতীয় শাক সব্জী খাদ্য বস্তুর অত্যন্ত অভাব আনিয়া ফেলিয়াছে। ইহা একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদাসীনতার ফল ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। কারণ এখনও এ দেশীয় অনেক শিক্ষিত ভদ্র লোকেরা, কৃষিকার্য্যকে সম্পূর্ণ রূপে সমাজ বিরুদ্ধ ঘৃণিত ও অপমানের কাজ মনে করেন, সুতরাং গরিব ও মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর লোক সম্পূর্ণভাবেই অর্থ ও খাদ্যের অভাবেই মারা যাইতেছেন। পক্ষান্তরে কৃষকেরা পাটে নগদ টাকার লোভে, দিন দিন বলবান হইয়া সমাজকে আরও চাপিয়া ধরিতেছে। শিক্ষিত দল ইহা অবনত মস্তকে সহ্য করিয়াও প্রতিকারের চেষ্টায় সম্পূর্ণ বিমুখ। অধিকন্তু বাঙ্গালাদেশে এক কাঠা জমিও খরিদ বা জমা করিয়া লইতে পাওয়া যায় না। ভদ্রলোকের একমাত্র বিনা মূলধনের ব্যবসায় যে চাকরী, তাহাও সম্পূর্ণ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। এজন্য আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, উল্লিখিত দুইটী অল্প ব্যয় সাধ্য ফলের নিম্ন লিখিত ভাবে চাষ ও ব্যবসায় করিলে, অনায়াসে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া দুই পয়সা সঞ্চয় হইতে পারে।

২। ছোগনাগপুর বিভাগটী, ছোট ছোট সুদৃশ্য পর্ব্বত মালা এবং সমতল ভূমিতে পরিবেষ্টিত। এদেশীয় অনভিজ্ঞ সাঁওতাল জাতির অদূরদর্শিতার জন্য এখনও চারি দিকে শত শত বিঘা ভূমি অকর্ষিত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল বাঙ্গালী বাবুরা চাকরীর চেষ্টায় এবং হাওয়া খাইবার জন্য শীতের পূর্ব্বে এদিকে আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত কতকগুলি লোকে দল বাঁধিয়াই হোক্ বা একাকীই পারেন, এই কাজে হস্তক্ষেপ করিলে বড়ই ভাল হয়।

৩। আমি গিরিডী আসিবার কালে, জগদীশপুর, মহেশমণ্ডা, গিরিডী, পচম্বা প্রভৃতি স্থানের অনেক দূরবর্ত্তী পল্লী ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি যে, অনেক মোয়া গাছ পূর্ণ সাদা জমি পতিত রহিয়াছে। এই মাটী লাল কোমল বালি দোয়াঁস। ইহার অনেকটা আটালিয়া মাটির ন্যায় জল ধারণের ক্ষমতা আছে। এই বিভাগে ছোট ছোট পর্ব্বত মালা হেতু বর্ষাও বেশ হয়। জমির খাজনাও বেশী নহে। কুলী মজুরও বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা অনেক সস্তা। গড়ে প্রত্যেক

মজুর দৈনিক ৵১০—হইতে ।১০ আনার বেশী নহে। এদেশে বিস্তর পাথরিয়া কয়লা এবং অভ্রের খনি অধিকৃত হওয়ায় এত দুর পর্য্যন্ত মজুরী বাড়িয়াছে। কিন্তু এখানে একজন সাঁওতাল কুলী, ৴১৫ পয়সার ছাতু খাইয়া বেলা ৭টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত অক্লান্ত ভাবে যে কাজ করে, দুইজন বাঙ্গালী মজুর ঐ সময়ের মধ্যে তাহার অর্দ্ধেক করিতে পারে কি না সন্দেহ। অধিকন্তু ইহারা প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী।

৪। উল্লিখিত যে কোন রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটে ২০ কিম্বা ২৫ বিঘা জমি স্থানীয় ঘাঁটোয়াল্ জমিদারের নিকট হইতে খাজনা করিয়া লইয়া তাহার মধ্য স্থলে প্রথমতঃ একটী ইন্দাঁরা বা কূপ খনন করিয়া লইতে হয়। পরে তাহার চারিদিকে কাঁটাগাছের বা লোহার কাঁটার বেড়া দিতে হয়। পরে—প্রয়োজন মত ক্ষেত্রের মধ্য স্থলের মৌয়া গাছ তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। তবে মৌয়া গাছেও এদেশে অনেকটা আয় হয়। তৎবিষয় পরে বর্ণনীয়। ঐ নির্দ্দিষ্ট জমিখানিকে, শক্ত কোদালি দ্বারা যতদূর সম্ভব সমতল করিয়া, চারিদিকে নালা কাটিয়া জলরক্ষা করার উপায় করিতে হয়। নতুবা পাথরের নুড়িবিশিষ্ট জমি শীঘ্রই নীরস হইবার সম্ভব।

এই ভাবে জমিখানিকে মহিষের লাঙ্গল দ্বারা আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে, জমি সরস থাকিতে থাকিতে ৩।৪ বার ডবল ফের্‌তা কর্ষণ করিয়াই, বৈদ্যবাটী, চন্দ্রনগর প্রভৃতি স্থান হইতে ছোট ছোট কলার তেউড়্ আনিয়া, ৮ হাত অন্তর এবং ১॥ দেড় হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে রোপণ করিতে হইবে। রোপণের পূর্ব্বে উহাদের পাতার অগ্রভাগ কতকটা ছাঁটিয়া দিতে হয়। আর রোপণের পূর্ব্বে ঐ সকল গর্ত্তে মধুপুর এবং গিরিডী সহরের (Refusal) সহর ঝাঁটান আবর্জ্জনা দ্বারা কতকটা পরিমাণে পূরণ করিয়া দিবে। তাহা হইলে ঝাড়গুলি অধিক দিন স্থায়ী হইয়া বড় বড় কাঁদী ফেলিবে ও কলা মোটা হইবে। ক্ষেত্রটী গিরিডী রেলওয়ে লাইনের ও সাব্‌ডিভিসনের নিকটে, ঐখানে এই বাগান করিবার কথা বলা হইয়াছে বলিয়াই নিকটস্থ সহরের আবর্জ্জনার কথা উক্ত হইল। কৃষি কাজের কৌশলে ক্রমে যত কম খরচা করা যাইতে পারিবে, ততই বেশী লাভ দাঁড়াইবে। অনেকে সেদিকে নজর না করিয়া, ইচ্ছামত খরচ করিয়া ফেলিয়া শেষে ভদ্রলোকের চাষের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিয়া থাকেন।

৫। কলার তেউড়গুলি বেশ লাগিয়া দুই একটী পাত্ ফেলিলে, তখন ঐ গাছগুলি একেবারে মাটী সমান করিয়া কাটিয়া দিয়া ক্ষেত্‌খানি বেশ চৌরশ্ করিয়া মই দ্বারা সমতল করিতে হয়। পরে, ঐ ঐ ঝাড় হইতে, অতিতেজস্কর মোটা মোটা তেউড়্ বাহির হইয়া গাছগুলি বেঁটে আকার ধারণ করিয়া ঝাড়াল হয়। এই গাছের কলা মোটা, ফলন বেশী এবং কাঁদী লম্বা হয়। ঝাড়ও অধিক

দিন স্থায়ী হয়। সাধারণতঃ কলার ঝাড় ৩ বৎসর পর্য্যন্ত তেজস্কর থাকে এবং কলা মোটা হয়; এই ভাবে চাষ করিলে, একস্থানে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত সমান তেজস্কর থাকে। কিন্তু প্রতি বৎসর বৈশাখ ও আষাঢ় মাসে, প্রত্যেক ঝাড়ে ২৩টী করিয়া গাছ রাখিয়া বাকী তেউড়গুলি তুলিয়া ফেলিয়া, অন্য স্থানে লাইন্ বন্দী করতঃ রোপণ ও পুরাতন আটিয়া তুলিয়া ফেলিয়া ঝাড় পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। কলার আটিয়ার জল ধারণের ক্ষমতা অতিশয় প্রবল। ইহাতে জমি বেশ সরস ও কোমল করিয়া দেয়। এইজন্য অন্যান্য চারার তেজ বৃদ্ধি করে।

৬। এদেশে প্রায়ই জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বৃষ্টি আরম্ভ হয়;—সুতরাং কার্ত্তিক হইতে বৈশাখের শেষ মধ্যে যদি দুই চারিবার বৃষ্টি না হয়, তবে ঐ সময় মধ্যে উক্ত পাত্‌কুয়া হইতে রৌদ্রের প্রখরতা বুঝিয়া, নালিদ্বারা ঝাড়ের গোড়ায় মধ্যে মধ্যে জল সেচনের আবশ্যক হইবে। বর্ষা আরম্ভ হইলে আর সেচনের দরকার হইবে না। আর এদেশীয় পাথরীয়া জমিতে একপ্রকার (Marle) পদার্থ উৎপন্ন হইয়া ঝাড়ের গোড়াগুলি সরস ও তেজস্কর করে। ঐ ঐ কলা ঝাড়ের ৪ হাত ব্যবধানে আষাঢ় মাসে একটী করিয়া, বড় জাতীয় গোলাকার বোম্বাই পেঁপের চারা রোপণ করিয়া দিলে, এক কাজে দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ইহাতে কলা এবং পেঁপে উভয় জাতীয় গাছই তেজস্কর হয় এবং অধিক ফল ধরে ও লাভ হয়।

৭। এই ভাবে কাজ করিলে প্রত্যেক ৩ বিঘা ২ কাঠা জমিতে বা এক একারে (Acre) ৩৬৫ ঝাড় কলা ও পেঁপে গাছ জন্মিবে। * এ সম্বন্ধে বাঙলাদেশে একটা প্রচলিত প্রথা আছে তাহাই এখানে অবলম্বন করা ভাল বলিয়া মনে হয়।

(১)

"ডাক্ দিয়ে কয় রাবণ, কলা পোতে আষাঢ় আর শ্রাবণ,
কলা পুতে না কেটো পাত্, তাতেই হবে কাপড় আর ভাত,

(২)

দেড় হাত গভীর, সওয়াহাত গই,
কলা পুতো চাষা ভাই।

---

* প্রত্যেক কলা ঝাড়ের মাঝে একটি পেঁপে গাছ বসাইলে এক একরে প্রায় ৪০০ কলা ও ৪০০ পেঁপে গাছ বসিবে। এত ঘেঁস গাছ জন্মিলে কোনটিরই ফলন ভাল হইবে না। ১২ ফিট অন্তর গাছের ব্যবধান এবং ১০॥ ফিট অন্তর সারি করিয়া কোণাকোণী গাছ বসাইলে গাছ হইতে গাছের ব্যবধান উভয় দিকেই ১২ ফিট থাকিবে অথচ ১ বিঘায় প্রায় ১২ টা, একরে ৩৬ টা গাছ অধিক বসিবে। 'অধিকন্তু পগারের ধারে ও রাস্তার ধারে ফাঁক্ বুঝিয়া পেঁপে গাছ বসাইলে এক একর কলা বাগানে ৫০টা পেঁপে গাছ বসান যাইতে পারে। কিন্তু কলার মাঝে পেঁপে এরূপ মিশ্রিত আবাদ করা আমরা সুযুক্তি বলিয়া মনে করি না। কৃঃ সঃ

অর্থাৎ প্রত্যেক গর্ত্তটী ১॥ হাত গভীর এবং ১। সওয়া হাত পরিসর করিলে কলা গাছ পুতিয়া, যদি তাহার পাতা কাটিয়া তেজ নষ্ট করা না হয়, তবে তাহাতেই গৃহস্থের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হইয়া বেশ আয় হইতে থাকে। পূর্ব্বে কৃষি-শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতেরা এই ভাবে কদলীর প্রতি ঝাড় হইতে খরচা বাদে ১৲ টাকা উৎপন্ন ধরিয়া বার্ষিক ৩৬৫৲ টাকার স্থিতি দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান বাজার দর অনুসারে খরচা বাদে রোজ ২৲ টাকা আয়েরও অধিক অনুমান করা যায়। কারণ আজি কালি সহরের বা মফস্বলের বাজারে বড় বেহুলা বা কাঁচা কলা দুইটা ৫ পয়সার কমে খরিদ করিতে পাওয়া যায় না। আর ভূতো, কাঁঠালি এবং চিনি-চাঁপা কলা, গড়ে ৫ পয়সায় দুই টার বেশী দেয় না, মর্ত্তমান কলা ৫ পয়সায় একটা। তাহা হইলে, প্রত্যেক কাঁদিতে কত বেশী আয় হয়, ভাবিয়া দেখুন্।

	কাঁদির হিসাব।	কাঁদিপ্রতি ফলন ...	কাঁদিপ্রতি আয়।
১।	রংপুরী কাঁচাকলা	গড়ে ৮০ টা ...	গড়ে ১৲ টাকা।
২।	মর্ত্তমান	ঐ ৫০ টা ...	ঐ ৸১০ আনা।
৩।	ভূতো	ঐ ৬০ টা ...	ঐ ।৶১০ আনা।
৪।	কাঁঠালি	ঐ ৮০ টা ...	ঐ ॥৵০ আনা।
৫।	চিনি চাঁপা	ঐ ১৬০ টা ...	ঐ ॥৵০ আনা।
৬।	চীনের ডইরে	ঐ ৮০ টা ...	ঐ ॥৵০ আনা।
৭।	ডইরে বা বীচেকলা ...	ঐ ১৬০ টা ...	ঐ ৸৴৫ আনা।
৮।	বড় বেহুলা	ঐ ৮০ টা ...	ঐ ১৲ টাকা।
			৫৸৶৫

প্রত্যেক হাটে বাজারে এই ৮ প্রকার কলার খরিদ বিক্রয় দেখিতে পাওয়া যায়। যে হারে কাঁদির ফলন এবং বিক্রয় দর উক্ত হইল, ইহাই সর্ব্বত্র বিক্রয় হইতে দেখা যাইতেছে। ইহা ভিন্ন দূরস্থ রেলওয়ে ষ্টেসনে, আরও বেশী হারে, পাকাকলা বিক্রিত হয়। সুতরাং উল্লিখিত ৮ প্রকার কলার বিবেচনামত আবাদ করিয়া গড়ে প্রত্যহ ঐরূপ ৮ কাঁদি কলা বিক্রয় করিলে, ঐরূপ দৈনিক গড়ে ৬৲ টাকার কম আয় হয় না। সুতরাং খরচা হিসাবে ৪৲ টাকা বাদ দিলে, খাঁটি আয় ২৲ টাকার কোন অংশেই কম পড়ার সম্ভব নহে।

৮। গিরিডীর নিকটস্থ কোন স্থানে এইরূপ একখানি বাগান করিলে, নিকটস্থ মধুপুর, বৈদ্যনাথ, শিমুলতলা, জামতাড়া, ধানবাদ, আসনশোল, রাণীগঞ্জ, ঝাঁজা প্রভৃতি স্থানেই সমুদায় কাট্‌তি হইতে পারে। কলিকাতা পর্য্যন্ত চালান দিবার জন্য ভাবিতে হয় না। কিন্তু যদি কলিকাতার বাজারে পাঠাইবার নিতান্তই বাসনা থাকে, তবে কতকগুলি পাইকের স্থির করিয়া, গিরিডী

হইতে যে গাড়ি রাত্রি ১০টার সময় কলিকাতায় যায়, সেই গাড়িতে চালান দিলে, ভোরে যাইয়া কলিকাতার মিউনিসীপাল মার্কেট, নূতন বাজার, পোস্তা, মাধব বাবুর বাজার প্রভৃতি বড় বড় বাজারে ৯টার মধ্যে মাল পৌঁছিয়া দৈনিক বিক্রয় হইতে পারে। এই ভাবে বেশ কলার ব্যবসায় চলিতে পারে।

৯। কলা হইতে অন্য প্রকারের উৎপন্ন ও আয়,—

কলা গাছের মোচা ও থোড়্ উৎকৃষ্ট তরকারি। কলিকাতার বাজারে ৩ খানা থোড় এবং ১টী মোচা প্রত্যেকে ৴৫ হারে বিক্রয়। ১ তাড়ি পাতা ৴৫ পয়সা। মর্ত্তমান, চিনি চাঁপা, চীনের ডইরে কলার পাটুয়া হইতে, মহিশূর রাজ্যে কলে রেশমের ন্যায় সূতা প্রস্তুত হইয়া ইউরোপে চালান যায়। কাঁঠালি, বড় বেহুলা, মর্ত্তমান কলা চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুখাইয়া যাঁতায় পিসিয়া উৎকৃষ্ট ময়দা ও আটা প্রস্তুত হয়। ইহা অতি উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। বহুমূত্র রোগীকে, এই আটা দুগ্ধের সহিত খাইবার ব্যবস্থা করিলে ব্যাধির বিশেষ উপকার হয়। কাঁচ কলা ও বড় বেহুলা কলার আটায় এবং তরকারিতে সাধারণতঃ অম্ল নাশ করে। এই কলার এবং থোড়ের কস্ জল হইতে জুতার কালি প্রস্তুত করা যায়। বীচে বা ডইরে কলার তরকারিতে বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। সকল জাতীয় কলার আঠিঁয়া পোড়াইয়া কাপড় কাচা ক্ষার হয়। আর ঐ ক্ষার চোঁয়াইলে সোডা পাওয়া যায়। কলার বাস্না, পুরাতন নেকড়ার সহিত মিশাইয়া, কাগজের কলে লিখিবার কাগজ প্রস্তুত করে।

১০। এদিকে কাগ্জি, পাতি, কলম্বা লেবুও অতিশয় মহার্ঘ—পয়সায় একটীর বেশী পাওয়া যায় না অথচ এই ফলটী প্রত্যেক লোকেই চাহে, এজন্য এই কলা বাগানের ধারে ধারে বেড়ার আকারে এই লেবুর চারা রোপণ করতঃ, বার মাসে স্থায়ী আয়ের সংস্থান করিবে।* এই গাছের বিশেষ কোন তদ্‌বির করিতে হয় না। কেবল কার্ত্তিক মাসে শুষ্ক ডাল পালা গুলি ছাঁটিয়া দিয়া, গোড়াটী বাঁধিয়া দিতে হয়। ইহা হইতেও ব্যয় বাদে বার্ষিক অনূন ৷৷০ আনার কম আয় হয় না। আর বাগানটী ঘেরার পক্ষে কাঁটার দ্বারা বিশেষ সাহায্য করে। ইহার কলম হইতেও বেশ আয় হয়। লেবুর রসে পরিপাক শক্তির অত্যন্ত বৃদ্ধি করে। শরীরও মস্তিষ্ক শীতল রাখে। আহারে সুস্বাদু ও রুচিকর। অধিকাংশ কবিরাজী ও ডাক্তারি ঔষধে এই সকল লেবুর রস ব্যবহৃত হয়। পুরাতন জর, গ্রহণী, উদরাময়, রোগে, ইহা অতিশয় উপকারী।

---

* যে গাছই বসাও এবং যত গাছই বসাও আসল আবাদের ক্ষতি না হয় তাহা যেন স্মরণ থাকে। প্রত্যেক গাছেরই খাদ্য আবশ্যক, সকলই এক জমি হইতে সংগ্রহ হইবে। কৃঃ সঃ

১১। আমি যত স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি তন্মধ্যে এই ছোট নাগপুরের প্রত্যেক স্থানেই যেরূপ তেজস্কর পেঁপেগাছ ও তাহার ফল দেখিয়াছি, এমন কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। ২০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে পেঁপে একটা বুনো ফল মধ্যে পরিগণিত ছিল। এখন ইহার অত্যন্ত আদর বাড়িয়াছে। সেভাবে ইহার রোপণের ব্যবস্থা বলা—হইয়াছে।

১২। আজি কালি একটী বড় পেঁপে ⁄১০ পয়সা হইতে ✓০ আনা পর্য্যন্ত গড়ে বাজারে বিক্রিত হয়। প্রত্যেক গাছে গড়ে ১০০ এক শতেরও অধিক পেঁপে ধরে। সুতরাং ভাবিয়া দেখুন, প্রত্যেক গাছ হইতে বার্ষিক কি আয় হইবে? ইহা উৎকৃষ্ট তরকারি। পাকিলে খাইতে অতি সুস্বাদু, স্নিগ্ধ, মিষ্ট আস্বাদ। ইহাতে পেপিন (Pepine) আছে। সেজন্য কাঁচা পেঁপে কুটিয়া সেই আঠাসুদ্ধ সিদ্ধ করিয়া, ডালনা বা তরকারি রাঁধিয়া খাইলে অন্য ভুক্তদ্রব্য সহজে জীর্ণ ও পরিপাক করিয়া দেয়। ইহা যকৃতের কার্য্যের খুব সহায়তা করে।

সরকারী কৃষি সংবাদ

ধানের উফ্‌রা রোগ

ইম্পিরিয়াল মাইকোলজিষ্ট ডাঃ ই, জে, বট্‌লার লিখিত ইংরাজীর অনুবাদ।

উফ্‌রা ক্রিমির স্বভাব পর্য্যালোচনা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ধানক্ষেতের বিশেষতঃ আউশ ধানের মাঝে মাঝে প্রথমে রোগ দেখা দেয় এবং ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; সেইজন্য আক্রান্ত স্থানসমূহের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী কোন কোন গাছ নীরোগ দেখা যায় আবার কোন কোন গাছে 'থোড়' এবং 'পাকা' উফ্‌রার বিভিন্ন অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ আক্রান্ত স্থানের মাঝখানেই রোগ অনেক দিন হইতে বর্ত্তমান থাকে, সেইজন্য এই মাঝখানের প্রত্যেক শীসই আক্রান্ত দেখা যায়। কোন কোন মাঠে ক্ষতির পরিমাণ শতকরা দশভাগের বেশী দেখা যায় নাই। আবার কোথাও কোথাও মাঠের প্রায় সমস্ত ধানই বিনষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। আমন ধান অধিক দিনে হয় বলিয়া রোগ বাড়িবার সময় পায় এবং সেই কারণে ইহাতে আউশের অপেক্ষা বেশী ক্ষতি হয়।

এ রোগসম্বন্ধে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রোয়া ধান স্বাভাবিক অবস্থায় বোনা ধানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত রোগমুক্ত থাকে। রোয়া ধান গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয় বলিয়া বোধ হয় নাই। বাস্তবিক ইহা যে একেবারে রোগাক্রান্ত

হয় না তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। রোয়া আমন ধান কাটার সময় কয়েকটী গাছ রোগযুক্ত বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু ইহারা জাব পোকা ও মাজরাদ্বারা আক্রান্ত ছিল বলিয়া পোকার আক্রমণে শুকাইয়াছিল কি উফ্‌রার আক্রমণে শুকাইয়াছিল স্থির করিতে পারা যায় নাই। কৃত্রিম উপায়ে রোয়া ধান্তে উফ্‌রা রোগ ধরান অতি সহজ এবং এরূপ করিতে হইলে রোগগ্রস্ত ডাঁটার এক টুকরা জীবন্ত কৃমিসহ গাছের পত্রাবরণের বা পাতার পেটোর ভিতরে স্থাপন করিতে হয় অথবা গোড়ায় জল রাখিয়া দিতে হয়। অতএব বোধ হইতেছে যে, রোয়া ধানে উফ্‌রা লাগিবে না এমন কোন গুণ নাই। যে কোন কারণেই হউক কৃমি রোয়া ধানে পৌঁছিতে পারে না সেইজন্য রোয়া ধান বাঁচিয়া যায়। কি কারণে পৌঁছিতে পারে না তাহা এখনও জানা যায় নাই।

উফ্‌রা কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে এবং কি পরিমাণ অনিষ্ট ইহার দ্বারা সাধিত হইতেছে এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত সঠিক খবর জানা যায় নাই, কেননা ঐ সব জায়গায় যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা এবং স্থানীয় কৃষি-বিভাগও অতি অল্প দিন হইল গঠিত হইয়াছে।

নোয়াখালীর মধ্য ও পশ্চিমাংশে এ রোগ হইয়া থাকে। সুধারাম, বেগমগঞ্জ, রামগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুর থানায় হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বেগমগঞ্জ থানায় প্রায় ২০০,০০০ মণ ধান লোকসান হইয়াছে। চৌমুহানির চারিদিকে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রায় অর্দ্ধার্দ্ধি হৈমন্তিক ধান নষ্ট হইয়াছে। আমার অনুমান এতদপেক্ষা আরও অধিক ক্ষতি হইয়াছে। গত ত্রিশ বৎসর হইতে এই জায়গায় উফ্‌রা বর্ত্তমান আছে জানা যায়। বিগত ২০ বৎসর হইতে ইহা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কিছুদিন হইল সমধিক ক্ষতি করিতেছে। এইস্থানের মধ্যবয়স্ক লোকেরা বলেন যে তাঁহাদের পিতার আমলে এ রোগ ছিল না এবং বিগত ৬ বা ৮ বৎসর হইতে ইহা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই রোগের ইতিবৃত্তসম্বন্ধে ইহার বেশী বোধ হয় জানিবার আশা করা যাইতে পারে না।

ত্রিপুরা জেলায় চাঁদপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে এ রোগ বর্ত্তমান আছে। নিশ্চয়ই নোয়াখালী হইতে উত্তরে এই প্রদেশে ইহা বিস্তৃত হইতেছে এবং কুমিল্লার চারিদিকেও ছড়াইয়াছে। নোয়াখালী ও এই সব স্থানের মাঝে খুব সম্ভবতঃ এ রোগ বিদ্যমান আছে এবং লাখ্‌সামের দক্ষিণেও এ রোগ হইতেছে শুনা গিয়াছে। তবে এই সকল স্থানে রোগের বৃদ্ধির পরিমাণ কিরূপ তাহা জানা যায় নাই।

ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে জানা যায় যে ঢাকা জেলার অন্তর্গত মধুপুর জঙ্গলের অনেক জমির ধান ১৯০৪ এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে "ডাক" নামক এক সংক্রামক রোগে একেবারে শুকাইয়া যায়। গ্রামবাসীরা বলে যে "ডাক" ভূমি হইতে উত্থিত এক

প্রকার বাষ্প। এই মড়কের সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। ডাক রোগাক্রান্ত গাছ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পুষায় পাঠান হয় এবং দেখা যায় যে নোয়াখালী ও ত্রিপুরার "উফ্‌রা" এবং "ডাক" একই রোগ। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ সবডিভিসনে গভীর জলে জাত আমন ধান্য এই "ডাক" রোগে আক্রান্ত হয়। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের উদ্ভিদের রোগ অনুসন্ধানকারী বাবু অমৃতলাল সোম লিখিয়া জানান যে, গত দশ বৎসর হইতে এ রোগ বিদ্যমান আছে কিন্তু গত পাঁচ বৎসর যাবৎ বিশেষ অনিষ্ট করিতেছে। আউশ ধানের এ রোগ হয় না বলিয়া লোকে বলে কিন্তু তাঁহার প্রেরিত আউশ ধানের গাছে রোগ ছিল। বিক্রমপুরের নিকটে অন্য এক বিস্তৃত জায়গায় এ রোগের সংবাদ কিছুদিন হইল পাওয়া গিয়াছে। ইহা পশ্চিমে এবং উত্তর পশ্চিমে অনেকদূর পর্য্যন্ত পদ্মা নদীর দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এখন যতই অনুসন্ধান করা হইবে এবং এদিকে মনোযোগ দেওয়া হইবে নিশ্চয় ততই নূতন নূতন জায়গায় এ রোগ আছে বলিয়া জানা যাইবে। এতদ্বারা নূতন জায়গায় যে রোগ ছড়াইয়া পড়িল এরূপ বুঝায় না। যতদূর সপ্রমাণ হইয়াছে তাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এ রোগ অতি ধীরে ধীরে ছড়াইতে থাকে এবং অনুসন্ধানের ফলে যে সকল নূতন স্থানে রোগ প্রকাশ পাইবে, সেখানে খুব সম্ভব ইহা পূর্ব্ব হইতেই আছে। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে কোন্ কোন্ জায়গায় রোগ বর্ত্তমান আছে তাহার অনুসন্ধানের সুবন্দোবস্ত হইবে। উপরিউক্ত জেলাসমূহে ধানের সময় এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমনের অসুবিধা কত যাঁহারা জানেন তাঁহারাই বুঝিবেন এরূপ অনুসন্ধান কত কঠিন।

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কি উপায়ে এ রোগ দূরীকৃত করা যায় তাহা অল্প কয়েক মাসের মধ্যে ঠিক করা যায় না। যে সব জায়গায় রোগ বর্ত্তমান আছে তথায় নানারূপ পরীক্ষা করিতে হইবে এবং হয়ত অন্যান্য শস্যের ন্যায় অনেক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষার পর একটি স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে। তবে রোগ দূরীকরণের চেষ্টা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকটি উপায় আপাততঃ অবলম্বন করা যাইতে পারে এবং যে সকল উপায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে কৃষকেরা নিজেরাই তাহার কোন কোনটী পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে।

রোগ নিবারণ করিতে যে সকল উপায় সম্ভব তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। এক, কৃমিদিগকে বিনাশ করা যাহাতে তাহাদের সংখ্যা কমিয়া যায়, দ্বিতীয়, এমন ধান উৎপন্ন করা কৃমিরা যাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না বা খুব কমই ক্ষতি করিতে পারিবে।

ধান যখন ক্ষেতে থাকে এবং কৃমিরা মাঠে বাড়ে তখন ইহাদিগকে মারিবার চেষ্টা করা বৃথা। ভারতবর্ষে ধানের মত বিস্তৃত ফসলে আরক ছিটান অসম্ভব।

কোন রকম কৃমি বিনাশকারী ঔষধ জলে মিশাইয়া কৃমিদিগকে বিনাশ করাও সম্ভব নয়, কারণ ইহাদের অধিকাংশই জলে না থাকিয়া পত্রকোরকের অভ্যন্তরে এবং গাছের উপরিভাগে থাকে। বিস্তৃত ক্ষেত্রে আরক বা ঔষধ প্রয়োগ ও বহু ব্যয়সাধ্য। শীতকালে যখন কৃমিগুলি নিদ্রিত অবস্থায় ধানের গোড়ায় এবং ধানে থাকে তখনই ইহাদিগকে বিনষ্ট করা অধিকতর সম্ভবপর হইবে। ইহাতেও কৃতকার্য্য হওয়া নানা ঘটনার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ এক এক ক্ষেত্রের যাবতীয় কৃমি বিনাশ করা চাই এবং দ্বিতীয়তঃ একবারে খুব বেশী পরিমাণ মাঠে কৃমি বিনাশ করা চাই যাহাতে পুনরায় আক্রমণ না হইতে পারে। একেত কৃমিরা একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে পারে, তাহার উপর জোয়ার ভাঁটার দরুণ এবং জমির উচ্চতা ও নিম্নতা অনুসারে দূর দূরান্তরে জলস্রোত বহিতে থাকে। এই সব কারণে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা খুব বেশী। তৃতীয়তঃ "বোরো" ধান্য-ক্ষেত্রেও এ রোগ দেখা দিতে পারে। এই ধান শীতকালে এমন সময় জন্মে যে ঐ সময়েই কেবল উফ্রার কৃমি বিনাশের পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। তবে ইহা বোধ হয় বিশেষ আশানুরূপ হইবে না কারণ বোরো ধানে এখন পর্য্যন্ত রোগ দেখা দেয় নাই এবং এই ধান মাত্র কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানেই উৎপন্ন হয়। নোয়াখালীতে যখন এ ধান জন্মায় না তখন নোয়াখালীর বেলায় এ বিষয় আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

আমার বিশ্বাস হৈমন্তিক ধান্য কাটিয়া লইবার পর নাড়াগুলিকে জ্বালাইয়া দিলে সম্ভবতঃ এ রোগ অনেকটা কমিয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া যে বীজে এই কৃমি নাই এরূপ বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং নানা রকমে জমির উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন হইতে পারে। কৃমিদের কতক নিশ্চিত ধান কাটার পর নাড়ায় থাকিয়া কিছুদিন কাটায় এবং কতক যে সকল শীসে "পাকা" উফ্রা ধরিয়াছে তৎসঙ্গে গোলায় চলিয়া যায়। জমিতে এ সময় কোন কৃমি জীবিত অবস্থায় থাকে কি না এ পর্য্যন্ত সটিক জানা যায় নাই। প্রমাণের দ্বারা যতদূর জানা গিয়াছে গোলাজাত ধানে বা মাটিতে যে সকল কৃমি থাকে তাহাদিগের দ্বারা পর বৎসর পুনরায় রোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া বোধ হয় না। যদি এ রোগ সাধারণতঃ বীজের দ্বারা সংক্রামিত হইত তাহা হইলে ইহা যেমন বাড়িয়াছে তদপেক্ষা দ্রুতবেগে ছড়াইয়া পড়িত, কেননা এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় বীজের কতক পরিমাণ বিনিময় হইয়া থাকে। যদি কৃমিরা জমিতে থাকিয়া রোগ জন্মাইত তাহা হইলে রোয়া ধানের জমিতেও নিশ্চয় অনেক দিন পূর্ব্বেই ইহার আক্রমণ দেখা দিত। যেহেতু শীতের শেষে নিম্ন ভূমি হইতে মাটি উঠাইয়া যে সব জমিতে পাট বুনিবে তাহাতে দেওয়া হয় এবং এই পাটের জমিতে হৈমন্তিক

ধান রোয়া হয়। আমরা কৃমি লাগাইয়া দেখিয়াছি যে যদি কৃমিরা রোয়া ধানে পৌঁছিতে পারে তবে এই সকল গাছেও উফ্‌রা হয়। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, ধান রোপণ করার সময় মাটিতে কোন কৃমি বর্ত্তমান থাকে না।

নাড়াগুলি জ্বালাইয়া যে উপকার হইয়াছে তাহার আশাজনক সংবাদ ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। কীটতত্ত্ববিদ ফ্লেচার সাহেব এবং আমি গত বৎসর এরূপভাবে নাড়া পোড়াইতে উপদেশ দিয়াছিলাম। মাজ্‌রা পোকাদ্বারাও উফ্‌রা রোগাক্রান্ত জেলাসমূহের এত বেশী অনিষ্ট হয় যে মাজ্‌রা নিবারণ করিবার জন্য ফ্লেচার সাহেবের মতে কৃষকদিগের নিয়মিতরূপে ধানের গোড়া সকল পোড়ান উচিত। বাঙ্গালার অন্যত্র এ রীতি আছে এবং যে সব জায়গায় উফ্‌রা অথবা মাজ্‌রা দ্বারা ক্ষতি হয় তথায় এ পদ্ধতির চলন হওয়া উচিত। নীচু জমিসকল এখন যেরূপভাবে চাষ দেওয়া হয় তদপেক্ষা ভালরূপে কর্ষণ করার জন্য পরামর্শ দিতেছি। কেননা যদিও মাটিতে কৃমি জীবিত থাকে না তবু যে সব ধান্য ক্ষেত্রেই ঝরিয়া পড়ে ও যে সব নাড়ার অংশ মাঠে থাকে তাহাতে কৃমি থাকা সম্ভব। এরূপভাবে ক্ষেত্রকর্ষণ করিলে খড় কুটা ইত্যাদি মাটির ভিতরে পড়িয়া পচিয়া যাইবে এবং কৃমিদের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইবে না। দেখা গিয়াছে যে সেঁতা জমিতে ইহারা বেশী দিন জীবিত থাকে না। অবশ্য এরূপ কর্ষণ সব সময় সহজ হইবে না, কারণ অনেক নিম্ন জমি ধান কাটার পর শুকাইয়া শক্ত হইয়া যায় এবং বসন্তাগমে বৃষ্টি না পড়িলে এদেশীয় গরু মহিষের দ্বারা কর্ষণ উপযোগী হয় না। ইহা ছাড়া ধানের নাইট্রোজেন (নেত্রজন) নামক উপাদানের বিশেষত্ব এই যে, বেশী চাষ দিলে উহা যথেষ্ট কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে অথবা অতিরিক্ত কর্ষণের জন্য বিষাক্ত হানিকর নাইট্রাইট্‌ নামক পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে।

যদি সংক্রামিত বীজ ব্যবহার করা এখনকার অপেক্ষা বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে নীরোগ বীজ সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হইবে। বাঙ্গালার কৃষি বিভাগ ইহা করিতে সক্ষম হইবেন।

রোগ নিবারণ করিবার উপায়ের মধ্যে ধান গাছের উন্নতি সাধন করার চেষ্টা আবশ্যক এবং যাহাতে ইহা রোগাক্রান্ত না হয় সেইরূপ অবস্থায় ইহাকে উৎপাদন করা দরকার। যেখানে সম্ভবপর হয় চারা উঠাইয়া ধান রোপণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; কেন না রোয়া ধানে এ রোগ দেখা যায় নাই। সম্ভবতঃ আপত্তি হইতে পারে যে প্রতিবৎসর ক্ষেত সকল জলমগ্ন হওয়ায় রোয়া ধানের তত বেশী চাষ হইতে পারে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস এরূপ আপত্তির তেমন কোন সন্তোষজনক কারণ নাই। কেন না বেগমগঞ্জের নিকট পাটের চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় গত কয়েক বৎসরের মধ্যে রোয়া ধানের চাষ বিশেষরূপে বাড়িয়াছে। ইহা

হইতেই বোধ হয় এরূপ আপত্তি খাটে না। ইতিমধ্যেই লোকেরা রোয়া ধানের চাষ বাড়াইয়াছে এবং যদি বুঝাইয়া বলা হয় সম্ভবতঃ আরও বাড়াইবে। একবার-মাত্র বীজ ছড়াইয়া বপন করা অপেক্ষা ধান উঠাইয়া রোপণ করা বেশী কষ্টসাধ্য। যে সকল প্রদেশে ধানের আবাদ হইয়া থাকে তাহার মধ্যে কোন কোন স্থানের কৃষকেরা বড়ই অলস। নোয়াখালীর কৃষকেরাও সেইরূপ। তাহাদিগকে বুঝাইয়া বা কোনরূপে বাধ্য করিতে পারিলে তবে রোয়া ধানের চাষ বাড়াইতে পারা যাইবে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের পরামর্শে জমিতে চূণ ছড়াইয়া এ রোগ কমাইতে চেষ্টা করা হয়, তদ্দ্বারা রোগ দেরীতে দেখা দেয় কিন্তু ফসল রক্ষা পায় নাই। নোয়াখালী জেলায় চূণ ব্যবহারের খরচ এত বেশী পড়ে যে বেশী পরিমাণ চূণ জমিতে ব্যবহার করা সম্ভবপর নয়।

যে জমির মাটিতে বৎসরের অধিকাংশ সময় বাতাস লাগিতে পায় না, সেই সকল জমিতে উৎপন্ন ধান গাছে উফ্‌রা রোগের আক্রমণ অধিকতর লক্ষিত হয়। যদিও যে সব জমিতে জল বিশেষভাবে আটকাইয়া থাকেনা পুষায় এরূপ জমির ধানে উফ্‌রার কৃমি লাগাইয়া রোগ উৎপাদন করিতে পারা গিয়াছিল, তথাপি বেগমগঞ্জ ইত্যাদি স্থানের জলপ্লাবিত জমির ন্যায় ইহার আক্রমণ তত বেশী হয় নাই। নোয়াখালী প্রভৃতি জায়গায় অধিকাংশ জমির নিম্নতার দরুণ গভীর জলে ধান ছিটাইয়া বপন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কিন্তু অধিকাংশ জমি হইতে জল নিকাশের উপায় করা যাইতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে জল নিকাশের জন্য প্রাকৃতিক নালার উন্নতি সাধন করিবার প্রস্তাব অনেক দিন হইতে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। উফ্‌রা রোগাক্রান্ত জেলায় এ বিষয়ের উন্নতি করিলে ঐ রোগের দ্বারা যে ক্ষতি হয়, তাহা কমিতে পারে।

উপরি উক্ত জেলাসমূহে ধানের এই উৎকট রোগের দরুণ বিশেষ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। এইখানে আবাদি জমির ৪ ভাগের তিন ভাগ জমিতে ধানের চাষ হয় এবং অন্য কোন শস্য ধানের পরিবর্ত্তে প্রচলিত হইতে পারে না। এ রোগ বিশেষ সংক্রামক, নূতন স্থানে এবং নূতন ধানে কৃমি লাগাইয়া সহজেই রোগ জন্মান যায় ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে। সুতরাং রোগাক্রান্ত জেলার ক্ষতির কথা ছাড়িয়া অপরাপর জেলায় এ রোগ ছড়াইয়া পড়িলে যে গুরুতর ক্ষতি করিবে, ইহাই বেশী আশঙ্কার বিষয়। একদিকে বাঙ্গালার বিস্তৃত ধানের চাষ এবং অন্য দিকে ব্রহ্মদেশের বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র। ইহা দূরে হইলেও মধ্যবর্ত্তী স্থানে ধানের চাষ থাকায় উহাদের মধ্যে যোগ আছে। শেষোক্ত প্রদেশ হইতেই ভারতবর্ষের অধিকাংশ রপ্তানির ধান সংগৃহীত হয়। যদি ইহা নিশ্চিতরূপে জানা যাইত যে রোয়া ধানেহয় এ রোগ না

তাহা হইলে এই সব স্থানে বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা থাকিত না। যখন রোয়া ধানে রোগের বীজ লাগাইয়া সহজেই এ রোগ জন্মাইতে পারা যায় তখন ইহাতে যে রোগ ধরিবে না এমন বিশ্বাস করা নিরাপদ নহে। ব্রহ্মপুত্র নদীর পশ্চিমে এ রোগ হওয়ার কথা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। ব্রহ্মদেশে ইরাবতী নদীর উপকূলবর্ত্তী প্রদেশে এ রোগ এ পর্য্যন্ত হয় নাই, ইহা কিছু দিন হইল আমি ব্রহ্মদেশে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছি। ঐ সব জায়গায় স্বল্পহানিকর কয়েক রকম ধানের রোগ পাওয়া গিয়াছে।

ধান গম ইত্যাদি ধান্য জাতীয় শস্য। ইহাদের মধ্যে ধানে রোগ অতি অল্পই দেখা যায়। এই নূতন উৎকট রোগটি ধানে জন্মিয়া রোগাক্রান্ত জেলার অনেক মাঠের শস্য কাটিবার পূর্ব্বেই সমূলে বিনষ্ট হওয়ায় এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার। ভারতবর্ষ অপেক্ষা উন্নততর দেশে হয়ত অনতিবিলম্বে কেবল এই কার্য্যের জন্যই অভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিয়া এ বিষয় সম্যকরূপে অনুসন্ধান করা হইত। কিন্তু ভারতবর্ষ সে অবস্থায় এখনও পৌঁছে নাই। এদেশের কৃষি বিভাগে যে সকল লোক এ বিষয় জানেন তাঁহাদের উপর অন্যান্য কাজেরও ভার ন্যস্ত আছে। এই রোগ নিবারণের উপায় করিবার জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এই বর্ত্তমান সনে এগার হাজার টাকা রাখিয়াছেন। রোগ উৎপাদনকারী কৃমির জীবনের অনেক তথ্য আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই; কতক শীঘ্রই প্রকাশ পাইবে আশা করা যায়। কৃমিদ্বারা আক্রান্ত হইবার পর ধান গাছের কি হয় সে সম্বন্ধেও এখনও অনেক বিষয় অজানা আছে, তাহারও কতক জানা যাইতে পারে। এই সকল জানিতে পারিলে তবে আমরা আরও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই রোগ নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে পারিব এবং নিবারণ করিতে পারিব বলিয়াও আশা করি। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের সহিত একযোগে কাজ করা যাইবে। উপস্থিত যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিতেছি তাহাই এ বিষয়ে শেষ কথা নয়। রোগ নিবারণ করিবার জন্য যে সব পরীক্ষা আরম্ভ করা হইয়াছে বা করা হইবে তাহাদের ফলাফল দেখিয়া তবে যেমন প্রয়োজন বিস্তৃত ভাবে কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে।

কার্ত্তিক, ১৩২১ সাল।

ধান্যতত্ত্ব

ভারতীয় খাদ্য শস্যের মধ্যে ধান্য অন্যতম। যব, গোধুম, ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতির তুলনায় ভারতে ধান্যের প্রাধান্য অনেক অধিক। যে পরিমাণ জমিতে ভারতবর্ষে ফসল উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছয় হাজার লক্ষ বিঘা তাহার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ জমিতে ধান্য উৎপাদিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও—ইতালী, এসিয়া মাইনর, চীন, জাপান, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার প্রদেশ বিশেষে ধান্য আবাদ অপরিচিত নহে। বস্তুতঃ ধরিতে গেলে মনুষ্য জাতির খাদ্য হিসাবে ধান্য কাহারও নিম্নস্থান অধিকার করে না।

কিন্তু কৃষি-জগতে ধান্য সর্ব্বপ্রধান ফসল হইলেও ইহার সেরূপ বৈজ্ঞানিক সমালোচনা হয় নাই। আলোচ্য বিষয় বহু বিস্তীর্ণ বলিয়াই হউক কিম্বা নিতান্ত পরিচিত বলিয়াই হউক, অতি সামান্য সংখ্যক লেখকই কথিত ধান্য—জাতি সমূহের উৎপত্তি, লক্ষণাবলী, জলবায়ু মৃত্তিকার তারতম্যে প্রকার ভেদ, নিষেক-প্রণালী প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য সকল অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ধান্য চাষের উন্নতি সাধন করিতে হইলে এগুলি প্রথমেই জানা আবশ্যক। আমরা এ স্থলে তজ্জন্য ধান্যের পুরাতত্ব ও শরীর তত্ব প্রভৃতির জটিলাংশে প্রবেশ না করিয়া কতকগুলি মূল বিষয়ের উল্লেখ করিব। পাঠকবর্গেরা তাহা হইতে উদ্ভিদ তত্বের দিক হইতে ধান গাছের একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারিবেন।

ধান্য ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। উদ্ভিদ শাস্ত্রে ইহা গ্রামিনেসী (Graminaceæ) জাতির অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হয়। এই জাতীয় গাছের অধিকাংশেরই কাণ্ড কোমল, কচিৎ দারুময়, ফাঁপা, কেবল গাঁইটের স্থানে নিরেট এবং এই জাতীয় অতি সামান্য উদ্ভিদই ডাল পালা বিশিষ্ট হয়। সাধারণভাবে বলিতে

গেলে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য এই জাতি মনুষ্যের নিকট বিশেষ পরিচিত। গোধূম, যব, যই, ভুট্টা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। ইক্ষুও এই জাতির অন্তর্ভুক্ত। অনেক জাতীয় ঘাস উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য; পক্ষান্তরে অন্যান্য ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ্ হইতে সুগন্ধ-তৈল, রজ্জু ও কাগজ প্রস্তুতের গৃহ নির্ম্মাণ ও সজ্জার উপাদানও পাওয়া যায়। বাঁশ তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

খাদ্য-শস্যের জন্য ধান্যের আবাদ বহু পুরাকাল হইতে হইয়া আসিতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রবর ডি ক্যাণ্ডেলি কর্ষিত উদ্ভিদ সমূহের উৎপত্তি (A. De Candalle's Origin of Cultivated Plants) নামক গ্রন্থে খৃষ্টপূর্ব্ব ২৮০০ অব্দ পর্য্যন্ত ধান্য চাষের ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন। উক্ত বৎসরে চীন-সম্রাট, চিংনং ধান্য বপনের উৎসবের (এতদ্দেশীয় হল চালন) প্রথম অনুষ্ঠান করেন। ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, তাহার পূর্ব্বেও চীন দেশের স্থানে স্থানে ধান্য চাষ হইত এবং ধান্য চাষের পরিসর বৃদ্ধি করিবার জন্যই এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা বলা অসঙ্গত নহে যে, ধানের আবাদ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। কোন দেশে প্রথমতঃ ধান্যের উৎপত্তি হয়, তাহা বলা যায় না। সম্ভবত সম নৈসর্গিক অবস্থা বিশিষ্ট একাধিক দেশে এক সময়ে ধান্য দেখা দিয়াছিল। ঐতিহাসিক প্রমাণের হিসাবে চীনের পরেই ভারত ধান চাষের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন সংস্কৃতে ব্রীহি, আরুণ্য প্রভৃতি ধান্যের নাম তাহার প্রমাণ। মধ্যএসিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে ধান্য বিভিন্ন জাতির সহিত বিভিন্ন সময়ে নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু ধান্য চাষের পুরাতত্ত্ব নির্দ্ধারণ বাক্যে যত সহজ, বর্ত্তমান সময়ের কর্ষিত ধান্য জাতি সমূহের আদিম পুরুষ নির্দ্ধারণ করা তত সহজ নহে। জল, বায়ু ও মৃত্তিকার তারতম্যে ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট জাতীয় সজীব কত তারতম্য হইয়া যায় তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। সুতরাং পাঁচ হাজার বৎসর চাষের পর ধান্যের ন্যায় সহজ পরিবর্ত্তনশীল উদ্ভিদের আদি পুরুষ নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া কত পরিমাণ গবেষণা ও পর্য্যবেক্ষণ সাপেক্ষ তাহা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ে দৃষ্ট কোন জাতীয় বন্য-ধান্য হইতে অপরাপর বন্য ও কর্ষিত জাতি উৎপাদিত হইয়াছে তাহা স্থির করা প্রায় অসম্ভব। সাধারণতঃ ইহা বলিতে পারা যায় যে, আদিম ধান্য জলজ উদ্ভিদ এবং অপরাপর জলজ উদ্ভিদের ন্যায় ইহারও বাসস্থান বহু বিস্তৃত। ভারত ও চীনের মধ্যস্থিত নানাজাতির মধ্যে প্রচলিত ধান্যের বহু পুরাতন নাম দেখিয়া ইহা প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গদেশ হইতে চীন পর্য্যন্ত দক্ষিণ এসিয়ার নানাস্থানে ধান্য স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইত। ভারতেও

যে সকল স্থলে ধানের আবাদ নাই সেরূপ দেশের জলাশয়ে ও হ্রদ প্রভৃতি জলাশয় বিশেষে বন্য ধান দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা ঠিক যে ক্ষেত্রে বপনের পূর্ব্বে এই সকল বন্য অবস্থায় ধান্য জন্মিত।

যাবতীয় কর্ষিত ধান্য সমূহের একটি আদি পুরুষ স্থির করিতে না পারা গেলেও, দেশ বিশেষে কয়েক প্রকার ধান্যকে তদ্দেশ উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণীর ধান্যের আদি বলিয়া ধরিতে পারা যায়। এই হিসাবে বিবেচনা করিতে গেলে Oryza Sativa নামক জাতিকে অধিকাংশ কর্ষিত ধান্যের জন্য আদি পুরুষ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। তেলিগু ভাষায় ইহাকে নেবারী বলে। উড়ি ধান ইহার রূপান্তর। ইহা জলে এবং জলাশয়ের পার্শ্বস্থ জমিতে ও অন্যান্য স্থানেও জন্মিয়া থাকে। যেহেতু ইহার কাণ্ড সাধারণ ধান্য অপেক্ষা কঠিন এবং ২ হইতে ৮।১০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থলে মান্দ্রাজ, ব্রহ্ম, বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও আরাকান এবং কোচিন চিনে এই জাতি যথেষ্ট পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ অবয়বে পুষ্পবিন্যাসে ও ফলের গঠনে কর্ষিত ধান্যের সহিত এই বন্যধান্যের কতক গুলি প্রভেদ আছে, তন্মধ্যে ফলাভ্যন্তরে কোন কোন বন্যধান্যের একাধিক শস্যের সংঘটন বিশেষরূপ উল্লেখ যোগ্য। বলা বাহুল্য যে বন্যধান কর্ষিত ধান অপেক্ষা অধিকতর কষ্ট সহিষ্ণু এবং স্থানে স্থানে এরূপ দৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছে যে, বন্যধান্য অবস্থা বিশেষে ধান্য ক্ষেত্র অধিকার করিয়া কর্ষিত ধান্যের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। ইহাদের বীজ বপন করিতে হয় না। গাছ হইতে ছড়াইয়া পড়িয়া বায়ু, জল অথবা অন্য উপায়ে স্থানান্তরে নীত হইয়া ইহারা বংশ বৃদ্ধি করে। ধীবরগণ ও অন্যান্য আরণ্য জাতি সমূহ ইহার বীজ সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করে।

Oryza Sativa ভিন্ন অন্য দুইটি বন্যধান্যের উল্লেখ করিতে পারা যায়। একটির নাম Oryza granulata ; ইহা শুষ্ক জমিতে সিকিম, আসাম, ব্রহ্ম, ছোটনাগপুর ও মালাবার অঞ্চলে ৩০০০ ফিট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। কাণ্ড প্রায় দারুময় এবং একাধিক বর্ষজীবি। শস্যের ভিতরের পর্দ্দার দানাদার গঠন প্রণালী ইহার বিশেষ লক্ষণ। চাউল বেশ সুস্বাদু এবং সু-তার। অন্য জাতির নাম Oryza officinalis। ব্রহ্ম, খাসিয়া পর্ব্বত এবং সিকিম প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থানে ইহা পাওয়া যায়। ইহার কাণ্ড অপেক্ষাকৃত বন্য দারুময় এবং অপরাপর লক্ষণাবলী পূর্ব্বোক্ত বন্যধান্য ও কর্ষিত ধান্যের মধ্যবর্ত্তী।

পণ্ডিত প্রবর রক্সবরা ধান্য সমূহের জলদী ও নাবী হিসাবে দুই ভাগ করিয়াছেন। নাবী ৮ প্রকার—সকলগুলিই শ্বেতশস্য বিশিষ্ট ও শুঁয়া রহিত। জলদী আট প্রকারের মধ্যে ৪টিতে শুঁয়া আছে ও শস্য রক্তবর্ণ, ১টি শুঁয়াযুক্ত শ্বেতবর্ণ ও অন্য তিনটি শুঁয়া বিহীন শ্বেতবর্ণ।

একটি নির্দ্দিষ্ট প্রকারের ধান্য কিরূপে ও কতগুলি শারীরিক গঠন প্রণালীর পরিবর্ত্তনের স্তর দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। তবে আমরা যে কয়টি জাতির উল্লেখ করিয়াছি সে গুলির মধ্য হইতেই ইহাদের আদিম পুরুষ অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। সাধারণ ধান্যের জীবনতত্ত্ব অধ্যয়ন এই কার্য্যে বিশেষ সাহায্য প্রদান করে। বিবর্ত্তনবাদের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া সাধারণ ভাবে ইহা বলিতে পারা যায় যে, কোন একটি উদ্ভিদ অথবা জীবের ভ্রূণ হইতে পরিণত অবস্থা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির স্তরগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গেলে তাহা হইতে তাহার উৎপত্তির আভাস ও ঘনিষ্ট সম্পর্কীয় উদ্ভিদ কিম্বা জীবের সহিত সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। সুতরাং জীবন তত্ত্ব অধ্যয়ন মুখ্য বিষয়।
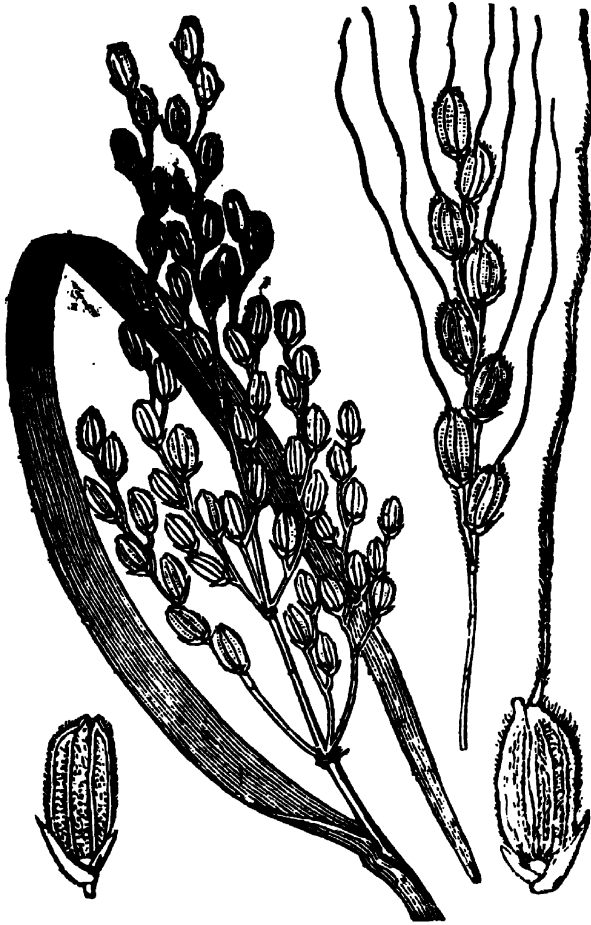
ধান্য একবীজদল শ্রেণীর উদ্ভিদ। অনেকেই তেঁতুলের অঙ্কুর উৎপত্তি দেখিয়াছেন যখন বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং গাছ সামান্য বড় হওয়া পর্য্যন্তও কাণ্ডের দুইটি মূল চেপ্টা অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলিকে বীজদল বলে ; ছোলা মটর, সীম প্রভৃতির বীজ খুলিলেই এইরূপ দুইটি দল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ধান, গম, যব প্রভৃতিতে একটি মাত্র দল। ধান্যের অঙ্কুরিত গাছের এক দিকেই বীজ সংলগ্ন থাকে।

একবীজদল ও দ্বি-বীজদল উদ্ভিদের অন্য কতকগুলিও স্ব স্ব প্রকৃতিগত লক্ষণ আছে। তন্মধ্যে মূল হিসাবে একবীজদলের গুচ্ছমূল অর্থাৎ কাণ্ড ও মূলের সংযোগ মূল হইতে একটি প্রধান মূল নির্গত না হইয়া একেবারে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল নির্গত হয়। ধান্যেরও সেইপ্রকার। কাণ্ড কোমল ; পাট, শণ প্রভৃতির

ন্যায় কঠিন ও দারুময় নহে। কাণ্ডের ভিতর ফাঁপা; কেবল যে মূল হইতে পত্র বহির্গত হয় (কক্ষ অথবা গাইট) সেই মূলই নিরেট। পত্রেরও একটু বিশেষত্ব আছে। অন্যান্য পত্রের ন্যায় ইহার বোঁটা নাই। তৎপরিবর্ত্তে পত্রের নিম্নাংশ নলের মত হইয়া কাণ্ড পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উদ্ভিদ শাস্ত্রে এই অংশকে কাণ্ডকোষ বলা হয়। পত্রও প্রস্থে অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া লম্বা দিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শিরা বিন্যাস দৈর্ঘিক প্রণালী অনুযায়ী হইয়া থাকে। ধান্যের কাণ্ডই পরিণত অবস্থায় প্রান্তভাগে পুষ্পদণ্ডে পরিবর্ত্তিত হয়। প্রধান দণ্ড হইতে কতকগুলি উপদণ্ড বহির্গত হয় এবং তাহাতে ফুলগুলি সন্নিবিষ্ট থাকে। ধান্যের ফুলের সহিত বেল, গোলাপ, জবা প্রভৃতি সাধারণতঃ বাগানে উৎপাদিত ফুলের অনেক পার্থক্য আছে। যাহাতে ফুলের প্রতি প্রধানতঃ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় অর্থাৎ সুরঞ্জিত পাঁপড়ী তাহা ধান্যে নাই। তৎপরিবর্ত্তে ইহাতে কঠিন, অমসৃণ ক্ষুদ্রাকৃতি তুঁষ রহিয়াছে। উদ্ভিদ শাস্ত্রে ধান্য পুষ্পের এই সমুদয় বহিরাবণ বিভিন্ন নামে আখ্যাত হয়। এ স্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বহিরাবরণকে তিনটি স্তবকে ভাগ করা যায়—প্রথমতঃ ১ জোড়া ক্ষুদ্র পত্রাকৃতি আবরণ, ইহার অভ্যন্তরে পরে পরে দুই তিনটি পুষ্প থাকিতে পারে। হয়ত প্রত্যেক পুষ্প ১ জোড়া বৃন্তস্থলির রূপান্তরিত পত্র এবং হয়ত ঐ প্রকারের আর এক জোড়া স্রকস্থলীর পত্র। এই সমুদয় বহিরাবণের পর পুষ্পের মুখ্য অংশ অর্থাৎ পুং ও স্ত্রী নিবাস। এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে ধান্যের ফুল উভলিঙ্গ। অর্থাৎ একই পুষ্পে স্ত্রী ও পুং যোনি নিহিত রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বহিরাবণের পর ছয়টি পুংকেশর সন্নিবিষ্ট করিয়াছে। পুং কেশর আবর্ত্তের পরেই গর্ভ কেশর। ইহা এক কোষ বিশিষ্ট এবং ইহার মধ্যেই ভ্রূণ নিহিত থাকে; পরে পুং কেশরস্থ পরাগ দ্বারা নিষিক্ত হইলে বীজে পরিণত হয়।

ধান্যে কিরূপভাবে পরাগ সংযোগ ও নিষেক ক্রিয়া (Pollination and Fertilization) সম্পাদিত হয় তাহা এতদ্দেশে এ পর্য্যন্ত উত্তম রূপে আলোচিত হয় নাই। এস্থলে নিষেক ক্রিয়া সম্বন্ধে একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। কোন কোন উদ্ভিদে একটি উভলিঙ্গ পুষ্পের পরাগ হইতে তাহার গর্ভকেশর নিষিক্ত হইয়া থাকে। সে স্থলে নিষেক ক্রিয়াকে স্বকীয় নিষেক বলিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে অন্যপ্রকার পুষ্পের গর্ভকেশর উক্ত পুষ্পস্থিত পরাগ হইতে নিষিক্ত হয় না। সমজাতীয় অন্য পুষ্পের পরাগ দ্বারা নিষিক্ত হয়। এস্থলে নিষেবন ক্রিয়াকে পরকীয় নিষেক বলা যায়। ধান্যে উভয় প্রকারে ভ্রূণ নিষিক্ত হইয়া থাকে। পরকীয় নিষেকের কালে অতি লঘু পরাগ রেণু সমূহ বায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া আসিয়া গর্ভকেশরের উপর পতিত হয় এবং ক্রমশঃ

ডিম্ব কোষের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া ভ্রূণ নিষেক করে। স্বকীয় নিষেকের সময় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার অনতি পূর্ব্বেই পরাগ সংযোগ ক্রিয়া সাধিত হইয়া যায়।

ধান্যের ক্ষুদ্র পুষ্প গুচ্ছ সমূহ প্রান্ত হইতে নিচের দিকে পরিণত হয় অর্থাৎ সর্বাগ্র ভাগস্থ মুকুল আগে ফুটে, তৎপরে তন্নিম্নস্থ পুষ্প এইরূপে ক্রমশঃ নিচের দিকের ফুল ফুটিতে থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ক্ষুদ্র পুষ্প গুচ্ছের (২৩ টি ফুলের সমষ্টি) বাহিরে একটি আবরণ থাকে। যখন গুচ্ছস্থ প্রত্যেক ফুল বৃদ্ধি হইয়া দৈর্ঘে আবরণ অতিক্রম করিয়া যায় তখনই তাহার পরাগ সংযোগ ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ যদি বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে এইরূপে ফুল নিষ্ক্রান্ত হয় তাহা হইলে সেই দিনেই পরাগ সংযুক্ত হইয়া যায়; তাহা না হইলে তৎপর দিন দ্ব প্রহরের পূর্ব্বে হয়। অধিকাংশ কর্ষিত ধান্যে স্বকীয় নিষেকই বোধ হয় নিয়ম। কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে পুষ্প বহিরাবরণ হইতে বাহির হইতে না হইতেই পরাগ কোষ বিদীর্ণ হইয়া রেণু পুষ্প মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। তখনও গর্ভতন্ত্র আবরণের ভিতর থাকে। সুতরাং অন্য পুষ্পের রেণু সংযোগ হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

আউশ ও আমন ধানের পুষ্প নিষ্ক্রামণ ও পরাগ সংযোগের সময়ের কিছু পার্থক্য আছে। আউশের জ্যৈষ্ঠ মাসে ফুল হয়; ঐ সময়ে ৭।৮ টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংযোগ ক্রিয়া সাধিত হইয়া সে দিনের মত বন্ধ হইয়া যায়। আমন ধানের কার্ত্তিক মাসে ফুল ফুটিলে ৯।১০ টা হইতে আরম্ভ হইয়া ১২টা পর্য্যন্ত উক্ত ক্রিয়া চলিতে থাকে। এই রূপ সময়ের পার্থক্যের কারণ বোধ হয় উষ্ণতার হ্রাস। গরম দিনে ফুল শীঘ্র ফুটে এবং শীতল দিবসে ফুটিতে বিলম্ব হয়।

পরাগকেশর বিদারণের সময় পরাগ কেশর সমূহ প্রায় ঊর্দ্ধমুখে অবস্থিতি করে তৎপরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নিম্নমুখ হইয়া পড়ে। প্রস্ফুটিত পুষ্পের প্রসারণের পরিমাণ এবং প্রস্ফুটিত অবস্থায় থাকার সময় পুষ্প বিশেষে তারতম্য হয় বটে কিন্তু জাতি ভেদে ইহার একটা সঠিক হিসাব করিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ সময় অথবা প্রসারণের হ্রাস বৃদ্ধি জাতিগত লক্ষণ নহে তৎকাল প্রচলিত জল হাওয়া অনুসারে ইহার ন্যূনাধিক্য হয়। সাধারণতঃ বহিরাবরণ ফুটিয়া ফুল বাহির হওয়ার সময় হইতে পরাগ কেশর ঝুলিয়া পড়া পর্য্যন্ত ১৫ মিনিট সময় লাগে। এ সম্বন্ধে আউশ ও আমন একই রূপ। কিন্তু ফুল ফুটন্ত অবস্থায় থাকার সময়ের পার্থক্য আছে। আউশের ফুল আধঘণ্টার অধিক ক্বচিৎ ফুটন্ত থাকে; পক্ষান্তরে আমনের ফুল ১ হইতে ১½ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ফুটিয়া থাকিতে পারে। ফুল ফুটিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে মেঘ বৃষ্টির অধিক প্রাদুর্ভাব থাকিলে ফুল একবারেই ফুটে না কিম্বা ফুটিলেও আর বন্ধ হয় না। আউশের ফুলের সময় প্রায় এইরূপ অবস্থা দাঁড়ায়।

তাহাতে পরাগ রেণু নষ্ট হইয়া যায় এবং নিষিক্ত না হওয়ার জন্য ফুল বীজ প্রসব করে না। আউশ ধানে অপেক্ষাকৃত অধিক আগড়া হওয়ায় ইহা অন্যতম কারণ। একটি ধানগাছের সমস্ত পুষ্পদণ্ড নিষিক্ত হইতে প্রায় চারি দিন সময় আবশ্যক হয়।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে স্বকীয় নিষেক প্রণালীর প্রথা ফলতঃ অবগত হওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পরকীয় নিষেক প্রণালী ধান্যে অবিদিত নহে। বস্তুতঃ সময়ে সময়ে দেখা যায় যে ফুল ফুটিবার সময় গর্ভকেশরের দুইটি চিহ্ন গর্ভকেশরের দুই পার্শ্ব দিয়া পার্শ্বিক ভাবে ঈষৎ বক্র হইয়া থাকে। সে সময়ে অবশ্য পুংকেশর নিম্নদিকে লম্বমান হইয়া পড়ে এবং সকল সময়ে তাহার পরাগ-কেশর একবারে রেণু শূন্য হইয়া যায় না। এইরূপ অবস্থায় যদি মৃদু বাতাস ও সূর্য্যালোক থাকে তাহা হইলে পরকীয় নিষেক হওয়া অসম্ভব নহে। সম্প্রতি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের মিঃ হেক্টর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে এইরূপ ভাবে নিষিক্ত হইয়া ঢাকা কৃষি ক্ষেত্রে কতিপয় সঙ্কর উৎপাদিত হইয়াছে। তিনি আরও অনুমান করেন যে নিম্নবঙ্গে শতকরা চারিভাগ বীজ পরকীয় নিষেক ক্রিয়া সাধিত। কিন্তু এই প্রকারে নিষেবন সাধিত হইলেও যে বহু দূরবর্ত্তী গাছের মধ্যে হয় না তাহা ঠিক। নিকটবর্ত্তী ২।৪ ফুট ব্যবধানের গাছের মধ্যেই ইহা হইতে পারে। যেরূপ ভাবে আমাদের বীজ নির্ব্বাচন হয় তাহাতে পরকীয় নিষেকের সম্ভাবনাই অধিক এবং পরকীয় নিষেক না হইলেও ধানের এত প্রকার জাতি উৎপাদিত হইত না। কোন বিশেষ জাতীয় ধান্য লইয়া পরীক্ষা করিতে হইলে তাহার নিষেক প্রণালী প্রথমেই জানা আবশ্যক। তাহা না হইলে উহা হইতে উৎকৃষ্টতর জাতি উৎপাদন করিতে যাওয়া অনেকটা অন্ধকারে লম্ফ প্রদানের ন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে। কিরূপ জল বায়ু মৃত্তিকার অবস্থায় নিষেক ক্রিয়ার সুবিধা অসুবিধা হয় তাহা বারান্তরে আলোচ্য।

পত্রাদি

সিংভূমে ফলের গাছ বসান—ডাঃ কেদারনাথ দত্ত, ঘাটশীলা, সিংভূম।

আপনার পত্রের উত্তরে আপনাকে জানান যাইতেছে যে,—ঘাটশীলার মত জায়গার জমি শীঘ্র নিরস হইয়া পড়ে সুতরাং তথার ফলের গাছ বসাইতে হইলে আশ্বিন মাস গত হইতে দেওয়া উচিত নহে। সেচন জলে মাটি সরস রাখা এবং জমির স্বাভাবিক সরসতা দুইয়ে অনেক তফাৎ। আম গাছ গুলির ব্যবধান ৩৫ ফিট হওয়া উচিত। নির্দ্দিষ্ট স্থানে গর্ত্তটি আশে, পাশে ও গভীরতায় অন্ততঃ ৩ ফিট হইবে, বেশী হইলেও ক্ষতি নাই। গর্ত্তগুলি পুরাতন গোময়সার ও পুরাতন পাঁক মাটিদ্বারা

প্রায় পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। গর্ত্ত খনন সময়ে যে মাটি উঠিবে তাহা গর্ত্তের চারি দিকে আইল আকারে রাখা হয়, এই মাটি গুলিও রোদ বাতাস পাইয়া সারবান হইয়া উঠে। প্রত্যেক গর্ত্তে অর্দ্ধসের হিসাবে মাছের গুঁড়া দিলে ভাল হয়। গাছ বসাইবার ১ মাস পূর্ব্বে গর্ত্তটি সার মাটিদ্বারা পূরণ করিলে অধিকতর উপকার পাওয়া যায়। সার মাটি গর্ত্তস্থিত মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া ও রৌদ্র বাতাস ও বৃষ্টি পাইয়া সরস হয়। সার, রস রূপে পরিণত না হইলে বৃক্ষের আহার যোগাইতে পারে না। সদ্যপ্রদত্ত সারে সদ্য রোপিত গাছের আশু উপকার না হইলেও কিছু পরেও সেই উপকার হয়। কিন্তু সদ্য গোময় বা সদ্য পাঁক ব্যবহার অকর্ত্তব্য। ইহাতে চারা গাছের ক্ষতি হয়। প্রবোধ বাবুর Treaties on mango পুস্তকের দাম ১৲, Woorow's The mango ইহারও দাম ১৲ টাকা। শেষোক্ত বইখানি এখন পাওয়া যাইতেছে না, উভয় পুস্তকই অসম্পূর্ণ। সঠিক সব খবর পাওয়া যায় না।

ধান ও পাটে সার প্রদানের সময়—শ্রীআহম্মদ হোসেন, গুলুচিয়া, মুর্শীদাবাদ।

আমি নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি জানিতে বাসনা করি। আগামী মাসের কৃষকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বাহির (প্রচার) করিয়া বাধিত করিবেন।

পাটের জমিতে বীজ বপনের পূর্ব্বে কর্ষণ করিবার সময় হাড় ও সোরা দেওয়া ফল দায়ক কিম্বা চারা বাহির হইবার পর দেওয়া ফল দায়ক?

হৈমন্তিক ধান্য,—ঐ জমিতে মাঘ মাসে জমি-প্রথম-কর্ষণ সময় হাড় সোরা দেওয়া উপকারী কিম্বা আষাঢ় মাসে রোপণের সময় দেওয়া উপকারী কি, না?

পাট এবং ধানের জমিতে কোন্ সময় কি হারে একর প্রতি কি সার দিলে ভাল ফল পাওয়া যাইবে? এবং আপনাদের লিখিত মত একর প্রতি ৩ মণ হাড় ও ১০ সের সোরা দিলে, অন্য সারের প্রয়োজন হইবে কি না? এবং ঐ সার প্রথম কর্ষণের সময় দেওয়া যাইবে কি না?

ইক্ষুর গাছের "মাঝ পাতা" প্রথমতঃ মরিয়া গাছ মরিয়া যায় তাহার প্রতিকার কি?

আলুর গাছে পোকা ধরিয়া গাছ মরিয়া যায় তাহা নিবারণের উপায় কি? যে কোন গাছে "উইপোকা" ধরিলে প্রতিকারের উপায় কি?

অগ্রহায়ণ মাসে আলু লাগাইতে পারা যায় কি না? (লাল আলু) বা পাট কাটার পর কোন্ ধান লাগান যাইতে পারে?

উত্তর—পাট বা ধানের জমিতে প্রথম বর্ষারম্ভেই জমি চষিয়া সার দিতে হয়, বিশেষ হাড়ের গুঁড়া সার যাহা গলিয়া মাটির রসের সহিত মিলিতে বিলম্ব হয়। শুষ্ক পাঁক মাটি, গোময় সার, বীজ বপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রয়োগ করা চলে কিন্তু

হাড়ের গুঁড়া সেই সময় প্রয়োগ করিয়া সামান্য ফলই পাওয়া যায়। শীতের শেষে যখন বৃষ্টি হয় তখন জমি চষিয়া হাড়ের গুঁড়া ছড়াইলে আরো ভাল। হাড়ের গুঁড়ার সহিত সোরা ঐ সময় ব্যবহার করা যাইতে পারে। সোরা কখন কখন বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা গুলি কিঞ্চিৎ বড় হইলে প্রয়োগ করা হয়। ইহাতে বিশেষ ফল পাওয়া যায় এবং চারাগুলি যেন নব বল পাইয়া সতেজ করিয়া উঠে। সোরা মাটির রসের সহিত সহজে এবং শীঘ্র মিশে।

ধান ও পাটে সারের পরিমাণ—ধানক্ষেতে একর প্রতি ৩ মণ হাড়ের গুঁড়া ও ত্রিশ সের সোরা পর্য্যাপ্ত এবং ইহা প্রয়োগ করিলে অন্য সার দিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। একর প্রতি ১৫০ মণ গোময় সার যথেষ্ট। একজন লোকে সহজে বহন করিতে পারে এরূপ এক হাজার ঝুড়ি পগারের পলি মাটি একর প্রতি ছড়াইতে পারিলে, তাহার সহিত ৫০ মণের অধিক গোময় সার পাটক্ষেতে ছড়াইবার আবশ্যক হয় না।

আলুতে রোগ, গাছে উই—আখের মাজা ধরা, আলুর ধসাধরা, গাছে উই লাগা ইহার প্রতিকার জানিতে চান—ইহার বিশেষ আলোচনা "ফসলের পোকা" পুস্তকে পাইবেন। ইহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক। আশ্বিন কার্ত্তিকের মধ্যে আলু বসান শেষ করিতে হইবে।

অগ্রহায়ণ মাসে আলু—অগ্রহায়ণে আলু বসাইয়া লাভ নাই। পাটের ফুল ধরিতে আরম্ভ করিলে যে পাট কাটা হয় তাহাকে ফুল পাট বলে। আষাঢ়ের শেষে শ্রাবণের প্রথমে ঐ পাট কাটা হয়। ইহার পর আমন ধানের চাষ করা চলে। উচ্চ জমি হ .লে উহাতে আশ্বিন মাসে আলু বসান চলে।

কুয়াশায় আম্র মুকুলের ক্ষতি—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, মাড়ুই বাজার, বিষ্ণুপুর পোঃ আঃ; জেলা বাঁকুড়া।

ঘাটশীলার আম্র গাছের মুকুল কুয়াসায় ও রৌদ্রে চুঁইয়া নষ্ট হইয়া যায়, ফল প্রায় হয় না। ইহার যদি কোনও প্রতিকার থাকে তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী মাসের "কৃষকে" উহা প্রকাশ করিলে বড়ই বাধিত হইব। আমি ঘাট শীলাতে গোটাকতক কলমের আম গাছ লাগাইতে চাই।

আপনার পত্রের উত্তরে আপনাকে জানান যাইতেছে যে, দৈবী আপদের কোন প্রতিকার নাই, তবে দেখা যায় যে, গাছগুলির ভালরকম তদ্বির হইলে তাহারা সতেজ মুকুল উৎপন্ন করে এবং সে গুলি কুয়াসা ও রৌদ্রের প্রভাব সহনে অধিকতর সমর্থ হয়। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে আম লিচু গাছের গোড়ার মাটি কোপাইয়া,

নাড়িয়া শিকড় গুলিতে রৌদ্র বাতাস লাগাইলে ঐ সকল ফলবৃক্ষ বেশ আবহাওয়ার প্রভাব সহন ক্ষম হয় এবং তাহাদের মুকুল বড় সহজে চুঁড়ে না বা ফল ঝরে না।

বিদেশে গাছ পাঠাইতে বিশেষ প্যাকিং—শ্রীঅনাথবন্ধু দাস, বিমোড়া কাছারী, বঙ্গাইগাও পোঃ আঃ, গোয়ালপাড়া, আসাম।

মহাশয়! আপনাদের প্রেরিত আম ও লিচুর কলম আটটী আজ ষ্টেসনে পৌঁছায়, ষ্টেসন মাষ্টারদ্বয়ের উপস্থিতিতে কলমের পার্শ্বেলটী ডিলিভারী লওয়া হইয়াছে। আমের কলম ৪টী ভাল অবস্থায় পৌঁছিয়াছে বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় লিচুর কলম ৪টী গাছ একেবারেই শুথাইয়া শুষ্ক কাষ্ঠবৎ অবস্থায় পাওয়া গেল। ইহার কারণ কি ?

আপনার পত্রের উত্তরে আপনাকে জানান যাইতেছে যে, লিচুর কলমগুলি অপেক্ষাকৃত সুখী, একটু জলের অভাব হইলে বা তাত লাগিলে মরিয়া যায়। রেলে গাছ পাঠাইলে অনেক সময় অনেক গাছ মরিয়া যায়, তাহার কোন প্রতিকার করা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে কাঠের গুঁড়া, কয়লার গুঁড়া দিয়া এবং কাপড় মুড়িয়া প্যাক করিয়া পাঠাইলে গাছ মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু তাহাতে গাছ প্রতি ॥০ আনা হিসাবে খরচ পড়ে। ইহাই একমাত্র প্রতিকার, অন্য উপায় দেখি না। কিন্তু এপর্য্যন্ত করিয়াও সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া মনে হয় না। রেলে মাল এরূপভাবে নামান ও তোলা হয় যে তাহাতে গাছের সমূহ ক্ষতি হয় ইহার প্রতিকার নাই। ইতি

কাপাস বুনিবার সময়, চীনাবাদাম চাষের সময়, পাটে সবুজ সার শ্রীখগেন্দ্রনাথ রায়।

মহাশয়! আমার জমিতে এ বৎসর, একাংশে, কিছু "কার্পাস" ও চিনেবাদাম চাষ করিব মনস্থ করিয়াছি। আমার গ্রামের জমি দোয়াঁস, কাল। আমার অনুমান যে উক্ত জমিতে বুড়ি এবং দেব কার্পাস ভাল হইবে।

পাট বুনিয়া সবুজ সার দেওয়া চলে কি না; ধঞ্চের বীজ আপনাদের নিকট আছে কি না; এবং মূল্য কত তাহাও লিখিয়া বাধিত করিবেন।

জমি সম্বন্ধে আপনার অনুমান ঠিক। কিন্তু বুড়ী কাপাস কিম্বা দেব কাপাসের বীজ বপনের আর সময় নাই। চীনাবাদামের চাষ এখন করা যাইতে পারে। বীজ চীনাবাদামের দাম ১০৲ টাকা মণ প্যাকিং ও মাশুল, স্বতন্ত্র লাগিবে। ধঞ্চে বীজের দর ১০৲ টাকা মণ, অর্দ্ধ মণের অধিক আবশ্যক হইবে না। বিঘায় আড়াই তিন সের মাত্র বীজ আবশ্যক। সবুজ সারের জন্য পাট বীজ বুনিতে পারেন, তাহার দাম ৮৲ টাকা মণ এবং কম বীজে অধিক জমিতে বুনা চলিবে, সুতরাং ধঞ্চে অপেক্ষা সস্তা কিন্তু কাজে সমান।

সার-সংগ্রহ

ঢাকার মসলীন একটি লুপ্ত শিল্প

'এ, এফ, এম্‌, আবদুল আলি, এম্‌-এ, এম্‌-আর-এ-এস, ইত্যাদি।

("রঙপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা")।

এই (রঙপুর) সাহিত্য-পরিষদের গত বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে জনৈক বক্তা ঢাকাই মসলি'নর জগৎব্যাপী খ্যাতি ও উহাতে ব্যবহৃত তন্তুসমুদয়ের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে সুললিত ভাষায় উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই অধুনা-বিস্মৃত শিল্পটির প্রতি আমার প্রীতি অগাধ এবং উহার তথ্যসংগ্রহেও আমার উৎসাহ অসামান্য; তজ্জন্যই উক্ত বিষয়ের কয়েকটি তথ্য নিম্নে বিবৃত করিতেছি, আশা করি, ইহা পরিষদের সভ্যগণের কৌতুহলপ্রদ ও রুচিকর হইবে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইংলিসম্যান পত্রের কোন রবিবাসরীয় সংস্করণে ঢাকাই মসলিন সম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, উক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ প্রবন্ধ হইতে অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। ঢাকা বহুকাল হইতেই মসলিনের জন্য প্রসিদ্ধ। ঢাকাই মসলিনের সুতাতন্তুসুলভ স্বচ্ছত্ব, প্রকৃষ্ট সূক্ষ্মত্ব এবং বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সুদুর অতীত যুগের বস্ত্রশিল্প-বিশেষজ্ঞগণের নিকট সমাদৃত হইত। রোমদেশ যখন সমৃদ্ধির শিখরে অবস্থিত ছিল, তখন মসলিন রোমক-মহিলাদের বিলাসোপকরণরূপে পরিগণিত হইত, ইতিহাস এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে। ঢাকার ইতিহাসকার টেলার সাহেব মনে করেন যে, বাঙ্গালার মসলিন যে কার্পাস নামে অভিহিত হয়, ঐ শব্দটি সংস্কৃত "কার্পাস" এবং হিন্দি 'কাপাস' শব্দ হইতে উদ্ভূত। প্লিনির সময়ে "কার্পাসিয়াম" বা "কার্পাসিয়ান" বলিতে সর্ব্বপ্রকার সূক্ষ্ম তন্তুজাত বস্ত্রকেই বুঝাইত।

প্লিনি কার্পাসবয়ন-শিল্পের যে বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে এক সময়ে ঢাকা বঙ্গদেশের মধ্যে উক্ত শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এক দিকে চীন, অপর দিকে তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, ইথিওপিয়া এবং পারস্য দেশের সহিত এই বাণিজ্য চলিত। ইহার কিছুদিন পর প্রভেন্স, ইটালী, ল্যাংগুইডক্‌ এবং স্পেন দেশেও ঢাকার মসলিন প্রেরিত হইত। ঢাকার ইতিবৃত্তে মসলিন বিবরণে টেলার সাহেব নবম শতাব্দীর দুই জন মুসলমান পরিব্রাজকের লিখিত "চীন ও ভারতের সংবাদ" নামক গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের অনুবাদক আবিব তিওইছারাৎ। ভারতবর্ষের কার্পাসবস্ত্র সম্বন্ধে ঐ পুস্তকে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং পুস্তক লিখিত অন্যান্য ঘটনাবলীর সমবায়ে উহা যে

ঢাকাই মসলিন উপলক্ষ করিয়াই লিখিত, ইহা স্পষ্টই অনুমিত হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত মুসলমান পরিব্রাজকদ্বয় বলিয়াছেন," সেই দেশের লোক এমন আশ্চর্য্য কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করে যে, তাহার তুলনা অন্য কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। এই বস্ত্রগুলি গোলাকারে রক্ষিত এবং এরূপ সূক্ষ্মভাবে বয়িত যে মাঝারি আকারের একটি অঙ্গুরীয়কের মধ্য দিয়া টানিয়া বাহির করা যায়।

মসলিনের সূক্ষ্মতা ও উৎকর্ষজ্ঞাপক অসংখ্য গল্প কথিত হইয়া থাকে। ট্রেভার-নিয়ার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, "পারস্যরাজের ভারতীয় দূত মহম্মদ আলিবেগ ভারত হইতে পারস্যে ফিরিয়া আসিয়া বাদসাহ দ্বিতীয় চাসেফিকে বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত অষ্ট্রীচ্ পক্ষীর ডিম্বাকৃতি একটি ক্ষুদ্র নারিকেল উপহার দিয়াছিলেন। যখন নারিকেল ভাঙ্গা হইল, তখন তাহার মধ্য হইতে ষষ্টি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ মসলিনের পাগড়ীর কাপড় বাহির হইল, উহা এমন সূক্ষ্ম যে হাতে রাখিয়াও সঠিক জানা যায় না যে, কি হাতে রহিয়াছে।"

"প্রাচীন এবং মধ্য যুগের ভারতবর্ষ" নামক গ্রন্থে—মিসেস ম্যানিং লিখিয়াছেন যে, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্বকালে জনৈক তন্তুবায়ের গাভী শষ্পোপরি প্রসারিত এক খণ্ড মসলিন বস্ত্র খাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া ঢাকা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। ঐ প্রকার মসলিন আবিরাওয়ান বা প্রবহমান সলিল নামে অভিহিত হইত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক খাফি খাঁর গ্রন্থ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অলোকসামান্যা রূপবতী নুরজাহান বেগম ঢাকাই মসলিনের প্রতি এত অনুরক্তা ছিলেন যে, তৎকালে তাঁহার জন্য দিল্লী-দরবারে এবং দিল্লীর সংস্রবযুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রীয় নগরীতে ঢাকাই মসলিন বিশেষ আদরের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছিল। সূক্ষ্মত্বগুণে উৎকৃষ্টতম মসলিন সমস্তই বাদসাহ-অন্তঃপুরচারিণীগণের ব্যবহারেই পর্য্যাপ্ত হইত। অন্য কেহ তাহা ব্যবহার করিতে পারিত না।

নিম্নে বর্ণিত গল্পটি ভারতবর্ষে সুপরিজ্ঞাত। অবশ্য ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতে আমি অপারগ, কিন্তু ইহা দ্বারা ঢাকাই মসলিনের অসাধারণ সূক্ষ্মতা-বিষয়ে সুন্দর ধারণা জন্মিতে পারিবে।

সাহিত্যক্ষেত্রে কবিতা রচয়িত্রী বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিতা সম্রাট্ আরঙ্গজেবের রূপবতী কন্যা কুমারী জেব উন্নিসা একদা মসলিন-পরিহিতা হইয়া পিতৃ সমীপবর্ত্তিনী হইলে কঠোর "পিউরিটান" নীতি পন্থাবলম্বী সম্রাট্ কন্যাকে অন্তঃপুরচারিণীগণের নীতিবিগর্হিত স্ত্রীজনোচিত লজ্জাশীলতা বিষয়ে ঔদাসীন্য হেতু ভর্ৎসনা করিয়া-ছিলেন। জেব উন্নিসা ইহাতে দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি কাপড় সত্তর ভাঁজ করিয়া পরিধান করিয়াছেন। পারস্য কবি সিরাজকুঞ্জকোকিল হাফেজকে ভারতবর্ষে আগমন করিবার জন্য গায়সউদ্দীন নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন

এবং অন্যান্য বহুমূল্য উপহারের সহিত কয়েকখানি মসলিনবস্ত্রও তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ঢাকাই মসলিন যে তৎকালে কি আদরের জিনিস ছিল, ইহা হইতেই তাহা অনুমিত হইবে। সেই উপহার-প্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ কবিবর তাঁহার লোকবিশ্রুত গজল রচনা করিয়া বাঙ্গালায় পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত গজলে কবি বলিয়াছেন যে, পারস্যের এই শর্করা (গজল) ভারতের তোতা-পাখীদিগের কণ্ঠ মধুময় করিবে।

আলঙ্কারিক ভাষায় সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করা প্রাচ্য দেশবাসীর চিরন্তন প্রথা। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ঢাকাই মসলিনের এই জন্য নানা আলঙ্কারিক নাম ছিল, যথা—"আবি-রাওয়ান" বা প্রবহমান সলিল। "সাব্‌নাম" বা সান্ধ্য শিশির, কারণ জলসিক্ত হইলে উহা শিশির হইতে পৃথক বলিয়া অনুমান হয় না। "জামদানী" ফুল দেওয়া মসলিন। 'মালওয়াল খাস" অর্থাৎ রাজবস্ত্র। ডাক্তার টেলার সাহেবের সময়ে বিদেশীয় অল্প মূল্যের বস্ত্রে ভারত প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং মসলিন তখন মৃত্যুর কবলবদ্ধ; সে সময়ে ও ছত্রিশ প্রকারের মসলিন ঢাকায় প্রস্তুত হইত। টেলার ক্লে এবং অন্যান্য লেখকগণ প্রাচীন কালে তন্তুবায়গণ যে সমস্ত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিত, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। "আবি-রাওয়ান" প্রস্তুত করিতে ১২৬ প্রকার যন্ত্রের প্রয়োজন হইত বলিয়া কথিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশখণ্ড সূত্রে গ্রথিত করিয়া সেই সমস্ত যন্ত্র প্রস্তুত হইত। বর্ষাকালই সূক্ষ্ম বস্ত্রবয়নের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সময় বলিয়া বোধ হয়। অষ্টাদশবর্ষীয়া হইতে ত্রিংশ-বর্ষীয়া হিন্দু স্ত্রীলোকগণই সূক্ষ্মতন্তু নির্ম্মাণ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা পটু বলিয়া বিবেচিত হইত। ত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রম অতীত হইলেই তাহারা কর্ম্মে অনুপযুক্ত হইত। চত্বারিংশ বর্ষ বয়সে তাহাদের দৃষ্টিশক্তি এত দুর খারাপ হইয়া পড়িত যে, তাহারা আদৌ মিহি সূতা কাটিতে পারিত না। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালেই তাহারা কার্য্য করিত, কারণ ঐ সময়ে বায়ু স্বভাবতঃই সিক্ত থাকে, এবং আলোকরশ্মি চক্ষুর কোন অপকার সাধন করে না। ১৮৫১ অব্দের বিরাট প্রদর্শনীতে ঢাকা হইতে আনীত এক অদ্ভুত চরকা প্রদর্শিত হইয়াছিল। কতকগুলি বক্র কাষ্ঠখণ্ড সূতা দিয়া বাঁধিয়া ঐ চরকাটি প্রস্তুত হইয়াছিল। উহার দ্বারা কি প্রকারে যে মসলিনের সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ সূত্র প্রস্তুত হইত, তাহা স্থির করা সুকঠিন। ১৮৩৬ অব্দে ডাঃ ইউর লিখিয়াছেন, ইউরোপবাসিগণের প্রতিভা যে প্রকার সূত্র নির্ম্মাণ করিতে অক্ষম তাদৃশ সূত্র ঢাকায় তখনও প্রস্তুত ও মসলিন বয়িত হইত। কি কৌশলে যে ঐ প্রকার চরকা ও মাকুদ্বারা তাদৃশ সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে, লেখক তাহা ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৮৩৭ অব্দে বয়িত একখণ্ড উৎকৃষ্ট মসলিন ডাঃ টেলার সাহেবের নিকট ছিল, তিনি লিখিয়াছেন বিশেষ সতর্কতা সহকারে উহা

পরিমাণ করিয়া ২০০ শত গজ দীর্ঘ সেই কাপড়খানি ওজনে ৫ গ্রেণ মাত্র হয়। মসলিনের প্রশংসা করিতে গিয়া উক্ত ডাক্তার বলিয়াছেন যে, "পুরুষপরম্পরাক্রমে মসলিন তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সমভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং বর্ত্তমান দিনে বিলাতে বস্ত্রবয়নশিল্প অশেষ উন্নতি লাভ করা সত্বেও মসলিনের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে এমত বস্ত্র অদ্যাপি-প্রস্তুত হয় নাই। সৌন্দর্য্য, স্বচ্ছত্ব, সূক্ষ্মত্বাদি গুণে পৃথিবীর যত প্রকার বয়নযন্ত্র আছে, তাহার নির্ম্মিত বস্ত্র অপেক্ষা ঢাকার মসলিন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। মসলিনের সূক্ষ্মতর বস্ত্রগুলি স্বদেশী কার্পাস দ্বারা প্রস্তুত করা হইত। ঐ প্রকার কার্পাস নিউ অর্লিন্‌স্ এর সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্পাস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। উহার আজ কাল ক্রেতার অভাব, এ জন্য ঐ কার্পাসের চাষও বন্ধ হইয়াছে। মিঃ ক্লে তৎপ্রণীত ঢাকার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, ১৮৬৭ অব্দে মসলিনের উৎপত্তি এত কমিয়া গিয়াছিল যে, বিশেষ আদেশ ব্যতীত ভাল মসলিন প্রস্তুত করাই হইত না।

১৮৫১ অব্দের প্রদর্শনীর বিবরণে অধ্যাপক কুপার সাহেব লিখিয়াছেন যে ইউরোপ প্রভৃতি দেশ হইতে প্রদর্শিত যাবতীয় বস্ত্র অপেক্ষা ঢাকার মসলিন অনেক উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ১৮৬২ অব্দের প্রদর্শনীতেও ঢাকাই তাঁতের উৎপন্ন দ্রব্যাদি "শিল্পের জয়চিহ্ন" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ভারতীয় সাইক্লোপিডিয়া নামক গ্রন্থ-প্রণেতা সার্জ্জন জেনেরাল এডওয়ার্ড বালফোর বলেন যে, ১৮৫১ অব্দের প্রদর্শনীর জন্য উত্তম ঢাকাই মসলিন সংগ্রহ করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং ১৮৬২ অব্দে উক্ত প্রকার উৎকৃষ্ট মসলিন প্রস্তুত করিতে পারে এমত শিল্পী এক ঘর মাত্র ছিল। লণ্ডনের শিল্পাগারে ২০ গজ দীর্ঘ ও ১ গজ প্রস্থ বস্ত্র রক্ষিত ছিল, তাহার ওজন ৭½ আউন্স মাত্র। বয়ন শিল্প (textile manufactures) নামক গ্রন্থের লেখক ডাঃ এফ, ওয়াটসন্ ঢাকাই কাপড়ের সহিত ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের বস্ত্রের তুলনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ঢাকার দ্রব্যগুলি অন্যান্য সমস্ত কাপড় অপেক্ষা অনেক উত্তম। বিশেষতঃ ঢাকায় সূত্র পাকাইয়া বয়িত হয় বলিয়া তন্নির্ম্মিত বস্ত্রাদি অধিকতর স্থায়ী হয়। ১৭৭৬ অব্দে মসলিনের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল, এক একখানি বস্ত্র ৬০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হইত। মিঃ ক্লে বলেন যে, জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময়ে একখানি "আবি-রাওয়ান" ৪০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হইত। মিসেস ম্যানিং লিখিয়াছেন যে, আওরঙ্গজেব বাদসাহের জন্য প্রস্তুত এক একখানি বস্ত্র ৩১ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হইত। ১৯০৫ অব্দের ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের সংস্করণ হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল। পুরাকালে ঢাকা ও শান্তিপুর সূক্ষ্ম মসলিনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই মসলিন ইউরোপে বিশেষতঃ ফ্রান্স দেশে

প্রভূত পরিমাণে রপ্তানী হইত। ১৮১৭ অব্দে কেবল ঢাকা হইতেই ১৫২০০০০১ এক কোটি বায়ান্ন লক্ষ টাকার মসলিন রপ্তানি হইয়াছিল। ভারত নির্ম্মিত সাধারণ বস্ত্রেরও ইউরোপে যথেষ্ট কাটতি হইত। ১৭০৬ অব্দে তন্তুবায়দিগকে কলিকাতার সন্নিহিত পল্লীতে বসবাস করাইবার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। ইউরোপে যন্ত্রবয়ন-শিল্পের উদ্ভাবনা দ্বারা কেবল যে ভারতের রপ্তানী বিনষ্ট হইয়াছে, এমত নহে, এ দেশ অল্প মূল্য বস্ত্রে ছাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে স্থানীয় শিল্পের যথেষ্ট সঙ্কোচ সাধিত হইয়াছে। দেশী বস্ত্র অধিক দিন স্থায়ী হয় এবং সুদূর পল্লীতে তন্তুবায়গণ এখনও জাতীয় ব্যবসায় চালাইয়া থাকে, এই ভাবে গৃহজাত শিল্পের আকারে বস্ত্র বয়ন এখনও চলিতেছে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে আর ঐ শিল্পের অস্তিত্ব দেখা যায় না। যে সমস্ত তন্তুবায় ঐ প্রকার ব্যবসা করে তাহারাও বিদেশনির্ম্মিত সূত্র দ্বারা বস্ত্র বয়ন করে মাত্র।

পরলোক-গত বন্ধু-প্রবর মুন্সি রহমন আলি তাঁহার তাবারিখ-ই-ঢাকা নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, কাপাসিয়া গ্রামে এবং তৎসন্নিহিত স্থানেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিত। উক্ত স্থানের নাম ইহারই প্রমাণ করিতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে মনে হইত যে ঢাকার বয়ন-শিল্পের লোপ অবশ্যম্ভাবী। ১৯০৮ অব্দে সিলংএ প্রকাশিত মিঃ জে, এন গুপ্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের শিল্প-বিষয়ক সরকারি বিবরণে সন্নিবিষ্ট কয়েকটি মন্তব্য, ঢাকাই মসলিন জগতের সর্ব্বত্র পুনরায় আদৃত হউক এই ইচ্ছা যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের প্রাণে আশার একটি ক্ষীণ রশ্মির উন্মেষ করাইয়া দেয়, উক্ত বিবরণে লিখিত হইয়াছে যে, এই প্রদেশের সর্ব্বপ্রধান শিল্পটির অধোগমনের বেগ যেন নিবারিত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রই মৃদু উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। মিঃ কামিং অল্পদিন হইল লিখিয়াছেন, "গত ২ বৎসরের স্বদেশী আন্দোলনে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপন্ন বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি দেখিতেছি যে, প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগের তন্তুবায়গণের ইহাতে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। যে সমস্ত ব্যক্তি বহুকাল তাহাদের জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা সেই সেই ব্যবসা পুনর্গ্রহণ করিয়াছে।" মিঃ চ্যাটারটন মান্দ্রাজেও ঠিক ইহাই দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি বলেন 'হস্ত-পরিচালিত তাঁতের দিকে যে লোকের এত দৃষ্টি পড়িয়াছে, স্বদেশী আন্দোলনই তাহার মূল। নূতন রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্যই অনেক হস্তপরিচালিত তাঁতের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে।"

পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রধান বস্ত্রবয়ন শিল্পের কেন্দ্রগুলিতেও যে বয়নশিল্পের পুনরায় প্রচলন পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহা বড়ই আনন্দের কথা।

বাগানের মাসিক কার্য্য

অগ্রহায়ণ মাস

সব্জীবাগান।—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেষ হইয়া গিয়াছে। সীম, মটর, মূলা প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে। যদি কার্ত্তিকের শেষেও মটর, মূলা, বিলাতি সীম, বোনার কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাবী জাতীয় উক্ত প্রকারের বীজ এই মাসেও বোনা যাইতে পারে। নাবী আলু অর্থাৎ নৈনিতাল, বোম্বাই প্রভৃতি এই সময় বসান যাইতে পারে। পটল চাষের সময় এখনও যায় নাই। শীতপ্রধান দেশে কিম্বা যথায় জমিতে রস অধিক দিন থাকে—যথা উত্তর-আসামে বা হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এই মাস পর্য্যন্ত বাঁধাকপি, ফুলকপি বীজ বোনা যায়। নিম্নবঙ্গে কপি চারা ক্ষেত্রে বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

দেশী সব্জী।—বেগুন, শাকাদি, তরমুজ, লঙ্কা, ভুঁই শসা, লাউ, কুমড়া, যাহার চৈত্র বৈশাখ মাসে ফল হইবে তাহা এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি আঁশ জমিতে যেখানে অধিক দিন জমিতে রস থাকে তথায় তরমুজ বসাইতে হয়।

ফুলের বাগান।—হলিহক, পিঙ্ক, মিগ্নোনেট, ভার্বিনা, ক্রিসন্থিমম, ফ্লক্স, পিটুনিয়া ন্যাষ্টারসম, স্থইটপী ও অন্যান্য মরসুমী ফুল বীজ বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল হওয়া অসম্ভব হইবে। যে সকল মরসুমী ফুলের বীজের চারা তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার চারা এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হইবে বা টবে বসাইয়া দিতে হইবে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে যে সকল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নুতন মাটি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদি না হইয়া থাকে তবে এ মাসে উক্ত কার্য্য আর ফেলিয়া রাখা হইবে না, পাঁকমাটি চুর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবর সার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে অধিক ফুল ফল প্রসব করে।

কৃষি-ক্ষেত্রে।—মুগ, মসুর, গম, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ যদি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া না থাকে, তবে এমাসের প্রথমেই শেষ করা কর্ত্তব্য। একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া বরং ভাল, তাহাতে ষোল আনা না হউক কতক পরিমাণে ফসল হইবেই। পশুখাদ্যের মধ্যে মাঙ্গোল্ড বীটের আবাদ এখনও করা যাইতে পারে। কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়ায় ও নব রোপিত বৃক্ষের নিয়ে

আইল বান্ধিয়া দেওয়া এ মাসেও চলিতে পারে। যব, যই, মুগ, কলাই, মটর এই সকল রবি শস্যের বীজ বপন এবং পরে গমের বীজ বপন ; আলু ও বিলাতি সব্জীর বীজ লাগান এ মাসেও চলিতে পারে ; কপির চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাদের তদ্বির করাই এখন কার্য্য। তরমুজ ও খরমুজের বীজ বপন ; মূলা, বীট, কুমড়া, লাউ, শসা, পেঁয়াজ ও বরবটীর বীজ বপন করা হইয়াছে ঐ সকল ক্ষেত্রে কোদালী দ্বারা ইহাদের গোড়া আল্গা করিয়া দেওয়া ; আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে ; বিলাতী সব্জীর চাঁটিতে জল সিঞ্চন, প্রাতে বেলা ৯টার সময় উহাদের আবরণ দিয়া সন্ধ্যায় আবরণ খুলিয়া দেওয়া ; বার্ত্তাকু, কার্পাস ও লঙ্কা চয়ন ও বিক্রয় ; ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল সেচন ও কোপান এই সময়ের কার্য্য।

গোলাপের পাইট।—কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর বাকি রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনার সময় কাটিয়াছে। কালী পূজার পর ঐ কার্য্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিম ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, "ডাল কাটা" কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায় এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, সেই গুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিতে হয়। টীগোলাপ খুব ঘেঁসিয়া ছাঁটিতে হয় না। মারসাল নীল প্রভৃতি লতানীয়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরাতন ডাল বা শুষ্কপ্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটার সঙ্গে সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যক মত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সার দিতে হয়। জমি নিরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় পোড়ামাটি, সরিষার খৈল, গোমূত্র ও অল্প পরিমাণে এঁটেল মাটি একত্র পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। সার-জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে। গুঁড়া সার সরিষার খৈল এক ভাগ, পচা গোময় সার এক ভাগ, পোড়ামাটি এক ভাগ এবং এঁটেল মাটি দুই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে সিকি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত এই সার দিতে হয়। ঐ মিশ্র সারে একটু ভুষা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভুষা কালকাতার বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ড মিশ্র সারে এক পেকেট ভুষা যথেষ্ট, ভুষা দিলে গোলাপের রঙ বেশ ভাল হয়। পাকা ছাদের রাবিশের গুঁড়া কিঞ্চিৎ, অভাবে পোড়ামাটি ও গুঁড়া চুণ সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া লইলে গাছে ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

পঞ্চদশ খণ্ড,—৮ম সংখ্যা

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্

অগ্রহায়ণ, ১৩২১

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶৹ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

KRISHAK

Under the Patronage of the Governments of Bengal and E. B. and Assam.

THE ONLY POPULAR PAPER OF BENGAL

Devoted to Gardening and Agriculture Subscribed by Agriculturists, Amateur-gardeners, Native and Government States and has the largest circulation. It reaches 1000 such people who have ample money to buy goods.

Rates of Advertising.

1 Full page Rs. 3-8. 1 Column Rs. 2.
½ Column Rs 1-8

MANAGER—"KRISHAK."
162, Bowbazar Street, Calcutta

কৃষক।

সূচীপত্র।

অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

বিষয়। — পত্রাঙ্ক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ খণ্ড। | অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

পেঁপে।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায় লিখিত

মফঃস্বলে অনায়াসলব্ধ আর একটী তরকারি উৎপন্ন হয়, সেটা আমাদের পেঁপে। পেঁপে সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানের সাবকাশ ঘটে নাই তবে আমার নিজের বহুদর্শিতায় পেঁপের কথা যতটুকু অবগত আছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। সম্ভবতঃ ভারত মহাসাগরস্থ পপুয়া দ্বীপ হইতেই এই স্বনামধন্য মহোপকারী পেঁপে ফল সর্ব্ব প্রথমে ভারতে আসিয়াছিল। সেখানে Brid of Poradise র ইহা অতীব প্রিয় খাদ্য। পেঁপে রাঁধুনীর তরকারি, বৈদ্যের ঔষধ, বড়লোকের জলখাবার ; আর ডাক্তার দিগের সবে ধন নীলমণি। যেমন কুইনাইন, পেঁপেও গৃহস্থের পক্ষে সেইরূপ। কাঁচায় পাকায় ডাঁসায় ইহাকে সংসারের যে দিকে লাগাও সেই কুল রক্ষা করিয়া থাকে। এই যে মূল্যবান পেঁপে, যাহা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, বিকৃত লিবার, কোষ্টবদ্ধ বঙ্গবাসীর আহার ঔষধের জন্য স্বল্প যত্নে বাঙ্গালার আগানে বাগানে পুকুর পাড়ে ঘরের কানাচে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে ইহাকে কি কেহ প্রকৃত যত্ন করিতে শিখিয়াছে, কখনই নয়! সহরের আকর্ষণে তন্নিকটবর্ত্তী পল্লী সমূহে আজ কাল পেঁপে গাছের যত্ন দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কয়েক বিঘা জমি লইয়া পেঁপে গাছের উপযুক্ত আবাদ খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। কলিকাতায় যে পেঁপেটী ।৵০ আনা দামে বিক্রী হয় মফঃস্বলের অনেক স্থানে অমন সুন্দর সুন্দর টুকটুকে রাঙ্গা পাকা ফল হয়ত কাকে খাইয়া যাইতেছে গৃহস্থ সে দিকে লক্ষ্য করিবারও সাবকাশ পায় না, অর্থাৎ এমন অনেক গৃহস্থ দেখিয়াছি সে পেঁপে ফলের প্রতি বাস্তবিকই এইরূপ উদাসীন থাকে। বাঙ্গালার মফঃস্বলে পেঁপে গাছের আবাদ অনেকটা নিম্ন প্রকারে সমাধা হইয়া থাকে,—হয়ত গৃহস্থের ছেলেপিলে পাকা পেঁপে খাইয়া পেঁপের বীচিগুলি

আঙ্গিনার পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়াছে সেখানে কতকগুলি চারা জন্মাইল, গৃহস্থ বর্ষাকালে বাকীগুলি মারিয়া দিয়া বড়টী রাখিয়া দিল, অযত্নে পালিত গাছটী ফলবান হইয়া যাহা ফল দিল গৃহস্থের তাহাই লাভ হইল। ইহার আর কোন পাইট বা তদ্বির করিবার আবশ্যক হইল না। হয়ত বাড়ির কর্ত্তা ফাল্গুন, চৈত্রে কতকগুলি পেঁপের বীজ বেড়ার ধারে ঘাসের ভিতর ছড়াইয়া রাখিল, বর্ষাকালে চারা বাহির হইলে কতকগুলি সেই আদাড়েই থাকিল, বাকীগুলি কোন সব্জি ক্ষেতের পগারে, বাড়ির কানাচে, আওতায়, আঁস্তাকুড়ে, যেখানে ছায়ায় কোন ফসল হইবার সম্ভব নাই সেই স্থানেই পুতিয়া দিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এত অনাদরেও পেঁপে গাছ বাঙ্গালার মাটীতে প্রচুর ফল প্রদান করিয়া থাকে বটে, তবে সে ফল সুমিষ্ট, পুষ্টও বড় হয় না। যাহারা ভাল তরকারির কৃষাণ, বাজার, হাটে শাক সব্জি বিক্রয় করিয়া থাকে তাহারা কলাবাগানে কলা ঝাড়ের আওতায় প্রায়ই পেঁপে রোপণ করিয়া থাকে, মোট কথা পাড়াগাঁয়ের অনেক স্থানে পেঁপেকে এত তুচ্ছ জ্ঞানে আবাদ করা হয় যে, যে জমিতে কখনও কোন ফসল জন্মিবার সম্ভব থাকে না সেই স্থানেই এই দেবদুর্ল্লভ পেঁপের জন্ম স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, আর সেই জন্যই আমরা প্রায়ই নেবু গাছের পাশে, কলাঝাড়ের আড়ে, রান্নাঘরের পাশে, কচার বেড়ার গায়ে পেঁপে গাছকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল ভারে ক্ষীণশীর্ষকে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া থাকি। নারিকেল গাছের ন্যায় পেঁপে গাছে বারমাসই ফল ধরিয়া থাকে, ইহাতে জল সেচনেরও বিশেষ কোন আবশ্যক করে না সেই জন্যই বুঝি বাঙ্গালায় পেঁপে গাছের এত হতাদর। পেঁপে যদি বিলাতী ফল হইত পশ্চিমদেশ হইতে ভারতে আসিত, তাহা হইলে আলু, টমাটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির ন্যায় ইহাকে বাজার হাটে আদর করিতে এক দিনও পরাঙ্মুখ হইতাম না। গুণের তুলনায় পেঁপে ফলের মত আর কোন ফল (নারিকেল ব্যতিত) ভারতে আছে কি না সন্দেহ। যেমন দুই একটী পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনে ব্যাধি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় গরুহারাণরও অনুসন্ধান মিলিয়া থাকে, রোগীর পথ্য সম্বন্ধে পেঁপেকেও সেই স্থানীয় বলিলে কোনও অত্যুক্তি হয় না, কারণ এমন কোন রোগই প্রায় নাই যাহাতে পেঁপে অব্যবস্থেয় হইতে পারে। পেপসিন নামক উপকারি ঔষধটী কেবল জীব দেহ হইতে পাওয়া যায়, আর উদ্ভিজ্যের মধ্যে এক মাত্র পেঁপে হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। পেটের দোষ সম্বন্ধীয় যে কত প্রকার বিলাতী পেটেণ্ট ঔষধ পেঁপে হইতে তৈয়ার হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পেঁপে গাছের ডাঁটায় ছেলেপিলে বাঁশী করে। তদ্বির করিয়া প্রস্তুত করিতে পারিলে পেঁপের কাঠে খুব পাতলা সহজ দাহ্য কয়লাও প্রস্তুত হইয়া থাকে। পেঁপে সিদ্ধ অর্শ, শোথ ও লিবারগ্রস্থ রোগীর প্রধান খাদ্য। পেঁপে বীজ কৃমি নিঃসারক।

পেঁপেফলে পেপসিন আছে বলিয়া শ্বেতসার ভোজী ভারতবাসী, যাহাদের অজীর্ণ ও অম্ল হয়, ভাল হজম হয় না, গন্ধঢেকুর উঠে, পেটভার হয়, ভুট ভাট করে তাহারা যদি দুই বেলা আহারের পর দশ ফোঁটা করিয়া পেঁপের আটা বাতাসার ভিতর ফেলিয়া খাইতে পারেন ত তিন দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই অমন কঠিন ব্যাধির বার আনা উপশম হইয়া যায়, দীর্ঘ দিন ব্যবহারে রোগ সম্পূর্ণ আরাম হইয়া থাকে।

যেমন আমাদের দেশে শসা ও কাঁকুড়ের বিবিধ তরকারি হইয়া থাকে পেঁপেরও ঠিক সেইরূপ তরকারি হয়। প্রায়ই অনেকে পেঁপের ডাল্‌নাকে কাঁকুড়ের ডাল্‌না বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। ইহা যেমন বিধবার খাদ্য তরকারি তেমনি আমিষ ভোজীর, কারণ ইহার দ্বারা আমিষ ও নিরামিষ বিবিধ ব্যঞ্জন ও অম্বল রান্না হইয়া থাকে। অনেকে অরুচির জন্য অসময়ে স'ল মাছ দিয়া কাঁচা আমের ঝোল খাইয়া থাকেন, সেটা পেঁপে ছাড়া অন্য কিছুই নহে কারণ অসময়ে কচি আম মিলান মফঃস্বলে সহজ নহে। সরিষার ফোড়ণ দিয়া পেঁপে ও মাছের টক রাঁধিয়া আমাদার রস দিয়া নামাইয়া লইলেই অসময়ের আমের ঝোল তৈয়ার হইয়া গেল, প্রকাশ না করিলে প্রকৃত রহস্য কেহই বুঝিতে পারে না, আমাদা দিয়া কচি পেঁপের টক এত সুগন্ধী, এত মুখ রোচক যে, চৈত্র, বৈশাখ মাসের কচি আম দিয়া প্রকৃত স'ল মাছের ঝোলও ইহার নিকট স্থান পায় না। পেঁপের ও মাছের ডাল্‌নার কথা আর অধিক কি বলিব জ্যৈষ্ঠ আষাড় মাসে যেমন কাঁকুড় মাছ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সকলেই আস্বাদ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন, ইচ্ছা করিলে বার মাসই পেঁপে মাছের ডাল্‌না সেই ভাবে রান্না করিয়া খাইতে পারেন। কাঁকুড়ের তরকারি অপেক্ষা পেঁপের তরকারি সহস্র গুণে ভাল ও উপকারী। আবার পেঁপে গৃহস্থের অসময়ের কাণ্ডারী। যে গৃহস্থের গোলায় ধান থাকিল, গোয়ালে গাই থাকিল, গাছে নারিকেল ফলিল, পেঁপে গাছে ফল ধরিল, বেড়ায় ডুমুর গাছ রহিল, পুকুরে মাছ থাকিল সে ত সংসারে সৌভাগ্যবান পুরুষ, সেই ত প্রকৃত দেশের রাজা। অতিথি অভ্যাগতকে সে যেরূপ অসময়ে অভ্যর্থনা করিতে পারিবে, নিঃঝঞ্ঝাটে সংসার চালাইতে পারিবে সেরূপ কোন বড় লোকেও পারে কিনা সন্দেহ, সেই জন্য পল্লী কথায় ছড়াদারে গাহিয়া থাকে—

"যার ডুমুর গুলে বেড়া ভরা পেঁপে ঝুলে গাছে,
আর গো, নেরেলে পুকুর পাড় আলোকরে আছে ;
ওগো গৈলে থাকে কুম্‌লে বাছুর, পুকুরেতে পোনা,
ও সে রাজা রাজ্‌ড়ার ঠাকুর দাদা, তুচ্ছ যে তার সোণা।
ও ভবের জীবন এই—গাঁয়ের জীবন এই ইত্যাদি"—

পেঁপে কাঁচায় অম্বল, ডাঁসায় ডাল্‌না, পাকায় জল খাবার, রোগীর পথ্য। পাকা পেঁপে কিরূপ মুখ প্রিয়, কিরূপ অম্ল নাশক দাস্ত পরিষ্কারক তাহা বোধকরি এই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বঙ্গবাসীকে আর বেশী করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। গৃহস্থকে পেঁপে, নারিকেল, ডুমুর ও গরু, পুত্রের মতন প্রতিপালন করিবার যেরূপ আবশ্যক সেরূপ অন্য কিছুরই নহে।

পেঁপে গাছ এক বৎসরেই সাবালক হইয়া থাকে ৩.৪ বৎসর পুষ্ট হয় ও ফল দান করিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়। অতঃপর ফল খুব ক্ষুদ্র ও গাছের মাথা ক্রমশঃ সরু হইয়া গাছ মরিয়া যায়। আবার বুড়া গাছের মাজা পাড়িয়া কাটিয়া দিলে গাছ হইতে নূতন ডাল বাহির হইয়া ফল ধরিয়া থাকে কিন্তু সে ফল নিতান্ত ক্ষুদ্র হয় ও তত স্বাদ থাকে না। কোন কোন পেঁপেগাছে প্রথম হইতেই লম্বা ডাঁটাওয়ালা ফুল ধরিতে আরম্ভ হয়। সেই সব ফুলে আমড়ার মতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেঁপে ধরিয়া ঝরিয়া যায়, তাহাকে মরদা বা বাঁজা গাছ কহিয়া থাকে। মরদা গাছে ফুল ধরিলে তখনি সমস্ত ফুল ভাঙ্গিয়া দিলে ও গাছের মাথা কাটিয়া ফেলিলে নূতন ডালে ভাল ফল ধরিয়া থাকে।

দোয়াঁস জমিতে কিম্বা ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক আঠাল দোয়াঁস জমিতে পেঁপের আবাদ খুব ভাল হইয়া থাকে। মোটের উপর এইটুকু জানিয়া রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে, যে জমিতে কলা বাগান ভাল হইয়া থাকে সেই জমিতে পেঁপে গাছও উত্তম তেজাল হয় এবং ফল বৃহৎ ও সুস্বাদু হইয়া থাকে। পেঁপেগাছ মাথার সমান উচু হইলে গাছের মাথা কাটিয়া মাথায় এক তাল গোবর দিয়া রাখিলে গুঁড়ির চারিধার হইতে নূতন ডাল বাহির হইয়া গাছটী দেখিতে বেশ ঝোপ্‌সা হইয়া পড়ে এবং প্রতি ডালে বেশ বড় বড় অনেক পেঁপে ধরিয়া থাকে। এইরূপে পেঁপেগাছের পাইট করিলে গাছ দীর্ঘ দিন সুফল প্রসব করিয়া থাকে, গাছ লম্বা হইয়া পড়ে না, ফল পাড়িবার বিশেষ সুবিধা হয়। ইচ্ছামত ছোট ছোট ফল ভাঙ্গিয়া দিলে বাকী ফল বেশ বড় হইয়া পড়ে।

পেঁপে গাছে থাকে থাকে অজস্র ফল ধরে, পেঁপের ব্যবসা করিতে হইলে এই সমস্ত ফল ভাঙ্গিয়া ফল পাতলা করিয়া না দিলে ফল বড় হয় না ও দরে বিক্রী হয় না। আমাদের গ্রামের সন্নিকটে ইচ্ছামতী নদীতীরে সজী ক্ষেতওয়াল এক জন অবস্থাপন্ন কাপালি দেড় বিঘা জমিতে কেবল পেঁপের চাষ করিয়া দুই বৎসর মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া আয় করিয়াছিল। মোটের উপর মফঃস্বলে বেগুন, আলু, পটল, কলা, কপির ন্যায় পেঁপেরও পৃথক আবাদ হওয়া উচিত। ডাঁসা পেঁপে কলিকাতায় চালান দিলে নষ্ট হইবার সম্ভব থাকে না, পাইকারী দরে বিক্রী হইতে পারে। দিন দিন সহরে কলার মোচা ও পাকা

পেঁপের মূল্য অসম্ভব বাড়িয়া উঠিতেছে। প্রকৃত গাছপাকা পেঁপে সহরে মেলা অসম্ভব।

আদাড়ে, বিদাড়ে, পুকুর পাবায় পেঁপে গাছ না পুতিয়া ভাল রোদ বাতাসে খোলা জায়গায় ভাল জমিতে অল্পবিস্তর পেঁপের আবাদ করা প্রত্যেক গৃহস্থেরই একান্ত কর্ত্তব্য। ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় ভারতের পাহাড়ি মাটীতেও পেঁপে সুমিষ্ট হয় ও বৃহদাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ছোটনাগপুরের কঙ্করাবৃত পাহাড়ে রাঙ্গা মাটীতে ছোট ছোট পেঁপে গাছে প্রকাণ্ড কুমড়ার মতন পেঁপে দেখিলে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িতে হয়। আমরা সেবার রাঁচিতে এত বড় একটী প্রকাণ্ড পেঁপে খরিদ করিয়া ছিলাম, যে পেঁপেটীকে বাসার সকলেই মিষ্টি কুমড়া (সুর্য্যিকুমড়া) বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। বাস্তবিক রাঁচির পেঁপে ও আমাদের দেশের বিলাতী কুমড়ার আকারে কোন পার্থক্য নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অত বড় পেঁপের ভিতর একটী বীজ ছিল না। আমরা প্রায়ই বৃহৎ বৃহৎ পেঁপে খরিদ করিতাম কিন্তু কচিৎ কোনটীর মধ্যে ২।৩টী করিয়া বীজ পাওয়া যাইত। আমরা অতি যত্নে অনেক গুলি বীজ সংগ্রহ করিয়া দেশে আনিয়াছিলাম, গাছও হইয়াছিল কিন্তু আকারে তাহার পূর্ব্ব পুরুষের আট ভাগের এক ভাগ মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহা ফলিয়াছিল তাহাও এদেশের পেঁপে অপেক্ষা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এমন সুন্দর ফল ক্রমশঃ পরের জেনারেসানে আমাদের দেশী পেঁপের দেহ প্রাপ্ত হইয়া পড়িল এবং ভিতরও বীজ পূর্ণ হইয়া উঠিল।

মহুয়া

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী লিখিত

ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগণা জেলা সমূহের চারি দিকেই কেবল মহুয়া, শাল, এবং অন্যান্য শক্ত মূল্যবান্ গুঁড়ি বিশিষ্ট বৃক্ষের জঙ্গলেই পরিপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশের ন্যায় এদেশে এখনও জ্বালানী কাষ্ঠাদির অভাব হয় নাই। সত্যবাদী সাঁওতাল রমণীগণ, বহুদূরস্থ জঙ্গল হইতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে মোটা মোটা শাল, মহুয়া, শিশু, কাঠের তাড়ি বাঁধিয়া সহর অভিমুখে দলে দলে বিক্রয়ার্থ আনিয়া থাকে। ইহাদের পুরুষেরা প্রায়ই গৃহকার্য্য এবং চাষ বাসে নিযুক্ত থাকে। আর স্ত্রী লোকেরা কাষ্ঠের তাড়ি ও গো মেষাদির ঘাস কাটিয়া লইয়া সহরবাসী গৃহস্থের নিকট বেচিয়া, সাংসারিক আবশ্যকীয় খাদ্যাদি বাজার হইতে খরিদ করিয়া লইয়া যায়।

২। এদেশের কঠিন ভূমিতে উক্ত গাছের কোনপ্রকার বীজ বপন বা চাষ আবাদ করিতে হয় না। আপনা আপনিই, কেওড়ার শূলার ন্যায় শিকড় চালাইয়া মাটী ভেদ করিয়া, চারা জন্মাইয়া জঙ্গলে পরিণত হয়। এই গাছ গুলি দেখিলে, প্রথমতঃ অতি অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু ইহার অনেক গুণ আছে। ঈশ্বর যে দেশে, যে লোকের বাসস্থান করিয়াছেন, সেই দেশে তদ্রূপ খাদ্যাদিরও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। আমাদের ভারতবর্ষই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। এ দেশে, বিভিন্ন বিভাগে বা উপবিভাগে, বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুতে, বিভিন্ন প্রকার মানুষের আকৃতি, প্রকৃতি ও খাদ্যের সংস্থান করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং যে কোন বিষয় বর্ণনা করিবার পূর্ব্বেই ভগবানের গুণগান না করিয়া থাকা যায় না।

৩। এই গাছ ইচ্ছা করিয়াও কেহ কেহ বাঙ্গালা দেশের রাস্তা ঘাট সাজাইবার জন্য দুই চারিটি রোপণ করিয়া থাকেন। ইহা আম্র, কাঁঠাল গাছের ন্যায় গুঁড়ি বিশিষ্ট, গাঢ় সবুজবর্ণ পাতাওয়ালা বৃক্ষ। একটি একটি গুঁড়িতে ১ বা ২ ইঞ্চি দলের ১৫।১৬ খানি করিয়া তক্তা প্রস্তুত হয়। এই তক্তার, জানালা, দরজা, তক্তাপোষ, বেঞ্চ, জলচৌকি, প্রভৃতি গৃহ কার্য্যের নানাবিধ আবশ্যকীয় গৃহসজ্জা প্রস্তুত হয়। ডাল পালায় জ্বালানি কাষ্ঠ হয়। দুই চারিটি পাতা একত্রে শেলাই করিয়া দোকানদারেরা জিনিষ পত্রাদি বিক্রয় করে। এ দেশে কলার পাতার সম্পূর্ণ অভাব বশতঃ এই সকল পাতাই ব্যবহৃত হয়। পাতাগুলি বেশ পুরু এবং কাঁঠাল পাতা অপেক্ষা অনেক লম্বা এ দেশ হইতে শাল পাতা দুই চারিটা একত্রে শেলাই করিয়া (১০০) একশত হারে তাড়ি বাঁধিয়া, মালগাড়িতে চালান হইয়া কলিকাতার বাজারে বেশ ব্যবসায় চলে। আমি বাঙ্গালা দেশের অতি দূরবর্ত্তী পল্লীবাসী দোকানেও, আজ কাল শালপাতায় লবণ, চিনি, মসলা বাঁধিয়া বিক্রয় করিতে দেখিয়াছি। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, পাটের আবাদের দৌলতে, চাষীরা, কলার বাগান পর্য্যন্তও তুলিয়া দিয়া কদলী পাতারও অভাব আনিয়া ফেলিয়াছে। অতএব অনায়াস লব্ধ শাল পাতা ভিন্ন উপায় নাই, মহুয়া পাতাও ঐরূপ কার্য্যে লাগান যাইতে পারে।

৪। বসন্তকালেই মহুয়া, শাল প্রভৃতি বৃক্ষের ফুল ফল জন্মে। ইহাদের ফুল বা মহুয়া গুলি দেখিতে হরিদ্রাভ শ্বেতবর্ণ গুটী গুটী এবং অতি সুন্দর। ফুল ফুটিলে, জাপানের চেরি ফুলের ন্যায় মাঠময় ধবলবর্ণে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারের এক অপূর্ব্ব দৃশ্য শোভা ফুটিয়া উঠে। বাঙ্গালার ন্যায় এ দেশ তত জনাকীর্ণ কোলাহলময় নহে। সুতরাং এই সকল নির্জ্জন, শান্তিময় স্থানের শোভা দর্শনে ভাবুক পরিব্রাজকদিগের অন্তরে অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বর মহিমায় উল্লাসিত করিয়া তুলে।

ফাল্গুন, চৈত্র মাসে, মহুয়া ফুল খাইবার জন্য ভীষণ আকার ভালুকেরা, রাত্রিতে নিকটস্থ পাহাড়ের গুহা হইতে মহুয়া তলায় নামিয়া আইসে। ভালুকেরা এই ফুল ফল খাইতে বড়ই ভাল বাসে। কিন্তু নির্ভীক বলবান, ভীল, কোল্, সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীগণ, কাষ্ঠে আগুন ধরাইয়া এই সকল ফুল ফল কুড়াইতে যায়। হিংস্র জন্তু, আগুনকে বড়ই ভয় করে। সুতরাং দূর হইতে অগ্নি দর্শনে ভয় পাইয়া, পলাইয়া যায়, আর মানুষে সুযোগ বুঝিয়া মহুয়ার ফুল ফল সংগ্রহ করিয়া লয়। মহুয়ার ফুলে অত্যন্ত মধু থাকে। সুন্দরবনে যেমন এই সময়, সুন্দরী, পশুর, গেঁও, কেওড়া গাছের ফুলের মধুপান করিয়া, মধুকরেরা বড় বড় মৌচাক বাঁধে; পশ্চিম দেশেও তদ্রূপ উন্মত্ত-মধুলোভী, মধুপগণ মধু খাইয়া, জঙ্গলে, বড় বড় চাক্ বাঁধিয়া থাকে। এই ফুলে অত্যন্ত বেশী মধু হয়। যদি কোন বঙ্গবাসী, বসন্ত-কালের রাত্রি শেষে, মহুয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া স্থানান্তরে গিয়া থাকেন, তবে তিনিই সম্যক রূপে, প্রকৃতির এই নির্জ্জন, শান্তিময়, বৃক্ষ বাটিকার প্রশান্ত মূর্ত্তিময়ী, শোভা দেখিয়া উন্মত্ত মধু লোভীর মনোহারিণী গুণ গুণ রবে, মধুকরের প্রাণ মাতান ঝঙ্কার শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

৫। ফুল ফল এদেশের লোকের অনেক কাজে লাগে। সাঁওতাল জাতিরা, এইভাবে ভালুক তাড়াইয়া, টুক্রী বোঝাই করিয়া, ফুল ফল সংগ্রহ করিয়া, নিজ নিজ কুটীর বোঝাই করিয়া রাখে। পরে, ফুল বা মৌয়া পাড়া শেষে হইলে, তখন ইহা রৌদ্রে শুকাইয়া বর্ষাকালের খাদ্য ও তেল তৈয়ারি করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। মহুয়ার মধু পানে, সামান্য নেশা বোধ হয়। কিন্তু ইহা অতিশয় সুমিষ্ট। ইহার ফুলের বোঁটা গুলি এত নরম যে, ভোরের বেলা গাছের তলা দিয়া গেলে মহুয়া তলায় রাত্রি শেষে শিলা বৃষ্টি হইয়া, ছোট ছোট শিল পড়িয়া গাছের তলা বিছাইয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

৬। খাদ্যের ব্যবহার—ফুল বা মহুয়াকে উত্তমরূপে শুকাইয়া ডাউল ভাঙ্গার ন্যায় ভাঙ্গিয়া দেখিলে ফুলের পাপ্ড়িগুলি পৃথক হইয়া এক একটী মটরের ডাউলের ন্যায় ডাউল বাহির হয়। উহা দেখিতে ঠিক্ শাদামটরের মতন হয়। সাঁওতাল, ভীল, কোলেরা ভাতের অভাব হইলে, উহা যাঁতায় ভাঁঙ্গিয়া চাউলের ক্ষুদ্ বা কুঁড়ার সহিত ভিজাইয়া বাটিয়া আটার রুটীর ন্যায় রুটি প্রস্তুত করিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাকে ইহাদের প্রধান খাদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গরিব হিন্দুস্থানীরাও ইহা খাইয়া অনেক সময় জীবন ধারণ করে। দ্বিতীয়তঃ এই মহুয়াকে চানা বা ছোলার সহিত দুই তিন ঘণ্টা একত্রে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে অল্প জলে পেঁয়াজ বা রশুনের কুচির সহিত ভাজিয়া লঙ্কা ঝাল সহযোগে, তরকারি রূপে ভাত দিয়া ভোজন করে। ছোলার সহিত যাঁতায় পিসিয়া ছাতু

করিয়াও খাইয়া থাকে। ইহাতে শরীরে খুব রক্ত ও শক্তি বৃদ্ধি করে। পিষ্ট মহুয়ার ফুল, খইলের ন্যায় জলে ভিজাইয়া গো, মহিষাদি গৃহপালিত পশুকে খাইতে দেয় ইহাতে দুগ্ধের পরিমাণ বেশী হয় এবং গাভী বলবান হয়। এই চূর্ণীকৃত মহুয়া বাজার দর অনুসারে প্রতি মণ ꣲ৶৹ আনা হইতে ১৲ পর্য্যন্ত। পাপ্‌ড়ি চূর্ণ আবার ফসলের সাররূপে ক্ষেতে দেয়। গৃহপালিত পশুদের খাদ্য ভূসী রূপে, পাটনা, গয়া, ভাগলপুরের গৃহস্থেরা ꣲ৶৹, ৸৹ আনা মণদরে খরিদ করিয়া লইয়া যায়।

৭। মহুয়া ফুল ঝরিয়া পড়া শেষ হইলে মহুয়া গাছে, শিশুফল বা ছোট ছোট পটলের ন্যায় ফল জন্মায়। তখন গাছের পুরাতন পাতা সমুদায় ঝরিয়া গিয়া নূতন কচি কচি পাতা জন্মায়। এই ফল বৈশাখ মাসের মধ্যেই পাকিয়া উঠে। পরে, এদেশীয় তেঁতুল পাড়ার ন্যায় আঁকুশী দ্বারা ক্ষেতোয়ানেরা ঐ পরিপক্ব ফল, গাছ হইতে পাড়িয়া লইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া উহার মধ্যস্থ কাঁটাল দানার ন্যায় মোটা মোটা ফলগুলি পৃথক করিয়া লইয়া তেলের জন্য জমা করিয়া রাখে, আর ফলের খোসাচূর্ণ পূর্ব্বোক্ত রূপে ভূসীর ন্যায় বাজার দরে পশু খাদ্যের জন্য বিক্রয় করিয়া ফেলে এবং নিজ ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দেয়। সুতরাং মহুয়া গাছ হইতে একেবারে লোকেরা দুইটী ফসল পায়।

৮। তেল প্রস্তুত—অতঃপর ফলগুলিকে, প্রথমতঃ বড় বড় গামলায় দুই একদিন পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া সর্ষপ তৈলের ঘানি গাছের ন্যায় একপ্রকার ঘানি গাছে ঐ ভিজান ফল চড়াইয়া দিয়া তেল বাহির করিয়া লয়। এই ফল পরিপক্ব হইলে অধিক পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়, আর কাঁচা ফল হইলে তেলের পরিমাণ কম হয়। সুতারাং অধিকাংশ লোকেই সুপরিপক্ব ফল হইতে বেশী পরিমাণে তেল প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করে। পরিপক্ব বীজের ১৲ এক মণ ফল হইতে প্রায় ১৬ ১৭ সের তেল পাওয়া যায়। আর অর্দ্ধেক পরিমাণে খইল হয়। এই তেলের তরল অবস্থায় তিক্তাস্বাদযুক্ত, কিন্তু ঐ তেলকে পুনরায় মাখন হইতে ঘৃত প্রস্তুতের ন্যায় জ্বালাইয়া জলীয়াংশ বাদ দিলে শাদা বর্ণ গাওয়া ঘৃতবৎ জমাটি বাধিয়া উঠে। তখন আর উহাতে তিক্তাস্বাদ বোধ হয় না। সেই জমাটি বাঁধা তেল চীনের বাদামের তেলের সহিত ভাঁজাল দিয়া এবং অল্প চর্ব্বি মিশাইয়া, আজিকালি, খারাপ ঘৃত বলিয়া বিক্রিত হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। এই শ্বেতবর্ণ তেল বাজার দর অনুসারে টাকায় ৴৪, সের ৴৪ꣲ সের হিসাবে বিক্রিত হয়। আর তেলের তরলাবস্থার অংশটা সাঁওতালদের নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দেয়। জমাট বাঁধা ঘৃত অংশ, ইহারা ব্যঞ্জনাদিতে দিয়া খায়। খৈল পূর্ব্ববৎ গৃহপালিত পশুতেই খাইয়া থাকে এবং আলু, কপি, আক এবং অন্যান্য শাক সব্জীর সারের জন্য

বিভিন্ন দেশে চলিয়া যায়। টাট্‌কা মহুয়া তৈলে ভাজা লুচী, পরেটা খাওয়া ঘৃতে ভাজা বলিয়া ভ্রম হয়।

৯। এক বিঘা জমিতে, স্বভাবজাত রূপে, ২০।২২টী মহুয়া গাছ জন্মিতে দেখিতে পাই। স্থানে স্থানে ইহা অপেক্ষাও অধিক হয়। গাছে ফুল ধরিলে কোন কোন স্থানে প্রত্যেক মহুয়া গাছ ১৲ হইতে ১।৹ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। "চিড়্‌ চিড়িয়া" এবং মহুয়া গাছের পাতা, আজ্‌কাল্‌ "বিড়ীর" জন্য চালান যাইতেছে। পাতা সংগ্রহের জন্য কোন পয়সা লাগে না। তুলিতে পারিলেই হয়।

১০। সাঁওতালেরা বৃক্ষের কোটর, পাহাড়ের গর্ত্ত অনুসন্ধান করিয়া বড় বড় মহুয়া মধুপূর্ণ মৌ-চাক্‌, ভাঁঙ্গিয়া লইয়া আসিয়া নূতন গামছায় বাঁধিয়া, কোন মাটীর পাত্রে নিঙড়াইয়া লয়। এক একখানি মৌ-চাকে, চারি পাঁচ সের হিসাবে মধু পাওয়া যায়। পরে ঐ চাক্‌কে কোন মাটীর পাত্রে করিয়া জাল দিয়া, অন্য একটী তাদৃশ বড় পাত্রে জল রাখিয়া তাহাতেই উত্তপ্ত তরল মোম্‌কে ঢালিয়া জমাট বাঁধিয়া চাকৃতি প্রস্তুত করে। উহাই আবার পরিষ্কার করিয়া লইলেই শ্বেতবর্ণ মোম হয়। চর্ব্বির মোমবাতি অপেক্ষা, দেশী মোম্‌বাতি অধিকক্ষণ জ্বলে। ব্যবসার হিসাবে এই মোমের দ্বারা অনেক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। ঐরূপ এক একখানি চাক্‌ হইতে /১॥ দেড় বা /২ দুই সের আন্দাজ খাঁটি মোম্‌ পাওয়া যায়।

১১। কথিত বিশুষ্ক মহুয়া ফলকে ডাউলের মতন ভাঙ্গিয়া বড় বড় গামলায় ১৫।১৬ দিন পর্য্যন্ত জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পচিয়া উঠিলে পরে ভাঁটিতে চোঁয়াইয়া দেশী মদ্য প্রস্তুত করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যখন বিনা চাষ ও তদ্‌বিরে মহুয়া গাছ মানুষের এত কাজে আইসে, বিধিমত আবাদ করিলে না জানি কতই লাভ হইতে পারে।

নীলের দর—লণ্ডনে বাঙ্গালাদেশ জাত নীলের দর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। নীলকর সাহেবদের পক্ষে আনন্দের কথা বটে। জর্ম্মণীর নকল নীলের আমদানী বন্ধ হওয়াতেই বিলাতে আসল নীলের আবার আদর বাড়িয়াছে।

যুদ্ধের খরচ—যুদ্ধ শুধু লক্ষ লক্ষ লোকক্ষয়কর মহামারী ব্যাপার নহে; ইহা প্রভূত অর্থক্ষয়কর একটী বিরাট ব্যাপারও বটে। বর্ত্তমান যুদ্ধে শুধু ইংরেজ পক্ষের প্রতিদিন কত করিয়া খরচ পড়িতেছে জানেন?—দশ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ দেড় কোটি টাকা।

সরকারী কৃষি সংবাদ

চুঁচ্ড়া ফার্ম্মে কয়েক প্রকার ধান

দাদখানি, বাদ্সাভোগ, বাঁকতুল্সী, হাতিশাল, নগ্রা এই কয়টী ধানের পরীক্ষা গত ৪ বৎসর যাবৎ চলিতেছে। গড়ে নাগ্রা ধান্তের ফলন অধিক দেখা যায়।

আমন ধানের বীজ ও কাটি কয়টী করিয়া রোপণ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফসল উৎপন্ন এবং লাভ হয়, তাহা নির্ণয় করিবার জন্ত ১৩১৬ সাল হইতে এই তিন বৎসরের পরীক্ষাফল হইতে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছিল যে, আষাঢ় মাসে ধান্ত রোপণ করিলে একটী কাটিতেই অধিক লাভ হইবে। এই অনুমানের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্ত এই বৎসর ১৫ই আষাঢ় হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত প্রতিসপ্তাহে এক একটী জমিতে একটী করিয়া কাটি দিয়া ধান্ত রোপণ করা হয়, নিম্নে তাহার ফল দেওয়া গেল।

ক্রমিক নম্বর।	কোন সময় ধান রোপণ করা হয় ও সময়ের বিভিন্নতা।	প্রতি ৩ বিঘায় কত ফলন হইয়াছে।	
		১৩১৯	
		ধান	খড়
১	আষাঢ় মাসের ৩য় সপ্তাহ ...	৩২ ১/২	৩৪/০
২	আষাঢ় মাসের ৪র্থ সপ্তাহ ...	১৭ ৩/৪	৩২/০
৩	শ্রাবণ মাসের ১ম সপ্তাহ ...	১২ ৩/৪	২৪/০
৪	শ্রাবণ মাসের ২য় সপ্তাহ ...	২৪ ১/৪	২৬/০
৫	শ্রাবণ মাসের ৩য় সপ্তাহ ...	২১ ৩/৪	২৩ ১/৮
৬	শ্রাবণ মাসের ৪র্থ সপ্তাহ ...	১৮ ১/৮	২১ ৩/৪
৭	ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহ ...	১৭ ৩/৪	১৮ ৩/৪

এই পরীক্ষাফল হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, একটী করিয়া কাটি রোপণ করিতে হইলে আষাঢ় মাসের মধ্যেই রোপণ করা আবশ্যক। উপরোক্ত তালিকাতে ইহাও দৃষ্ট হইতেছে যে, ৩ নম্বর পরীক্ষাফল ৪ নম্বর পরীক্ষাফল অপেক্ষা কম। ইহার কারণ সম্ভবতঃ জমির উর্ব্বরা শক্তির সামান্ত ইতর বিশেষ হইয়াছে।

উদ্ভিজ্জসারসম্বন্ধে পরীক্ষা—

মাটীকে অর্গানিক (জীবজ) পদার্থে পুষ্ট করিতে হইলে উদ্ভিজ্জসারের ফসল জন্মাইয়া মাটীতে বসাইয়া দেওয়া অপেক্ষা ভাল উপায় আর নাই, বিশেষতঃ যদি ধঞ্চা, শণ প্রভৃতির ফসল দেওয়া হয়।

কতকগুলি অবস্থায় কোন্ কোন্ ফসল সব চেয়ে ভাল তাহা ঠিক করিবার জন্যও অনেকগুলি ফসলের পরীক্ষা করা গিয়াছে।

বাঙ্গালায় ধঞ্চা বিশেষ ভাল রকম কাজ করে, শীঘ্র শীঘ্র জন্মে ও বহুল পরিমাণে অর্গানিক পদার্থ উৎপন্ন করে। গাছ খুব শক্ত হইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে উহাকে লাঙ্গল দ্বারা মাটীর সহিত চষিয়া দেওয়া আবশ্যক। ধঞ্চার ফসল সত্বর বুনিয়া জুলাই মাসের মাঝামাঝি লাঙ্গল দিয়া চষিয়া দেওয়া উচিত। ভাল অবস্থায় এই সময় বরাবর ফসল ৫ ফুট উচ্চ হওয়া উচিত। এইরূপ ফসলদ্বারা মাটিতে অনেক টন্ উদ্ভিজ্জ অর্গানিক পদার্থ বাড়িয়া যায় এবং ঘন ফসল হইলে একর প্রতি প্রায় ১০০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন সরবরাহ হয়। গাছ বেশী শক্ত হইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে লাঙ্গল দিয়া চষিয়া দিলে মাটীতে পড়িয়া সহজেই পচিয়া যায়।

শণ—

বাঙ্গালায় শণ, ধঞ্চার ন্যায় ভাল কাজ করে না। আর উঁচু জমিতে ইহা বেশী ভাল কাজ করে। শক্ত জমিতে ও বর্ষাপ্রধান স্থানে ইহা মাটীতে অর্গানিক পদার্থ ও নাইট্রোজেন সরবরাহ বিষয়ে ধঞ্চার সহিত পারিয়া উঠে না।

বর্বটী—

অধিকাংশ অবস্থায় বর্বটীই বোধ হয় সবচেয়ে ভাল উদ্ভিজ্জসারের ফসল। ইহা খুব ঝাড়াল হইয়া ঘন রসাল উদ্ভিদের দেহাবরণ উৎপন্ন করে, যাহা মাটীতে চষিয়া দিলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে পচিয়া যায় ও মাটী প্রচুর পরিমাণে অর্গানিক পদার্থ ও নাইট্রোজেন বাড়াইয়া দেয়। ইহা লম্বালম্বা লতা হয় বলিয়া ইহাকে ধঞ্চার মত লাঙ্গল দিয়া মাটীতে চষিয়া দেওয়া যায় না, কোদালি দিয়া মাটি খুঁড়িয়া চাপা দিতে হয়।

টক্ মাটীতেও এই ফসল ভাল রকম জন্মে, কিন্তু চুণের সার দেওয়ার পর আরও ভাল রকম জন্মে। ইহা ধঞ্চা শণ অপেক্ষা কম সময়ে ও বেশী পরিমাণে রসাল উদ্ভিজ্জসার উৎপন্ন করে। ইহার আরও এই গুণ যে, ইহা ধঞ্চা বা শণ তুলিবার সময়ের অনেক পরে বুনিলেও ভাল ফসল উৎপন্ন করে। ঢাকায় ইহা দেরী করিয়া এমন কি আগষ্ট মাসের প্রথমে বোনা হয়, তথাপি সেপ্টেম্বর মাসের

মাঝামাঝি বেশ ভাল ফসল জন্মে সুতরাং রবি শস্যের চাষ ও বোনার জন্য যথেষ্ট সময় থাকে।

দেখা গিয়াছে যে ঢাকায় জল বায়ুর সমান অবস্থায়, আউশ ধান কাটিবার পরেও রবিশস্য বুনিবার পূর্ব্ব মাসে বেশ একটী বর্ব্বটীর ফসল উৎপন্ন করা যাইতে পারে। ধান কাটিবার ঠিক পরেই জমিতে চাষ দিয়াও, মই দেওয়ার অবস্থা থাকিলে, মই দিয়া অবিলম্বে বীজ বোনা উচিত।

এটা খুব প্রয়োজনীয় বিষয় কারণ এইরূপ বর্ব্বটীর চাষে সাধারণ ফসলের কোন ব্যাঘাত হয় না কিন্তু ধঞ্চা কিম্বা শণ জন্মাইলে আউশ ধান জন্মান যায় না।

রবিশস্য বুনিবার এক মাস পূর্ব্বে বর্ব্বটী মাটিতে বসাইয়া দিলেই উহা পচিবার ও মাটীকে বীজ বোনার উপযুক্ত করিবার জন্য যথেষ্ট সময় পাইবে।

আগামী বৎসরে অন্যান্য উদ্ভিজ্জসারের ফসল সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইবে।

গো জনন—

বহুবিধ কারণবশতঃ গোজাতির সাধারণ উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতিসাধন করা ঘটিয়া উঠে নাই। এই বৎসরে নানাস্থান হইতে উত্তম বৃষের জন্য অনেক আবেদন আসিয়াছিল কিন্তু উপযুক্ত ও উত্তম বৃষ না পাওয়ায় সকলের অভাব মোচন করিতে পারা যায় নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নানা কারণে এই বিষয়ে সম্যক উন্নতিসাধন করিতে পারা যায় নাই, তন্মধ্যে সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতির অভাবই প্রধান। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে উৎকৃষ্ট পুংবৎস (এঁড়ে বাছুর) গুলিকে বলদ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বৎস উৎপাদন বিষয়ে একেবারে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলা হয় এবং নিকৃষ্ট বৎস উৎপাদনের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। এই প্রথা সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। যে সমস্ত এঁড়ে বাছুরগুলির ভবিষ্যতে উত্তম বৃষে পরিণত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে তাহাদিগকে স্থানে স্থানে বিতরণ করিয়া এবং বাকী অনুপযুক্তগুলিকে বলদ করিয়া দিয়া, এই নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় প্রথা দমন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে।

সাধারণের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে তাঁহারা যেন এইরূপ উপযুক্ত বাছুরের সন্ধান জানাইয়া আমাদিগকে সাহায্য করেন। পরীক্ষা করিয়া যে গুলিকে যথার্থ উপযুক্ত বিবেচনা করা যাইবে তাহাদিগকে সাধারণের উপকারের জন্য স্থানে স্থানে বিতরণার্থ রাখিয়া দেওয়া হইবে।

পশুক্লেশ নিবারণার্থেও এই বিভাগ হইতে যথেষ্ট চেষ্টা করা যাইতেছে, এই বিষয়েও সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

এই বিভাগসংক্রান্ত অপরাপর বিষয়েও যথেষ্ট উন্নতি বিধান করা গিয়াছে, সে সমস্ত এখানে উল্লেখযোগ্য নহে। অনুসন্ধিৎসুগণ এই বর্ষের বার্ষিক রিপোর্ট দেখিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

এইখানে গোপালন সম্বন্ধে একটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না। গো জাতির যথার্থ উন্নতি সাধন করিতে হইলে যে তাহাদিগকে উপযুক্ত পরিমাণে আহার দেওয়া উচিত, তাহা অনেকে বুঝিয়াও বুঝেন না। নতুবা যতই উৎকৃষ্ট পশু আনা যাউক না কেন, উপযুক্ত আহার না দিলে তাহাদের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। অতি উত্তম বৃষ, গাভী ও বৎস আনয়ন করিবার পর তাহাদিগকে যদি, বর্ত্তমানে বঙ্গের গবাদিকে যেরূপ অর্দ্ধাহারে রাখা হইতেছে, সেইরূপভাবে রাখা হয়, তাহা হইলে তাহারাও দুই এক পুরুষের মধ্যেই, উপস্থিত বঙ্গীয় গোজাতির ন্যায় এমন কি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া যাইবে। ভিন্ন প্রদেশ হইতে গবাদি আনয়ন না করিয়া কেবলমাত্র যদি এখানকার এই দুরবস্থাপন্ন পশুগুলিকেই উপযুক্ত পরিমাণে আহার দেওয়া ও যত্ন করা হয়, তাহা হইলে ইহারাই কিছুদিনের মধ্যে উত্তম বৃষ ও গাভীতে পরিণত হইতে পারে।

এই দেশে গোজাতির উন্নতিসাধন করিতে হইলে এইটিই সর্ব্বাগ্রে হৃদয়ঙ্গম করা ও তদনুসারে কর্ম্ম করা উচিত, নচেৎ অন্যান্য সমস্ত উপায়ই ব্যর্থ হইবে।

আসাম কৃষি বিভাগ—১৯১৪ সালের ২নং পত্রিকা

শস্যাদি আক্রমণকারী কীটসমূহের নমুনা সংগ্রহ করিবার ও পরীক্ষার্থ পাঠাইবার নিয়ম,—

১। শস্যে পোকা লাগিলে তাহার নমুনা স্বরূপ কয়েকটী পোকা অবিলম্বে গৌহাটীতে এণ্টমলজিকেল এসিষ্টাণ্টের (Entomological Assisant) নিকট পাঠাইতে হইবে।

২। পোকা জীবন্ত অবস্থায় অথবা মৃত অবস্থায় স্পিরিটের ভিতর পাঠান যাইতে পারে।

জীবন্ত পোকা পাঠাইতে হইলে একটী শক্ত কার্ডবোর্ড বা শক্ত কাঠের বাক্স অথবা শক্ত টিনের কৌটা হইলে ভাল হয়। বাক্সের চারি ধারে বায়ু প্রবেশের জন্য ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া দিতে হইবে। টিনে পাঠাইতে হইলে উহার মুখ রাঙ দিয়া বন্ধ করিয়া দিবেন না।

৩। সাধারণতঃ পোকায় শস্যের পাতা, ফুল ইত্যাদি বাহিরে অংশ খাইয়া, বা গাছের কাণ্ডের ভিতর ছিদ্র করিয়া, অথবা মাটির নীচে শিকড় বা গোড়া খাইয়া অনিষ্ট করে। যে পোকা বাহিরে পাতা, ফুল ইত্যাদি খায় সেগুলির জীবন্ত নমুনা প্রচুর পরিমাণে তাজা পাতার সহিত বাক্সে প্যাক্ করিয়া পাঠাইতে পারা যায়। এরূপভাবে প্যাক্ করিবেন যেন পোকার উপর চাপ না পড়ে। বাক্সের ভিতর শুষ্ক খড় কিংবা এরূপ অন্য কিছু জিনিষ রাখিবেন যাহাতে বাতাস হইতে রস টানিয়া লইতে পারে। এইরূপ পোকার মধ্যে কতকগুলি এত ক্ষুদ্র এবং নরম যে তাহাদিগকে সহজে গাছ হইতে ছাড়ান যায় না। এইরূপ পোকার নমুনা পাঠাইতে হইলে গাছের ছালের সহিত কাটিয়া আনিয়া বাক্সে প্যাক্ করিয়া পাঠাইবেন। যে সকল পোকা গাছের কাণ্ড বা ফলের মধ্যে ছিদ্র করিয়া বাস করে সে সকল পোকার নমুনা পাঠাইতে হইলে, গাছের যে ভাগে তাহারা বাস করে তাহার সহিত কাটিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। গাছের কোনও অংশে এরূপ পোকার বাসার চিহ্ন থাকিলে উহাও কাটিয়া পাঠাইবেন। যে সকল পোকা

গাছের শিকড় বা গোড়া খায় তাহাদের নমুনা শিকড় বা গোড়ার সহিত পাঠাইতে হইবে। মাটির নীচে যে সকল পোকা থাকে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি মাটি ছাড়া বাঁচিতে পারে না; ঐরূপ পোকার নমুনা আরা ঈষৎ ভিজা মাটির মধ্যে শিকড় বা গাছের যে অংশ তাহারা খায় তাহার সহিত বাক্সে ভরিয়া পাঠাইতে হইবে।

৪। নমুনার সহিত পোকার বিবরণ লিপি পাঠাইবেন। বাক্সের ভিতর একখণ্ড কাগজে আক্রান্ত শস্যের নাম ও বিবরণ লিপির তারিখ ইত্যাদি লিখিয়া রাখিবেন। বাক্স বা টিন একখণ্ড খুব পাতলা কাপড় দিয়া মুড়িয়া ও সেলাই করিয়া বন্ধ করিবেন এবং উহার উপর পরিষ্কার অক্ষরে শিরোনামা লিখিয়া দিবেন।

৫। জীবন্ত নমুনা যে দিন সংগ্রহ করা যায় সেই দিনেই পাঠাইতে হইবে। নমুনা যত শীঘ্র পৌঁছে এরূপ ব্যবস্থা করিবেন। সাধারণতঃ ডাকে পাঠাইলে ভাল হয়।

৬। পোকার মৃত নমুনা পাঠান অপেক্ষাকৃত সহজ। এরূপ নমুনা শিশির মধ্যে ফর্‌মেলিন এবং জল (এক ভাগ ফর্‌মেলিন, ৫ ভাগ জল) অথবা মেথিলেটেড স্পিরিট্ অথব এল্‌কোহলের ভিতর রাখিয়া পরে শিশির মুখ কাক দিয়া ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া পাঠাইতে হইবে। তৎপর শিশিটী শক্ত কাঠের বাক্সে ভরিয়া চারিদিকে খড়, তুলা বা কাঠের গুঁড়া দিয়া প্যাক্ করিবেন যেন শিশি না ভাঙ্গে। ইহার মধ্যেও একখণ্ড কাগজে পূর্ব্বোক্ত বিবরণ লিখিয়া রাখিবেন। সম্ভবপর হইলে জীবন্ত ও মরা দুই রকম ও প্রত্যেক রকমের অন্ততঃ ৬টী * নমুনা পাঠাইলে ভাল হয়।

৭। নমুনা পাঠাইবার সময় বিবরণ লিপি লিখিবেন। উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা চাই:—

পোকার বাঙ্গালা নাম, সংগ্রহের তারিখ, স্থান, পোকা প্রথম কখন দেখা গিয়াছিল, ক্ষতির পরিমাণ, কিরূপ ক্ষতি অর্থাৎ গাছের কোন্ অংশে ক্ষতি ঘটিয়াছে, পূর্ব্বে সেই স্থানে কিংবা অন্য কোন স্থানে এই পোকার উপদ্রব দেখা গিয়াছিল কি না, কৃষকেরা কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা করে কি না, করিলে উহা কি, পোকার প্রকৃতি সম্বন্ধে যত দূর জানিতে পারিয়াছেন, ইত্যাদি।

---

* কীটের নমুনার সঙ্গে ঐ কীটের পূর্ণবয়স্ক পতঙ্গের নমুনাও পাঠাইলে পরীক্ষা করিবার ও কীট নিবারণ সম্বন্ধীয় উপদেশ দিবার পক্ষে সুবিধা হয়।
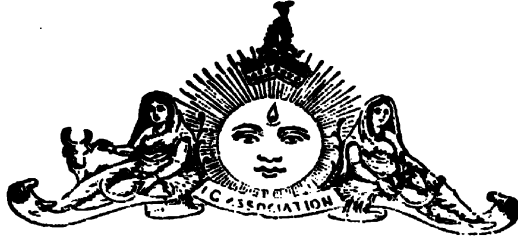
অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সাল।

স্পেনদেশে ধানের চাষ

ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত "ধান্যতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে ভারত ভিন্ন অন্যান্য দেশে ধান চাষের উল্লেখ মাত্র করা হইয়াছিল। অবশ্য খাদ্য শস্যের হিসাবে ভারতবাসীরা ধানের উপর যতটা নির্ভর করে অন্য কোন দেশের লোক ততটা করে না এবং সেই জন্য এতদ্দেশে ধান্য চাষের পরিসর সর্ব্ব দেশ অপেক্ষা অধিক। কিন্তু তাহা হইলেও ইউরোপ খণ্ডে ধানের চাষ অবিদিত নহে। পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহের নানাস্থানে ধান্য আবাদের পরিণাম দেখিলেই তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়।

ইউরোপের মধ্যে ইতালী দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধান্য উৎপাদিত হইয়া থাকে। এখানে আবাদী জমির পরিমাণ ১০,৮০,০০০ বিঘা। তৎপরেই স্পেন—আবাদী জমি ২,৮৮,০০০ বিঘার কম নহে। এতদ্ভিন্ন বুলগেরিয়া, গ্রীসদেশের নব অধিকৃত অঞ্চল সমূহ এবং ফরাসী দেশের রোন নদীর উপকূলেও অল্প বিস্তর ধান চাষ হইয়া থাকে। ধান চাষে ম্যালেরিয়ার আধিক্য হয় এইরূপ একটি অমূলক ধারণা না থাকিলে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে ধান চাষের পরিসর আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষ ধান চাষের আদিম স্থান হইলেও এখানে যে চাষের উৎকর্ষতা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সাধিত হইয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে ভারতে উৎপাদনের মাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা কম বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ফলনের হিসাবে স্পেন দেশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। আমরা তজ্জন্য স্পেন দেশে ধান্য চাষের প্রথাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে সমালোচনা করিব। নিম্নোদ্ধৃত তালিকা হইতে পাঠকবর্গ বিভিন্ন দেশে ধান্য চাষের ও উৎপাদনের পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন।

স্পেনে ধান্য রোপণ দৃশ্য।

স্পেনে ধান রোপণের প্রথা আমাদের বাঙলা দেশেরই মত। বাঙলা দেশে যেমন সম্মুখ হইতে রোপণ করিতে করিতে কৃষাণগণ পশ্চাৎ হঠিয়া যাইতে থাকে, দৃশ্য দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, স্পেনের কৃষাণগণও সেই ভাবে ধান রোপণ করিয়া থাকে। এখানে বাঙলারই মত গুচ্ছ গুচ্ছ বীজ ধান রোপণ করা হয়। বাঙলা দেশের চাষীরা এক গর্ত্তে ১০।১২টা বা ততোধিক বীজ-ধান রোপণ করাকে অপব্যয় বলিয়া মনে করে না, কারণ তাহারা জানে নিস্তেজ চারাগুলি মরিয়া যাইতে পারে, ক্ষেতে পোকা লাগিয়াও দুই একটা চারা কাটিয়া দিতে পারে কিম্বা দৈবী কোন আপদ ঘটিলেও ঘটিতে পারে। চারা অধিক রোয়া থাকিলে কখন ফসলের সম্পূর্ণ হানি হইবে না। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ গর্ত্তে একটি, দুইটি, তিনটি চারা রোপণ করিয়া কত বীজ ধান বাঁচাইতে পারেন চেষ্টা করিতেছেন, আমরা কিন্তু বলি সামান্য বীজ-ধানের অপব্যয়ে বিশেষ কিছু মারাত্মক ক্ষতি হইবে না। তাঁহারা সার প্রয়োগে বা চাষের গুণে স্পেনের মতন ফলন উৎপাদন করা শিক্ষা দিলে বরং দেশের একটা বড় রকমের কাজ হয়।

দেশের নাম	জমির পরিমাণ, একর হিঃ, ১ একর=৩ বিঘা	উৎপাদনের পরিমাণ টন হিঃ, ১ টন=২৭½ মণ	একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ, পাঃ হিঃ ১ পাঃ=প্রায় অর্দ্ধ সের
স্পেন	৯৬,০০০	২৪৬,০০০	৫,৭০০
ইতালী	৩৬০,০০০	৫৩৪,০০০	৩ ৩০০
মিসর	২৫৪,০০০	৩৭৫,০০০	৩,৩০০
জাপান	৭,৩৯৩,০০০	৭,০২৬,০০০	২,১০০
আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশ	৮২৭,০০০	৫১৭,০০০	১,৪০০
ভারতবর্ষ	৭০,৫৮০,০০০	২৮,১৬৭,০০০	৮৯০

স্পেন দেশের পূর্ব্ব উপকূলে, বিশেষতঃ ভ্যালেন্‌সিয়া নামক অঞ্চলে ধান চাষ হইয়া থাকে। এই সমুদয় ধান-জমির একদিকে পর্ব্বতমালা এবং অন্যদিকে সমুদ্র। ক্ষেত্রগুলি প্রায় সমতল এবং অল্পোন্নত। স্থানে স্থানে বড় বড় জলা রহিয়াছে, সুতরাং কতিপয় বিষয়ে এ সমুদয় ক্ষেত্রকে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক ধান-জমির সহিত তুলনা করিতে পারা যায়। কিন্তু আমাদের দেশের জলাজমির ন্যায় এখানে জল আবদ্ধ হইয়া থাকে না। জুকার এবং তুরিয়া নামক দুইটি নদী হইতে খাল কাটিয়া জল নিষ্কাষণের সুচারুরূপ বন্দোবস্ত রহিয়াছে।

ভ্যালেন্সিয়া অঞ্চলে ধানের চাষের প্রথম সূত্রপাত—স্পেনে মুসলমান অধিকারের সময়। ধান রোপণের প্রথা এক ভ্যালেন্সিয়া ভিন্ন ইউরোপের আর কোথাও দেখা যায় না। সম্ভবতঃ মুসলমানগণ এই উন্নত প্রণালীর প্রবর্ত্তক। আমাদের দেশের ন্যায় তলা ফেলিবার জমি, ক্ষেত্রের জমি অপেক্ষা অনেক উচ্চ। তলা হইতে ক্ষেত্রও অনেক স্থলে বহুদূরে অবস্থিত। তলার জমিতে সবুজ অথবা খনিজ সার উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজ বপনের আগে ঘোড়ার দ্বারা তলায় বেশ করিয়া কাদা করিয়া লওয়া হয় এবং সকল সময়ে আঁচড়া ব্যবহার হয় না।

আশ্বিন মাসে স্পেনে ধান্য কাটা হয়; তখনও ক্ষেত্রে জল থাকে। পৌষ মাসে জল খুব কমিয়া গেলে প্রথম চাষ দেওয়া হয় এবং বিশেষ প্রকার বিদের সাহায্যে এই সময় আগাছা গুলিও কাটিয়া বিনষ্ট করিয়া ফেলা হয়। নিম্নতল জমিতে মাটি

বেশী এঁটেল বলিয়া "বালাওরা" নামক এক প্রকার ১ ফুটের অধিক ব্যাস চাকাওয়ালা আঁচড়া দ্বারা চাষ দেওয়া হইয়া থাকে। পৌষ মাসের পর জমি শুষ্ক হইয়া যায় এবং ইহাই চাষের মুখ্য সময়। পূর্ব্বে স্পেন দেশের লাঙ্গল অনেকটা এতদ্দেশীয় লাঙ্গলের মত ছিল। কিন্তু কতিপয় বৎসর হইতে একপ্রকার মাটি উল্টান লাঙ্গল ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে ৫।৬ ইঞ্চি কিম্বা ততোধিক গভীর মাটির বড় বড় চাপ উল্টান যায়। স্পেনের কৃষকেরা বলে যে ইহার প্রবর্ত্তনে ধান চাষের অনেক উন্নতি হইয়াছে। ইহা চালাইতে ২।৩টি অশ্বের আবশ্যক হয়। লাঙ্গল ভারী হইলেও চালাইতে ততটা অসুবিধা হয় না, কারণ পূর্ব্বোক্ত বালাওরা নামক যন্ত্র চালাইবার সময় মাটিতে বড় বড় আঁচড় পড়িয়া থাকে এবং মাটি শুকাইলেই তৎসমুদয় ফাটিয়া মাটি আলা হইয়া যায়। বস্তুতঃ এই দুটি যন্ত্রের সাহায্যে মাটিতে যত হাওয়া লাগে ও গভীর কর্ষণ হয় এতদ্দেশে তাহা হয় না।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান চারা রোপণের কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে ক্ষেত্রে জল সেচন করিয়া বেশ করিয়া নিড়াইয়া দেওয়াও হইয়া থাকে। ক্ষেত্রে ৩—৫ ইঞ্চি জল থাকিতে চারা রোপণ করা হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বীজ তলা ক্ষেত্র হইতে অনেক দূরে। এই সকল তলা হইতে চারা তুলিয়া মূলগুলি বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলা হয়। পরে ৪০০ হইতে ৫০০ চারার এক একটি আঁটি বাঁধিয়া ক্ষেত্রে চালান দেওয়া হইয়া থাকে। পৌঁছিতে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দেরী হইলেও চারার ক্ষতি হয় না। আয়তন হিসাবে একটি তলার গাছে উহার ১০ অথবা ১২ গুণ জমিতে চাষ যথেষ্ট হয় এবং সংখ্যা হিসাবে এক বিঘায় প্রায় ৮৩।৮৪ আটি আবশ্যক হয়। রোপণের প্রথা এতদ্দেশেরই মত। ৩টি হইতে পাঁচটি চারা একত্র পুতিয়া দেওয়া হয়; এক একটি চারা রোপণের নিয়ম আদৌ নাই। ছয় জন লোকে দিনে প্রায় ৭½ বিঘা জমি রোপণ করিতে পারে এবং উহাদের দৈনিক মজুরী ২৸৴০ হইতে ৩৶০।

পরবর্ত্তী চাষ প্রায় এতদ্দেশেরই ন্যায়। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে ক্ষেত্রের জল বাহির করিয়া একবার নিড়ান আবশ্যক হয় এবং এই সময়ে আরও কিছু সার দেওয়া হয়। ফসল কাটিবার জন্য এখনও কাস্তের প্রচলন আছে এবং ধান মাড়াও মজুর কিম্বা অশ্ব দ্বারা হইয়া থাকে। ঝাড়িবার জন্য চালুনি কমই ব্যবহার হয়; সাধারণতঃ হাওয়ার সাহায্যেই এই কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে। সম্প্রতি কলেরও ক্রমশঃ প্রবর্ত্তন হইতেছে।

সারের সম্বন্ধে বলিতে গেলে প্রথমেই বলা আবশ্যক যে স্পেনে খনিজ সারের প্রচলন অত্যন্ত অধিক। উচ্চ জমিতে সবুজ সার দেওয়া হয়। কিন্তু ইহা বাদেও

উচ্চ নিম্ন উভয় প্রকার জমিতেই যথেষ্ট খনিজ সার দেওয়া হয়। উহার পরিমাণ বিঘা প্রতি ২½ মণ হইতে ৩½ মণের কম হইবে না। এইরূপ খনিজ সারের উপাদান শতকরা ৪০ ভাগ সল্‌ফেট্‌ অব্‌ আমোনিয়া, ৫৪ ভাগ সুপার ফস্‌ফেট্‌ এবং ৬ ভাগ সল্‌ফেট্‌ অব্‌ পটাস। রোপণের পূর্ব্বে ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার আগেই কখনও সমস্ত সার একবারে দেওয়া হয় এবং কখনও এই সময়ে ⅓ ভাগ এবং ১ মাস পরে অবশিষ্টাংশ প্রদত্ত হয়। কোন কোন স্থানে উপরোক্ত মাত্রায় গুয়ান সার দেওয়া হইয়া থাকে।

এ স্থলে ম্যাঙ্গানিজের বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। জাপানে ম্যাঙ্গানিজ ঘটিত সার প্রয়োগে অত্যধিক ফল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন কোন রাসায়নিক বলেন যে, সর্ব্ববিধ জমিতে এবং সকলপ্রকার ম্যাঙ্গানিজ সারে সমান ফল হয় না। ম্যাঙ্গানিজ গাছের অক্সিজেন প্রাপ্তির সুবিধা করে বলিয়াই ইহার উপকারিতা। ইহার দ্বারা সেই কার্য্য পাইতে হইলে ম্যাঙ্গানিজ কার্ব্বনেট রূপে ব্যবহার করা দরকার। এতদ্ভিন্ন জমিতেও যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্গারাম্ল থাকা আবশ্যক। জাপান, ইতালী ও স্পেন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ম্যাঙ্গানিজ প্রয়োগে বিভিন্ন ফল পাওয়ার কারণ দেশভেদে এই সমুদয় স্বাভাবিক অবস্থা সমূহের বিভিন্নতা।

সাধারণতঃ বিবেচনা করিতে গেলে স্পেনে ধান্য চাষের প্রণালী এতদ্দেশ প্রচলিত প্রণালী সমূহের সহিত বিশেষ পৃথক বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু পার্থক্য অবশ্য রহিয়াছে তাহা না হইলে উৎপাদনের মাত্রা এতদ্দেশ অপেক্ষা ৬½ গুণেরও অধিক হইবে কেন? তিনটি বিষয় স্পেন দেশে ধান্যের অধিক ফলনের কারণ বলিয়া বোধ হয়,—১ম, শীতের সময় চাষের জন্য জমি অধিক সুচারুরূপে কর্ষিত হয় এবং অধিক পরিমাণে অক্সিজেন সংযুক্ত হয়,—২য়, যথেষ্ট মাত্রায় নাইট্রোজেন এবং ফস্‌ফরিক এসিড সংযুক্ত সার প্রয়োগ এবং ৩য়, নূতন জাতীয় ধানের প্রবর্ত্তন। প্রথম এবং দ্বিতীয় কারণ সমূহ দ্বারা এতদ্দেশে চাষের যে অসুবিধা হয় তাহা সর্ব্বস্থানে এবং সকল সময় সংশোধন হওয়া সম্ভবপর নহে। নূতন নূতন বীজ প্রবর্ত্তন সহজেই হইতে পারে। ইহা সকলেই জানেন যে এক জমিতে একই জাতীয় ধান বৎসরের পর বৎসর চাষ করিলে ফলনও কম হয় এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ গাছ অধিকতর ব্যাধিগ্রস্থ হয়। সেরূপ অবস্থায় জাতি পরিবর্ত্তন বিশেষ আবশ্যকীয়। বস্তুতঃ স্পেনে ধান্য চাষের উন্নতির অন্যতম কারণ জাপান হইতে নূতন নূতন জাতীয় ধানের আমদানি। সার এবং চাষ এই উভয়েরও যে অনেক স্থলে উন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহারও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও ধান চাষে সেরূপ সুশিক্ষিত, অর্থশালী ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাহা হইলে কতক পরিমাণ ফল ইতিমধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

পত্রাদি

ধানে সার—ডাঃ আশুতোষ পাল, নহিনীকুটীর বোলপুর, ই, আই, আর।

এই সম্বন্ধে বহুবার কৃষকে আলোচনা হইয়াছে। আপনি কৃষি রসায়ন নামক পুস্তক খানি পাঠে সার ও সারের ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক মীমাংসা পাইবেন। ধা'ন বিঘা প্রতি ১ মণ হাড়চূর্ণ ও ১০ সের সোরা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। স্পেনে ধান চাষ ও বন্ধ পাঠ করুন।

তামিল পাম—মিঃ এইচ, ব্রায়ান, সি, হিল, আসাম।

সুপারি (Areca nut Palm) ও তামিল পাম এক জাতীয় গাছ কি না জানিতে চান।

উত্তর—তামিল পাম ও সুপারি এক জাতীয় গাছ বলিয়া আমাদের মনে হয়। আসামী ভাষায় সুপারি তাম্বুল কথার অপভ্রংশ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই দুই জাতীয় বৃক্ষে যদি কোন পার্থক্য থাকে তাহা আপনার স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়া লওয়া উচিত।

পুকুরের পানা সার—শ্রীসৈয়দ আবদুল লতিফ, চট্টগ্রাম।

মহাশয়, অনুগ্রহ* পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত বিষয়ে উত্তর দানে বাধিত করিবেন,—

পুকুরে যে ফেনা হয়, তাহা পচাইলে সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না? ধানের জমিতে দিলে কিরূপ উপকার হয়? কলা গাছে বা অন্যান্য ফল গাছের গোড়ায় দিলে কিছু উপকার হয় কি না?

হাড়ের গুঁড়া—হাড়ের গুঁড়া করিবার সহজ প্রক্রিয়া কি?

উত্তর—পুকুরের পানা পচাইয়া ব্যবহার করিলে উত্তম সারের কার্য্য করে। কলা ও নারিকেল গাছে এই সার দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা জমির প্রাকৃতিক গঠনের পরিবর্ত্তন হয়। সেই হিসাবে অন্য সারের সহিত ধানের ক্ষেতে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

হাড় দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করা যায়। এই চূর্ণ জলে তাদৃশ দ্রব হয় না। সাধারণ লবণ ও সোরা মিশ্রিত জলে ইহা অল্প পরিমাণে দ্রব হয়। ইহার সহিত সাল-ফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিতে পারিলে ইহার অধিকাংশই জলে দ্রব হয়। মৃত্তিকার রসের সহিত দ্রব না হইলে হাড়চূর্ণ সম্পূর্ণভাবে বৃক্ষপোষণ করিতে পারে না। কৃষি-রসায়ন নামক পুস্তক দেখুন।

* ফেনা=পানা এই অর্থে ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়া লওয়া হইল। কৃঃ সঃ

ভদ্রাসনে বৃক্ষরোপণ—শ্রীকালীধন রায়, বেলঘোরিয়া পোঃ আঃ ২৪ পঃ।

মহাশয়,

আপনার ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসের সংখ্যা "কৃষক" পত্রিকায় "আর্য্যকৃষি" প্রবন্ধ পাঠে উৎসাহিত হইয়া আপনার নিকট নিম্নলিখিত বিষয়ে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত মতামত জানিতে প্রয়াসী হইলাম। আশা করি কৃষিকার্য্যানুরাগী সাধারণের গোচরার্থে এই বিষয়ের মীমাংসা আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন।

সম্প্রতি কৃষিকার্য্যে আমার কিছু অনুরাগ হইয়াছে। আমার প্রত্যহ প্রাতের অবসর ঐ কার্য্যে ব্যয়িত হয় এবং বহু পরিশ্রমে নিজেই আমার আবাসবাটীর পশ্চিমস্থ কিয়দংশ স্থান পরিষ্কার করিয়া উহাতে বীজ বপন করি। অর্থাভাব প্রযুক্ত স্থানীয় ব্যক্তিদিগের নিকট সংগৃহীত বীজ ও চারায় আমায় পরিতৃপ্ত থাকিতে হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত প্রকারে সংগৃহিত যে কোন চারা আমার বিশেষ মনোনীত হইয়াছে তাহা "ভদ্রাসনে রোপণ নিষিদ্ধ" এই বাক্যের দ্বারা নিরুৎসাহ হইয়া ত্যাগ করিতে হইয়াছে যথা—

কাবুলী কদলী, কানাই বাঁশী, পটল (পল্‌তার অভিপ্রায়), মূলা, নাগকেশর চম্পক।

উত্তর—বৃক্ষাদির দ্বারা সাধারণতঃ বায়ু পরিষ্কৃত হয়, কিন্তু আমড়া, তিন্তিড়ি প্রভৃতি বৃক্ষ সঞ্চালিত বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর, সে জন্য ইহারা "ভদ্রাসনে নিষিদ্ধ"। আনারস প্রভৃতি কতকগুলি সুমিষ্ট ফলের এবং কাঁঠালি চম্পক প্রভৃতি কতকগুলি তীব্র পুষ্পসৌরভে সর্পাদি হিংস্রক জন্তু আকৃষ্ট হয়, এ কারণ ইহারা ভদ্রাসনে রোপিত হইবার অনুপযুক্ত। এই নিয়মে নাগকেশর চম্পক "ভদ্রাসন নিষিদ্ধ" হইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত কাবুলী কলা, পটল প্রভৃতির ভদ্রাসনে রোপণ নিষেধের কারণ কি?

সকল প্রকার বৃক্ষ সকলকে রোপণ করিতে নাই এ প্রবাদের ভিত্তি কি?

কোন একপ্রকার বৃক্ষ পুতিয়া গৃহস্থের মঙ্গল হইল না বা তাহার বংশের কাহারও মৃত্যু হইলে সুতরাং তাহার বংশধরগণ আর কেহ সেই বৃক্ষ রোপণ করিলে অনুরূপ ফল হইবে, এই প্রকার প্রবাদের শাস্ত্রোক্ত কোন প্রমাণ আছে? শুনা যায় বহুবীজ সম্পন্ন বৃক্ষ ভদ্রাসনে রোপণ করা উচিত নয়। সে কি জাতীয় বৃক্ষ? দুই একটী উদাহরণ পাইলে বাধিত হইব। নিম্ব বহুবীজ সম্পন্ন কিন্তু বায়ু পরিষ্কারক। কোন্ কোন্ বৃক্ষ ভদ্রাসন কোনে নিষিদ্ধ?

নারিকেল, বেল প্রভৃতি কতিপয় বৃক্ষ কর্ত্তন করিলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয় এমন কি কাহারও মৃত্যু অবধি ঘটিতে পারে। গৃহস্থের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বৃক্ষাদি রক্ষাকল্পে এই প্রবাদ অনুশাসন বাক্য মাত্র বা মানবভাগ্যের সহিত এই প্রকার বৃক্ষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে?

ভদ্রাসন কথার যথার্থ অর্থ কি ? গৃহ সংলগ্ন কোন দিকের কত অংশ ইত্যাদি ? তীব্র পুষ্প সৌরভযুক্ত "হাসনাহানা" বৃক্ষ ভদ্রাসনের উপযুক্ত কি ?

উত্তর—অনেক সময় বৃক্ষাদি রোপণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বিধি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। লোকচার বা দেশাচার প্রবল ভাবে কার্য্য করে দেখিতে পাওয়া যায়।

সদর অন্দরের ঘর দুয়ার ও অঙ্গিনা যাহা এক বেষ্টনি মধ্যে থাকে তাহাই সাধারণতঃ বাঙলা দেশে ভদ্রাসন নামে অভিহিত। ভদ্রাসনের মধ্যে বৃক্ষ রোপণ করিয়া রৌদ্র বাতাসের পথ বন্ধ করা উচিত নহে, সেই জন্য ভদ্রাসনে বৃক্ষাদি রোপণ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইতে হয়। নারিকেল মহা উপকারী বৃক্ষ, সেইজন্য নারিকেল বৃক্ষ ছেদনে মহাপাপ বলিয়া সকলে মনে করে কিন্তু ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি আছে শাস্ত্রকারেরা তাহার মীমাংসা করিতে পারেন। তেঁতুলের শুধু হাওয়া খারাপ নহে, উহার শিকড় ঘরের মধ্যে আসিলেও দোষ। এই হিসাবে হয়ত "তাল, তেঁতুল, কুল বংশ করে নির্ম্মূল"। সেইজন্য ঐ সকল বৃক্ষ ভদ্রাসনে রোপণ নিষেধ। কলা রোপণে কি ক্ষতি আমাদের জানা নাই। হয়ত ভদ্রাসনে কলা রোপণ করিয়া কোন বংশের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকিবে সেই কারণে তাহাদের বংশে কলা রোপণ নিষেধ হইয়া গিয়াছে। এই গুলির শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায় না বা আমাদের জানা নাই। দেশাচার ও লোকাচার অনুসারে আমরা অনেক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ঠিক করিয়া থাকি। ভদ্রাসনে নাগেশ্বর চম্পক কেন, কোন চম্পক বৃক্ষ রোপণ নিষিদ্ধ—ইহাই প্রবাদ। তাহার একটা কারণ ত খুঁজিয়া পাওয়া যায়,—চম্পক বৃক্ষ মাত্রেই ব্রহ্মদৈত্যের আশ্রয় হউক না হউক চম্পক ফুল মাত্রেরই উগ্রগন্ধ হেতু উহাকে দূরে রাখাই বিধি। হাসনা হানারও বড় উগ্রগন্ধ সুতরাং হাসনা হানাকেও দূরে রাখাই ভাল। দূর হইতে এই জাতীয় পুষ্পগুলির আঘ্রাণ বরং সুখকর।

বহুবীজ সম্পন্ন বৃক্ষ অর্থে যাহার একটা ফলের মধ্যে একাধিক বীজ থাকে যেমন তাল তেঁতুল, পেঁপে, বীচেকলা ইত্যাদি নারিকেল, বেল, নিম এই সকল মহা উপকারী বৃক্ষ ; এই নিমিত্ত এই সকল বৃক্ষ ছেদনে এত ভয় প্রদর্শণ করা হয়।

পূর্ব্ব দিকের সুখকর রৌদ্র এবং দক্ষিণের মলয়ানিল কোন ক্রমে প্রতিহত না হয় এই নিমিত্ত বাঙলায় ভদ্রাসন করিবার একটি প্রবাদ বাক্য আছে।

"দক্ষিণ ছেড়ে, উত্তরে বেড়ে ঘর করগে যা ভেড়ের ভেড়ে, পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ সুখে বাসকর বারমাস।"

পটল ও মূলার ভদ্রাসনে চাষ হয়ত পটল তোলা ও মূলা তোলা (মূল উচ্ছেদ করা) এই দুইটি গ্রাম্য কথা ধ্বংস সূচক অর্থে ব্যবহার হয় বলিয়া উহাদের চাষ ভদ্রাসনে নিষিদ্ধ হইতে পারে। শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ নাই বলিয়া মনে হয় যদি

কিছু থাকে শাস্ত্রকারেরা ইহার মীমাংসা করিয়া দিবেন। আমরা কিন্তু বহু গৃহস্থ প্রাঙ্গনে এই দুইটিই দেখিয়াছি।

কর্পূর—ফর্ম্মোসা দ্বীপে কর্পূর বৃক্ষ জন্মে। জাপানীগণ এই দ্বীপের আদীম অধিবাসীগণকে লইয়া কর্পূর চাষ করিতেছেন। কর্পূর চাষ এখানে খুব ফলাস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষেও অনেক স্থানে কর্পূর বৃক্ষ আছে, সিংহলে কর্পূরের রীতিমত আবাদ আছে। আমেরিকায়ও কর্পূর চাষ আরম্ভ হইয়াছে। ফ্লোরিডা অন্তরীপে বিস্তৃত আবাদ হইতেছে। আমেরিকাবাসীগণ গাছ ছাঁটার বন্দোবস্ত করিয়া ভালই করিয়াছেন। গাছ খুব উর্দ্ধে বাড়ে না অথচ শাখা পল্লব বিস্তৃত হইয়া খুব ঝাড়াল হয়। প্রতিবৎসর ডাল ছাঁটার পর যে কচি পাতা পল্লব বাহির হয় সেই গুলি আহরণ করিয়া তাহা হইতে বেশ কর্পূর তৈয়ারি হয়। পাতা পল্লবগুলি উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া জলীয় বাষ্প পরিচালিত করিলে কর্পূর বাষ্পাকারে বাহির হয়, তাহাই ঘনীভূত হইয়া কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কর্পূর কাষ্ঠখণ্ড জলে সিদ্ধ করিয়া চোলাই করিলেও কর্পূর প্রস্তুত হয়। আমেরিকায় এক একর জমিতে প্রত্যেকবার গাছ ছাটাই হইতে প্রায় ৮০০০ পাউণ্ড পাতা ডাল পাওয়া যায়। ১২ ফিট অন্তর শ্রেণী এবং ১৫ ফিট গাছ বসাইলে এক একরে ২৪০টা গাছ বসিবে। ২০০ একর জমি না হইলে একটা ছোট খাট কর্পূরের আবাদ হয় না। ৫০০ একর জমি হইলে তবে লাভ বেশ বুঝিতে পারা যায়।

কর্পূরের ব্যবসায় লাভ আছে, কর্পূর অনেক কাজে ব্যবহার হয়। জাপান গভর্ণমেণ্ট অনেক কর্পূরের আবাদ করিতেছেন। কর্পূরের মূল্য অধিক—লাভের কাজ কে ছাড়ে? ভারতবর্ষে কর্পূরের আবাদ চলিতে পারে। ভারতে ৫০০ একর জমি সংগ্রহ করা কঠিন নহে। ধনী ও কাজের লোক একত্রে কাজে লাগিলে কোন কার্য্যই আটকাইবে না এবং লাভও হইবে।

লবঙ্গ—আফ্রিকার পূর্ব্বদিকে ভারত মহাসাগরে জাঞ্জিবার দ্বীপের উত্তর পেম্বা দ্বীপে অবস্থিত। এই দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে লবঙ্গ উৎপন্ন হয়। লবঙ্গ তরু শ্রেণীতে দ্বীপটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। দ্বীপের বেলাভূমি সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, ছোট, বড় কত স্রোতস্বিনী উর্দ্ধ, অধঃ উপত্যকা প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিতেছে, কদলীকুঞ্জ বেষ্টিত কুটীর ও পল্লীশ্রেণী অনতিদূরে, বিপুল বিস্তৃত অরণ্য, দ্বীপটির সুন্দর শোভা বড়ই চিত্তাকর্ষক।

এই দ্বীপে লবঙ্গ বৃক্ষ স্বভাবতঃ জন্মায়, লবঙ্গ ব্যবসায়ে লাভ দেখিয়া দ্বীপবাসীগণ লবঙ্গের আবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক্ষণে ইহা লবঙ্গের প্রধান আবাদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বাণিজ্য হিসাবে দেখা যায় যে, পৃথিবীর মোট

উৎপন্ন লবঙ্গের প্রায় ⅘ ভাগ পেম্বা ও জাঞ্জিবার দ্বীপ দ্বয় হইতেই সংগৃহিত হয়। এখানকার বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলেই লবঙ্গ আবাদে লিপ্ত।

লবঙ্গ বৃক্ষগুলি বহুশাখা প্রশাখা যুক্ত হয় এবং উচ্চতায় ৬০।৭০ ফিটের কম নহে। বৃক্ষ গুলি বড় ঘন সন্নিবিষ্ট—এমন কি লবঙ্গ কুঞ্জের মধ্যে সূর্য্য রশ্মী প্রবেশ করিতে পারে না।

লবঙ্গ বৃক্ষের পাতাগুলির উপরিভাগ কাঁটাল পাতার মত মসৃণ ও উজ্জ্বল, প্রায় গোলাকার। গাছগুলি চির-সবুজ বর্ণ ধারণ করিয়া আছে। লবঙ্গগুলি বিকাশোন্মুখ পুষ্পমুকুলমাত্র, উহাদের রঙ প্রথমাবস্থায় ধুসরবর্ণ থাকে পরে বিবর্ণ হইয়া পাটল বর্ণ ধারণ করে। এক একটি স্তবকে ৮।১০ হইতে ১৫।১৬ টি মুকুল থাকে। মুকুল গুলি ফুটিতে দিলে লবঙ্গের মূল্য কমিয়া যায়। সকলেই দেখিয়াছেন যে, লবঙ্গের অগ্রভাগে একটি গোলাকৃতি অস্ফুটন্ত কলিকা থাকে। ফুল ফুটিলে পাপড়ি গুলি ঝরিয়া পড়ে, সেইজন্য ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে লবঙ্গ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে।

গাছে মুকুল ধরিবার পাঁচ মাস পরে চয়ন কার্য্য আরম্ভ হয়। তিন মাস যাবৎ চয়ন কার্য্য চলিতে থাকে। এক একটি গাছ একবারে শেষ করা হয়। এক গাছে একবার মাত্র লবঙ্গ সংগ্রহ করা হয়, কখন বা দুই তিন বার হইয়া থাকে, ইহা কিন্তু সাধারণ নিয়ম নহে। পরিত্যক্ত মুকুলগুলি বড় হয় ও প্রস্ফুটিত হয় ও বীজ উৎপাদন করে। এই গুলি হইতে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

স্ত্রী পুরুষ সকলেই লবঙ্গ চয়ন করে, বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ছোট আঁকুষির সাহায্যে ডাল পালা নোয়াইয়া লবঙ্গ গুচ্ছগুলি ছিঁড়িয়া লয় এবং সঙ্গে যে থলে থাকে তাহাতে রাখে। খুব প্রাতে চয়ন আরম্ভ হয় অপরাহ্ণ দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত এই কার্য্য চলিতে থাকে। সংগৃহিত গুচ্ছগুলি সুপরিষ্কৃত চত্বরে ফেলিয়া শুকান হয় ও বাছাই কার্য্য চলিতে থাকে। লবঙ্গ বাছিয়া লইয়া বৃন্ত গুলি এক পাশে জমা করা হইয়া থাকে। সে গুলিও বিক্রয় হয়, লবঙ্গ যদি টাকায় এক সের বিকায় তবে ঐ গুলি অন্ততঃ দুই আনা সের বিকাইবে। বাছাই লবঙ্গ গুলি চেটাইয়ের উপর বিছাইয়া ক্রমাগত শুকাইতে হয়—কাঁচা থাকিলে পচিয়া যাইবে। কাঁচা লবঙ্গের গন্ধ মধুর কিন্তু শুকান লবঙ্গে গন্ধ উগ্র।

লবঙ্গ কাঁচা থাকিবে না অথচ একবারে নিরস হইয়া যাইবে না। খুব নিরস হইলে লবঙ্গের গুণ কমিয়া যায়। শুষ্ক লবঙ্গগুলি বস্তাবন্দী হইয়া নৌকা যোগে জাঞ্জিবারে চলিয়া যায়। জাঞ্জিবারে উহা বিক্রয় হয়। জাঞ্জিবার গবর্ণমেণ্ট লবঙ্গ ব্যবসা হইতে অনেক পয়সা পান। ভারতবর্ষে লবঙ্গ আবাদ হইতে পারে কি না ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরীক্ষা হইলে ভাল হয়।

সার-সংগ্রহ

ঢাকাই মস্‌লিন্

ঢাকা জেলার মধ্যে ঢাকা, সোণারগাঁ, ডুমরোয়, তীতবাদী, জঙ্গলবাড়ী, বাজিতপুর, কাপাসিয়া প্রভৃতি স্থান কার্পাস শিল্পের আড়ঙ ছিল।

ঢাকার বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি প্রসিদ্ধ পর্য্যটক্ টেভার্নিয়েরর ভ্রমণকাহিনীতে লিপিবদ্ধ দেখা যায়। এই ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হইয়া ঢাকায় সর্ব্ব দেশের লোক সমবেত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফারসী ও জার্ম্মানী প্রধান। ১৮৫০ সালে ঢাকার তন্তুবায় সংখ্যা ছিল ৭৫০ ঘর।

মুরাপাড়া,-বালিয়াপাড়া এবং লক্ষীয়া নদীতীরবর্ত্তী আরো কয়েকখানি গ্রামেও কয়েক প্রকারের মস্‌লিন্ প্রস্তুত হইত। বিক্রমপুরের অন্তর্গত আবদুল্লাপুরে অন্যান্য মহকুমায় মিশ্রিত একপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। কালোকোপা, জেলালপুর (ঢাকা), এবং ত্রিপুরার অন্তর্গত নারায়ণপুর, চাঁদপুর ও শ্রীরামপুরে মোটা কাপড় উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত তিন স্থান ব্যবসায়ের প্রধান আড়ঙ্ ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানার কুঠি হইতে মোটা কাপড় ও ছিট ইউরোপে প্রচুর রপ্তানি হইত।

তুলা

ঢাকার মস্‌লিনের জন্য তুলা সেই প্রদেশেই উৎপন্ন হইত। এই তুলার গাছ বাঙলার সাধারণ তুলা হইতে কিছু বিভিন্ন প্রকারের ছিল (See Roxburgh's Flora Indica, Vol. III., p. 184); সাধারণ তুলা অপেক্ষা ঢাকার তুলার আঁশ দীর্ঘ, সূক্ষ্ম ও কমল হইত। এই 'দেশী' তুলাকে সাধারণত 'ফোটি' বলিত। 'বৈরারতি' নামক তুলা হইতেও সূক্ষ্ম মস্‌লিন উৎপন্ন হইত, কিন্তু ঢাকায় ইহার অধিক আদর ছিল না। ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও উহারই শাখা নদী সকলের ধারে ধারে তুলার চাষ হইত। ১৮০০ সালের ঢাকার বাণিজ্য-রেসিডেণ্ট বলিয়াছেন যে ঢাকার ফিরিঙ্গী বাজার হইতে ইদিলপুর পর্য্যন্ত ৪০ মাইল ভূভাগে কার্পাসের চাষ হইত এবং ইহার তুল্য তুলা জগতে আর কুত্রাপি হইত না। লক্ষীয়া নদী হইতে ধলেশ্বরী রূপগঞ্জ পর্য্যন্ত ও রাজসাহীর (?) ভূষণা প্রভৃতি স্থানেও বিস্তৃত কার্পাস চাষ ছিল। বৎসরে দুইবার—এপ্রেল-মে ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে—তুলা জন্মিত। ধান কাটিয়া বিচালিতে আগুন লাগাইয়া সেই ছাই সার প্রাপ্ত জমি চষিয়া তাহাতেই তুলা বপন করা হইত। তুলার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ধান বা তিলের চাষ করা প্রথা ছিল। বীজের গায়ে যে তুলা লাগিয়া থাকে তাহা হইতেই মস্‌লিনের সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত হইত; তাহার পরের তুলায় মাঝারী সূতা ও তাহার পরের তুলায় মোটা সূতা হইত। একটি কার্পাস-কোষের মধ্যের তুলার এই তারতম্য টুকু ঢাকার তাঁতিরা ধরিয়া সূক্ষ্ম সূত্র উৎপাদনে চরম কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।

গ্রীষ্মের তুলা অপেক্ষা শারদী তুলা নিকৃষ্ট হইত। তুলার দাম গড়ে মণ প্রতি ৩৲ টাকা মাত্র ছিল।

গারো পাহাড়, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে 'ভোগ' নামক এক প্রকার মোটা তুলা জন্মিত। মৃজাপুর ও আরাকান হইতেও প্রচুর তুলা ঢাকায় আমদানি করা হইত। ব্রহ্মযুদ্ধের পরে (১৮২৩) আরাকান হইতে তুলার আমদানি বন্ধ হইয়া যায়।

কাট্না কাটা

কাপাসের কোয়া হইতে স্ত্রীলোকেরা তুলা বাহির করিয়া পরিষ্কার করিত। বোয়াল মাছের কানকো ও দাঁত চিরুণী রূপে ব্যবহৃত হইত। চালতা গাছের কাঠে তৈয়ারি তক্তার উপর তুলা রাখিয়া একটা লৌহশলাকায় তুলার জড়াইয়া জড়াইয়া আঁশ হইতে বীজ ছাড়ান হইত। তৎপরে একটা ধনুক দিয়া তুলা ধুনিত হইত। পেঁজা তুলা গোলা কাঠের গায়ে জড়াইয়া কাঠ খুলিয়া জড়ান তুলা দুইখান তক্তার মধ্যে চাপিয়া রাখা হইত। তার পরে নলীতে জড়াইয়া কুঁচে মাছের নরম চামড়ায় ঢাকিয়া রাখা হইত, যেন ধুলা মাটি লাগিয়া ময়লা না হয়।

সমস্ত সূক্ষ্ম সূত্র হিন্দুমেয়েরা প্রস্তুত করিত। এই কাজে বিষম ধৈর্য্যের দরকার; ধৈর্য্যগুণে হিন্দুমেয়ে জগতে অপরাজিতা; ডাক্তার কুক্ টেলার বলিয়াছেন যে হিন্দুর মেয়েদের এমন একটি অনন্যসুলভ ক্ষীণভাবে স্পর্শ করিবার শক্তি আছে যাহাতে তাহাদের পেশীবলের অভাব পূরণ হইয়া যায়। ত্রিশ বৎসরের ন্যূনবয়স্কারাই সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তত করিতে পারে। সূতা তৈয়ারির তোড়জোড় একটী চুবড়ীতে থাকে; তোড়জোড়ের প্রধান—'পুনি' (তুলার নলী), হাল্কা লোহা বা বাঁশের টাকু, কাদায় বসান একটা ঝিনুক বা শামুক; একটা ছোট পাথর বাটীতে একটু চা খড়ি গুঁড়া। টাকু একটা মোটা সূচের মত, তলার দিকে একটা বড় মটরের মত একটু মাটি লাগান। সূত্রবয়নকারিণী বসিয়া বামহস্তে তুলার নলী ধরিয়া থাকে ও মাটিতে আটকান ঝিনুকের খোলের উপর টাকু একটু কাত করিয়া রাখিয়া ডাহিনহাতের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে পাক দিয়া তুলার এক একটি আঁশ টানিয়া সূতা প্রস্তুত করে। মধ্যে মধ্যে আঙ্গুলে খড়ির গুঁড়া লাগাইয়া লয়। খানিক সূতা পাকান হইলে তাহা টাকু হইতে খুলিয়া নাটাইয়ে জড়াইয়া রাখা হয়। বাতাস জলীয়বাষ্পশূন্য থাকিলে সূতা ভাল হয় না; এইজন্য সূত্রবয়নের সুবিধাজনক সময় প্রাতঃকাল বা বৈকাল ও সন্ধ্যা। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সূক্ষ্মতম সূত্র বয়ন করা হয়। যদি প্রাতঃকালেও বাতাস শুষ্ক বোধ হয় তবে একটা চিটকে পাত্রে জল রাখিয়া তাহার উপর সূতা পাকান হয়, পাত্রের জল গরমে বাষ্পীভূত হইয়া তুলার আঁশ সরস রাখে।

পূর্ব্বে দিল্লীর দরবারে যে সূত্র প্রেরিত হইত তাহার ১৫০ হাত সূতার ওজন হইত গড়ে ১ রতি মাত্র। ১৪০ হাতে ১ রতি যে সূতা তাহার 'পড়েন' ও ১৬০ হাতে ১ রতি ওজনের সূতার 'টানা' করা হইত। সোণারগাঁয় ১৭৫ হাত সূতার ওজন ১ রতি হইত। ১৮৪৬ সালে এই বক্ষ্যমান পুস্তক রচয়িতা রেসিডেণ্ট সাহেব দেখিয়াছিলেন যে আধসের তুলা হইতে ২৫০ মাইল লম্বা সূতা তৈয়ারী হইয়াছিল। ডাক্তার কুক টেলার বলিয়াছেন যে অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত এই সকল সূতার অসমতা ও বন্ধুরতা পরিলক্ষিত হয় না; হিন্দু রমণীর স্পর্শানুভাবকতা এত সূক্ষ্ম। একজন বয়নকারিণী প্রত্যহ প্রাতঃকালে সূতা কাটিলে মাসে এক তোলা সূতা

কাটিতে পারে। এই চরম পরিমাণ। সুসূক্ষ্ম সূত্রের এক তোলার দাম ৮৲ টাকা মাত্র।

মোটা 'ভোগা' তুলার সূতা চরকায় কাটা হয়। এই তুলা ধুনুরীরা পিঁজিয়া ধুনিয়া দেয়।

বয়ন,—মসলিন বয়নের কয়েকটি ক্রম, যথাঃ—সূতার পাইট ও সূতা গুটান, টানা খাটান, টানায় নলী পরান বা সানা দেওয়া ও বয়ন।

সূতা প্রথমে নলীতে জড়ান থাকে বা ফেটির আকারে থাকে। সেই সূতার নলী বা ফেটি জলে ভিজাইয়া দেয়। তার পরে একটা কাঠির মধ্যে পরায়, কাঠিটা এমন হওয়া চাই যেন নলীটা তাহার উপর ঘুরিতে পারে; একটা বাঁশের বাখারী অর্দ্ধেক চিরিয়া ফাঁক করিয়া তাহার মধ্যে কাঠিশুদ্ধ নলী আটকাইয়া বাঁ পায়ের বুড়া অঙ্গুলের ফাঁকে চাপিয়া ধরিয়া নাটাইয়ে সূতা জড়াইয়া লয়; নাটাই একটা নারিকেল মালার উপর রাখিয়া ডান হাতে পাক দেয়, বাঁ হাতে নলী হইতে সূতা খুলিয়া লয়।

টানার সূতা তিন দিন জলে ভিজান থাকে; প্রত্যহ দুইবার জল বদল করা হয়। চতুর্থ দিনে সূতার ফেটি জড়াইয়া তাহার মধ্যে দুইটা লাঠি দিয়া জোরে মোড়া দিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হয়। তার পরে রান্নার হাঁড়ির তলার ভুষাকালী মিশ্রিত জলে মোড়া খুলিয়া সূতা ডুবাইয়া দুই দিন রাখিয়া দেওয়া হয়, তারপর জল নিংড়াইয়া কাঠিতে টাঙাইয়া ছায়ায় শুকাইতে দেয়। আবার শুকাইলে এক রাত্রি জলে ভিজাইয়া রাখে। তৎপর দিন একটা পিড়ির উপর সূতা খুলিয়া খৈয়ের মাড়ের সঙ্গে গুঁড়া চূণ মিশাইয়া সূতায় মাখান হয়। মনুর সময় হইতে সূতায় ধানের মাড় দেওয়া ভারতে প্রচলিত দেখা যায়। তার পরে নাটাইয়ে জড়াইয়া জড়াইয়া রৌদ্রে দেয়। তৎপরে সূতার শ্রেণী বিভাগ করে; অতি সূক্ষ্ম সূতা টানার ডাহিন দিকে, তার চেয়ে একটু মোটা বাম দিকে, তার চেয়ে মোটা মধ্য স্থলে দেওয়া হয়। এই হইল সাদা মসলিনের টানা। ডুরে মসলিনের জন্য দুই খেই সূতা একত্র পাকাইয়া একটা ডুরের টানা করে; এবং চারখানা মসলিনে চারখেই একত্র পাকায়।

পোড়েন বা ভরণার সূতা আগে প্রস্তুত করে না। বয়ন আরম্ভের দুই দিন আগে প্রস্তুত করে। এক দিনের কাজ চলে এতখানি সূতা ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখে। পর দিন জল শুকাইয়া মাড় দিয়া লয়। যতদিন না কাপড় বোনা শেষ হয় ততদিন রোজকার সূতা রোজ প্রস্তুত করিতে থাকে।

টানার স্থান তাঁতির গৃহের সন্নিহিত কোন গাছতলায় ফাঁকা জায়গায়। ৪টা খুঁটা পুঁতে, খুঁটার মধ্যে মধ্যে দুটা দুটা করিয়া শরকাটি পুঁতে। তাঁতি দুই হাতে দুইটা সূতার নাটাই লইয়া সেই খোঁটা ও কাঠির গায়ে জড়াইয়া জড়াইয়া দেয়। তার পরে সানা পরায়। একটা বেতের এক মুখ থেঁতো করিয়া সেই কুঁচি দ্বারা সূতার জোট ছাড়াইয়া দেয় (ইহাকে 'ঝাড়নি' বলে) এবং 'জোয়া' নামক ধনুকাকৃতি বেত দিয়া সূতা গুলিকে সমান্তরাল করিয়া দেয়। তৎপরে একটা দাণ্ডার গায়ে সেই সূতার টানা জড়াইয়া গৃহে আনে। তাঁত তাঁতির গৃহমধ্যেই থাকে।

চার কোণে চার খুঁটি পোঁতা থাকে, খুঁটির উপর লম্বালম্বিভাবে দুইটা বাঁশ বাঁধা থাকে, তাহার উপরে তাঁতের 'দাণ্ডাদড়ি' আশ্রিত থাকে।

মাকু সুপারি কাঠে প্রস্তুত হয়, দুই কোণে লোহা বাঁধান থাকে। মাকুর মধ্যে ছিদ্র থাকে, সেইখানে সুতার নলী পরান হয়, এবং নলীর সুতা মাকুর কোণের এক ছিদ্রের মধ্য দিয়া খুলিয়া খুলিয়া বাহির হইয়া যায়। টানার সুতার মধ্য দিয়া মাকু একদিক হইতে অপরদিকে যাতায়ত করিতে থাকে ও নলীর সুতা খুলিয়া ভরণা বয়ন করে। ভারতের হিন্দু তন্তুবায়দিগের মাকু চালাইবার অসাধারণ ক্ষমতা। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অর্ম্মে বলেন, যে যন্ত্র লইয়া হিন্দু তাঁতি সুসূক্ষ্ম মসলিন বয়ন করে, সেই যন্ত্রে য়ুরোপীয় তাঁতির অনমনীয় মোটা আঙুল মোটা ক্যাম্বিশ গড়া বুনিতে পারে কি না সন্দেহ। বয়নের সময় ঘর্ষণ অতিক্রম করিবার জন্য মাকু, নলী প্রভৃতিতে তৈল মাখাইয়া দেয় এবং একটা নল থেঁতো করিয়া সেই কুঁচি সর্ষপ তৈলে ডুবাইয়া মাঝে মাঝে টানার উপর বুলাইয়া দেয়। ১০।১২ ইঞ্চি কাপড় বুনা হয় আর তাহার উপর একটু করিয়া চূণের জল ছড়াইয়া 'নাটানারদে' জড়াইয়া রাখে। দ্বিপ্রহরে কাপড় ভালো হয় না, এজন্য প্রাতঃ সন্ধ্যায় তাঁতিরা কাপড় বুনিয়া থাকে। আষাঢ় শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বায়ুমণ্ডল জলবাষ্প পূর্ণ থাকে, ঐ তিন মাসেই বস্ত্র বয়নের উত্তম সময়। গরম শুখার সময় তাঁতের নীচে চিটকে পাত্রে জল রাখিয়া বাষ্প সংগ্রহ করে। বাষ্পাভাব হইলে সুতা ছিঁড়িয়া যায়।

শুধু টানা তৈয়ারি করিতে দুজন লোকের ১০ হইতে ৩০ দিন লাগে। দুজন লোকে বুনিতে আরম্ভ করিলে সাধারণ কাপড় ১০ হইতে ১৫ দিন, সূক্ষ্ম ২০ দিন, সুসূক্ষ্ম ৩০ দিন, অতি সূক্ষ্ম ৪০।৪৫ দিন এবং অতি সূক্ষ্ম ডুরে বা চারখানা বুনিতে ৬০ দিন লাগে। ৭০।৮০৲ টাকার মলমল খাস বুনিতে ৫।৬ মাস লাগে।

ফুলদার জামদানি কাপড় বুনিতে ফুলের নক্সা কাগজে আঁকিয়া সেই কাগজ টানার নীচে ধরে ও তাহারই রেখার অনুসরণ করিয়া ফুল বুনে।

কাপড়ের নাম ও প্রকার,—মসলিন সাধারণত ২০ গজ লম্বা ও ১ গজ চৌড়া হয়। মসলিনের দুই পাশে ছিলা থাকে। মিশরের মমী [অর্থাৎ রক্ষিত মৃতদেহ] শরীরে জড়ান কাপড় ঠিক মসলিনের মত ছিলাদার; হাজার হাজার বৎসর অবিকৃত রহিয়াছে। মসলিনের মধ্যে প্রধান গুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) মলমল খাস—অর্থাৎ খাস রাজারাজড়ার ঘরে ব্যবহারের জন্য। ইহাই 'আব্বি' অর্থাৎ ১০ গজ লম্বা ১ হাত চৌড়া। ওজন ৮ তোলা ৬ আনা মূল্য ১০০৲ টাকা। হাতের অঙ্গুরীয়ের মধ্য দিয়া গলিয়া যাইতে পারে। ইহাকে লূতাজালের সহিত তুলনা করিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা বড় ঘরের মেয়েরা পরিধান করিতেন। নগ্নতা নিবারিত কেমন করিয়া হইত ?

(২) ঝুনা—অর্থাৎ সূক্ষ্ম। দেশীয় নর্ত্তকী গায়িকারা এবং অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকারাই শুধু ব্যবহার করে। তিব্বতীয় 'দুলবা' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে—কলিঙ্গরাজ কোশলরাজকে এই বস্ত্র উপঢৌকন দিয়াছিলেন। এই বস্ত্র Gtsug-Dgah-mo নাম্নী এক ভিক্ষুণীর হস্তগত হয়; সে ইহা পরিধান করিয়া প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত হয়, তাহার নগ্নতা আবরিত হয় নাই। তদবধি ভিক্ষুণী-দিগের এই বস্ত্র পরিধান নিষিদ্ধ হইয়াছে। টেবার্ণিয়ে তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে

লিখিয়াছেন যে, এবংবিধ বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হইতে পারিত না, মোগল দরবারে ও দরবারী আমির ওমরাহদিগের জন্যই সমস্ত ক্রীত হইত। পুরস্ত্রীরা গ্রীষ্মকালের পোষাক করিতেন এই কাপড়ে এবং রাজারাজড়ারা এই বস্ত্রপরিহিতা রমণী লাস্তলিলা দেখিয়া বড়ই কৌতুক অনুভব করিতেন।

(৩) রং—ঝুনার মত উলঙ্গ বাহার কাড়।

(৪) আব্-রবান্-অর্থাৎ বহমান (রবান্) জল (আব্)। সম্রাট ঔরংজেব তাঁহার কন্যার পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে সকল অঙ্গ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে দেখিয়া কন্যাকে ভৎর্সনা করিয়া ছিলেন। কন্যা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে তিনি ত' আবরুর জন্য সাত সাতটা জামা পরিয়াছিলেন। নবাব আলীবর্দ্দি খাঁয়ের আমলে একখানা আব্রুয়াঁ কাপড় ঘাসের উপর মেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল সেই কাপড় ঘাসের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, একটা গাভী চরিতে চরিতে ঘাসের সঙ্গে গোটা কাপড় খানাই খাইয়া ফেলিয়াছিল।

(৫) সরকার আলি—প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের জন্য প্রস্তুত হইত।

(৬) খাসা—ইহার উৎকৃষ্টতম কাপড়ের নাম জঙ্গলখাসা।

(৭) শুব্-নাম—প্রভাত শিশির, বা শব্-নাম-সন্ধ্যার শিশির।

(৮) আলবল্লা—এই বস্ত্র গ্রীক যোদ্ধারা বর্ম্মের উপর পরিত ; সেই পরিচ্ছদের নাম ছিল 'আবোল্লা'।

(৯) তন্-জেব—তন্ মানে দেহ, জেব মানে অলঙ্কার।

(১০) তরহ্-উন্দাম—প্রায় উলঙ্গ (?)।

(১১) নয়ন-সুখ—নয়নানন্দকর বস্ত্র বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

(১২) বদন-খাস—কেবল দেহ, এই বস্ত্র পরিলে দেহ ভিন্ন বস্ত্র লক্ষ্য হয় না বলিয়া বোধ হয় এই নাম।

(১৩) শর্-কন্দ্—শিরোবন্ধন, পাগড়ীর কাপড়।

(১৪) সরবতী—সরবতের মত পাতলা ; বা শর্-বুটি—শিরোষ্টেন, পগড়ীর কাপড়।

(১৫) কামিজ— জামার কাপড়। জরির কাজ করা পোষাক পরিয়া তাহার উপর এই কাপড়ের 'জামা' (কুঞ্চিত, স্তর বিন্যস্ত আগুল্ফ লম্বিত এক প্রকার পরিচ্ছদ) পরিলে জরি সাটিনের জলুষ সাদা কাপড়ের সূক্ষ্ম-স্তর ভেদ করিয়া বাহির হইত ;—যেন বাষ্পভরা বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া নক্ষত্র দ্যুতির চমকানিটুকু, আধো গুপ্ত আধো ব্যক্ত।

(১৬) ডুরিয়া।

(১৭) চারখানা।

(১৮) জামদানি—লতা ফুলকাটা কাপড়। সম্রাট ঔরংজেবের জন্য ২৫০৲ টাকা ১ থান জামদানি তৈয়ার হইত। ঢাকার নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁর জন্য ফি থান ৪৫০৲ টাকা করিয়া পড়িত।

বাইবেল উল্লিখিত (Ezekiel xvi, 10, 13) মেশি নামক বস্ত্র বোধ হয় মসলিন (See Harris's *Natural History of the Bible.*) অতি পুরাকালে ভারতের এই বস্ত্র প্যালেষ্টাইনে নীত হইত ইহার প্রমাণ বাইবেলে ভূরি ভূরি

পাওয়া যায়। (Exodus 34, 24, 23)। খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে ভারত বিদেশকে বস্ত্র সরবরাহ করিত। অধ্যাপক উইলসন তাঁহার ঋগ্বেদ সংহিতার ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে ভারতীগণ শিল্পকুশলী সমুদ্রযাত্রিক ব্যবসায়ী জাতি ছিল। হায়, সে দিন আমাদের কেন গেল, আবার কবেই বা ফিরিয়া আসিবে!

ঢাকার কাপড়ের খ্যাতি রোমক দার্শনিকদিগের রচনায় ও জুভেনালের বঙ্গকবিতার মধ্যে দেখা যায়। প্রাচীনেরা এই বস্ত্রকে 'হাওয়ার কাপড়' (vantus textilis) আখ্যা দিয়াছিলেন। ঢাকার মসলিন গজ কতক ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় বলিয়া এই নাম হইয়াছিল না। হাওয়ার মত অদৃশ্য বলিয়া?

এরিয়ানের পুস্তকেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়। এরিয়ান মিশরবাসী গ্রীক, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর লোক। তুলাকে প্রাচীন লাটিন লেখকগণ বলিতেন 'কার্বসস,' হিব্রু 'কার্পাস,' পারস্য 'কার্বাস,' সংস্কৃত 'কার্পাস'।

দুইজন মুসলমান পরিব্রাজক বঙ্গীয় বস্ত্রের খ্যাতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (নবম শতাব্দী)। নবম হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ইহার কোন উল্লেখ আর দেখা যায় না। ১৫৮৬ সালে ইংরাজ পর্য্যটক র‍্যালফ্ ফিচ সোনারগাঁয়ের মসলিনকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান বঙ্গের বস্ত্রশিল্পের বিশেষ সাহায্যকারিণী ছিলেন। তাঁহার সময়ে ঢাকার সূতি কাপড় ও মালদহের রেশমী কাপড় রাজদরবারের প্রধান পরিচ্ছদ বলিয়া গণ্য হইত।

সূক্ষ্ম মসলিনে হাজার হইতে দেড়হাজার সুতার টানা থাকে। মসলিনে দুই আড়াই হাজার সুতার টানা পর্য্যন্ত থাকিলেও তাহার সূক্ষ্মতা অন্য দেশের কারিগরের অনায়ত্ত।

ঢাকায় মসলিন ভিন্ন নিম্নলিখিত বস্ত্র সকল বয়ন করা হইত:—

(১) বাফতা—পারস্য শব্দ মানে 'বোনা'। ট্যাভার্নিয়ে ইহার দুই থান প্রায় ১৫০৲ টাকায় জোড়চে বিক্রি হইতে দেখিয়াছিলেন। হিন্দু স্ত্রীলোকের পরিধেয়।

(২) বুন্নি—লাল বা কালো পাড়ওয়ালা। মুসলমান মহিলার পরিধেয়।

(৩) একপাট্টা—উড়নি রূপে ব্যবহৃত হইত।

(৪) জোড়—ব্রাহ্মণের পরিধেয়।

(৫) শাড়ী—পাড়ওয়ালা পরিধেয়।

(৬) ধুতি—ধৌত করা যায় বলিয়া এই নাম।

(৭) হাম্মাম—স্নানের সময়ের জন্য, মোটা কাপড়। শীতের সময় উড়ানিও হয়।

(৮) গামোছা।

(৯) গজি, গড়া—দরিদ্রের পরিধেয়। মৃতাবরণী।

মুগা রেশম মিশাইয়াও প্রায় ৩০ প্রকার কাপড় প্রস্তুত হইত। তন্মধ্যে প্রধান:—কুটাওরুমী, নওবুটি, আজিজুল্লা, লচক, কাশিদা, ফুলদার) এই সকল 'মালদীকী' (মালদহকী অর্থাৎ মালদহের) কাপড়ের অনুকরণ। এই সকল কাপড় আরব, ব্রহ্ম, মিশর, তুর্কী দেশে যাইত। মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে এই প্রকার মিশ্রিত উপাদানে বস্ত্রবয়ন প্রণালী মালদহ হইতে ঢাকায় প্রবর্ত্তিত হয়। মালদহের 'এলাচী' (তুপিঠ সমান) ও মশরু (সদর অন্দর পিটওয়ালা) কাপড় মুসলমান অধিকারের বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধ ছিল। রাণী হইতে দাসী পর্য্যন্ত সকলেই রেশমের বস্ত্র বয়ন করিত, কেহ হীন কাজ মনে করিয়া লজ্জা করিত না। পূর্ব্বকার

স্ত্রীলোকদিগের—কি হিন্দু কি মুসলমান—বস্ত্র বয়নই অবসরবিনোদন কার্য্য ছিল। ১৮২৮ সালে বিলাতী সুতা দেশে ঢুকিয়া শনৈঃ শনৈঃ সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কায়েস্থ পুরুষগণ ও এই ব্যবসায় করিতে হীনতা বোধ করিত না। তাঁতি ছাড়া যুগীরাও তাঁতের কাজ করিত।

বাগানের মাসিক কার্য্য

পৌষ মাস

সব্জী বাগান।—বিলতী শাক্-সব্জী বীজ বপন কার্য্য গত মাসেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন উদ্যানপালক এমাসেও পারস্লী (Parsley) বপন করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। কেবল বীজ বোনা কেন, কপি প্রভৃতি চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্যক মত জল দিবার জন্য মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে। সালগম, গাজর, বীট ওলকপি প্রভৃতি মূলজ ফসল যদি ঘন হইয়া থাকে, তবে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্র পাতলা করিয়া দিতে হইবে। আগে বসান জলদি জাতীয় কপির গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। গোড়া খুঁড়িয়া এই সময় কিছু খৈল দিয়া একবার জল সেচন করিতে পারিলে কপি বড় হয়।

কৃষি-ক্ষেত্রে।—আলু গাছে মাটি দিয়া গোড়া আর একবার বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটনাই আলুর ফসল প্রায় তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। এই সময় কিন্তু ফসল কোদালি দ্বারা উঠাইয়া না ফেলিয়া যতদিন গাছ বাঁচিয়া থাকে ততদিন অপেক্ষা করা ভাল। ইতিমধ্যে নিড়ানি দ্বারা খুঁড়িয়া কতক পরিমাণ আলু খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলুগুলি রাখিয়া বাকি গুলি তুলি৷ লওয়া যাইতে পারে। এই আলুগুলি তুলিয়া পরে গোড়া বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে গাছগুলি পুনরায় সতেজে বাড়িতে থাকে।আলু ক্ষেত্রে এমাসে দুই একবার আবশ্যক মত জল দেওয়া আবশ্যক। মটর মসুর, মুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাইট নাই। টেঁপারি ক্ষেতেও জল দেওয়া এই সময় আবশ্যক।

তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে শসা, লাউ কুমড়া ও উচ্ছে চাষের এই উপযুক্ত সময়।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

পঞ্চদশ খণ্ড,—৯ম সংখ্যা
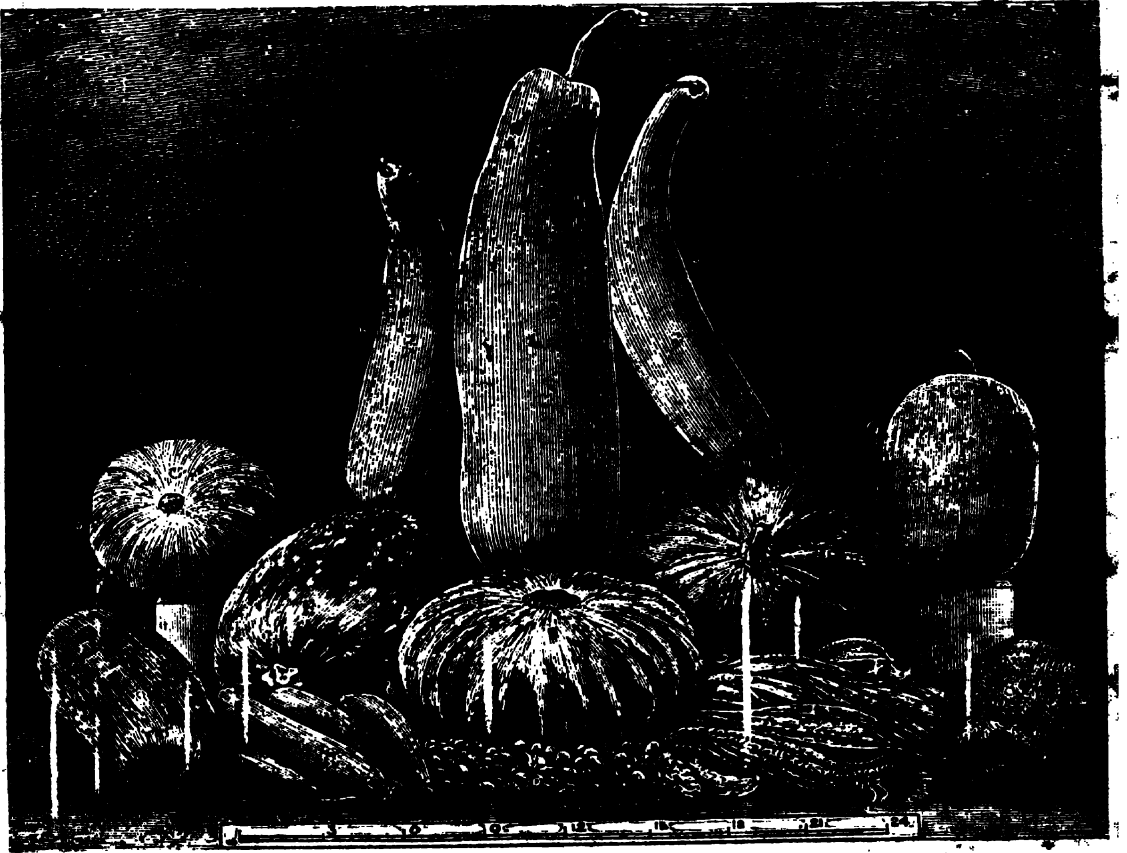
সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস

পৌষ, ১৩২১

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা, ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

কৃষক।

সূচীপত্র।

পৌষ ১৩২১ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ খণ্ড। } পৌষ, ১৩২১ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

বঙ্গের কৃষক

শ্রীপ্রসন্নকুমার বসু (টাঙ্গাইল) লিখিত

পল্লী-গ্রামই দেশের মেরুদণ্ড, আবার পল্লী গ্রামেই কৃষকের বাস। বাঙ্গালা দেশে হাজারকরা ৯৩৬ জন লোক পল্লী-গ্রামে বাস করে, অবশিষ্ট ৫৪ জন সহরে বাস করে, সুতরাং অতি সামান্য লোকেই সহরে বাস করিয়া থাকেন। যে ৯৩৬ জন পল্লী-গ্রামে বাস করেন তাঁহাদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশই কৃষি-জীবি। ইহাদের উপার্জ্জিত শস্যের উপরই কি পল্লীবাসী কি সহরবাসী সকলকার জীবীকা নির্ভর করিতেছে। সুতরাং বলিতে গেলে ইহা অতি সত্য কথা যে কি সহরবাসী কি পল্লীবাসী কৃষকগণই সকলকার অন্নদাতা।

এই কৃষকগণের এবং ইহাদের কৃষির অবস্থা শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমরা ক্রমে দেখাইতে প্রয়াসী হইব পল্লী-গ্রামের কৃষককুল যে যে শস্যাদির আবাদ করিয়া থাকে, তাহারা কি প্রণালী অবলম্বন করিলে সহজে অধিক পরিমাণে শস্য উপার্জ্জন করিতে পারে ও স্বীয় স্বীয় অবস্থায় উন্নতি করিতে পারে।

যাহারা আমাদের একমাত্র অন্নদাতা তাহাদের তাচ্ছল্য করিলে চলিবে না। তাহাদের উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে আমাদেরও উন্নতি ও অবনতি হইবে ইহা নিশ্চিত কথা। যাহাদের সঙ্গে জনসমাজের এই সম্বন্ধ তাহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা ও যত্ন করা প্রত্যেক শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের মধ্যে যাঁহারা সহরে বাস করেন, বিশেষতঃ কলিকাতাতে, তাঁহারা কৃষককুলের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কবি যথার্থ বলিয়াছেন।

"ভোজনে নিপুণ বটে অন্ন রুটি ডাল,
কিসে জন্মে জিজ্ঞাসিলে ঘটিবে জঞ্জাল"।

কলিকাতা সহর বাসী অনেকের কথা ঠিক এই প্রকার। দেশের শিক্ষার অবস্থা আমরা সকলেই জানি শতকরা ৫ জন লোক যে দেশে লেখা পড়া (অর্থাৎ সামান্য বর্ণ জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহাদের লইয়া) জানে, সে দেশের কৃষকগণ লেখাপড়া শিখিয়া উন্নত প্রণালীর কৃষি-বিদ্যা কবে শিক্ষা করিবে তাহা আমরা ভাবিতেই পারি না।

বঙ্গের অভাব অভিযোগের পার নাই, অনন্ত অভাব সম্মুখে বিদ্যমান। কি প্রকারে আমাদের ইহা দূর হইতে পারে তাহা আমরা জানি না। নিরক্ষর ৯৫ জন তো নিজের অভাবই অনুভব করিতে পারে না।

ম্যালেরিয়াতে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। বঙ্গের এমন পল্লী নাই যে পল্লীতে ম্যালেরিয়া রাক্ষসী প্রবেশ না করিয়াছে। ম্যালেরিয়াতে আমাদের অন্নদাতা কৃষক-কুল বেশী উৎসন্ন যাইতেছে।

পল্লী-গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। অবিশুদ্ধ জল পান করিয়া প্রতিনিয়ত লোকে ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, উদরাময় প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। কে ইহাদিগের পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়া দিবে ?

ঋণে পল্লী-বাসী জর্জ্জরিত, অনেক কৃষক ঋণ ভারে মাথা তুলিতে পারিতেছে না মহাজনের ঘরে জোত জমী সব বাঁধা। শস্যাদি বিক্রয় উপার্জ্জিত অর্থ মহাজনগণকে দিয়াও নিস্তার নাই। সুদই অনেকে দিতে পারে না আসল তো পরের কথা। এই প্রকার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

কৃষকদের অবস্থা ভাবিতে গেলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে, চক্ষু জলধারা রক্ষা করিতে পারে না। ইহাদিগকে রক্ষা করিতে না পারিলে, গবাদি পশুর উন্নতি বিধানে, সমবেত ঋণ দান সমিতি স্থাপনের আবশ্যকতা, বালক বালিকা দিগকে শিক্ষা দান, চাষ ইত্যাদির জন্য উৎকৃষ্ট বীজ রাখার উপায় ও তাহার বন্দোবস্ত, গোময় ছাই ইত্যাদি সহজলভ্য সার রক্ষা ও তাহার প্রয়োগ ইত্যাদি শিক্ষার বন্দোবস্ত হইতে পারিবে না।

ইহা শুধু কাগজে কলমে লিখিয়া সংবাদ পত্র স্তম্ভে প্রকাশিত করিলে চলিবে না অথবা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিলেও হইবে না। এই নিরক্ষর কৃষক-কুল যাহারা দিবা রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, রৌদ্র বৃষ্টিতে পুড়িয়া ভিজিয়া আমাদের অন্ন যোগাইতেছে, আমাদের মুখে শাক শব্জী, ফল মূল প্রতিনিয়ত উঠাইয়া দিতেছে তাহাদের দিকে কে তাকাইবে ? আমরা এবিষয়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজকে দায়ী করিতেছি। কৃষক পত্রের গ্রাহকগণ অবশ্য অনেকেই কৃষি ও কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা চিন্তা করিয়া থাকেন। তাই তাঁহা-

দিগকেও এই কার্য্যে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা কৃষক-কুলের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া কোথায় কি অভাব তাহার অনুসন্ধান করুন। গ্রামে কত অল্প শিক্ষিত লোক আছেন তাঁহারা কৃষকদের লইয়া অবৈতনিক অথবা স্বল্প বেতনে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করুন। তাহাদিগকে স্বাস্থ্যতত্ব, বিশুদ্ধ পানীয় জলের উপকারিতা, গবাদি পশুর উন্নতি বিধান ও তাহাদের জন্য গোচারণের মাঠ রাখা, জল নিঃসরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা, গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করা, বীজ শস্য রক্ষার উপায়, গৃহাদি পরিষ্কার রাখার আবশ্যকতা, সন্তান সন্ততিদের শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি শিক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হউন।

বাঙলায় কৃষক-কুলের এবং কৃষির কি প্রকারে উন্নতি হইতে পারে ভাবিতে গেলে বাঙলায় প্রধান খাদ্য শস্য ধান্য আবাদের উন্নতির দিকে আগে নজর পড়ে। ধানের আবাদ প্রণালী সম্বন্ধে "কৃষকে" কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। সেই সম্বন্ধে ক্রমে তাঁহারা আরও আলোচনা করিবেন এরূপ আশা করা যায়।

ধান—ভাতই বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। এইজন্যই বোধ হয় আমরা "ভেতো বাঙ্গালী" বলিয়া অভিহিত হইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধে এক রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় গড়ে ভারতবর্ষে বৎসরে ৭৬ কোটী মণ চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইংরেজ শাসিত ভারতে চাষের জমীতে এক তৃতীয়াংশ ধানের চাষ হয়। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার এগার কোটী বিঘার উপরে সুধু ধানেরই চাষ হইয়া থাকে।

এই ধান প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। আউশ এবং আমন তাহা সকলেই জানে। আউশের অপর নাম আশুধান্য অর্থাৎ যে ধান শীঘ্র শীঘ্র ফলে। আমন অর্থাৎ হৈমন্তিক ধান্য বিলম্বে ফলে। ধান সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা বোধ হয় এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আশুধান্য বর্ষা অথবা বন্যার জলের অপেক্ষা করে না। সামান্য দোয়াঁস জমীতেই আশুধান্য ফলিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টির জল পাইলেই বেশ্ আশুধান্য জন্মে। পূর্ব্বে এই আশুধান্য পূর্ব্ববঙ্গেই অধিক পরিমাণে আবাদ হইত। এইরূপ এখন পশ্চিম বঙ্গেও বেশ্ আবাদ হইতেছে। ভাগলপুর ও মুঙ্গের অঞ্চলে একপ্রকার আশুধানের আবাদ হইয়া থাকে, তাহা এত মিহি ও সুন্দর যে তাহা আশুধান্য বলিয়া মনেই হয় না। কলিকাতা কৃষি বিভাগ হইতে উহা স্বদেশী মেলাতে প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এই প্রকার ধানের আবাদ যাহাতে খুব বেশী পরিমাণে হয় সেইজন্য কৃষি বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারায় অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহারা আমাদিগকে ২।৩ প্রকার সরু আশুধান্যের নমুনা দিয়াছিলেন। উক্ত ধান্য কালজিরা ও রামসাইল এবং কামিনী ধান্য জাতীয়।

সাধারণতঃ আশুধান্য একটু মোটা এবং দুষ্পাচ্য বলিয়া ভদ্রলোকে প্রায় আহার করেন না কিন্তু ইহা অতি সুস্বাদু এবং বলকারী। কৃষকগণ অতি

আনন্দের সহিত আহার করিয়া থাকে। ইহার পান্তাভাত অতি উপাদেয়। ইহাতে অতি সুন্দর চিঁড়া প্রস্তুত হয়।

সাধারণতঃ ফাল্গুন, চৈত্র মাসের মধ্যে ইহার বুনানি শেষ হয়। জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মাসেই আশুধান্য পাকিয়া থাকে। অল্প দিনে এই ধান পাইয়া চাষীরা কত আনন্দ ও উপকার বোধ করে তাহার বর্ণনা করা যায় না। যেন তাহারা হাতে স্বর্গ পায়। যে ভূমিতে জল আটকায় তাহাতে আশুধান্য ভাল হয় না। বন্যার জল আসিবার পূর্ব্বেই আশুধান্য কাটা শেষ হয়।

পেঁপের বাগান

কলম করা বৎসরী পেঁপে গাছ

পেঁপের (Carica papaya) মত এত শীঘ্র জন্মিতে বা এত বেশী বেশী ফল ফলিতে অন্য কোন ফল-গাছ দেখা যায় না। আম, লিচু, জাম, জামরুলের কত রকমে কলম করার পন্থা বাহির হইয়াছে, তাহাদের আবাদের কতই উন্নতি হইল কিন্তু এত গুণের পেঁপের আজও পর্য্যন্ত কেবল বীজ হইতেই গাছ হইতেছে।

পেঁপে হয় না এমন স্থান খুব কম। ভূপৃষ্ঠে যেখান টুকু অরণ্য দ্বারা আচ্ছাদিত নহে এমন সকল স্থানেই পেঁপে গাছ জন্মিতেছে। পেঁপে বোধ হয় দক্ষিণ আমেরিকার আদীম অধিবাসী। কলম্বসের কল্যাণে এখন ইহা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ মাত্রেই পেঁপে আছে এবং মানুষে যে কত পেঁপে প্রতি বৎসর উদরসাৎ করে তাহা গণনা করা যায় না।

পেঁপের যে অনেক গুণ, তাই মানুষে পেঁপের এত অত্যধিক আদর করে। পেঁপের দুধের ন্যায় শাদা আঠাতে মাংস সহজে জীর্ণ হয়। পেঁপের পাতারও নাকি এই গুণ আছে। পেঁপে পাতায় মাংস বাঁধিয়া রাখিলে অতি বড় শক্ত মাংস কচুর মত নরম হইয়া আসে। দুগ্ধবৎ শাদা আঠাতে পেপিন নামক পদার্থ আছে বলিয়া এই রকম হয়। এই উদ্ভিজ্জ পেপিন জান্তব পেপিনের তুল্য। সুধু ফলের জন্য যে এখন পেঁপে চাষ তা নহে, পেপিনের জন্য পেঁপের আবাদ খুব বাড়িতেছে।

গ্রীষ্ম প্রধান ও নাতি শীতোষ্ণ প্রদেশে পেঁপের আবাদ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিলেও পেঁপের আবাদের কোন উন্নতি এতাবৎকাল হয় নাই। বীজ হইতে চারা উৎপন্ন ছাড়া কলম প্রভৃতি উপায় দ্বারা পেঁপে গাছ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা কেহ কখন করে নাই। একটা পেঁপের ভিতর যে বীজগুলি থাকে তাহা হইতে পুং স্ত্রী দুই রকমই গাছ হয়। অধিকাংশ চারা নিস্তেজ ও রুগ্ন হয়, কদাচিৎ ভাল চারা

যোড় কলমের পেঁপে গাছ
সন্থ বৎসরে গাছ তৈয়ারি হইয়া ফলবতী হইয়াছে।

হইলেও তাহার ফল মাতৃ-বৃক্ষের সমতুল্য খুব কমই হইয়া থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, যেখানে পেঁপে গাছ যথা তথা জন্মায় সেখানে লোকে পেঁপের কলম করিবার কথা আদৌ মনেই করে না। শীতপ্রধান দেশের লোকেরা কাঁচের ঘরের ভিতর পেঁপে গাছ পালন করিতে করিতে পেঁপে গাছের কলম করিবার কথা ভাবিল। পেঁপের ডাল কাটিয়া বসাইলে ও চোক কলম কিম্বা যোড় কলম হইতে পারে কি না চিন্তা করিতে লাগিল। তাহাদের চেষ্টা ক্রমে ফলবতী হইল।

পেঁপের কটিং—জ্যামেকার এস্‌টন নামক এক ব্যক্তি কটিং হইতে চারা উৎপন্ন করিতে পারিল। অবশেষে সকলে দেখিল এই প্রকারে চারা প্রস্তুত করা বড় বেশী শক্ত ব্যাপার নহে। কিন্তু ইহাতে একটি অন্তরায় আছে। কটিং হইতে গাছ তৈয়ারি করিতে অনেক সময় লাগে। জোড় কলমে শীঘ্র গাছ হয়। শীত প্রধান স্থানে যেখানে প্রতি বৎসর তুষার পাত হয়, তথায় ১৫ মাসের মধ্যে ফল পাকাইয়া লও-য়াই সুবিধা নতুবা সাধের ফল ভোগ হয় না। কলম করিলে এই অসুবিধা দূর হয়, সদ্যজাত গাছ হইতে ১৫ মাসের মধ্যেই ফল হয়, তাই উদ্যোগী পুরুষেরা পেঁপের কলম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

১ম চিত্র
পেঁপে গাছের গাত্র হইতে শাখা বাহির হইয়াছে।

ফলের বাগান যাঁহারা করেন তাঁহারা চান গাছের ফল গুলির আকার, রঙ, ওজন, স্বাদ এক রকমই হউক এবং ফল গুলি এক সময়েই পাকুক। এই হেতু আধুনিক উদ্যান পালকের নিকট আঁঠির চারা অপেক্ষা কলমের চারা অধিক আদৃত। কোন উদ্যান পালকই এখন আম, লিচুর আঁঠির চারা পুতিয়া বাগান করিতে চান না, কেন না তিনি বার বার ঠকিয়াছেন, বাগান তৈয়ারি হইলে ফলের গুণ দেখিয়া শত করা ৫০,৬০টা গাছ তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। আরও এক কথা কেবল আঁঠির চারা বসাইয়া এত দীর্ঘকাল ফলের মুখ চাহিয়া কে বসিয়া থাকিতে পারে? কলির জীবের যে পরমায়ু কম, কলির মানুষ যে বড় চঞ্চল।

পেঁপে গাছের বীজের চারা অধিকাংশ খারাপ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। সকলেই দেখিতে পান যে পেঁপে যথা তথা জন্মিয়াছে। এই সকল বুনো পেঁপে গাছের ফুলের রেণু দ্বারা ভাল পেঁপে পুষ্পে সহজেই পরাগ সঙ্গম হয় সুতরাং ফল কখনই ভাল হইতে পারে না। অতএব ইহার প্রতিকার অর্থে পেঁপের যোড় কলমের সৃষ্টি।

পেঁপের যোড় কলম—দক্ষিণ ফ্লরিডায় ইহার পরীক্ষা রীতিমতই হইয়াছে। সেখানে কাঁচের ঘরের ভিতর চারা প্রস্তুতের কারখানা। ফেব্রুয়ারি মাসে বীজ পুতিয়া মার্চ্চমাসে পেঁপে চারা কলম বাঁধিবার উপযুক্ত হইলে কলম করিয়া টবে বসাইয়া এপ্রিল শেষে ঘর হইতে বাহিরে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। এই সকল গাছের বাড় বড়ই চমৎকার। যে বৎসর কলম করা হইল সেই নভেম্বর কিম্বা ডিসেম্বর মাসে বৃক্ষ ফলবান হইল এবং আগামী বসন্ত ও গ্রীষ্মকাল এমন কি শরত কাল পর্য্যন্ত ফল দিতে রহিল। তথায় ইহা দেখা গিয়াছে যে, এক একটি গাছ সদ্য বৎসরে দুই হইতে তিন ডজন ফল প্রসব করে এবং এক একটি পেঁপে ওজনে ২ হইতে ৩ পাউণ্ড হয়; ১৫ মাসে একটা গাছ হইতে ৪৮ হইতে ৭২ পাউণ্ড ওজনের ফল লাভ হইতে পারে। পেঁপে গাছ পুরাতন হইলে তাহার শিকড় গ্রন্থী ফোলা রোগ হয় সুতরাং পেঁপে গাছকে বৎসরী গাছ করিয়া তুলিতে পারিলে লাভ আছে এবং কলম করিলেই তাহা সম্ভব হয়। জ্যামেকায়, ফ্লরিডায় যাহা হওয়া সম্ভব তাহা ভারতেও হইতে পারে।
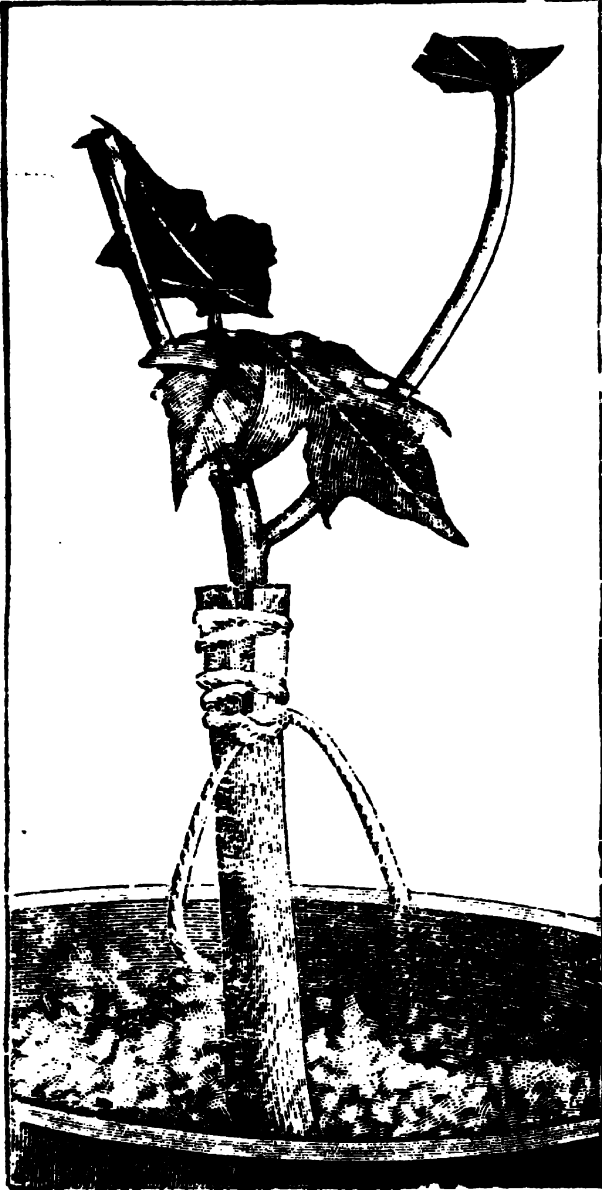
২য় চিত্র
পেঁপের গাছের যোড় কলম

পেঁপে গাছের শরীর পালন করিতে অধিক খাদ্যের প্রয়োজন হয়। সার গাদার উপর পেঁপে গাছগুলি কেমন সতেজ হয়। যেখানে মাটির উপরে সার না পায় সেখানে ইহা মাটির ভিতর বহুদূর পর্য্যন্ত শিকড় চালায় এবং ইতস্ততঃ চারিদিকে শিকড় বিস্তার করিয়া আহার অন্বেষণ করে। ইট বা পাথরের দেওয়ালের মধ্য দিয়া কি প্রকারে শিকড় চালাইয়া পেঁপে গাছ আহার সংগ্রহ করে তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনি ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। পেঁপে গাছের এই স্বভাবটি জানিতে পারিলে কোন উদ্যান পালক স্বভাবতই গোয়াল ঘরের ছাই, মাটি, গোময়, গোমুত্র মিশ্রিত মিশ্রসার পেঁপের গোড়ায় দিতে কৃপণতা করিবে না। এইরূপ সার প্রয়োগে গাছগুলি বেশ সতেজ ও খর্ব্বাকৃতি ঘটমত হইয়া উঠে।

ব্যবসায়ের জন্য পেঁপে বাগান করিতে হইলে উদ্যান পালককে মনে করিয়া রাখিতে হইবে যে, যে পেঁপের বেশ মৃদুগন্ধ তাহাই অনেকে খাইতে পসন্দ করে, উগ্রগন্ধ পেঁপে কেহ বড় খোঁজে না। জাহাজে দূর দেশে চালান দিবার পক্ষে বড় পেঁপে তত ভাল নহে। ১। ১॥ পাউণ্ডের বেশ সুগোল পেঁপেই কাগজে প্যাক করিয়া দূর দেশে পাঠাইতে ভাল। খুব পরিণত পেঁপে দেশান্তরে পাঠান যায় না। সম্পূর্ণ পুষ্ট হইয়াছে অথচ পাকিয়া এখনও হলুদে হয় নাই এমন সময় ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। পেঁপের রঙ পাকিলে হলুদে হয়, বা বেশী পাকিলে পেঁপে গলিয়া যায় এ কথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। পেঁপেতে আঁস নাই বলিয়াই ইহা এত গলিয়া যায়। দূর দেশে পেঁপে পাঠাইতে কিরূপ সতর্ক হইতে হয় তাহা জ্যামেকাবাসীগণ শিখিয়াছে। কিংস্‌টন্ সহর হইতে লণ্ডনে পেঁপে রপ্তানি হইয়া থাকে। লণ্ডনে একটা পেঁপের দাম ৪০ সেণ্ট অর্থাৎ প্রায় ২।।০ টাকা। জ্যামেকার বাজারে একটা বড় পেঁপে এক সময়ে ২৫ সেণ্ট মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। কিন্তু এই রকম অত্যধিক দর থাকিলে কয়জন লোকে পেঁপে খাইতে পারিবে? কলিকাতার বাজারে একটা বড় পেঁপের দাম।৵-॥০ আনা। ব্যবসার হিসাবে ইহার দাম ৵০ আনার অধিক হওয়া উচিত নহে।

কলম করিবার প্রণালী কিছু শক্ত নহে। তবে যে পেঁপের কলম করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে নাই তাহার স্বাভাবিক কারণ ১ম, বীজ হইতে অতি সহজে চারার উৎপত্তি; ২য়, পেঁপে গাছ সোজা হইয়া বাড়িয়া উঠে, ডাল পালা হয় না। কিন্তু যে গাছটির কোন কারণে মাথাটি ভাঙ্গিয়া গেল তাহারই ডাল পালা বাহির হয়। এই ডাল লইয়া কলম করিতে হয়। বৃক্ষগাত্র হইতে ডালটি কাটিয়া লইয়া গোড়ার দিকের দুই ধার উড়িষ্যা দেশের কুঠারের মত কলমছে করিয়া কাটিয়া লইয়া অন্য একটি পেঁপে বৃক্ষ কাণ্ডে বসাইতে হয়। বৃক্ষ কাণ্ডটি v ভি আকারে কাটা থাকিবে এ কথা বলা বাহুল্য। ২য় চিত্র দেখ। পেঁপে গাছের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ

কাটিয়া দিলেই গাত্র হইতে যে সকল শাখা নির্গত হয় সে গুলি ৬ হইতে ১০ ইঞ্চ বড় হইলেই কলম করিবার উপযুক্ত হয়। এই সময় এই শাখাগুলি নিরেট থাকে। ফাঁপা ডালে কলম বাঁধা চলে না। প্রথম চিত্রে পেঁপের ডাল বা বড দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় চিত্রে কি প্রকারে কলম বাঁধিতে হয় তাহা দেখান যাইতেছে। যোড় লাগাইয়া পেটো দড়ি দ্বারা জড়াইয়া বাঁধিতে হয় কিন্তু বেশী জোর করিয়া বাঁধিবার আবশ্যক নাই। জোরে বাঁধিলে বরং ক্ষতি আছে।

পেঁপের কলম করাটা প্রচলিত হইলে ভাল জাতের পেঁপের সৃষ্টি হইবে। জ্যামেকার দুই এক প্রকারের টেকসহি পেঁপে ফলের সৃষ্টি হইয়াছে। ক্যারিকা কোয়েরসিফোলিয়া (Carica quericifola) তন্মধ্যে একটা। এখানকার একপ্রকার পার্ব্বতীয় পেঁপে আছে (Carica Canadmarecensis) যাহা ৯০০০ ফিট উচ্চ পর্ব্বতের উপরে জন্মিতে পারে। সেই পেঁপের গাছ সিংহলে হইতেছে। পেঁপে চাষের প্রণালীর একটু পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন পদ্ধতিতে আবাদ করিতে পারিলে অচিরে এক মহৎ উপকারী ফল অতি সস্তায় সকলের প্রাপ্য হইবে।

বাঙলায় পাট

বাঙলায় পাটের একচেটে ব্যবসায়, এক্ষণে বাঙলার প্রধান বাণিজ্য, পাট। বাঙলা দেশে পাট হইতে বৎসরে প্রায় বাইশ তেইশ কোটী টাকা বিদেশ হইতে আসে। এতদ্ব্যতীত পাটের থলে, চট, দড়ির ব্যবসা হইতে অনেক টাকার আয় হয়। এই আয়ের সমুদয় লভ্য অংশ চাষীর ঘরে ঢুকিলে অনেক চাষী সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিত। পাটের ব্যবসায়ের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় বাঙলায় লক্ষ লক্ষ লোক সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে একথাও সত্য, কারণ পাট ব্যবসায়ে লিপ্ত কুলি, মজুর, কয়াল, যাচন্দার, চাঁপাদার, মার্কাম্যান, ওজন সরকার, গোমস্তা, কেরাণী, গাড়োয়ান, নৌকার মাঝি, চাষী সকলেই কিছু না কিছু অর্থ উপার্জ্জন করে কিন্তু পাট ব্যবসা সম্পূর্ণ বাঙালীদের হাতে নহে। পাটের বাজারে ইউরোপীয় দালাল দিগের আধিপত্য খুব। সমুদয় রপ্তানি পাটই তাহাদের হাত দিয়া বিদেশে যায়। আবার এদেশে যত গুলি পাটের কলকারখানা আছে তাহাতে বেশীর ভাগ বিদেশীয় টাকাই খাটিতেছে। এই সকল কলকারখানায়ও ইউরোপীয় দালালের হাত করিয়া পাট যোগান্ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পাটের ব্যাপারে বিদেশীয় ধনী, মহাজন ও দালালে মিলিয়া মাঝে পড়িয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করে। নিজ বাঙলা দেশের লোকের লাভ তাহাদের তুলনায় শতাংশের একাংশও

নহে এবং তাহাতে চাষীদের অংশ যে খুব বেশী তাহাও বলা যায় না। পাট চাষে কিন্তু চাষীর একটা মস্ত সুবিধা এই য, তাহারা পাট বেচিয়া এক কালে মোটা টাকা পায় এবং সেই টাকায় এক কালে রাজা মহাজনের দেনা শোধ করিতে পারে। ধান বেচিতে বরং তাহাকে দু'দিন বিলম্ব করিতে হয়, পাট বেচিতে এক দিনও বিলম্ব হয় না। অনেক সময় পাট চাষ আরম্ভ করিলেই তাহারা দাদনের টাকা বলিয়া কিছু টাকা অগ্রিম পায়।

পাটের মূল্য দিন দিন বাড়িতেছে। ৩০ বৎসর আগে অতি উৎকৃষ্ট পাটের দর ছিল ৩৷৷০।৪৲ টাকা, এখন সেই পাটের দর ১৪৲।১৫৲ টাকা। ধান চাষ করিয়া এক বিঘা জমি হইতে ২০৲ টাকা পাওয়া কঠিন, কিন্তু পাট চাষ করিলে অনায়াসে ৫০৲ টাকা আসে. কৃষক লোভে পড়িয়া ধান ছাড়িয়া পাট চাষ করে এবং চাউল কিনিয়া ভাত খায় কিন্তু অজন্মার দিনে তাহারা লাভের টাকা ব্যয় করিয়াও নিস্তার পায় না। উপরন্তু পাট পচাইয়া তাহারা গ্রামের খাল, বিল, পুষ্করিণীর জল দূষিত করে, পচা জল মাখিয়া নিজেদের দেহ অসুস্থ করিয়া ফেলে। পাটের লাভের টাকাত তাহারা প্রাপ্তমাত্র বহুদিন পূর্ব্বে বিলা৽৷ ব্যসনে খরচ করিয়া ফেলে এবং বিপদের সময় ক্ষুধার অন্ন ও রোগের ঔষধ পথ্যের জোগাড় কি রূপে হইবে ভাবিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে। ইহার উপর আবার দুদৈ'ব আছে, যেমন বর্ত্তমান বর্ষের ইউরোপীয় মহাসমর। এই দুর্ব্বৎসরে শত শত চাষী ও পাটের মহাজন পাট কোলে করিয়া লইয়া কাঁদিতেছে। ধান দিয়া লোকে যে কোন জিনিষ এমন কি সোণা রূপা পাইতে পারে, ধান দিয়া লোকে লেখা পড়া পর্য্যন্ত শিখিতে পারে কিন্তু পাটের সময় সময় এমন দুরবস্থা হয় যে, পাট লইয়া কেহ এক কাণা কড়ির জিনিষও দিতে রাজী হয় না।

এই সকল আপদ প্রতিকারের উপায় চাষীরা করিতে পারে না, কেননা তাহারা অভাবী ও লোভী। জমিদার মনে করিলে তাহাদিগকে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত করিতে পারেন। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে জমীদারগণের সেইরূপ বিবেচনা করার সময় আসিয়াছে। খাদ্য শস্যের মূল্য অপরাপর শস্যের অপেক্ষা যে কত অধিক সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। ভবিষ্যতে স্বদেশে খাদ্য শস্যের চাষ যথোপযুক্ত পরিমাণ আবাদ করিয়া তারপর লাভের পন্থায় যে কোন চাষ করিলে ভাল হয়। চাষের ধান ঘরে না আসিলে কি গোবৎস বাঁচিবে, না গৃহস্থের অতিথি, ফকির, আত্মীয় স্বজনের জন্য অন্ন সংস্থান হইবে? চাষের ধানের খুঁদটি, কুঁড়াটির যে মূল্য অনেক। •

বাঙলা দেশের মধ্যে পূর্ব্ব বাঙলা পাট আবাদের প্রধান স্থান এবং সেই অংশের পাটই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু তাহা হইলেও উত্তরবঙ্গ পশ্চিম বঙ্গের মধ্যেও

হাজার হাজার বিঘা ভূমিতে পাটের আবাদ হইয়া থাকে। পাটের আবাদ আসামেরও অংশ আছে এতন্মধ্যে কতক নারায়ণগঞ্জে কতক কলিকাতায় আসিয়া স্থান পায়। বঙ্গের অধিকাংশ পাটই এক্ষণে নারায়ণগঞ্জে আসে, কারণ উক্ত স্থানে কল সংস্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে যথেষ্ট পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে, এজন্য কলিকাতাও পাটের প্রধান আড্ডা।

কতকগুলি কলে গাঁইট বাঁধা হয়। গাঁইট বিলাতে রপ্তানি হয়। গাঁইট বাঁধা কলকে প্রেস বলে। যে কলে পাট হইতে দড়ি ও থান বা চট প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাকে মিল বলে। থান হইতে থলে প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমানে ৬০টী মিল এবং ৮৫ প্রেস আছে। মিল ও প্রেস হইতে প্রতি বৎসর কত টাকার পাট ও পাটপণ্য রপ্তানি হয় তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বিগত পাঁচ বৎসর মধ্যে পাটের ব্যবসায় কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেখুন—

বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ৩,১৯,০৫০০০, (তিন কোটী উনিশ লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকার বাণিজ্য অধিক হইয়াছে। দিন দিন যে পরিমাণে পাটের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সেই সঙ্গে পাটের মূল্যও বাড়িতেছে, সে অনুপাতে কিছু পাটের আবাদ বাড়ে নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে পাটের বস্তা সমই রপ্তানী হইত, কারণ তখন দেশে বেল (Bale) বা গাঁট বাঁধাই কিংবা চট নির্ম্মাণ করিবার কোন কল-কারখানা সংস্থাপিত হয় নাই। আমাদিগের অভাবকে আমরা যুগযুগান্তর পোষণ করিতে পারি, কিন্তু ইংরাজ তাহা পারে না। অভাবের সূত্রপাতেই তন্মোচনের উপায় করে, তাহার ফলে আজ ভাগীরথির উভয় কূলে অত্যুঙ্গ অভ্রভেদী চিমনী বক্ষে করিয়া রাশি রাশি পাটের কল বিরাজ করিতেছে। খ্রীঃ ১৮৫৫ সালে ভাগীরথীর তীরে সর্ব্ব প্রথম পাটের কল দেখা দিয়াছিল।

সংক্ষেপে বলি—পাটের ব্যবসায়ে আরও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য ইংরাজ বণিকের কত চেষ্টা। ব্যবসায় বাজারে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য ইউরোপীয় বণিকদিগের ছোট বড় সঙ্ঘ আছে এবং চেম্বার অব কমার্স তাহার নিদর্শন। তাহা ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন পণ্য বা কার্য্য ক্ষেত্র অনুসারে তাহাদিগের স্বতন্ত্র সঙ্ঘ আছে, যথা জুট এসোসিয়েশন, জুট ব্রোকার্স এসোসিয়েশন ইত্যাদি। কোন দিকে কাহারও ক্ষতি না হয় অথচ ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হয় ইহাই সকলের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে সম্মিলিত সভার অধিষ্ঠান হয়। স্বল্পদিন হইল বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের রেভিনিউ সেক্রেটারী লায়ন সাহেবকে একটী পরামর্শ সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া বণিক সম্প্রদায়ের মুখপাত্রগণ তাঁহাকে পাটের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য অনেক কথাই বলিয়াছেন। পূর্ব্বে পাটের আবাদের যে বিবরণী বা ফোরকাষ্ট বাহির হইত তাহা প্রায় আন্দাজে হইত,—গ্রাম্য চৌকিদারের নিকট খবর লইয়া কৃষি-বিভাগের

ডিরেক্টার সাধারণে পাটচাষের সাময়িক অবস্থার বিবরণী প্রচার করিতেন। এক্ষণে প্রত্যেক গ্রামের পঞ্চায়েতের দ্বারা ক্ষেত্রস্থ ফসলের খোঁজ লওয়া হয়। উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ঠিক জানিতে না পারিলে ক্রয় বিক্রয়ের বিষম ক্ষতি হইয়া থাকে। এক্ষণে যে বিবরণী প্রকাশিত হইতেছে, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহা অনেক বিশ্বাস্য। তথাপি কিন্তু পাটব্যাপারে লিপ্ত সকলেই বুঝিয়াছেন যে নানা কারণে ব্যস্ত অবৈতনিক গ্রাম্য পঞ্চায়েতগণের নিকট হইতে পাটের আবাদের সাময়িক সম্পূর্ণ খবর পাইবার আশা করা যায় না। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ চাষাবাদের উন্নতি কল্পে স্থাপিত। এই বিভাগের নায়ক ডিরেক্টর। সাধারণতঃ সিভিলিয়ানগণই ডিরেক্টর হইয়া থাকেন। কৃষি বিষয়ে তাঁহারা বিশেষজ্ঞ নহেন। আবার অধিক দিন কৃষি-বিভাগের তত্ত্বাবধান কল্পে নিযুক্ত থাকিবার অবসর পান না। সুতরাং বণিক সম্প্রদায় বলেন যে, অস্থায়ী ডিরেক্টর দ্বারা বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কার্য্য সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহিত হইতে পারে না ইহা যথার্থ। কৃষি-বিভাগে স্থায়ী বিশেষজ্ঞ অধিনায়ক হইলে সুধু পাট কেন অনেক পণ্যের উন্নতি হইবে আশা করা যায়।

সাময়িক কৃষি সংবাদ

আলুর চাষ প্রচলন ও বীজের জন্য পাহাড়ী আলুর ব্যবহার—

পূর্ব্ববঙ্গে আলুর চাষের বিশেষ প্রচলন নাই, যদিও তথাকার অনেক জমী এই চাষের বিশেষ উপযোগী। কৃষিবিভাগ হইতে আজ কয় বৎসর যাবৎ প্রজাদিগকে দেখান হইতেছে যে ইচ্ছা করিলেই উপযুক্ত জমীতে আলুর চাষ করিয়া প্রজাগণ বিশেষ লাভবান হইতে পারে। প্রথম বৎসর কোথাও খরিদ দামে আলুর বীজ সরবরাহ করিয়া, কোথাও বা বিনা মূল্যে বীজ দিয়া মাঠে কাজ করে এইরূপ সরকারী প্রদর্শকগণের সাহায্যে প্রজাদের দ্বারা তাহাদের জমীতে আলুর চাষ আরম্ভ করান হয়।

ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী ইত্যাদি জেলাতে এই প্রদর্শন কার্য্য প্রথম হয়। এই কার্য্যের ফল এত সন্তোষজনক হইয়াছিল যে বর্ত্তমানে সরকার হইতে বিনামূল্যে প্রজাদিগকে আর কোন বীজ দিতে হইতেছে না, তাহারা নিজ ব্যয়েই বীজ ক্রয় করিয়া আলুর চাষ আরম্ভ করিয়াছে। প্রদর্শকগণ নূতন নূতন স্থানে আলুর চাষের প্রবর্ত্তন কার্য্যে নিযুক্ত আছে। প্রতিবৎসরই ফল এমন সন্তোষজনক হইতেছে যে আশা করা যায় অনতিবিলম্বে পূর্ব্ববঙ্গে আলুর চাষ একটী সাধারণ কৃষির মধ্যে পরিগণিত হইবে।

আলু সাধারণতঃ দুই প্রকার—

১। নাইনিতাল (আলু) দেখিতে ডিমের মত একটু লম্বা ধরণের, খোসা প্রায় শ্বেতবর্ণ ভিতরের শাঁস শাদা এবং বেলে।

২। দার্জ্জিলিং (আলু) দেখিতে গোল, খোসা অনেকটা লালবর্ণ এবং শাঁস শাদা কিন্তু এঁটেল। ইহা নাইনিতাল আলু অপেক্ষা বেশী দিন ঘরে থাকে এবং ফলনও ইহার অনেক বেশী।

পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে পূর্ব্ববঙ্গে এই আলুই (দার্জ্জিলিং আলু) বেশী ভাল জন্মে।

তেলাপোকা—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সহকারী কীট্তত্ত্ববিদ্ লিখিত

সকল ঘরেই তেলাপোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বাক্স, দেরাজ প্রভৃতির মধ্যে অর্থাৎ যে সকল জায়গায় যাইয়া লুকাইয়া থাকিতে পারে, সেখানে বংশ বৃদ্ধি করে।

জীবনবৃত্তান্ত—তেলাপোকার ডিম্ব অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন—ইহা শক্ত এবং বাদামি রঙের, লম্বায় প্রায় ১ ইঞ্চি হইবে, ইহার একদিকে একসারী সরু কাঁটার মত থাকে। একটী ডিম্বকোষে ১৬।১৭টী ডিম পাশাপাশি ভাবে সাজান থাকে। প্রায় এক মাস পরে ডিম ফুটিয়া ছোট তেলাপোকা বাহির হয়। তখন বড় তেলাপোকার মতনই প্রায় দেখা যায়। কিন্তু নরম ও পাখাশূন্য থাকে। কয়েক মাস পরে ইহারা সম্পূর্ণ বড় হয়।

ঢাকা কৃষিক্ষেত্রের রাসায়নিক পরীক্ষা গৃহে এই পোকার বিশেষ উপদ্রব হইয়াছিল। উহারা খাদ্যশস্য বোতলের লেবেল প্রভৃতি যাহা পাইত, তাহাই খাইত।

প্রতিকার—তেলাপোকা নিবারণের জন্য প্রথমে গুঁড়া সোহাগা দেরাজে ছড়াইয়া রাখা হইয়াছিল কিন্তু কোন ফল হয় নাই। পরে গুড় ২ ভাগ, ও সোহাগা ১ ভাগ মিশাইয়া কাগজের উপর ইহা মাখাইয়া ঐ কাগজ নানা জায়গায় রাখা হইয়াছিল। ২।৩ দিন পর্য্যন্ত তেলাপোকারা ইহা খায় নাই, পরে একটু একটু খাইতে আরম্ভ করে, অবশেষে মিষ্ট আস্বাদ পাইয়া বেশী খাইতে লাগিল। কিছুদিন পরে একে একে প্রায় সকল তেলাপোকাই উপরোক্ত সোহাগা মিশ্রিত গুড় খাইয়া মরিয়া গিয়াছিল।
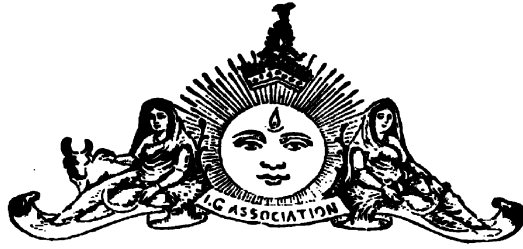
পৌষ, ১৩২১ সাল।

ভারতীয় বনজাত দ্রব্যাদি

সাধারণের মনে একটা ধারণা থাকিতে পারে যে কৃষির সহিত বনের কোন সম্বন্ধ নাই এবং যদিও থাকে তাহা বিরুদ্ধ সম্বন্ধ। কারণ, জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার না করিলে চাষ আবাদ হয় না। স্থানীয় হিসাবে এরূপ ধারণা সত্য হইতে পারে, কিন্তু বড় বড় ভূখণ্ডের হিসাবে বিবেচনা করিতে গেলে ক্ষেত্রের ন্যায় বনও একান্ত আবশ্যক। বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার ফলে ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে অরণ্য রীতিমত বারি পাতের সহায়তা করে, হঠাৎ জলপ্লাবনের আশঙ্কা অনেক পরিমাণে লাঘব করিয়া দেয় এবং মনুষ্যের ও পশ্বাদির ব্যবহারোপযোগী নানা বিধ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া দেশের ধন ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে।

বহু পুরাকালে দেশের বনাদির তত্ত্বাবধারণ সম্বন্ধে তৎকালিক শাসনকর্ত্তাগণ কিরূপ ব্যবস্থা করিতেন বলা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে বন বিভাগের সৃষ্টি লর্ড ডালহৌসীর সময় হইতে। ১৮৫৬ সালে মান্দ্রাজে প্রথম একজন অরণ্য পরিদর্শক নিযুক্ত হয়। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর যত্ন ও চেষ্টার ফলে আজকাল বন বিভাগ সরকারের একটি উন্নতিশীল ও অর্থকরী শাখা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আশানুরূপ উন্নতি হইতে এখনও অনেক বিলম্ব রহিয়াছে। তাহার মূল কারণ জঙ্গলের আয়তনের হিসাবে অধ্যক্ষ বর্গের সংখ্যার স্বল্পতা। ভারতের বন সমূহের আয়তন প্রায় আড়াই লক্ষ বর্গ মাইল অর্থাৎ সমস্ত ভারতবর্ষের এক চতুর্থাংশ জমি জঙ্গল দ্বারা আবৃত। কিন্তু সকল প্রদেশে বনের মাত্রা অবশ্য সমান নহে। আসামে, ব্রহ্মদেশে ও হিমালয়ের পাদদেশস্থ অঞ্চল সমূহে জঙ্গল অপেক্ষাকৃত অধিক। এতদ্ভিন্ন মধ্য প্রদেশে, গোদাবরী উপকূলে, সাতপুরায়, দাক্ষিণাত্যে ও নীলগিরি প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রভূত পরিমাণে বন রহিয়াছে। কিন্তু এতদ্দেশে বহুবিস্তৃত অরণ্য থাকিলেও

জনসাধারণ এখনও বনজ দ্রব্যাদি সদ্ব্যবহার করিতে শিখেন নাই এবং সরকারও তাহাদিগকে শিখাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন নাই।

অনেকেই মনে করেন যে জঙ্গলের স্থিতি কেবল কাষ্ঠ সরবরাহের জন্য। গবর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ যে ভাবে কার্য্য করেন তাহা দেখিলেও বোধ হয় যে কাষ্ঠ সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের জন্যই বন বিভাগ সমূহের সৃষ্টি। কাষ্ঠ বনের অবশ্য প্রধান ফসল ;—কিন্তু কাষ্ঠ ব্যতীত বনে যে অসংখ্য দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহাদেরও মূল্য কিছু কম নহে। জঙ্গল বিভাগ সমূহের আয় ব্যয় দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ১৯১১-১২ সালে মোট আয়ের পরিমাণ ২৮০ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে ৯৯ লক্ষ টাকা কাষ্ঠ ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যাদি হইতে প্রাপ্ত। এগুলিকে বন বিভাগের ভাষায় Minor Products অর্থাৎ গৌণ ফসল বলা হয় এবং কাষ্ঠ Major Product অর্থাৎ মুখ্য ফসল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

গৌণ ফসল সমূহের সংরক্ষণ অথবা উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য গবর্ণমেণ্ট সামান্যই চেষ্টা করিয়া থাকেন। এগুলি বিক্রয় করিয়া যে লাভ হয় সেটা অনেকটা উপরি লাভের ন্যায়। উপযুক্ত চেষ্টা করিলে গৌণ ফসল হইতে যে ৯৯ লক্ষের উপর অনেক অর্থ পাওয়া যাইতে পারে তৎ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এই সমুদয় গৌণ ফসল নানাবিধ প্রকারের এবং দেশ ভেদে ইহাদের প্রাচুর্য্যতার মাত্রার তারতম্য আছে। স্থূলতঃ বনজাত ফসল সমূহকে ব্যবহারের হিসাবে কয়েকটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি অন্যতম :—

১। তন্তু ও তন্তু উৎপাদক পদার্থ ;—বৃক্ষের অনেক অংশ হইতে তন্তু উৎপাদিত হয় ;—যথা পত্রজ তন্তু—কেয়া, ক্যারিওটা জাতীয় তাল, মুর্গা, বন্য কলা, খেজুর ও তাল, গোল পাতা প্রভৃতি গাছের পাতা হইতে যে তন্তু বাহির হয় তদ্বারা রজ্জু, জালের সূতা, বুরুষের কুঁচি, পাটি, মাদুর, থলে ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। বল্কজ তন্তু—পাট যে বর্গের অন্তর্ভুক্ত তাহাতে অনেক গুলি (ফলসা প্রভৃতি) বৃক্ষ আছে, যাহাদের তন্তু বিবিধ গৃহ কার্য্যে ব্যবহৃত হয় ; এতদ্ভিন্ন জঙ্গলা বাদাম, শিমুল, পলাশ, কাঞ্চন, শিশু, রিয়া, বট, সিদ্ধি, আকন্দ, পরেশ পিপুল, জিওল প্রভৃতি গাছের বল্ক তন্তু অল্প বিস্তর মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। তুলার ন্যায় বীজ হইতে তন্তু উৎপাদনেরও অনেক গুলি উদ্ভিদ্ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শিমুল, গলগল, আকন্দ, কুরচি, করবী ইত্যাদির নাম করিতে পারা যায়। নানা জাতীয় ঘাস হইতে যে তন্তু প্রস্তুত হইয়া রজ্জু, কাগজ, মাদুর, চুবড়ি, থলে প্রভৃতি তৈয়ারি হয় তাহা অনেকে জানেন। এই প্রকার ঘাসের মধ্যে মুঞ্জ ও সাবাই অন্যতম। শেষোক্ত ঘাস বঙ্গদেশে ছোটনাগপুর ও নেপাল তরাই অঞ্চলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। তৈল বীজ—বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায় এরূপ বৃক্ষের ভারতীয় বন সমূহে কোন অভাব নাই। তন্মধ্যে কতকগুলির নাম সুপরিচিত, যেমন মহুয়া, কুসুম, নাগেশ্বর, মালকুন্দী, বাদাম ও আবলুস জাতীয় বৃক্ষাদি, শাল, জঙ্গলী আখরোট, মোয়াল, ভেলা, হিজলী বাদাম প্রভৃতি ; এতদ্ভিন্ন বহুবিধ বৃক্ষের বীজ স্থানীয় লোকেরা খাইবার অথবা জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

৩। কস ও রঙ উৎপাদক পদার্থ। চামড়া প্রভৃতি কসের জন্য ও বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিতে নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। কেবল কস প্রস্তুতের জন্য এতদ্দেশে বিশেষ কোন কারখানা নাই ; সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট কেবল ভোরা জাতীয় সমুদ্রউপকূলজাত উদ্ভিদ্ হইতে কস প্রস্তুতের জন্য একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। বাবলা হইতেই আপাততঃ অধিক পরিমাণে কস প্রস্তুত হয়, কিন্তু কালকাসুন্দা, সোঁদাল, আসন, জারুল, জিওল, কাঞ্চন, কালজাম প্রভৃতির ছাল হইতেও যথেষ্ট পরিমাণে কস পাওয়া যাইতে পারে। হরিতকী কস উৎপাদক ফলের অন্যতম। প্রায় টন প্রতি ৮০৲ টাকা মূল্যে বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ টন হরিতকীর রপ্তানির হিসাব দেখিলে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। হরিতকী ভিন্ন আমলকী ও বহেড়ার ফলেও কস হয়। রঞ্জক পদার্থের মধ্যে রক্তচন্দনের কাঠ, দারুহরিদ্রা, আচ ও ডালিমের মূল, কমলাগুঁড়ি, সুরগিফুল, লটকান, পলাস, সিউলি এবং চাঁপা উল্লেখ যোগ্য। আলকাতরার রঙ সমূহের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ইহাদের চলন অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও অনেক স্থলে দেশীয় বস্ত্র রঞ্জনে এই সমুদয় রঙ ব্যবহৃত হয়।

৪। আঠা, রজন প্রভৃতি—পাইন, সাল, গর্জ্জন, মওয়াল প্রভৃতি গাছের নির্য্যাস হইতে আঠা ও রজন প্রস্তুত হয়। পাইনের নির্য্যাস অর্থাৎ গন্ধবিরোজা হইতে রজন ও তারপিন প্রস্তুত করিবার জন্য নৈনিতালের সন্নিকটে ভাওয়ালী নামক স্থানে গবর্ণমেণ্টের একটি কারখানা আছে। সাল, ঠেইণ, মওয়াল, ইত্যাদির আঠা অপর প্রকারের। প্রকৃত বাবলা গঁদ Acacia Senegal নামক বৃক্ষের নির্য্যাস। এতদ্দেশে ইহা সিন্ধু, রাজপুতনা ও পঞ্জাব অঞ্চলেই জন্মায়। বাজারে যে বাবলা গঁদ বিক্রয় হয় তাহাতে অনেক গাছের আঠা মিশ্রিত থাকে। রক্ত চন্দন, শিমুল, গলগল, জিওল, পলাশ, ধাওড়া, সজিনা, সালগা (গুগ্গুল, লোবান) প্রভৃতি গাছের আঠা মূল্যবান পণ্য। গর্জ্জনের তৈল এবং ব্রহ্মদেশ জাত থিট্সি তৈল ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে উৎপাদিত ও রপ্তানি হইতেছে। রবারকেও নির্য্যাসের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া ধরিতে পারা যায়। অবশ্য ব্যবসায়ের রবার প্রধানতঃ বড় বড় রবার বাগানের ফসল; কিন্তু এখনও অনেক বন্য গাছ হইতে রবার সংগৃহীত হইয়া বিক্রয় হয়।

৫। ঔষধ ও মসলা:—পোডোফাইলাম, বেলেডোনা প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিদের সার এখন বিলাত হইতে আমদানি হয় সে সমুদয় এ দেশেও প্রস্তুত হইতে পারে; কারণ বন্য অবস্থায় ঐ সকল গাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন কুট, আতিচ, দারু হরিদ্রা, কুঁচিলা, বচ প্রভৃতির ব্যবসাও চলতি কারবার। মসলার মধ্যে দারুচিনি, ছোটএলাচ ও গোলমরিচকেও অর্দ্ধবন্য ফসল বলিয়া বিবেচনা করিতে পারা যায়।

৬। খাদ্য দ্রব্য—স্বভাবজাত বন্যবৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি হইতে মনুষ্যের খাদ্যোপযুক্ত যে কত পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না। সভ্য জাতিরা দুর্ভিক্ষের সময় এবং অসভ্য জাতিরা সাধারণতঃ যে সমুদয় উদ্ভিজ্জ পদার্থ ব্যবহার করে তাহার আলোচনা করিলে উহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। জঙ্গলেও আম, জাম, কাঁঠালের অভাব নাই; কুল, আমড়া, জঙ্গলী আখরোট, খোবানী প্রভৃতিও দেশ বিশেষে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মহুয়া যে অনেক অৰ্দ্ধসভ্য ও অসভ্য জাতির খাদ্য তাহা অনেকে অবগত আছেন।

৭। গৃহসজ্জা ও নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি। ক্ষুদ্র গৃহস্থের কুটীর হইতে ধনকুবেরের অট্টালিকা পর্য্যন্ত সকল স্থানেই গৃহ প্রস্তুত, সজ্জা, তৈজস পত্র প্রভৃতির জন্য প্রভূত পরিমাণে বন্য বৃক্ষাদি আবশ্যক হইয়া থাকে। এক বাঁশের হিসাব ধরিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে বৎসরে প্রায় আট লক্ষ মুদ্রা মূল্যের ২১½ কোটি বাঁশ ভারতীয় জঙ্গল সমূহ হইতে কাটা হয়। এতদ্ভিন্ন বেত, (Canes and Willow) খুঁটি প্রভৃতির জন্য ছোট ছোট গাছ, ছাউনির জন্য পাতা, ছাল প্রভৃতিও জঙ্গল হইতে অনেক পরিমাণে সরবরাহ হইয়া থাকে।

৮। গন্ধ দ্রব্যাদি:—আমরা এক সময় হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলাম যে আন্দাজ শতাধিক বন্যগাছ হইতে গন্ধসার প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে খসখস্, গন্ধ তৃণ, রোজা ঘাস, দোনা, কুট, চামেলি, আয়ুর্বল, ধূপ, নাগেশ্বর, জটামাংসী, চাঁপা, বাবুই, তুলসী, চন্দন, মুস্কবালা প্রভৃতি সুপরিচিত; কিন্তু এই সমুদয় ব্যতিরেকে এমন অনেক বৃক্ষ এখন বনে জন্মিয়া অনাদরে লয় প্রাপ্ত হইতেছে, যে সমুদয়ের বৈজ্ঞানিক উপায়ে গন্ধসার প্রস্তুত হইলে কত সৌখিন ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতে পারিত।

৯। বিবিধ শিল্পোপযোগী কাষ্ঠাদি:—আজ কাল দেশে পেনসিল, বোতাম, দেশলাই, খেলনা, ক্রীড়া সজ্জা ও যন্ত্রাদি, কাষ্ঠ পাত্রাদি প্রস্তুতের জন্য অল্প বিস্তর চেষ্টা হইতেছে। এই সমস্ত কার্য্যের উপযুক্ত কাষ্ঠ জঙ্গলে অনেক পরিমাণে রহিয়াছে। কিন্তু কোন্‌টি কোন্ কার্য্যের জন্য ঠিক উপযুক্ত তাহা নির্দ্ধারণ করা

বহুল পরীক্ষা সাপেক্ষ; দেশলাই ও পেনসিল সম্বন্ধে কয়েকটি পরীক্ষা হইয়াছে কিন্তু সেগুলিও অসম্পূর্ণ।

১০। প্রাণীজ দ্রব্যাদি—বলা বাহুল্য অরণ্য কেবল বৃক্ষেরই সমষ্টি নহে; উদ্ভিদের ন্যায় অসংখ্য প্রকার প্রাণীও বনে পাওয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে কতিপয় হইতে ব্যবসায়োপযুক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে লাক্ষা, মধু, মোম, রেশম ও তসরগুটির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু এ সমুদয় ব্যতীত হরিণ প্রভৃতি পশুর শিঙ, খুর ও চামড়া, মৃগনাভি, শূকর কুঁচি, তেলিনী পোকা, হস্তী প্রভৃতিও প্রকৃত প্রস্তাবে অরণ্যজাত দ্রব্য বলিয়া হিসাব করিতে পারা যায়।

আমরা যে এই দশটি শ্রেণীর বনজ দ্রব্যাদির সমালোচনা করিলাম তাহা হইতে পাঠকবর্গেরা বুঝিতে পারিবেন যে ভারতীয় অরণ্য সমূহ হইতে কত বিপুল পরিমাণে অসংখ্য প্রকারের সামগ্রী পাওয়া যাইতে পারে। আরণ্য ফসল সমূহের আরও বিশেষত্ব এই যে ইহাদের ব্যবসায়ে ক্ষুদ্র এবং বড় ধনী উভয়েই ব্যাপৃত হইতে পারেন। যাঁহারা আজকাল চাকুরীর বাজারের অবস্থা দেখিয়া সামান্য মূলধনে কোন প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ছোট খাট কার্য্য অনেক রহিয়াছে। বড় ধনীর ত কথাই নাই। কারণ নানা শ্রেণীর এত বনজ পদার্থ সমূহ আজ কাল পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে যে তাহা উপযুক্ত লোকজন, তত্ত্বাবধারণ ও কলকব্জা সাহায্যে কাজে লাগাইতে পারিলে এক একটি বড় বড় ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইতে পারে। বর্ত্তমান সামান্য প্রবন্ধে সে সমুদয় বিষয়ের অবতারণা করিয়া কোন ফল নাই।

অপরাপর সরকারী বিভাগের ন্যায় অরণ্য বিভাগেরও বাৎসরিক বিবরণী, বিশেষ বিশেষ বিষয়ক পুস্তিকা ও পত্রাদি প্রকাশিত হয়। কিন্তু আলোচনার অভাবে জনসাধারণ বনজ ফসল বিষয়ে একেবারেই অনভিজ্ঞ। গবর্ণমেণ্টের ও শিক্ষিত সমাজের এ বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

সুগন্ধি জল—জলে গোলাপ, কেওড়া, লেবু, হাস্না হেনা, বকুল প্রভৃতির গন্ধ ধরাণ যায়। বাজারে গোলাপ জল ও কেওড়ার চলন খুব। বেল, মল্লিকা, চামেলী, যুঁই প্রভৃতি যে কোন সুগন্ধি ফুলের গন্ধে জল সুবাসিত করা যায়। বেল, যুঁই, মল্লিকার গন্ধ মৃদু মধুর সেইজন্য ইহার গন্ধ, জল অপেক্ষা তৈলে অধিককাল স্থায়ী হয়। একটু উগ্র গন্ধ না হইলে জলের সহিত গন্ধ গুলি মিশে না বা স্থায়ী হয় না। সিংভূম ও মধ্য প্রদেশের জঙ্গলে যখন শালগাছের ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয় তাহার গন্ধে বন ভরিয়া যায়, ইহার গন্ধে হাতি ক্ষেপিয়া উঠে।

শালপুষ্পের গন্ধ কেহ জলে বা তৈলে ধরাইতে চেষ্টা করে নাই, করিলে বোধ হয় কম খরচে একটা ভাল সুগন্ধি তৈল বা জল প্রস্তুত হইতে পারিত। কেন না পাঁচ সের সুগন্ধি জল প্রস্তুত করিতে হইলে অন্ততঃ ১ সের গোলাপ, কিম্বা বকুল কিম্বা হাস্না হানা ফুলের আবশ্যক। হাস্না হানা ফুল বহু পরিমাণে যোগাড় হইতে পারে এবং ইহার দামও কম কিন্তু বকুল ফুলের দাম কম নহে কারণ বকুল ফুল সংগ্রহে অনেক পয়সা খরচ হয়। গোলাপ ফুলের দামত সব চেয়ে বেশী। সুগন্ধি জল তৈয়ারি করা ব্যাপারটা বড় বেশী কঠিন নহে। ফুল জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া বকযন্ত্রে চোলাই করিয়া লইলেই হইল। একটা পাত্রে জলও ফুল একত্র স্থাপন করিয়া তাহা জ্বালে সিদ্ধ করিতে হইবে। জলে জ্বাল দিলেই জল বাষ্পাকারে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। এই বাষ্প, জ্বালে চড়ান আবদ্ধ পাত্রের মাথায় ছিদ্র করিয়া নল সংযোগে অন্য পাত্রে লইয়া গিয়া ঠাণ্ডা করিতে পারিলেই হইল। বাষ্প শীতল হইলে পুনরায় তরল অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ঠাণ্ডা করিবার জন্য এই পাত্র শীতল জল মধ্যে নিমজ্জিত রাখিতে হয়। সর্ব্বদা শীতল থাকা চাই এই কারণে জল মধ্যে মধ্যে বদ্‌লান আবশ্যক। কার্য্যের সুবিধার্থ এই দুই পাত্রের মাঝে একটি পাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে বাষ্প কতকটা জমাইয়া লইয়া তৃতীয় পাত্রে লইয়া যাওয়াই প্রশস্ত। পাত্র গুলি সব বায়ু বদ্ধ হইবে এবং ছিদ্র পথে বাষ্প নল বাহিয়া পাত্র হইতে পাত্রান্তরে যাতায়াত করিবে।

লেবুর খোসা বা লেবু ঘাস জলে সিদ্ধ করিয়া লেবু গন্ধ জল প্রস্তুত হইতে পারে। খস্‌খস প্রভৃতি আরও অনেক গন্ধতৃণ আছে যাহা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া চোয়াইয়া লইলে সুগন্ধি জল প্রস্তুত হয়। শ্বেতচন্দন কাষ্ঠ ঢেঁকিতে বা হামান দিস্তায় গুঁড়া করিয়া কিছু কাল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া অবশেষে চোলাই করিয়া লইলে চন্দন গন্ধ জল প্রস্তুত হইবে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ফুলও অধিক, সুগন্ধি উদ্ভিদাদিও অনেক। শীত প্রধান স্থানে ফুল আছে, ফুলের বাহার আছে কিন্তু তাহাতে গন্ধ নাই বা অতি সামান্যই আছে। এই জন্য জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড. আমেরিকার ফুলের সুগন্ধের অনুকারী নানাপ্রকার কৃত্রিম গন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টা প্রতিনিয়ত হইতেছে। চেষ্টার ফলে কৃত্রিম গন্ধে বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে—সে গুলি নিশ্চয় সস্তা সেই জন্য তাহার এত কাট্‌তি। আমাদের দেশের লোক এত বোকা যে, সেই সকল কৃত্রিম গন্ধদ্রব্য আনাইয়া স্বাভাবিক ফুল চোয়াইয়া ভারতে প্রস্তুত গন্ধ বলিয়া ভারতের বাজারে বিক্রয় করিতেছেন ও দেশের ব্যবসা নষ্ট করিতেছেন এবং লোক ঠকাইয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। স্বাভাবিক সুগন্ধি জলে যে গুণ আছে, তাহার যে উপকারীতা ঐ সকল জলে তাহার কোন গুণই দেখা যায় না বা তাহাতে উপকার হওয়া দূরে থাকুক বরং অপকার হয়।

চন্দন গন্ধ জলে গ্রীষ্ম সন্তাপ দোষ ও ব্রণ ঘামাচি বিনষ্ট হয়। গোলাপ জলে মাথা ঠাণ্ডা করে ও চক্ষুর দোষ দূর হয়। লেবুর জলে ক্ষত চুলকণা আরোগ্য হয়। কিন্তু কৃত্রিম সুগন্ধি জলে এই সকল গুণ আছে কি না বা কতটুকু আছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। সুগন্ধী জলের কারখানা প্রস্তুত করিতে হইলে কি কি যন্ত্রাদির আবশ্যক বা এরূপ একটি কারখানা প্রস্তুত করিতে কত খরচ আমরা জিজ্ঞাসুকে জানাইতে পারি। সুগন্ধি জল প্রস্তুত করিতে ছোট পাঁইট বোতল প্রতি /০, /১০ অথবা খুব অধিক হইলে ৵০ আনার বেশী খরচ হইবে না কিন্তু গুণানুসারে একটা পাঁইট সুগন্ধি জল ৵০ আনা হইতে ৷৹ আনা কিম্বা ৸০ আনা মূল্যে বিক্রয় হয়। ১ পাঁইট ভাল গোলাপ জল লোকে ১৷৹ টাকা দামেও খরিদ করে। অতএব গন্ধাদি সম্বন্ধে যথার্থ স্বদেশী ব্যবসা চালাইতে উদ্যোগী হওয়া কি উচিত নহে? ইহাতে লাভ অনেক,—স্বদেশী বাগ বাগিচা বাড়িয়া যাইবে; কারখানা ও বাগানে অনেক লোক প্রতিপালন হইবে এবং উৎকৃষ্ট জিনিষ হইলে বিদেশে রপ্তানি হইতে পারে। ইস্তাম্বুল আতর ও ভাল গোলাপী আতর সর্বদেশে সমাদৃত।

পত্রাদি

তামিল পাম বা শুপারি—মিঃ এইচ, ব্রেন, সি, হিল জানিতে চান যে, তামিল পাম ও শুপারি গাছ এক কি না?

উঃ—শুপারি ও তামিল পাম একই বৃক্ষের নামান্তর। আসামী ভাষায় শুপারিকে তাম্বুল বলা হয়। তামিল কথা তাম্বুল কথারই রূপান্তর বলিয়া আমরা মনে করি। তামিল বৃক্ষের যে বিবরণ তিনি দিয়াছেন তাহা শুপারি বৃক্ষের বিবরণের সহিত বর্ণে বর্ণে মিলে। স্থানীয় অনুসন্ধানে সব সন্দেহ দূর হইতে পারে।

শুপারি গাছের সার—সম্বন্ধে জানিতে চান—

উত্তর:—পুরাতন পাঁকমাটি শুপারির ভাল সার। গাছ প্রতি অর্দ্ধসের হাড়ের গুঁড়া ও এক ছটাক সোরা সার ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। যেখানে কিন্তু নদীর জল বাড়িয়া শুপারি বাগান ডুবিয়া যায় এবং জল সরিয়া গেলে যে পলি মাটি সঞ্চিত হয় তাহা শুপারি গাছের বিশেষ সারের কার্য্য করে। এরকম বাগানে অন্য সার প্রয়োগের আবশ্যক হয় না।

আশুধান্যের প্রকার ভেদ—শ্রীসন্তোষকুমার বসু, গৌহাটি, কামাখ্যা।

কতরকম আশুধান্য আছে ও কোন্‌টি ভাল জানিতে চান।

উত্তর ঃ—মোটা আশুধান্য কাল ও লালভেদে দুই প্রকার। সরু আউশও দুই তিন রকমের আছে তন্মধ্যে মধ্য প্রদেশের সরু আউশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহার চাউল অনেকটা দাদখানি চাউলের মত।

নাস্‌পাতি—শ্রীহরিমোহন ঘোষ, বাগবাজার; কলিকাতা।

উপর আসামে নাস্‌পাতি ভাল হইতে পারে কি না?

উত্তর ঃ—উপর আসাম ও দার্জ্জিলিঙে নাস্‌পাতি ভালই হইতেছে। দার্জ্জিলিঙ বা আসামের স্থানীয় নাসপাতি ভাল নহে। পঞ্জাব ও পেসোয়ারের নাস্‌পাতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উপর শিলঙে স্থানান্তর হইতে নাস্‌পাতি গাছ আনাইয়া তাহার আবাদ করায় ভাল সুস্বাদু নাসপাতি হইতেছে।

ফ্লাক্স—শ্রীশশীভূষণ সমদ্দার, দমদমা, ২৪ পরগণা।

আমরা যাহাকে শণ বলি তাহাকেই কি ফ্লাক্স বলে? এই উদ্ভিদের সহিত শণের যদি কিছু পার্থক্য থাকে তাহা কৃষকে প্রকাশ করিয়া সুখী করিবেন।

উত্তর ঃ—অনেক প্রকার তন্তুদ উদ্ভিদকেই আমরা শণ আখ্যা দিয়া থাকি। প্রত্যেক গুলিই পরস্পর বিভিন্ন। সাধারণ শণ Crotalaria Juncea। পাটের মত ইহারা এক ডাঁটা বিশিষ্ট গাছ হয়। অগ্রভাগ ব্যতীত গোড়ার দিকে ডালপালা থাকে না। বোম্বাই শণ Hibiscus Canabinus। ইহাকে বাঙলায় মেস্তা পাট বা ঢেঁরস পাট বলে। গাছের আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকটা বন্য ঢেঁরস গাছের মত। ফ্লাক্স বা বিলাতী শণ—ইহা তিসির (Linseed) গাছ—(Linum usitatissimum)।

সব্জী সংরক্ষণ—শ্রীনটবর মণ্ডল, চম্পাহাটী।

আপনারা কৃষকে ফল সংরক্ষণের কথা লিখিয়া থাকেন কিন্তু সব্জী সংরক্ষণের কথা কোথাও দেখিতে পাই না। সিংভূমে কখন কখন আমাকে যাইতে হয়। তথায় সব্জীর বড়ই অভাব। সেই সকল স্থানে সংরক্ষিত-সব্জী পাইলে অনেকে আদর করিয়া লইতে পারে। সব্জী সংরক্ষণের উপায়টি সাধারণকে শিখাইয়া দিলে অনেকের উপকার দর্শে।

উত্তর ঃ—ফল সংরক্ষণের যে নিয়ম সব্জী সংরক্ষণের সেই একই নিয়ম। টিনের ভিতর কপি, কলাই শুঁটি, বেগুন প্রভৃতি সব্জী রাখিয়া সেই টিন গুলি উত্তপ্ত জল পূর্ণ পাত্র মধ্যে স্থাপন করিয়া উত্তাপ সাহায্যে টিন হইতে বায়ু বাহির করিয়া দিতে হয় এবং উত্তাপ সাহায্যে টিন অভ্যন্তরস্থ উদ্ভিদাণু সকল নষ্ট করিয়া ফেলিতে

হয়। অবশেষে টিনের মুখগুলি ঝালিয়া বায়ু প্রবেশের পথ বন্ধ করিতে হয়। এই প্রকারে সংরক্ষিত সব্জী দেশ দেশান্তরে পাঠান যাইতে পারে। সাধারণতঃ সব্জী অন্য প্রকারেও সংরক্ষিত হইতে পারে। মূলা, কপি প্রভৃতি সব্জী খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া শুষ্ক করিয়া অসময়ে ব্যবহার জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাও এক প্রকারের সংরক্ষণ।

কৃত্রিম কাষ্ঠ—আমরা যাহাকে পিচ বোর্ড অথবা পেষ্ট বোর্ড বলি তাহা কাগজ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। কাগজ যেমন বাঁশ, ঘাস, খড়, কুটী, ছেঁড়া নেকড়া প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হয়, ইহারও উপাদান এই সকল। মোটা শক্ত পিচ বোর্ড দ্বারা গাড়ীর ছাদ, চারি দিকের ছাউনি এমন কি চাকা পর্য্যন্ত হইতেছে। ইহার কার্য্যাপযোগীতা দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে ইহা কাঠের গুঁড়া দ্বারা প্রস্তুত।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক কাঠের গুঁড়া জমাইয়া তক্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই তক্তা সাধারণ তক্তার ন্যায় দৃঢ় ও সুলভ হয় নাই। বিশেষতঃ সেই তক্তা নির্ম্মাণের জন্য কাঠের গুঁড়া আবশ্যক হইত। কিন্তু লিয়ন্স নগরে যে কাঠ নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে কাঠের কোন সংশ্রব নাই। খড় বা বিচালী খুব ছোট ছোট করিয়া কুচাইয়া উহা অনেকক্ষণ গরম জলে সিদ্ধ করা হয়, তাহার পর উহাতে এক প্রকার দ্রাবক মিশাইলে সেই খড়ের কুঁচা একেবারে গলিয়া যায়। পরে সেই তরল পদার্থকে চাপ দিয়া জমাইয়া কাঠ প্রস্তুত করা হয়। উহা ছাঁচে ঢালিয়া ইচ্ছানুরূপ তক্তা, কড়ি, বরগা প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইতে পারে, এই নকল কাঠের কড়ি, আসল কাঠের কড়ি অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে বরং অনেক গুণে উৎকৃষ্ট। করাত ও বাটালী দিয়া এই নকল কাঠ অনায়াসে কাটিতে পারা যায়। এই কাঠ জ্বালানী রূপেও ব্যবহার করিতে পারা যায়। উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অল্প ধূম হয় এবং আলোক ও উত্তাপ প্রচুর পরিমাণে হয়। এই নকল কাঠের প্রচলন হইলে, বড় বড় দ্বার বা জানালায় কপাট করিতে আর তক্তা জোড়া দিতে হইবে না। ইচ্ছামত লম্বা চওড়া পাওয়া যাইবে।

কংগ্রেসে ভূপেন্দ্রনাথ—এবার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু। তিনি স্বদেশের হিতকল্পে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। সকল গুলির বর্ণনা অনাবশ্যক। এবার তাঁহার বক্তৃতাটি বেশ হইয়াছিল। উহার প্রধান ত্রুটি এই, উহাতে দেশের শোচনীয় স্বাস্থ্যের এবং সুবৎসরেও দেশে লক্ষ লক্ষ লোকের যথেষ্ট খাদ্যের অভাবের কোন উল্লেখ বা আলোচনা ছিল না। প্রবাসী

অভ্র—ভারতবর্ষ হইতে গত বৎসর ৫৮২০০ মণ অভ্র খনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবারে অভ্রের কাজ এবং উত্তোলন কিছু অধিক বটে।

যশোহরে চিরুণী ফ্যাক্টরীতে বঙ্গেশ্বরের শুভাগমন—সম্প্রতি বঙ্গেশ্বর মহামতি লর্ড কারমাইকেল তদীয় পত্নী এবং অন্যান্য পরিষদবর্গের সহিত যশোহর চিরুণী কোম্পানীর কারখানাগৃহে উপস্থিত হয়েন। উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ এবং ম্যানেজিং এজেণ্ট বাবু ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়, নড়াইল জমিদার মহাশয় তাঁহাদিগকে ফটকের সম্মুখে অভ্যর্থনা করেন এবং কারবার গৃহে প্রবেশ করার পর কার্য্যাধক্ষ শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ এম, সি, ই, এম, আর, এস মহাশয় তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিয়া চিরুণী ও মাদুর প্রস্তুত প্রণালী আদ্যোপান্ত পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দেন। লর্ড কারমাইকেল মহোদয় চিরুণী ছাঁচে ঢালাই হইতে দাঁতকাটা, পালিস এবং প্লেন প্রভৃতি সমুদয় প্রণালী অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়া বিশেষ পরিতোষ লাভ করেন। তৎপরে রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা কিরূপ ভাবে তুলা গলাইয়া জমাট করিতে হয় তাহাও কার্য্যাধক্ষ মিঃ, ঘোষ বঙ্গেশ্বর মহোদয়ের সম্মুখে হাতে কলমে করিয়া দেখান; ইহাতে লর্ড কারমাইকেল মহোদয় আরও প্রীতি লাভ করেন এবং কোম্পানীকে সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দিতে চেষ্টা করিবেন বলিয়া কর্তৃপক্ষকে আশ্বাস দেন। অতঃপর কোম্পানীর কার্য্যাধ্যক মিঃ, ঘোষ এবং ম্যানেজিং এজেণ্ট ভবেন্দ্রবাবুর সহিত লর্ড এবং লেডী কারমাইকেলের ফটো লওয়া হয়। ফ্যাক্টরীর কার্য্য পরিদর্শনের জন্য মাত্র অর্দ্ধঘণ্টা সময় নির্দ্ধারিত ছিল, কিন্তু সে স্থলে প্রায় একঘণ্টা সেখানে খুঁটী নাটী দেখিতে থাকিয়া যান। ইহাতেই বুঝা যায় লর্ড কারমাইকেল মহোদয় ফ্যাক্টরির কার্য্যে কতদুর আগ্রহাতিশয্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

কারখানাগৃহ পরিত্যাগ করিবার সময় ম্যানেজিং এজেণ্ট বাবু, মান্যবর লর্ড, এবং লেডী কারমাইকেলকে দুইটী সুবৃহত ফুলের তোড়া এবং মিসেস্ এম, এন, ঘোষ সুন্দর দুইটী কৃত্রিম গোলাপফুল উপঢৌকন দেন। (যশোহর)।

ভারতে মাঙ্গানিজ—পৃথিবার মধ্যে ভারতবর্ষ হইতেই অধিক পরিমাণ মাঙ্গানিজ (খনিজ মিশ্র ধাতু) উত্তোলিত হইয়া পৃথিবার নানা স্থানে রপ্তানি হইয়া যায়, কিন্তু দেশের লোক আদৌ এদিকে মনোযোগী নহেন। ১৯১৩ সালে ৬৩৭৩৯১ টন ধাতু পৃথিবার বিভিন্ন প্রদেশে গিয়াছে। এ কার্য্যেও বৈদেশিক মূলধন অধিক খাটিতেছে। দেশবাসী বিলাসিতায় ডুবিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিয়া থাকে মাত্র।

পাটের দর—পাটের দর আবার কমিয়া যাইতেছে। খরিদদার নাই। খুব ভাল পাটের দর ৪॥০ টাকা।

খাসমহালের খাজনা—বিধাতার বিড়ম্বনায় গত বৎসর বন্যাবশতঃ এ অঞ্চলের প্রজা সাধারণের যে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহার জ্বালা জুড়াইতে না জুড়াইতে কোথা হইতে কাল "লোহাগোড়ার" উৎপাতে সেই জ্বালার উপর অস্ত্রাঘাত হইল। বন্যার লীলা তরঙ্গাঘাতে প্রজার ঘরবাড়ী পড়িল, জীবনোপায় ধান্য ফসল নষ্ট হইল, কৃষির প্রধান সহায় গবাদি মরিল, হতাশ কৃষক উদরান্নের সংস্থান জন্য দলে দলে স্থানান্তরে সরিল। তাহাদের আশা যে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট খাজনার দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া, নিরন্নকে অন্ন দিয়া, ভবিষ্যতে ধান্য চাষের অন্তরায় দূর করিয়া প্রজা রক্ষা করিবেন!

প্রজা আশা করিয়াছিল যে তাহাদের যে সমস্ত জমীতে গত বৎসর শস্য উৎপন্ন হয় নাই, বা যাহা দীর্ঘকাল জলমগ্ন থাকিয়া লাঙ্গলের স্পর্শসুখও অনুভব করিতে পায় নাই সেই সব জমীর খাজনা তাহারা রেহাই পাইবে। সদাশয় গবর্ণমেণ্টের বন্যা-কালীন আশাবাণী পাইয়া প্রজাগণের এ আশা বলবতী হইয়াছিল। কিন্তু খাসমহালের স্থানীয় কর্ম্মচারী যখন গত বৎসর ফসল কুত করিতে লাগিলেন, তখন কুতের নমুনা দেখিয়া প্রজাগণ বুঝিয়াছিল যে তাহাদের সে আশার মূলে কুঠারাঘাত হইতেছে। আমরা যথাসময়ে উচ্চকণ্ঠে সে কুতের প্রতিবাদ করিয়াছি, সহস্র প্রজার আর্ত্তনাদ রাজপুরুষগণের কর্ণগোচর করাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। জানিনা কোন্ প্রতিকূল প্রবাহে সে আর্ত্তনাদ রাজপুরুষগণের কর্ণগোচর হয় নাই বা বিপন্ন প্রজাগণের কোন্ অদৃষ্ট ফেরে তাহা রাজপুরুষগণের কর্ণগোচর হইয়াও হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

প্রজাগণ আশা করিয়াছিল যে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের চাষ আবাদের বিঘ্ন বাধা দূর করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ স্বচ্ছলতার ভিত্তি স্থাপন করিবেন, গ্রাম ভেড়ীর দুরবস্থা দূর হইবে, জলনিকাশ সুব্যবস্থিত হইবে। এ সম্বন্ধে স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীগণ কতদূর কি করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে গ্রাম ভেড়ীর কথার ধারাবাহিক প্রসঙ্গে বিস্তৃতরূপ আলোচনা করিয়াছি। সে সকল কথার পুনরালোচনা অনাবশ্যক। তবে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে গ্রামভেড়ী আদির সম্যক সংস্কার হইলে এ বৎসরের চাষের এত অধিক ক্ষতি হইত না, প্রজার কণ্ঠে এত হাহাকারও উঠিত না। পূর্ব্ববৎসরের ফসল কুতের কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে আজ প্রজাগণকে পতিত জমীর খাজনা দিবার আশঙ্কায় কম্পিত হইতে হইত না। মহালের খাজনা আদায়ের জন্য অসংখ্য সার্টিফিকেট জারি হইতেছিল, তখন উপায়হীন ভীত প্রজাগণ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট কাতর প্রার্থনায় টাকা দিবার বর্দ্ধিত সময় চাহিলে তিনি অবস্থানুরূপ আদেশ দানে সকলের মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার কারুণ্যে, তাঁহার ন্যায় বিচারে অনেকের সম্পত্তি রক্ষা হইয়া গিয়াছে। প্রজাগণের ভগবানে নির্ভরের ইহাও একটি সুফল বটে।

গত বৎসরের ও বর্ত্তমান বৎসরের খাজনা এখন খাসমহাল হইতে তলব হইতেছে, তহশীলদারগণ চেকবই ও কড়ছা লইয়া প্রজাগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া তাগিদ করিতেছে দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম। যদি গত বৎসরের খাজনা রেহাই দিবার কল্পনা পূর্ব্বে না ছিল, তবে গত বৎসর খাজনা আদায় স্থগিত রাখা হইয়াছিল কেন, এই প্রশ্ন আমাদের মনে অহরহঃ উদিত হইতেছে। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বন্যার সময় স্পষ্টরূপে প্রজাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে আবশ্যক হয় তো খাজনা রিমিশন দেওয়া হইবে। যখন খাজনা রিমিশন দেওয়া গবর্ণমেণ্ট অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন, তখন গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়াছেন যে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করতঃ অক্ষপাত দ্বারা এ অঞ্চলের ও এ অঞ্চলবাসীর দারুণ দুর্দ্দশার যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি তাহা অমূলক। এ অঞ্চলের প্রজাগণের দুরবস্থা আমরা অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণিত করিয়াছি এইরূপ ধারণা না হইলে কখনই আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট খাজনা রিমিশন দিতে বিমুখ হইতেন না। রাজার যেরূপ প্রজার প্রতি কর্ত্তব্য আছে, প্রজারও সেইরূপ রাজার প্রতি কর্ত্তব্য রহিয়াছে, রাজার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা করা প্রজার উচিত। যাহাতে রাজাকে কোনও কিছু হইতে বঞ্চিত হইতে না হয় তাহা করা প্রজার কর্ত্তব্য। রাজ ভাণ্ডার যাহাতে পূর্ণ হয়, রাজার যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, প্রজানামের উপযুক্ত পাত্রের তাহা প্রাণপণ যত্নে করা উচিত। রাজার যাহা প্রাপ্য, কড়ায় গণ্ডায় তাহা দেওয়া প্রজার কর্ত্তব্য। রাজাকে ফাঁকি দিতে, চাতুরী করিয়া রাজকর হইতে বঞ্চিত করিতে যে প্রজা প্রয়াসী হয়, ইহকালে পরকালে তাহার সদ্গতি নাই। এ অঞ্চলের বন্যা-বিধ্বস্ত প্রজাগণের মুখপত্ররূপে আমরা আমাদের পরম কারুণিক মহামান্য বঙ্গেশ্বর বাহাদুর সদনে বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যে এক্ষণে এ অঞ্চলের প্রজা সাধারণের অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে এ সময় তাহাদিগকে গত বৎসরের ও এ বৎসরের খাজনা দিতে হইলে তাহারা মারা যাইবে।—মেদিনী বান্ধব

প্রবাসী ভারতবাসী—রিপোর্টে প্রকাশ,—জামেকাদ্বীপে ষোল হাজার ভারতবাসী স্বাধীনভাবে প্রবাসী হইয়াছে। ইহাদের প্রায় অর্দ্ধ সংখ্যা কৃষি ও শ্রমজীবীর কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের ভিতর যাহাদের অবস্থা খুব ভাল, তাহাদের দখলে ত্রিশ হাজার বিঘা জমি আছে,—গবাদি পশুও সুবিস্তর। রিপোর্টের কথা,—জামেকার ভূমিসংগ্রহের আরও সুবিধা ঘটিলে তথায় ভারতবাসীর সংখ্যাও ক্রমে বাড়িতে পারে।

দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা—পত্রান্তরে একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন,—এবার ভাগলপুর অঞ্চলে ধান একেবারেই জন্মে নাই; ফলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা। এখন হইতেই সবিশেষ তথ্যসংগ্রহ একান্ত আবশ্যক।

গো-রক্ষা—আমাদিগের কৃষি-বিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয় গবাদি পালিত পশু রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। প্রচুর খাদ্যের অভাবে এতদঞ্চলের পালিত পশুগুলির অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছে। এ ভাবে আর কিছুদিন গত হইলে পশুবংশ নির্ম্মূল হইবে বলিয়াই আশঙ্কা হয়। একে খাদ্যের জন্য হনন অবাধে চলিতেছে, তাহার উপর অনাহারে পশুগুলি মরিতেছে, ইহাতে পশুর বংশ কতদিন থাকিবে? পূর্ব্বে এদেশে গো-চারণের যে সকল ভূমি ছিল, তৎসমুদায় ক্রমশঃ জমীদার ও প্রজাবর্গ দখল করিয়া আবাদ করিতেছে। কাজেই পশুদিগের খাদ্যের অভাব ঘটিয়াছে। কৃষি-বিভাগের ডাইরেক্টার মহোদয় এ বিষয়ে ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এসোসিয়েশন বলিয়াছেন যে, যে সকল ভূমি জমীদার বা প্রজা দখল করিয়া লইয়াছে তাহা বাহির করিবার এখন কোন উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি ভূমি সংগ্রহ বিষয়ক আইন অনুসারে ন্যায্য মূল্য দানান্তে ভূমি সংগ্রহ করেন এবং সেই ভূমি গো-চারণের জন্য রাখিয়া দেন, তাহা হইলেই উপায় হইতে পারিবে, নচেৎ নহে। কথাটি সঙ্গত বটে। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিলে আমরা সুখী হইব।

পশম রপ্তানি—সিন্ধু-করাচীর "সিন্ধু গেজেটে" প্রকাশ,—ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি পশম রপ্তানি সম্বন্ধে যে কঠোর বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন,—তাহা রহিত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় আবার সকল পশমই অবাধে রপ্তানি হইতে পারিবে। গভর্ণমেণ্টের এ ব্যবস্থায় করাচী, শিকারপুর, সক্কর এবং কোয়েটা প্রভৃতির পশম-কারবারীরা অতিমাত্র আনন্দিত হইয়াছেন। এদেশে সূক্ষ্ম সুতা প্রস্তুত সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের যে কড়াকড়ি বিধান আছে, সে বিধানও যদি গভর্ণমেণ্ট কতকটা শিথিল করিয়া দেন,—তাহা হইলে এদেশের বস্ত্র-কলপরিচালকগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধার বিষয় হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে সুবিবেচনা করিবেন কি?

আলুর চাষ—বাঙ্গালায় আলুর চাষ বাড়াইবার জন্য কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষ সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আলুর চাষের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিবার জন্য তাঁহারা গত বৎসর ৫৫৫ খণ্ড ভূমিতে আলুর চাষ করাইয়াছেন। তন্মধ্যে রঙ্গপুরে বিঘাপ্রতি প্রায় ১১৯ মণ আলু উৎপন্ন হইয়াছিল। কৃষি বিষয়ে কর্তৃপক্ষের এই যত্ন দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। বাঙ্গালার কৃষককে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ আবাদ শিখাইতে পারিলে বাঙ্গালার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সোণা ফলিতে পারে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে কৃষকদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদান করা আবশ্যক। সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষেরও বিশেষ আগ্রহ আবশ্যক।

সার-সংগ্রহ

উদ্ভিদের আত্মরক্ষা

ক্যাকটস্ বা ফণীমনসা তাহার দৃষ্টান্ত

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এফ, এল, এস, লিখিত

কি প্রাণী কি উদ্ভিদ্ সকল জীব শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছে। লৌহনির্ম্মিত বর্ম্ম পরিধান করিয়া মানুষ সে কালের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। কোন কোন প্রাণী ও কোন কোন উদ্ভিদও আপনাদের শরীর বর্ম্ম দ্বারা আবৃত করিয়াছে। কুম্ভীর, কচ্ছপ ও কাঁকড়া ইহার দৃষ্টান্ত। কচ্ছপের উপরে হাড় ভিতরে মাংস। গণ্ডার আপনার সর্ব্বশরীর বর্ম্ম দ্বারা আবৃত করে নাই। কেবল যে স্থানে অন্য পশুদের আক্রমণে বিশেষ রূপ আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা সেই স্থানে ঢাল পরিধান করিয়াছে। তাল জাতীয় উদ্ভিদ্ আপনাদের শরীর বর্ম্ম দ্বারা আবৃত করিয়াছে। ইহাদের শরীরের উপরিভাগ কঠিন, ভিতর কোমল। আম, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষের উপরে কোমল বল্কল ভিতরে কঠিন কাষ্ঠ।

মরুদেশে প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ফণী মনসাকে অন্য প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। প্রথম ফণী মনসা আপনার ছালটী স্থূল করিয়া জল সঞ্চয় করিবার স্থান করিয়াছে। তাহার পর আপনার সর্ব্বশরীরটী সবুজ করিয়া খাদ্য পরিপাকের উপযোগী করিয়াছে। তা যেন হইল, কিন্তু শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? মরুভূমিতে যে সমুদয় জীব জন্তু বাস করে তাহারা সকলেই সর্ব্বদা ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত। তাহাদের মুখ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় না করিলে মরুভূমিতে ফণী মনসা দুই দিনও জীবিত থাকিতে পারে না, মৃগাদি পশুগণ আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। আমাদের দেশে বৃক্ষপত্র, বায়ু হইতে খাদ্য সংগ্রহ ও সূর্য্যকিরণের সহায়তায় খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদন করে। তাহার পর যথা সময়ে কতকগুলি পত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া ফুল ফলে পরিণত হয়। ফণী মনসা পত্র উৎপাদন একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। পত্রগুলিকে কঠিন তীক্ষ্ণ

কণ্টকে পরিণত করিয়াছে। কণ্টকের গায়ে করাতের মত দাড়া আছে। একবার ফুটিলে সহজে বাহির করা যায় না। অবশ্য এক দিন দুই দিনে ফণী মনসা গাছে এরূপ কাঁটা হয় নাই। বহুকাল ভুগিয়া অনেক ঠেকিয়া ক্রমে ক্রমে ইহাকে এই বেশ ধারণ করিতে হইয়াছে। তীক্ষ্ণ কণ্টকে সজ্জিত হইয়া ফণী মনসা যেন অরণ্যের পশুদিগকে বলিল,—"এস, কে আমাকে ভক্ষণ করিবে, এস!" বলা বাহুল্য যে, অরণ্যবাসী পশুগণ কেহই এখন ইহার নিকটে যাইতে সাহস করে না।

পূর্ব্বে এদেশে ঘোড়া ছিল না। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে স্পেন দেশের লোক যখন মেক্সিকো জয় করিল তখন তাহারা এদেশে ঘোড়া লইয়া গেল। এখন এ দেশ পালিত, বন্য, অর্দ্ধবন্য, ঘোড়ায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দেশে ঘোড়া ছিল না, সে জন্য ফণী মনসা ঘোড়ার ন্যায় কঠিন খুর বিশিষ্ট পশুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় করে নাই। ঘোড়া সহজে ইহার নিকটে যায় না; কিন্তু নিদারুণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কণ্ঠাগতপ্রাণ হইলে খুর দিয়া ফণী মনসার গাছকে প্রথম খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে, তাহার পর অতি সাবধানে ভিতরের শাঁস ভক্ষণ করে। এই নূতন বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্ত কয়েক প্রকার নূতন জাতীয় ক্যাক্‌টসের সৃষ্টি হইতেছে।

নূতন এক জাতি ক্যাক্‌টস

এই সমুদয় নূতন জাতি আরও গোলাকার ধারণ করিয়া আরও নিবিড় ভাবে কণ্টকে সজ্জিত হইতেছে। ইহাদের নিকট যাইতে ঘোড়াও সাহস করে না।

গোলাকৃতি ক্যাকটস্

নূতন মূর্ত্তির ক্যাক্‌টস উদ্ভিদ্ সাহেবদের অতি প্রিয়। বাড়ীতে টবে করিয়া অতি যত্নে তাহারা ইহাদিগকে প্রতিপালন করেন। র‍্যাটেল সর্পগণ শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ইহাদের নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করে। জলহীন ক্যাক্‌টস অতি দুষ্প্রাপ্য। ইহারা দুর্গম অরণ্যে বাস করে। কিন্তু এইরূপ অদ্ভুত আকারের বিপৎসঙ্কুল মরু প্রান্তরে মানুষকে প্রাণ হাতে করিয়া যাইতে হয়। তথাপি অনেক টাকা খরচ করিয়া

নূতন নূতন ক্যাক্‌টসের অনুসন্ধানে মানুষ এই স্থানে গমন করে। কেহ বা মরিয়া যায়, কেহ বা নূতন প্রকারের ক্যাক্‌টস লইয়া প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হয়। এরূপ ক্যাক্‌টস অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়।

গৃহপালিত ক্যাক্‌টস

শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত অনেক কীট পতঙ্গ, মৎস্য, পশুও কণ্টক দ্বারা আপনাদের শরীর আবৃত করিয়া থাকে। শোপোকা ইহার এক দৃষ্টান্ত। এক একটী গাছ দেখিয়াছি, শো পোকায় পূর্ণ হইয়া থাকে। শোয়ার ভিতর চমৎকার কোমল মাংস। তথাপি কোন পক্ষী ইহাদের নিকটে যাইতে সাহস করে না। মাগুর, সিঙ্গি ও টেঙ্গরা মৎস্য সর্ব্বশরীর কণ্টক দ্বারা আবৃত করে নাই। শত্রু নিকটে আসিলে তাহাকে মারিবার নিমিত্ত কেবল দুই পার্শ্বে দুইটী কণ্টক রাখিয়াছে। কোন কোন মৎস্য আছে, তাহারা কোন কোন ক্যাক্‌টসের ন্যায় বর্ত্তুল আকার ধারণ করিয়া সর্ব্ব শরীরটী কণ্টকে আবৃত করিয়াছে। শত্রু নিকটে আসিলে সর্ব্ব শরীরটী ফুলাইয়া প্যাট প্যাট করিয়া চাহিয়া যেন বলিতে থাকে,—"কে আসিবে, এস! আমি কাহাকেও ভয় করি না।"

সাজারু তাহার সর্ব্ব শরীর কণ্টকে আবৃত করে নাই। শত্রুকে প্রহার করিবার নিমিত্ত পুচ্ছদেশে কণ্টকের সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে একজন একটী সাজারু পুষিয়াছে। কয়দিন আমি তাহার নিকটে গিয়া দেখিলাম, কিন্তু গায়ে হাত দিতে সাহস করি নাই। এ সাজারুটী পরিচিত লোককে চিনিতে পারে। কাণপুরে থাকিতে আর একটী জীব আমি দেখিয়াছিলাম।

একদিন বসিয়া আছি এমন সময় এক কৃষক কদম ফুলের ন্যায় গোলাকার দুইটী পদার্থ আনিয়া আমাকে দেখাইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ও কি?" সে বলিল, ইহা এক প্রকার প্রাণী, ইহার নাম এই—কি নাম সে বলিল তাহা এখন আমার মনে নাই। দেখিতে তখন কদম ফুলের মত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার সর্ব্বশরীর তীক্ষ্ণ শুভ্রবর্ণের কণ্টকে আবৃত ছিল। বর্ত্তুল আকার জীব দুইটী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার পর যখন বুঝিল যে, নিকটে বিপদের আশঙ্কা নাই, তখন উঠিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল। এখন কিন্তু আমি ক্যাক্টসের কথা বলিতেছিলাম। স্তম্ভ জাতীয় কোন কোন ক্যাক্টসের শরীর এক একটী দুর্গ বলিলেও চলে। কণ্টকগণ সঙ্গিন-হস্তে যোদ্ধাদিগের ন্যায় যেন দুর্গ রক্ষা করিতেছে। মরুভূমির পশুগণ যত কেন ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হউক না, কেহই ইহার নিকট যাইতে সাহস করে না। অপর পৃষ্ঠায় এইরূপ ক্যাক্টসের চিত্র প্রদত্ত হইল।
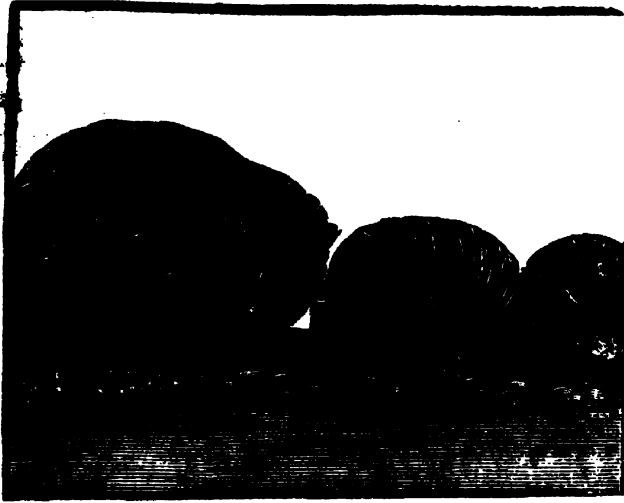
হেজ হগ নামক জীব

দুর্গাকৃতি ক্যাকৃটস

দীর্ঘকণ্টক ক্যাকৃটস

আর এক প্রকার ক্যাকৃটসের কাঁটা দীর্ঘ। ইহাদের নিকটও কোন পশু অগ্রসর হইতে সাহস করে না। এ জাতীয় ক্যাকৃটস দেশের মরুভূমিতে অনেক অনুসন্ধান করিয়া অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া অনেক কষ্টে দুই একটী লোকে প্রাপ্ত হয়। বিলাতে ধনবান লোকেরা অনেক টাকা দিয়া ইহা ক্রয় করেন ও অতি যত্নে ইহাকে প্রতি পালন করেন। ইহার চিত্র দেখিলে এ কথার সপ্রমাণ হয়।

আহার সংগ্রহ ও শত্রুহস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার নিমিত্ত জীবগণ নানা উপায় অবলম্বন করিয়া কেহ বা শরীর বর্ম্ম দ্বারা আবৃত করিয়াছে, বা শৃঙ্গ পরিধান করিয়াছে। কেহ বা নখ ও হস্ত বৃদ্ধি করিয়াছে, কেহ বা কণ্টকে সজ্জিত হইয়াছে, কেহ বা শরীর তিক্ত রসে পূর্ণ করিয়াছে, কেহ বা শরীরে বিষ সঞ্চিত করিয়াছে, এইরূপ নানা জীব নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছে। তাহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র এস্থলে প্রদত্ত হইল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ঘোরতর বিস্মিত হইতে হয়—বঙ্গবাসী।

বাগানের মাসিক কার্য্য

মাঘ মাস।

সব্জীক্ষেত্র।—বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যে গুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুন ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

ভুঁইয়ে শসা, করলা, তরমুজ, ঝিঙ্গা প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারি করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা উচিত। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরিবে ও ফল ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। গোবর, ছাই ও মাটি আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার। আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতিদূরে তৃণ, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে আগুন দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে, ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে, কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহত ভাবে লাগিতে পায়, এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।

বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে, সেই সকল স্থান প্রায় দুই হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই খোঁড়া মাটিগুলি কিছু দিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সার মাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া, খোঁড়া মাটি দ্বারা গর্ত্ত ভরাট করিবে।

পুরাতন ডালের কুল ও পিয়ারা ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পুরাতন ডাল প্রতি বৎসর ছাঁটা উচিত।

কৃষিক্ষেত্র।—সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে জল হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে, তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পলিমাটি দিয়া জমি তৈয়ারি

করিয়া রাখিবে। এই মাস হইতেই ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মূলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে, তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মূলার আগার দিকে চারি অঙ্গুলি রাখিয়া, তাহার মধ্যে খোল করিবে এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পূরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়ে উত্তম বীজ উৎপন্ন হইবে। এই মাসের প্রথম পনের দিনের পর, হলুদ ও আদা তুলিতে আরম্ভ করিবে। হলুদের ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ, গোবর মিশ্রিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। একবার উৎলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুক্‌না হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার দলিয়া দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীনা বাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান।—ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সমস্ত ফুটিয়াছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিতেছে। গোলাপ ক্ষেতে এখন যেন জলের অভাব না হয়। গোলাপের কলম বাঁধা শেষ হইয়াছে। বেল, মল্লিকা, যুথিকা ইত্যাদির ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাঁটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্যপ্রদেশে এখন এষ্টার, হার্টিজ, লর্কস্পর, পিকস্, ফ্লক্স, ভেজী, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীতকালের সব্জী যথা,—গাজর, সালগম, লেটুস্, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

এই মাসের শেষে বেল, যুঁই মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছগুলির তদ্বির না করিয়া জলদি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

পঞ্চদশ খণ্ড,—১০ম সংখ্যা

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্

মাঘ, ১৩২১

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৫শ খণ্ড। | মাঘ, ১৩২১ সাল। | ১০ম সংখ্যা।

ধান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত

আমরা ইতিপূর্ব্বে বীজ তলায় ধান বপনের কথা বলিতেছিলাম। ধানের বীজতলা সম্বন্ধে সব কথা নিঃশেষ করিয়া বলা হয় নাই। দুই প্রকার তলাতে ধান্য বীজ তৈয়ারী করা যায়; ১ম, উচ্চ বাগান জমিতে তলা, ২য় নিম্ন রসা জমিতে তলা। রসা জমিতে তলা প্রস্তুত করাকে বাঙলা দেশে কোথাও কোথাও "পেঁকে তলা" অর্থাৎ পাঁকে তলা বলে।

এইরূপ তলায় কি প্রকারে বীজ বপন করিতে হয় তাহা আমরা বলিয়াছি। বীজ বপনের সময় তলাতে জল থাকিবে না। বপনের ৩।৪ দিন পরে তলাটি জলে ডুবাইয়া দিতে হয়। জলে ডুবান মানে অগাধ জলে ডুবান নহে। জমির উপর আধ ইঞ্চ মাত্র জল থাকিবে। ২ দিন পরে আবার এই জল বাহির করিয়া দেওয়া আবশ্যক হয় ও পুনরায় ২ দিন পরে আবার জল প্রবেশ করাইতে হয়। এইরূপ কিছু দিন চলে। যত দিন না চারাগুলি সতেজে ও সবল হইয়া বাড়িতে থাকে ততদিন এইরূপ করিতে হয়। বীজ তলায় জল প্রবেশ করান ও বাহির করার উদ্দেশ্যে এই যে, তলার জল না পচিতে পায়, হিউমিক এসিড (Humic acid) নামক এক প্রকার অম্ল জন্মিয়া চারাগুলির হানি করিতে না পারে।

ধান রোপণ—ধান ছিটাইয়া বপন অপেক্ষা রোপণে যে ভাল ফল হয় তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। জাপান, ভারতবর্ষ, জাভা প্রভৃতি যে সকল দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধান্য উৎপন্ন হয় তথায় ধান রোপণেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। রোপণের ফলাফল দেখিয়া এক্ষণে য়ুরোপ ও এমেরিকার ধান রোপণ বিধি প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

বপন অপেক্ষা রোপণে অনেক কম বীজ ধানে খরচ হয়, সেটা কম লাভ নহে। সারি-বদ্ধ রোপণ হেতু ধান নিড়াইবারও সুবিধা হয়। ফাঁক ফাঁক হইয়া চারাগুলি বাড়িতে পায় বলিয়া ঝাড় বড় হয় এবং ধানের ফলনও বাড়ে। এমন কি ভাল জমিতে সময়মত রোপণ করিতে পারিলে প্রতি গর্ত্তে একটা হিসাবে চারা রোপণ করিয়াও বিচালি ও ধানের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাঁড়াইতে দেখা গিয়াছে। সিংহলে, জাভায় ইহার বহু পরীক্ষা হইয়াছে। আজ কাল বাঙলা দেশেও কৃষি-বিভাগ দ্বারাও পরীক্ষায় ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের দেশের চাষারা যে বীজ ধান বাঁচাইবার পন্থা জানে না তাহা নহে। তাহারা জমির অবস্থা বুঝিয়া প্রতি গর্ত্তে অল্পাধিক চারা রোপণ করে, তাহারা ঘণ ও পাতলা হিসাবে চারা রোপণ করে। ধান রোপণের সম্বন্ধে এতদ্দেশে একটা বচনই আছে—

কোল পাতল, ঘণ গুছি।
লক্ষ্মী বলেন আমি এইখানে আছি॥

এতদ্দেশের চাষাদের মিতব্যয়িতার জ্ঞান আছে। তথাপি যে তাহারা প্রতি গর্ত্তে একাধিক চারা রোপণ করে তাহার কারণ এই যে, তাহারা ধানকেই তাহাদের জীবনের সম্বল বলিয়া জানে এবং ভয় করে যে, পাছে একটা চারা মরিয়া যায়। একটা চারা মরার অর্থ একটা ধানের গোছ (গুচ্ছ) নষ্ট হওয়া। এই রকম শতাধিক গোছ নষ্ট হইলে তাহার সমূহ ক্ষতি হইবে, তাহার কত পরিশ্রম নষ্ট হইবে, তাহার কত আশা ভাঙ্গিয়া যাইবে।

পুণরায় একবার সংক্ষেপে বলি—ধান্য বীজ রোপণের জন্য কি কি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক—

(ক) বীজ ধান কুলা ছাড়া করিয়া লইতে হইবে। আগড়া চীটা বাদ দিয়া বাছা সুপুষ্ট বীজ গুলি ভিজাইতে হয়।

(খ) বীজ অঙ্কুরিত হইলে তাহা তলায় বপন করিতে হয়। ধান রোপণ করিবার এক মাস পূর্ব্বে এই সকল আয়োজন করা কর্ত্তব্য। মনে কর যেখানে আষাড়ে রোয়া চলে সেখানে জৈষ্ঠের প্রথমে তলায় বীজ বুনিতে হইবে।

(গ) ধান্য চারা বা বীজ ধান একমাস যাবৎ বীজ তলায় থাকিবে। বীজ তলা হইতে ধান্য চারা গুলিকে উঠানকে বীজ ভাঙ্গা বলে। বীজ ভাঙ্গিবার সময় শিকড় ও কাণ্ড যাহাতে অক্ষত থাকে তদ্বিষয়ে যতদূর সম্ভব যত্ন লইতে হয়। শিকড় সংলগ্ন কর্দ্দম ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। সেই দিনেই যদি চারাগুলি রোপণ করা না হয় তবে চারা পরিষ্কার জলে ফেলিয়া রাখিতে হয়। শিকড়ের অগ্রভাগ ছাঁটিয়া দেওয়া ও বাড়তি পাতা ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় উপকার আছে।

(ঘ) সতেজ চারা গুলি বাছিয়া রোপণ করিতে হয়। জমির অবস্থা ও সময় বুঝিয়া প্রতি গর্ত্তে এক অথবা অধিক চারা রোপণই বিধি এবং একটি চারা হইতে দ্বিতীয় চারার অন্তর ৯ হইতে ১২ ইঞ্চ হইবে।

(ঙ) চারাগুলি ঋজু ভাবে না বসাইয়া ঈষৎ বাঁকা করিয়া বসাইতে হয়। সব চারাগুলি সমান বাঁকা ও একধারে বাঁকাইয়া বসাইতে হইবে। চারা বসাইবার পর মধ্যে একবার নিড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়।

স্পেনদেশে ধান রোপণের চিত্র আমাদের দেশের ধান রোপণের চিত্রের অনুরূপ নিম্ন চিত্রে আমরা দেখিতেছি যে স্পেনের চাষীরা জামা পরিয়া ও মস্তক আবৃত করিয়া ধানচাষ করিতেছে। ঐ দেখ তাহাদের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পর্য্যন্ত জামা জোড়া পরিয়া তাহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। আমাদের দেশের চাষীরা তাহা করে না। তাহারা অনাবৃত দেহে ও অনাবৃত মস্তকে ধানের ক্ষেতে কাজ করে। গরমের দিনে তাহাদিগকে জামা কাপড়ে দেহাবরণ করিয়া ধান চাষ করিতে হইলে তাহারা প্রমাদ গণিত।

ধান ক্ষেতে আগাছা—ধান ক্ষেতে আগাছার বাড় কিছু বেশী বেশী বলিয়া মনে হয়। ধানের চারাগুলি বাড়িয়া উঠিতে না উঠিতে ঘাস প্রভৃতি আগাছাগুলি তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসে। যে সার ধান চারাগুলি পোষণ করিবে তাহা আগাছার ভক্ষ্য হইতে রহিল। আরও একটা বিপদ আছে যে, চারা বড় হইতে না হইতে আগাছাগুলিতে পোকা আসিয়া আশ্রয় করে। কোন্ সময় ও কতবার ক্ষেত বা বীজ তলা নিড়াইতে হইবে তাহা গণিয়া হিসাব করিয়া বলিয়া দেওয়া যায় না। ঘাস

কিম্বা আগাছা জন্মিলেই তুলিয়া ফেলিতে হইবে। বীজ তলায় চারাগুলি এক মাস কাল থাকে। বীজ তলাটি একবার ভাল করিয়া নিড়াইয়া এবং ঘণ ও রুগ্ন চারা-গুলি মারিয়া দিলে চারাগুলি শীঘ্র শীঘ্র সতেজে বাড়িয়া উঠে এবং দ্বিতীয়বার নিড়াইবার আবশ্যক হয় না সেইরূপ ক্ষেতে চারা রোপণের ৩০।৪০ দিন পরে ভালমতে ক্ষেত নিড়াইয়া দিলে আর দ্বিতীয়বার না নিড়াইলেও চলে। নিড়ান কার্য্য আশু ও আমন ধানের আগুপিছু হইয়াই থাকে। সতর্ক চাষীরা ঠিক সময় মতই এই কার্য্য সম্পাদন করে। ঘাস বা আগাছা ছোট থাকিতে থকিতেই নিড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলা আবশ্যক। শত্রু যত ছোট হউক তাহাকে উপেক্ষা করিতে নাই। একবার তাহারা দলে ভারি হইলে তাহাদের দমন কঠিন হইয়া পড়ে। আবার আগাছা গুলি বীজ পাকা পর্য্যন্ত যদি ক্ষেতে থাকিতে পায় তবে তাহারা যাহা ক্ষতি করিতে পারিল তাহা করিল এবং ভবিষ্যতের ক্ষতির জন্য বীজ বুনিয়া রাখিয়া গেল।

ধানের সহিত অন্য শস্যের পরিবর্ত্ত চাষ—এই ক্ষুদ্র শত্রু আগাছাগুলি দমনের জন্য এবং জমির উর্ব্বরার শক্তির সমতা রক্ষার জন্য ধানের সহিত অন্য শস্যের পাল্‌টি চাষ করিতে পারিলে ভাল হয়। বিল জমিতে পাল্‌টি চাষ চলে না, কারণ ঐ সকল জমি বৎসরের প্রায় সকল সময়েই জলমগ্ন থাকে। যে সকল জমি ধান কাটিয়া লইবার পর শুষ্ক হইয়া যায় তাহাতে সরস অবস্থায় চাষ দিয়া মটর বা অন্যান্য কলাই কিম্বা শসা, ঝিঙ্গা, উচ্ছে আবাদ করা যাইতে পারে। শুটিধারী শস্যের আবাদ করিলে সাক্ষাত সম্বন্ধে জমির উর্ব্বরা বাড়িবে। কারণ এই জাতীয় উদ্ভিদ তাহাদের শিকড় গ্রন্থীতে উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য নাইট্রোজেন সঞ্চয় করিয়া জমিটি সারবান করিয়া তুলে। সব্জী চাষ করিলে তাহার জন্য যে সার প্রদত্ত হয় তাহার সকল অংশ খরচ না হইয়া ধানের উপকার জন্য থাকিয়া যায় ইহাতে ধানের পরোক্ষে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

আর একটা বিশেষ লাভ এই যে, ধান ব্যতীত চাষীরা অপর একটা ফসল পাইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ধানের সহিত অন্যান্য কয়েক প্রকার সুবিধা জনক ফসলের পাল্‌টি আবাদ করিতে পারিলে অন্য ফসল হইতে একটা উপরি লাভ হয়; জমির ঘাস ও আগাছা নষ্ট হয়, জমির উর্ব্বরতার সমতা রক্ষা হয়, এবং সারা বৎসর ধরিয়া জন মজুরের কাজের অভাব হয় না। বাঙলা দেশে অনেক চাষী এক্ষণে পাট চাষ করিয়া লইয়া সেই ক্ষেতে ধান রোপণ করিতেছে। ইহাতে তাহাদের লাভের মাত্রায় আশাতীত হইতেছে। কিন্তু সব ক্ষেতে, সকল বৎসর এই সুযোগ ঘটিয়া উঠে না।

কৃষি এবং পক্ষীরক্ষা।

(শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার লিখিত।)

বিশ্বপিতার সৃষ্ট এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে কোন পদার্থই অকারণে নির্ম্মিত হয় নাই। পরন্তু ভূতময় এই জগতে অণ্ডজ, গর্ভজ, চেতন, অচেতন, জড়, উদ্ভিদ্ সকল পদার্থই পঞ্চভূত তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকগণ জড়পদার্থের স্পন্দন জিম্ভ্র ক্রন্দন প্রভৃতি জীবনের লক্ষণের পরিচয় পাইয়া জগৎ সমক্ষে প্রচার করিয়াছেন যে জড় জগতেও জীবনের লক্ষণ আছে। বহু শত সহস্রযুগ পূর্ব্বে ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ এই সত্য তাহাদিগের কৃত বেদ, উপনিষদ্, স্মৃতি ও দর্শনাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ভগবানের সংসারে বৃক্ষ, কীট, পতঙ্গাদির যেমন প্রয়োজন আছে সেইরূপ পশু মনুষ্য জীবজন্তুও পক্ষীকুলেরও তদ্রূপ আবশ্যকতা ও উপকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষি সাফল্য রূপে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, কৃষকের অনেকগুলি আনুসঙ্গিক বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়, যেমন বীজ, বলদ, কৃষি-যন্ত্রাদি মাটি, বায়ু, জল ইত্যাদি। বন্য পশু পক্ষী প্রভৃতি হইতেও সহায়তা হয়। এই প্রবন্ধে শরীসৃপাদি চতুষ্পদ জন্তুর কথা বিশেষরূপ আলোচনা না করিলেও এই মাত্র উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, সর্প, গীরগিটাদি বিষাক্ত জীব যেমন মনুষ্যের অপকারক ও প্রাণনাশক, কৃষিজাত পদার্থের তাহারা তেমন অহিতকর নহে। যেহেতু সরীসৃপগণ উই, উচ্চিংরা, কেন্নো, বিছা, বেঙ, টিকৃটিকি আদি ফসলের অনিষ্ট কারক শত্রুগণকে নষ্ট করে। টিকৃটিকি গাছ নষ্টকারী পতঙ্গগণকে আহার করিয়া গাছ রক্ষা করে। কাটবিড়ালী, ইন্দুর, সজারু প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু কৃষকের পরম শত্রু বলিয়া আমার মনে হয়। এই তালিকার মধ্যে আমরা ভাম, খেকৃসিয়ালি, খটাস, উদ্বিড়াল, ছুঁচা, গন্ধগকুলা প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। বড় চতুষ্পদের মধ্যে ব্যাঘ্র, নেকড়া, চিতা অর্থাৎ বিড়াল ও কুকুর জাতীয় বন্য পশুগণ, হস্তী বন্য শুকর হরিণাদি শস্যভুক্ পশুগণকে নাস করিয়া কৃষকুলের মহিয়সী হিত সাধন করিয়া থাকে— শ্বাপদগণ পুনশ্চ কৃষকগণের প্রধান সহায়, কিন্তু মেষ, মহিষ, গবাদি পশুর বিশেষ ক্ষতি-কারক।

আমার বিবেচনা হয় যে পক্ষিকুল অপেক্ষা কৃষকের অপর কোন সৃষ্টজীব এত অধিক উপকারী নহে। ভগবান্ কত শতসহস্র বর্ণের বিচিত্র, পরম মনমুগ্ধকর রঙ্গের পক্ষী সৃষ্টি করিয়া তাঁহার দয়া এবং বিশাল কৃতিত্বের মহীয়সী পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ভগবানের এই সৃষ্টজীবের উপর আমাদের কিরূপ নৃশংস ব্যবহার তাহা মনে হইলে হৃদ্‌কম্প হয়। আমরা হিন্দু, অহিংসা আমাদের সনাতন ধর্ম্ম। বিশেষতঃ এই ধর্ম্ম যে আমাদের হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বৌদ্ধযুগের পর হইতে তাহা কোন

ঐতিহাসিক অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমাদের দৈনিক জীবনের সমস্ত কাজই ধর্ম্মের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। যাহা বর্ত্তমান যুগের হাইজীন্, সায়েন্স, সোশিয়াল পলিটী, সোশিয়ালজী, তাহা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও গৃহ্যসূত্রাদির মতে সকলই ধর্ম্মভাবে জড়িত। প্রাচীন ঋষিগণের এইরূপ অনুশাসনের বিশেষ তাৎপর্য্য দেখা যায়। কারণ ধর্ম্মের সহিত মানব সমাজের দৈনিক নীতি নিয়মাদি জড়িত থাকিলে তাহা দৃঢ়ভাবে প্রতিপালিত হইবে বলিয়া তাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। জনন নীতিশাস্ত্রে হেরিডিটি, রিভার্শান, স্বগণিক, বৈগণিক উৎপাদন নীতিগুলি সবই আমাদের দেশের দূর-দর্শী ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের জানা ছিল কিন্তু আমরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখি নাই বলিয়া আমাদের দৃষ্টিপথে তাহা পতিত হয় না। ডারুইন, ওয়ালেশ্, স্পেন্সার, বসু প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের বর্ত্তমান যুগের আবিষ্কার আমাদিগকে স্তম্ভিত করিলেও ঐ সকল সত্য আমাদের দেশে অপরিজ্ঞাত ছিল না। মতঙ্গ, পরাশর, আশ্বলায়ন, হনুমান প্রভৃতির পুস্তক পাঠে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে প্রাচীন ভারতের আর্য্য ঋষিগণ বিজ্ঞানের কি চরম উচ্চ সোপানে আরোহন করিয়া তাৎকালীন সভ্যজগতকে তাঁহাদের জ্ঞানের জ্যোতিতে ঝলসিত করিয়াছিলেন!

কৃষির জন্য গোরক্ষা, গোপালন, গো উৎপাদক এবং গো-পরিচর্য্যা যেমন হিন্দুর একান্ত প্রয়োজনীয় সেইরূপ পক্ষীকুলকে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করাও আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে হয়। পশু জগতে যেমন শষ্প ও তৃণভুক এই দুই বিশাল পরিবার আছে সেইরূপ পক্ষী রাজ্যেও মাংসাশী এবং শষ্পাশী এবং উভয়াশী এই দুই বিশাল পরিবার দেখিতে পাওয়া যায়। কাক, চিল, শিকরা, বাজ প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী-গণ স্বভাবের মল পরিষ্কারক, যেমন রজককুল আমাদের কাপড়ের ময়লা ধৌত করে; বাবুই, টুন্‌টুনি, বুল্‌বুলি, ছাতার, সালিক, নিলকণ্ঠ, ময়না, তোতা, বগেরই, চরুই, বটের, তিতির, ঘুঘু, পায়রা, বন্য কুক্কুট জাতীয় পক্ষীগণ ক্ষেতের পোকা, গাছের পতঙ্গাদির অণ্ড ও ছানা নষ্ট করিয়া কৃষকদের অনেকবিধ কল্যাণ সাধন করিতেছে। হংস, কান্থবা, কহ্লার, টীল, মুর্গা, সুর্খাব, বালহাঁস, বিগড়ি হাঁস প্রভৃতি শত জাতীয় বিচিত্র বর্ণের জলচর পক্ষীগণ অলক্ষিতে বহমান জলের নির্ম্মলতা সম্পাদন করিয়া রোগ বীজানুর ধ্বংশ করতঃ দেশের কৃষককুলের মঙ্গল সম্পাদন করিতেছে তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না। ভগবানের প্রদত্ত এই প্রসাদের বিনিময়ে এই সুন্দর পক্ষীকুলকে আমরা এতই নির্দ্দয় নৃশংস যে তীরের ফলা, বন্দুকের ছর্‌রা, ব্যাধের ফাঁদ দ্বারা মারিয়া উদরসাত করি অথবা বহুবর্ণের পালক ছিন্ন ও উৎপাটন করিয়া পাশ্চাত্ত বিলাসিনিদের রূপ শোভা বর্দ্ধনের সহয়তা করিয়া থাকি। আমেরিকার বিশাল মহাদেশের বিলাসিনীদের করুণার কৃপায় শত শত পক্ষী, অষ্ট্রীচ, ইঁদুর স্বর্ণবর্ণের শিয়াল, এলায়েষ্ট্রস প্রভৃতি জন্তু ও পক্ষী উৎপাদন শালা প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহু ধনাকাঙ্ক লোকের ধনাগমের পথ উন্মুক্ত করিয়াছে।

ইহার জন্য কত কল কৌশল, কত কৃত্রিম বগু ফলান, কত কারুকারী কাজের বিস্তৃত ব্যবসা পরিচালিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে সময়ে যাহার কিছু জানিবার দরকার হইলে তিনি আমার নিকট পোষ্টেজসহ পত্র লিখিলে সবিশেষ খবর পাইতে পারেন। এ সম্বন্ধে আমি ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকায় ইহাও পূর্ব্বে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি।

মারকিন দেশে ১৮৯৩ সালের পূর্ব্বে কৃষিবিভাগ আদৌ ছিলনা। ১৮৯৭ সালের পর হইতে উদ্ভিদ্ ও জন্তু শাখা ঐ বিভাগে নূতন সাংযোজিত হইলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে তদ্দেশীয় কৃষির সবিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছে। ঐ দেশের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কৃষিবিভাগের অধীনে জীব উৎপাদক শাখা বা Animal Husbandry সংযোজিত আছে।

মারকিন দেশে যেমন কৃষির উন্নতি সাধিত হইয়াছে এরূপ আর কোন দেশেই দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ দশ বার বৎসর হইল আমেরিকার অন্তর্গত ফ্লোরিডা টেক্সাস্, কনেক্টীকট্, টেলিসি, নির্জর্ষি প্রভৃতি প্রদেশে কয়েক প্রকার পোকার উৎপাতে তদ্দেশীয় কপী, কাঁকরি, শসা, গম, আপেল, পিচ, লেবু এবং আঙ্গুর বাগানসমূহকে বিশেষ নষ্ট করে। কৃষক সমাজে মহা হাহাকার উঠিল, অনুসন্ধানে আরম্ভ হইল। ইহার ফলে জানা গেল যে দেশের যাবতীয় পক্ষীকুল ব্যাধ ও শীকারিকুলের দ্বারা অবাধ ধ্বংসে তদ্দেশের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অনিষ্ট ঘটিয়াছে। অনুসন্ধানে ইহা আরও প্রকাশ হইল যে আমেরিকা, কেনেডা দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে ১৯১৩ সালে ২৬৪৮ খানি পালক ব্যবসায়ীর দোকান পাশ্চাত্য বিলাসিনীদের রূপলালসা ও শোভা বর্দ্ধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাদের পোষণের জন্যই বিচিত্রবর্ণের পক্ষধারী পক্ষীকুলের প্রত্যহ নৃসংশ রূপে বিনাশ কোটি কোটি সংখ্যায় সাধিত হইতেছে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ড ৩৩২টী এবং একা প্যারিষনগরে ৬৮৩টী পালকের পোষাক বিক্রেতার দোকান বিরাজিত ছিল। ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে প্যারিষনগরী বিলাসিনীদিগের একটী প্রধান কেন্দ্র স্থলে, মুক্ত ও পালক বিক্রয়ের লণ্ডন, পৃথিবীর একটি প্রধান বাজার। কাজেই ভারতবর্ষ হইতে কোটী কোটী টাকার পালক নৃশংসরূপে পক্ষীকুলকে ধ্বংস করিয়া আহরিত হইয়া বিলাসিনীদের অঙ্গ শোভা সম্পাদনের জন্য ভারত হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে। প্রিয় পাঠক ! একবার ভাবিয়া দেখদেখি পৃথিবীর মধ্যে কত কোটী কোটী পক্ষী ও গবাদি পশু মানবজাতীর খাদ্য ও বিলাস সাধনের জন্য প্রত্যহ নিপাতিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীগণ যাহা করে তাহা সবই সুখের তাঁহারা গো-খাদক হইলেও তাঁহারা গো-রক্ষা ও গো-উৎপাদন করিতে জানেন। গো-পাল বান্ধব পাঠক অবগত আছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গোজাতীর প্রচার ভারত হইতে মিসর দেশ হইয়া অন্যত্র হইয়াছে। ভারতে যত প্রকার বিভিন্ন বর্ণের পক্ষীকুলের জন্ম স্থান এরূপ আর কোন স্থানে নাই। কৃষির প্রধান রক্ষক ও সহায়ক পক্ষীকুল প্রত্যহ কোটী কোটী সংখ্যার

নিধন প্রাপ্ত হইতেছে তাহার দিকে দেখে কে? পক্ষীগণ চঞ্চুর সাহায্যে ভূগর্ভস্থ কীট-বংশের উৎপাদন করিয়া সমগ্র ক্ষেত্রের সমভাবে চূণ, অম্লযান, জবক্ষার যান, কারবান প্রভৃতির উদ্ভিদ্ দেহের পুষ্টীসাধনের সামগ্রিসমূহ পরিচালিত করিয়া কৃষককুলের অলক্ষিতে উপকার করিতেছে তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না।

দীন ভারতের মা বাপ নাই!! প্রত্যহ পক্ষী ও গো-নাশের বিরুদ্ধে একটী কথাও কেহ বলিতে সাহস পান না; অথবা পোড়া দেশের অধিবাসীগণের চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে যে, ভগবানের সৃষ্টির বিনাশের বিরুদ্ধে একটীও কথা কেহ বলিতে সাহসী হয় না। আমরা এমনই পরমুখাপেক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়াছি যে, যে কোন হউক না কেন, তাহাতে দেশহিতকর কার্য্যে আমরা পথ প্রদর্শক হইতে পারি না। যে কাজে আমাদের শাসনকর্ত্তা অগ্রণী না হইবেন তাহা আমরা আর কদাচ আরম্ভ করিতে সাহসী হই না। যে জাতির নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত গিয়াছে সে জাতির অস্তিত্বের আর আশা কি?

পৃথিবীর বড় লোকদের সখের খাতিরে পক্ষীকুল জগৎ হইতে ক্রমিক অবসর গ্রহণ করিতেছে এবং ভগবানের নির্ম্মাণ কৌশলের পারিপাট্য ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে দেখিয়া কতিপয় সহৃদয় ইংরাজ পক্ষীরক্ষা ব্রত গ্রহণ করিয়া সমগ্র দেশে দেশে পক্ষী রক্ষার উপকারিতা মানব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে চেষ্টাবান হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে লেডি চাল্‌টন একজন তাঁহার ঠিকানা ৫নং জারমিন ষ্ট্রীট, লণ্ডন। মিঃ জেমস্ বক্‌ল্যাণ্ড রয়েল কলোনিয়াল ইনষ্টিটিউট্, লণ্ডনের নাম ও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার বাকি থাকিল তাহা পরবারে পাঠকগণকে উপহার দিব। আমার ঠিকানা। গোপালবান্ধব প্রণেতা শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, ভকীল হাইকোর্ট ১৮নং রসারোড, নর্থ ভবানীপুর, কলিকাতা। ক্রমশঃ।

অর্কিড পালন

এপিটাইফাল (স্বর্গীয়, যাহা ভুমির উর্দ্ধে হয়) অর্কিড পালন করিতে হইলে প্রথমেই সতর্ক হইতে হইবে যে তাহাদের গোড়াতে কোন কারণে জল না বসে। এই জাতীয় অর্কিড গোড়ায় জল বসা সহ্য করিতে পারে না, এই কারণে আমরা স্বভাবতঃ দেখিতে পাই যে এই সকল অর্কিড গাছের কাণ্ডে কিম্বা পাহাড় গাত্রে যেখানে জল না বসিয়া সহজেই জল সরিয়া যায় এমন স্থানে তাহারা তাহাদের আবাস মনোনীত করিয়া লয়। যে কোন উদ্ভিদ পালনে তাহাদের স্বভাবের অনুসরণ করাই শ্রেয়স্কর তাহার অন্যথা হইলে বিফল মনোরথ হইতে হয়।

গৃহপালিত এই জাতীয় অর্কিড এই জন্য আমরা কাষ্ঠ খণ্ডে ধরাইয়া রক্ষা করাই

সুবিধা জনক বলিয়া মনে করি। সেগুণ, কুল, পিয়ারা, ফার্ণ প্রভৃতি গাছের ডালই ইহাদের ভাল আধার। কাষ্ঠ খণ্ডে অর্কিডগুলি বাঁধিয়া দিতে হয়। যে কাষ্ঠ খণ্ডটি লইবে তাহাতে যেন রঙ করা না হয়। কাষ্ঠ খণ্ডের উপরেই অর্কিডগুলি জড়াইয়া বাঁধিয়া দিলে চলিবে না। কাঠের উপর প্রথমতঃ জীবন্ত মস্ স্থাপন করিয়া তাহার উপরিভাগে অর্কিডের শিকড়গুলি বিছাইয়া দিতে হইবে এবং অবশেষে শিকড়গুলি কথঞ্চিৎ ঢাকিয়া লইয়া নারিকেলের সরু দড়ি দ্বারা বাঁধিতে হইবে। শিকড় গুলিতে আঘাত না পায় বা ভাঙ্গিয়া না যায় বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। লোহার তার দিয়া বাঁধা উচিত নহে। লৌহ সংস্পর্শে গাছের ক্ষতি হয়। যদি ধাতু তার দিয়া বাঁধিতে হয়, লৌহের পরিবর্ত্তে তামার তার ব্যবহার করা ভাল। যতদিন না গাছগুলি নূতন শিকড় চালাইতে পারে ততদিনই বাঁধিয়া রাখিতে হয়। নূতন শিকড় কাঠে জড়াইয়া ধরিলেই আর অন্য বন্ধনের আবশ্যক হয় না। এই জাতীয় অর্কিডের মধ্যে দুই এক প্রকার অর্কিড আছে যাহারা অনাবৃত কাঠের উপরেই জন্মিতে ভাল বাসে। তাহাদের জন্য আর প্রথমে মস্ জড়াইবার আবশ্যক হয় না। এই রকমের অর্কিড গুলিতে ঘণ ঘণ জল ছিটান আবশ্যক। ইহারা সম্পূর্ণরূপে আবহাওয়ার সরসতা উপভোগ করিতে ভাল বাসে সুতরাং সর্ব্বদা জল ছিটাইয়া উহাদের সংস্পর্শের বায়ু সরস রাখা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

অনেকেই কিন্তু অর্কিডের এই প্রকার কাষ্ঠাধারের পক্ষপাতি নহে বরং বিরোধী। এই প্রকার কাষ্ঠাধারে সর্ব্বদা সমান ভাবে রস রক্ষা করা যায় না। এই রকমের কাষ্ঠাধার অপেক্ষা বাস্কেট বা ঝুড়ীতে অর্কিড পালন অধিক সুবিধা জনক। ঝুড়ি বলিলেই আমরা, বাঙ্গালা দেশের লোক, কঞ্চির বা বেতের গোল ঝুড়িই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এইরূপ কঞ্চি প্রভৃতির ঝুড়ি কয় দিন টিকিবে? অর্কিডের ঝুড়িগুলি সেগুণ কাঠের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমরা সেগুণ কাঠের উল্লেখ করিলাম কিন্তু যে কোন শক্ত টিক সহি কাঠে অর্কিডের আধার ঝুড়ি হইতে পারে। ঝুড়ির মাপ গাছের অনুপাতে ছোট বড় হইয়া থাকে। আধারটি অযথা বড় হইলে অধিক রস সঞ্চয় হেতু গাছের অনিষ্ট হয়। ঝুড়ির মধ্যে ফার্ণ, মস্, নারিকেল ছোবড়া প্রভৃতি দিলে গাছের উপকার হয়। এই সকল গাছ রস রক্ষা বিষয়ে সহায়তা করে। যখন অর্কিডগুলি কড়িকাঠে ঝুলাইয়া রাখা হয় তখন চারিদিকের বায়ু সংস্পর্শে অর্কিডের গোড়ার রস সুখাইতে থাকে, ঝুড়ির মধ্যে মস্ ছোবড়া প্রভৃতি থাকিলে রস সহজে উবিয়া যায় না অথচ গাছগুলির চারিদিকে জলও বসিতে পায় না।

বাস্কেট বা ঝুড়ি।

এপিফাইটাল অর্কিডকে আজকাল গামলায়ও ভালমতে থাকিতে দেখা যায়। অর্কিড

পালনের প্রধান লক্ষ্য রসের সমতা রক্ষা; সছিদ্র সামান্য সামান্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মস্ দিয়া এবং জল নিঃসরণের পথ সাফ্ রাখিয়া একটু তদ্বির করিয়া পালন করিতে পারিলে গামলা পালিত অর্কিড দেখিতে সত্বরেই মনোরম হয়। গামলাটির চারি ভাগের তিন ভাগ—কর্ক টুক্রা বা কাঠের কয়লা দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইতে হয়। ইহারা জল সহজেই শুষিয়া লয় ও ইহাদের রস রক্ষা করিবার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অধিক অথচ বাড়তি জল অনায়াসে বাহির হইয়া যাইতে পারে। মাটির গামলা অপেক্ষা গাছের ডালদ্বারা প্রস্তুত বাস্কেট ভাল। বাড়তি জলনিকাশী পথ ঠিক রাখিবার জন্য আর একটি কৌশল অবলম্বন করা যাইতে পারে। একটা বড় গাম্লার মধ্যে একটা সছিদ্র ছোট গাম্লা উপুড় করিয়া দিলে জল নিকাশের বেশ সুবিধা হয় এবং বিনা আয়াসে এই প্রকারে গাম্লার কিয়দংশ পূর্ণ হইয়া গেল। বাড়তি জল গাছের গোড়ায় দাঁড়াইতে যাহাতে না পায় তজ্জন্য এই সকল উপায় অবলম্বন বিধেয় হইয়া পড়ে। ছোট গামলাটি উপর ও চারিদিকে ইটের টুক্রা ও কাঠের কয়লা দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়।

খোলা ভাঙ্গা ইটের টুক্রার উপর একস্তর জীবন্ত মস্ বিছাইয়া তাহার উপর অর্কিড গাছ স্থাপন করিতে হয়। গাছ যে অবস্থায় থাকিলে সুবিধা হয় সেই অবস্থায় বাম হাতে ধরিয়া রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শিকড় গুলি চারিদিকে বিস্তৃত করিয়া দিতে হয় এবং তদুপরি পচাপাতা সার দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয়। গাছটি বাম হাতে ধরা থাকার দরুণ তাহাকে ইচ্ছামত সার মধ্যে প্রোথিত রাখা যায়। গাছের কাণ্ডমূলে যেখানে চোখ (Eye) থাকে তাহা মাটির উপরে থাকিবে। যদি সার মাটি ঢাকা পড়ে তাহা হইলে মূলটি পচিয়া যাইতে পারে। খুব সাবধানে কার্য্য করিতে হইলে মস্, ফার্ণ প্রভৃতি দ্রব্যাদি দ্বারা গাম্লা ভরিয়া লইয়া তাহারউপর অর্কিড স্থাপন করিলে ভাল হয়; কেন না তাহাহইলে আর কোন প্রকারে অর্কিডে জল বসিতে পাইবে না। গাম্লা চারি ভাগের তিন ভাগ ইটের টুক্রা বা কয়লা প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ হইবে, তদুপরি আধ ইঞ্চি আন্দাজ মোস্, বাকি অংশ পচাপাতা দ্বারা আচ্ছাদিত হইবে। চিত্রে তাহা দেখান হইয়াছে। গাম্লায় অর্কিড স্থাপন করিবার সময় আর একটি বিঘ্ন উপস্থিত হয়। গাছগুলি ঠিক অবস্থায় সোজা রাখা সময় সময় দুরূহ হইয়া পড়ে। বড় গাছ হইলে এই সমস্যা প্রবল হইতে প্রবলতর হয়। এক গাছা বাঁশের বাঁখারি গামলার মধ্যে স্থাপন করিয়া অর্কিড কাণ্ডটি যেরূপ ভাবে রাখিবার ইচ্ছা রাখিয়া, বাঁখারির সহিত বাঁধিয়া দিলে এই সমস্যার প্রতিবিধান হইয়া থাকে। গাছটি যখন স্বজোরে দাঁড়াইতে পারিবে তখন বাঁখারি গাছটি বাহির করিয়া লইলে ক্ষতি হয় না, বাঁখারি গাছটি থাকিতে দিলেও ক্ষতি নাই
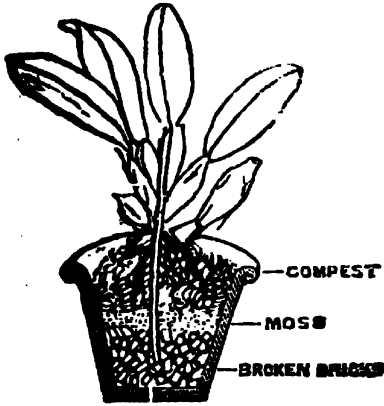
উপরে পচাপাতা, মধ্যে মস্, শেষে ইটের টুক্রা।

গামলায় দিবার জন্য কর্ণের আঁস (polypodium fibre) কিম্বা মস্ কিম্বা এই রকমের যে দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয় তাহাকে পটিং দ্রব্য (potting material) বলা হয়। কার্ণের আঁস এবং মস্ এতদুভয়েই খুব ভাল পটিং দ্রব্য। কার্ণের আঁস গুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লইতে হয়, উহার সহিত কিছু সাদা বালি ও ছোট ছোট কাঠের কয়লার কুজি মিশাইয়া লইতে হয়। এই যে মিশ্রণটি তৈয়ারি হইল ইহা খুব স্থিতি স্থাপক হয়। এই প্রকারে প্রস্তুত মাটি বসিয়া যায় না, ফাটিতে পারে না এবং ইহার সহিত মিশ্র মস্ রস রক্ষার সহায়তা করে। এইরূপ মিশ্রণ দ্বারা পটটি পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে কিন্তু মাটি খুব চাপিয়া বসাইয়া দেওয়া অবিধি। আল্‌গা পদার্থের উপর ব্যতীত অর্কিড থাকে না।

ভূমিজ (Terrestrial) অর্কিডগুলিও গাম্‌লা বসাইয়া পালন করিতে হয়। তাহাদিগকে গাম্‌লায় বসাইতে এপিফাইট্যাল অর্কিডের মত এত সতর্ক হইতে হয় না এবং জল নিকাশী ব্যবস্থার প্রতি এত কড়া নজর রাখিতে হয় না। একটু বড় গাম্‌লায় ইহাদিগকে পালন করিতে হয়। গামলাটির তলদেশ ২।৩ ইঞ্চ পর্য্যন্ত খোলা বা ইটের টুকরা দ্বারা পুরাইয়া তাহার উপর কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত মস্ কিম্বা কার্ণ আঁস ও কাঁকর বিছাইতে হয়। তদুপরি অর্কিডটি স্থাপন করিবার উপযুক্ত সার দ্বারা ঢাকিয়া দিলে গাছের সম্পূর্ণ পাইট করা হইল। সার প্রয়োগের পরও যেন গাম্‌লা এক ইঞ্চ পর্য্যন্ত খালি থাকে। ভূমিজ অর্কিডের জন্য পচাপাতা, ঘাসের চাপের মিহি কুচা, পুরাতন গোময়সার এবং মোটা বালির মিশ্রণ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

অবশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে গাম্‌লা বা ঝুড়ি বা প্যানে যে পাত্রেই অর্কিড রক্ষা করা হউক না পাত্রগুলি মস্ দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে লাভ এই হয় যে অর্কিড আদ্র মস্ সংযোগে সুখকর শৈত্যসুখ অনুভব করে এবং আদ্র মস্ হইতে যে জলীয় বাষ্প উত্থিত হইতে থাকে তাহা অর্কিডের বড় প্রাণারামদায়ী হয়। অর্কিডের পাত্রগুলি এই প্রকার ঢাকিয়া দিলে বেশ শোভনদর্শনও হইয়া থাকে এবং গাছগুলির চেহারা যেন বদলাইয়া যায়।

সয় সীম—শিম্বি জাতীয় উদ্ভিদ বলিয়া ইহারা শিকড়ের গ্রন্থিতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে এবং এই হিসাবে ইহা শণ ধঞ্চের মত সবুজ সার। গবর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রের পরীক্ষায় জানা যায় যে অন্যান্য সবুজ সার অপেক্ষা ইহা অনেকাংশে ভাল। ইহার বীজ ভারতীয় কৃষি সমিতি হইতে পাওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ড।০ আনা। বীজের ভাল মন্দ আছে। পরিমাণে অধিক লইলে ১৫৲ টাকা মণ দরে পাওয়া যাইতে পারে।

বীজ পাইবার ঠিকানা ম্যানেজার ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন্ (ভারতীয় কৃষি সমিতি) ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাময়িক কৃষি সংবাদ

খৈল সারের ব্যবহার—

এ প্রদেশের অনেক স্থানের কৃষকেরা আকের ক্ষেতে সরিষার খৈল দিয়া থাকে; এরূপ অনেক স্থানও আছে যেখানে লোকে উহার আদৌ ব্যবহার করে না। খৈল সারের ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রচলিত হওয়া উচিত। এরণ্ড বা রেড়ীর খৈলসার আকের পক্ষে উৎকৃষ্ট। রেড়ীর খৈল পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের দুই এক স্থানে পাওয়া যায়। রাজসাহী জেলে রেড়ীর খৈল পাওয়া যায়। কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণে রেড়ীর খৈল পাওয়া যাইতে পারে। ২৪ পরগণা ও হুগলী জেলায় আক, গোল আলু, বাঁধা কপি প্রভৃতি ফসলের জন্য বিস্তর পরিমাণে খৈল ব্যবহৃত হয়। বর্দ্ধমান জিলায় ধানের ক্ষেতেও সরিষার খৈল দিবার প্রথা আছে। সরিষার খৈল অপেক্ষা রেড়ীর খৈল তেজস্কর বেশী, সেই জন্য রেড়ীর খৈলের দরও বেশী।

খৈলের দাম বড়ই কমে বাড়ে। উৎপন্ন অপেক্ষা খরচ বেশী বা কম হইলে দাম বেশী বা কম হইবে। পাড়াগাঁয়ে সরিষা খৈলের দাম সাধারণতঃ মণকরা ১৲ হইতে ১।৷০ টাকার ভিতর ছিল। কলিকাতায় রেড়ীর খৈলের দাম মণকরা ১৸০ হইতে ২।০ নয় সিকা বেশী হইত না। এইরূপ দামে খৈল পাওয়া গেলে, উহা আক, আলু, শাক সব্জী প্রভৃতি মূল্যবান ফসলে দিলে বিলক্ষণ লাভ হইবারই কথা। কিন্তু সম্প্রতি খৈলের মূল্য বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। পাড়াগাঁয়ের অনেক স্থানে সরিষার খৈল প্রতিমণ ২।৷০ টাকার কমে পাওয়া যাইতেছে না ও কলিকাতায় রেড়ীর খৈলের দাম ৪৲ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এত বেশী দামে সকল স্থানে খৈলের ব্যবহারে লাভ হইবে কিনা পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে বলা যায় না।

কি পরিমাণে এই দুইটী সার ব্যবহার করিলে ভাল হয়, তাহা বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু পরিমাণ মত ব্যবহার করা না করা কৃষকের আর্থিক শক্তির উপর নির্ভর করে। আলু ও আকের ক্ষেতে বিঘায় ৬ হইতে ১০ মণ পর্যন্ত খৈল দেওয়া চলে। বর্ষাকালে আকের গোড়ায় ২।৩ বার মাটি দিতে হয়, মাটি দিবার সময় ২।৩ বারে খৈল দিলে ভাল হয়। যেখানে আলুর ক্ষেতে জল দেওয়া না হয়, সেখানে খৈল দিতে হইলে আলু লাগাইবার কিছু পূর্ব্বে দেওয়া উচিত, নতুবা উহা পচিয়া সার হইতে পারে না। আর যদি আলুর ক্ষেতে জল দেওয়া হয়, তাহা হইলে আলুর গোড়ায় মাটি দিবার সময় খৈল দিলে চলিতে পারে।

যত প্রকার খৈলসার আছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইয়াছে। কোন্ সারে কত মাত্রায় নাইট্রোজেন, পটাস, ফস্ফরিক অম্ল আছে তাহা জানিতে পারিলেই সারের গুণাগুণ তুলনা করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ রেড়ী ও সরিষার খৈলেরই বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

খৈলের নাম।		নাইট্রোজেন	ফস্ফরিক এসিড।	পটাস।	চুণ।
চীনের বাদামের খৈল	...	৭·৬	·৯	·৪	অনিশ্চিতা
রেড়ীর-খৈল ...	...	৫-৭	২·৯	২·৬	·৭
তিসির ,, ...	...	৪-৫	অনিশ্চিত	অনিশ্চিত	অনিশ্চিত
তিলের ,, ...	...	৪·৭	১·৯	·৯	২·৫
সরিষার ,, ...	...	৫·৫	১·০	অনিশ্চিত	অনিশ্চিত
গুঁজির ,, ...	...	৫·৩	২·২	·৯	১·০
করঞ্জার ,, ...	...	৩·৭	·৮	,,	অনিশ্চিত
মহুয়ার ,, ...	...	২·৫	·৯	,,	,,
কুসুমের ,, ...	...	৫·৮	১·৯	,,	,,
নারিকেলের খৈল ...	...	৩·৩	১·১	,,	·২
পেস্তাদানার ,, ...	...	৭·০	৩·০	,,	অনিশ্চিত
কাপাস বীজের খৈল	...	৬-৭	১·৫	২-৩	,,

গোবিন্দপুরে স্কোয়াস—স্কোয়াস পাহাড়ে ভাল হয় কিন্তু ইহা নিম্ন সমতল ভূমিতে ভালরূপে জন্মিতে পারে কি না অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন। আমরা ইহার একটা ঠিকঠাক উত্তর দিবার জন্য কয়েক বৎসর হইতে স্কোয়াস চাষ করিয়া দেখিতেছি। এমেরিকা হইতে দুই এক প্রকার স্কোয়াস বীজ আনান হয়। এই জাতীয় স্কোয়াস ওজনে তিন পোয়া এক সের কখন বা তাহার অধিক হয়। দার্জ্জিলিঙ্গে এক প্রকার স্কোয়াস হয় তাহা ছোট, দেখিতে কতকটা পেয়ারার মত। দার্জ্জিলিং হইতে বীজ আনাইয়াও আমরা পরীক্ষা করিয়াছি কিন্তু কোনটিরই ফল মনোমত হয় নাই। স্কোয়াস এক রকম কুমড়া জাতীয় গাছ। নিম্ন ভূমিতে কুমড়া বেশ হয়, খুব বড় বড় হয়, কিন্তু স্কোয়াস সেরকম হয় না। আসাম অঞ্চলে ছোট স্কোয়াসই স্বভাবতঃ জন্মিত, এক্ষণে কৃষিবিভাগের উদ্যোগে শিলঙে ও খাসিয়া পাহাড়ে ভাল স্কোয়াসের চাষ খুব বিস্তার হইয়াছে। স্কোয়াস খাইতে বিলাতী কুমড়ার (Red gourd) মত নহে। দেশী কুমড়ার স্বাদের সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য আছে। ঠিক ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয় ইহার স্বাদ দেশী ও বিলাতী কুমড়া·

মিশাইলে যেমন ঠিক তেমনি। শেষ কথা ইহা তরকারির হিসাবে মন্দ নহে, ইহার চাষে লাভ আছে। নিম্ন ভূমিতে ইহা একেবারে হয় না তাহাও নহে, তবে পাহাড়ে ইহা অতি বিস্তর ফলে এবং স্বাদে গন্ধে পাহাড়ে উৎপন্ন স্কোয়াসগুলাই যেন ভাল বলিয়া বোধ হয়।

পশুখাদ্যে লবণ—মনুষ্যের ন্যায় গবাদি পশুখাদ্যে কিয়ৎপরিমাণে লবণ মিশ্রিত করা আবশ্যক। পশুখাদ্যে অতিরিক্ত লবণ আবার বিপদ জনক। নিউ সাউথ ওয়েলসের কৃষি গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে, অনুসন্ধানে তথাকার কৃষিবিভাগ জানিতে পারিয়াছেন যে, অনেক স্থলে অতিরিক্ত লবণ ব্যবহার হেতু পশুগণ রোগাক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছে। অথচ পশুখাদ্যে কিছু লবণও থাকা চাই। কোন একজন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন যে শুকর ও ভেড়াকে ১০ তোলা হইতে ২০ তোলা লবণ খাওয়াইলে তাহাদের দেহে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়। অধিক মাত্রায় লবণ ব্যবহারে ঘোড়া গরুরও অপকার হয়। মোরগ প্রভৃতির খাদ্যে সামান্য একটু লবণ ভাগ অধিক হইলেই তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে। অতিরিক্ত লবণ ব্যবহার হেতু যে ক্রিয়া আরম্ভ হয় তাহা প্রথমেই স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করে। ইহাতে পশুগণের পা ধরিয়া যায়,—তাহারা চলিতে বা দাঁড়াইতে পারে না এবং স্নায়বিক ক্রিয়া নষ্ট হইয়া তাহারা মারা যায়।

জল বৃষ্টির সঙ্কেত

আজকাল যাঁহারা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করেন না যে, মনুষ্য ভবিষ্যৎ ঘটনা গণিয়া বলিতে পারে। মানবের স্ব স্ব অবস্থা সম্বন্ধে যাহাই হউক, পূর্ব্বের লক্ষণ ইত্যাদি দেখিয়া পৃথিবীর জল বায়ু ঘটিত অবস্থা অর্থাৎ বৃষ্টি কখন হইবে, ঝড় কখন হইবে কি না বলা যাইতে পারে, ইহাতে আর সন্দেহের কারণ নাই, যদি সাধারণ লক্ষণ দেখিয়া ৩।৪ দিবস পূর্ব্বে ঝড় বৃষ্টির কথা গণনা করিয়া বলা যাইতে পারে, তবে অনেক বুদ্ধিমান্ লোকে আরও সূক্ষ্ম লক্ষণ দেখিয়া ৩।৪ মাস কি বৎসর পরে যাহা হইবে তাহা স্থির করিতে না পারিবেন কেন? এদেশের কৃষকদিগকে শস্য ক্ষেত্রের জলের জন্য আকাশেরদিকেই তাকাইয়া থাকিতে হয়। কোন্ মাসে কিরূপ জল্ হইবে, দুর্ভিক্ষ হইবে কি না, এ সকল বিষয় পূর্ব্বে জানিবার কোন উপায় থাকিলে কৃষকদের আবাদ বুনানী কার্য্যের যে কত সুবিধা হইতে পারে তাহার সীমা নাই। এই সকল বিষয় নিরূপণ করিবার বিস্তর সঙ্কেত আছে, সেগুলি জানা থাকিলেও জল বৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক বিষয় পূর্ব্বেই জানিতে পারা যায়, নিম্নে কতকগুলি লিখিত হইল।

(১) "আগে পাছে ধুধু চলে মীন অবধি তুলা, মকর কুম্ভ বিছা দিয়া কাল কাটায়ে গেলা।" পৌষ মাসের ত্রিশ দিন বার ভাগ করিলে উহার প্রথম ১॥০ দিন ও শেষ ১॥০ দিন পৌষ মাসের জন্য রাখিয়া প্রথমের সওয়া দিনের পর হইতে প্রত্যেক ২॥০ দিন ক্রমে মীন অর্থাৎ চৈত্র মাস, মেষ বৈশাখ, বৃষ জ্যৈষ্ঠ, মিথুন আষাঢ়, কর্কট শ্রাবণ, সিংহ ভাদ্র, কন্যা

আশ্বিন, তুলা কার্ত্তিক, বিছা অগ্রহায়ণ, মকর মাঘ, কুম্ভ ফাল্গুন ও ধনু পৌষ এইরূপ বার ভাগ করিয়া লইতে হইবে। এখন পৌষ মাসের যে তারিখে যেরূপ রৌদ্র বৃষ্টি বাদলা ঝড় বা বাতাস হইবে (সেই সেই অংশে যে যে মাসের নাম করা হইয়াছে) সেই মাসেও তদ্রূপ ঘটিবে, অর্থাৎ মাসের মোটামুটী ঘটনা ঐ ২॥০ দিনের অবস্থা দেখিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে। স্থূল কথায় এই সঙ্কেত দ্বারা পৌষ মাসকে বৎসরের সূচী পত্র স্বরূপ মনে করিয়া লওয়া হইয়াছে। এখন ঐ সঙ্কেত দ্বারা কতদুর সত্য ঘটনা হয় পাঠকগণ স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

আকাশের অবস্থা, মেঘের অবস্থা, সূর্য্য উদয়ের ও অস্তের অবস্থা, দেখিয়া এমন কি পাখী ও কীট পতঙ্গের কার্য্য দেখিয়াও জলবৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যৎ তত্ত্ব জানা যাইতে পারে।

(২) "চৈতে থর থর, বৈশাখে ঝড় পাথর, জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে, তবে জান বর্ষা বটে।"

চৈত্র মাসে শীত, বৈশাখ মাসে ঝড় বৃষ্টি ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আকাশ বেশ নির্ম্মল থাকিলে সে বৎসর সুবর্ষা হয়।

(৩) "আষাঢ় নবমী শুকুল পাখা, কি কর শ্বশুর লেখা জোকা, যদি বর্ষে ঝিমি, শস্যের ভার না সহে মেদিনী, যদি বর্ষে মুষলধারে, মাঝ সমুদ্রে বগা চরে, যদি বর্ষে ছিটে ফোটা, পর্ব্বতে হয় মীনের ঘটা, হেসে সূর্য্য বসে পাটে, চাষার বলদ বিকায় হাটে।"

আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে যদি অনবরত অল্প অল্প বৃষ্টি হয়, তবে শস্য পূর্ণা বসুন্ধরা জানিতে হইবে। যদি মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয় তবে সে বৎসর জলাভাবে শস্য নষ্ট হয়। যদি ছিটে ফোটা বর্ষণ হয় তবে সুবর্ষা ও ফশল ভাল হয়, আর যদি হাসিতে হাসিতে সূর্য্য অস্ত যায় অর্থাৎ সূর্যাস্তকালে আকাশ মেঘ শূন্য থাকে, বৃষ্টি বাতাদি কিছুই না হয়, সে বৎসরের অবস্থা ভাল হইবে না, পদে পদে অন্ন কষ্টের আশঙ্কা হইবে।

(৪) ফাল্গুনে রোহিণী যত্নে চাই, আগামী বৎসর গণিয়া পাই, সপ্তমী অষ্টমী হয় ধান, দশমীতে নির্ম্মূল পাতাল।

(৫) দিনে জল রাতে তারা, এই দেখবে শুকোর ধারা।

(৬) পৌষ গরমী বৈশাখে জাড়া, প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া।

(৭) পূর্ব্বেতে উঠিল ঝড়, ডাঙ্গা ডোবা একেকার।

(৮) চাঁদের সভার মধ্যে তারা, বর্ষে পানি মুষলধারা।

(৯) কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা, এলোমেলো বহে বা, কৃষককে বলা বাঁধতে আল, জল হবে আজ কাল।

(১০) দুর সভা নিকট জল, নিকট সভা রসাতল। মতান্তরে নিকট সভা দুর জল।

১১) পশ্চিমে ধনু নিত্য খরা, পূবের ধনু বর্ষে ঝড়া।

(১২) বেঙ ডাকে ঘণ ঘণ, জল হবে শীঘ্র জান ।

(১৩) বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়, জল হবে সে বৎসর খনা কয় ।

(১৪) পৌষের কুয়া বৈশাখের ফল, য দিন কুয়ই ত দিন জল ।

(১৫) কর্কট ছরকট সিংহ শুকা কন্যা কানেকান, বিনা ব্যয়ে বর্ষে তুলা কোথা রাখবি ধান ।

(১৬) জ্যৈষ্ঠে শুকো আষাঢ়ে ধারা, শস্যের ভার না সহে ধরা ।

(১৭) যদি বর্ষে মকরে, ধান হবে টেকরে ।

(১৮) কার্ত্তিক পূর্ণিমা কর আশা, খনা বলে শোনরে চাষা, নির্ম্মল মেঘে যদি বাত বয়, রবি খন্দের ভার ধরণী না সয়, মেঘ করে রাত্রে আর হয় জল, তবে জেন মাঠে যাওয়াই বিফল ।

(১৯) পূর্ণ আষাঢ় দক্ষিণা বয়, সেই বৎসর বন্যা হয় ।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত ।

মাঘ, ১৩২১ সাল।

বঙ্গে সরকারী কৃষি

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় কৃষি বিভাগের বাৎসরিক বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে ১৯১৩ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯১৫ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট কৃষি-তত্ত্ব সংক্রান্ত যে সমুদায় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কার্য্যাবলীর আলোচনার পূর্ব্বে আমাদিগের পাঠকবর্গকে সরকারী কার্য্যাদি নির্ব্বাহ পদ্ধতির একটি বিবরণ দিলে ভাল হয়।

বঙ্গদেশীয় কৃষি-বিভাগ কেবল কৃষি কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকে না। রেশম উৎপাদন, বস্ত্রবয়ন, মৎস্য তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ও এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের কর্ত্তা অথবা ডাইরেক্টর সিভিল সার্ভিসের মেম্বর। আফিসের কার্য্যাদির জন্য তাঁহার একজন সহকারী আছেন। এতদ্ভিন্ন দুইজন ডিপুটি ডাইরেক্টর বিভিন্ন স্থানের কার্য্যাদির তত্ত্বাবধারণের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশে পাঁচটি বিভাগ রহিয়াছে যথা প্রেসিডেন্সি, বর্দ্ধমান, ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম। ইহার প্রত্যেকটিতেই একজন কৃষি-পরিদর্শক নিযুক্ত আছেন এবং তৎ সহায় একজন অতিরিক্ত পরিদর্শক আছেন, তিনি এখন রঙ্গপুর গোশালার তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত। প্রতি জেলায় জেলায় কৃষি কার্য্যাদি পরিদর্শন; কৃষিপরীক্ষাদি স্থানীয় লোকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া ও কৃষি বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য কতিপয় ব্যক্তি নিযুক্ত রহিয়াছেন। স্থূলতঃ এই কয়েক শ্রেণীর কর্ম্মচারীর দ্বারা কৃষি-বিভাগের সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

কৃষি সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ বিষয় পর্য্যালোচনা ও মৌলিক তত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য অবশ্য বিশেষজ্ঞের আবশ্যক। সেই হিসাবে বঙ্গদেশেও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আছেন। যথা ১ জন কৃষি রসায়নিক, ১ জন ব্যবহারিক উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ, ১ জন তন্তু তত্ত্ববিদ, ২ জন

সহকারী সহ ১ জন মৎস্য তত্ত্ববিদ্, ১ জন রেশম তত্ত্ববিদ্ ও এক জন বয়ন কলা বিদ্। কীটতত্ত্ব ও ছত্রক-রোগ তত্ত্বের জন্য বঙ্গদেশে কোন বিশেষজ্ঞ নাই। পুষায় যে ভারত গবর্ণমেণ্টের বিশেষজ্ঞগণ রহিয়াছেন, তাঁহাকেই এই দুই বিভাগের তত্ত্বাবধারণ করিতে হয়। কেবল তাঁহাদের অধীনে এই দুইটি বিভাগে বঙ্গদেশে দুইজন সংগ্রাহক আছে মাত্র। বঙ্গদেশে কৃষি কলেজও নাই। ভারতে মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও বঙ্গ এই তিনটি প্রেসিডেন্সি তুলনা করিতে গেলে বঙ্গদেশের কৃষি-বিভাগই ইহাদের মধ্যে সর্ব্ব নিম্ন স্থান অধিকার করে। এখানে অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর সংখ্যাও কম এবং কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থারও বিশেষ অভাব।

এতদ্দেশে কৃষি বিষয়ক পরীক্ষাদির জন্য যে কয়েকটি ক্ষেত্রাদি আছে তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত স্থান সমূহে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ফলাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

চুঁচুঁড়া ক্ষেত্র—গোবর সারের পরিমাণ বিঘা প্রতি কিঞ্চিৎদধিক ৪৮ মণ যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ধানের মধ্যে নাগরা, বাদসা-ভোগ, দাদখানি ও বাঁকতুলসি অন্যান্য জাতি অপেক্ষাও অধিক ফল দায়ক। ধান রোপণে চারা হইতে চারার ব্যবধান ১০ ইঞ্চি।

ঢাকা ক্ষেত্র—স্থানীয় মৃত্তিকার পক্ষে মালতী, দাদখানি, বাদসা ভোগ প্রভৃতি আমন ও বোয়াল মুড়ি নামক আশুধান সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। সংরক্ষিত গোবরসার ও অযত্ন রক্ষিত গোবরসার প্রয়োগে প্রায় ১ মণ বিঘা প্রতি ধান ফলনের তফাৎ হইয়া থাকে।

বুড়িরহাট ক্ষেত্র—ভবিষ্যতে এস্থলে কেবল ৩০ বিঘা জমিতে তামাক চাষ হইবে। দেশীয় তামাক জাতির নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অধিকতর মনোনিবেশ করা হইবে।

কালিমপং ক্ষেত্র—এই ক্ষেত্রে পীত গোল, পীত চেপ্টা, সাদা গোল, সাদা চেপ্টা, ও লাল গোল প্রভৃতি জাতীয় ভুট্টার বীজ নির্ব্বাচিত করিয়া উৎপাদিত হইয়াছিল।

রঙ্গপুর গোশালা- গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য এই যে, বঙ্গদেশের জল হাওয়ার উপযুক্ত উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী ও বলদ এস্থলে উৎপাদিত হইবে। কিন্তু প্রভূত চেষ্টায় এখনও পর্য্যাপ্ত প্রয়োজন মত গাভী পাওয়া যায় নাই। যে সমুদয় গাভী লইয়া একবৎসর পরীক্ষা চলিয়াছে তাহারা গড়ে প্রত্যহ দুইসের দুগ্ধ দেয়। সুতরাং বর্ত্তমান সময় বঙ্গদেশীয় উৎকৃষ্ট গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ বৎসরে অর্থাৎ ৮ হইতে ৯ মাসে প্রায় ১২।০ মণ। কিন্তু গোশালার এমনও গাভী আছে যাহারা ১৭॥০ মণ দুগ্ধ দিয়াছে। গোশালা প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্দেশ্য সাধারণ গাভীর উন্নতি সাধন করিয়া এরূপ অবস্থায় আনয়ন করা যাহাতে সাধারণ গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ গড়ে ১৭॥০ মণ হয়। উদ্দেশ্য সফল হওয়ার যে আশা নাই তাহা বলিতে পারা যায় না, তবে ইহা অনেক সময় সাপেক্ষ।

সাধারণ কৃষি-পরীক্ষা ব্যতীত বিশেষ বিশেষ বিষয়েরও অনুসন্ধান হইয়াছিল—কিন্তু কোনটিতেই উল্লেখ যোগ্য ফল পাওয়া যায় নাই। তত্ত্বতত্ত্ববিৎ

নির্ব্বাচন করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট জাতীয় পাটের বীজ উৎপাদন করিয়াছেন; সাধারণ বীজের সহিত তুলনায় তাহার এখনও পরীক্ষা হয় নাই। রসায়ন তত্ত্ববিদের বিভাগে, খেজুরে গুড় প্রস্তুতের প্রসারের চেষ্টা চলিতেছে। রস ধরিবার ও জ্বাল দেওয়ার যন্ত্র পাতি ও প্রথার পরিবর্ত্তন করিলে সুলভ মূল্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গুড় প্রস্তুত হইতে পারে ইহা রসায়নতত্ত্ববিদের বিশ্বাস। কিন্তু ইহা পরীক্ষা সাপেক্ষ। পক্ষান্তরে তারপুর চিনির কারখানায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে গুড় না করিয়া একবারে রস হইতেই উৎকৃষ্ট শ্বেত শর্করা প্রস্তুত হইতে পারে। এই প্রথায় প্রস্তুত চিনির ভবিষ্যত যে যথেষ্ট আশাপ্রদ তাহা বলা বাহুল্য। রসায়ন তত্ত্ববিদ আর একটি অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ করিয়াছেন—তাহা বঙ্গদেশের জমির পরীক্ষা ও শ্রেণী বিভাগ। অন্যান্য প্রদেশে এই বিষয়ে ইতি মধ্যেই অনেক দূর কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে। বঙ্গদেশে এতদিন এই কার্য্যে যে কেন হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় কৃষি সমিতি এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু কার্য্য বহুব্যয় সাধ্য বলিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় নাই।

ব্যবহারিক উদ্ভিদ তত্ত্বের বিভাগে—অমিশ্রিত ধান্য জাতি উৎপাদন অন্যমত পরীক্ষা। প্রায় ২০০ প্রকার আমন জাতীয় ধান্য তিন বৎসর পরীক্ষিত হইবার পর কয়েকটি বিশেষ জাতি নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এখন সেইগুলি লইয়াই পরীক্ষা চলিবে। সরিসা, তিল ও মাষকলাই সম্বন্ধেও এইরূপ পরীক্ষা চলিতেছে। কীট-তত্ত্ব বিভাগে ধান্যের ভাপুরোগ, আমের ও গাঁজার পোকা এবং ছত্রক্ তত্ত্বের বিভাগে ধানের উফ্রা রোগই কার্য্যাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মীনতত্ত্ববিদের বিভাগ কৃষি-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু কার্যের মধ্যে বস্তুতঃ কিছুই নাই বলিলেও হয়। মীনতত্ত্ববিৎ একটি লঞ্চের অভাবে ইলিশ, ভেট্‌কি, তোপসি প্রভৃতি মাছের ডিম্বোৎপাদন স্থান ঠিক করিতে পারেন নাই। রোহিত জাতীয় মৎস্যের উৎপাদন ও বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন বিশেষ তথ্য সংগৃহীত হয় নাই এবং যে সকল বিষয় তাঁহার বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেক-গুলিই মফঃস্বলের অনেক ব্যক্তি জানেন। কেবল আমতায় ৩০০০০ হাজার পোনা পুকুরে ছাড়া হইয়াছে। সেগুলি বড় হইলে নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

লোণা জমির উন্নতি—মান্দ্রাজে ইহার পরীক্ষা হইয়াছে। জমি খণ্ডের পরিমাণ ০. ২০ একর অর্থাৎ প্রায় ১২ কাঠা। উক্ত জমি খণ্ডে ৩ পাউণ্ড ধঞ্চে বীজ বোনা হইয়াছিল। মার্চমাসের প্রথমেই ধান কাটিয়া লইয়া জমিতে একটা চাষ দিয়া ধঞ্চে বোনা হয়। জমিতে তখন রস ছিল। ধঞ্চে গাছ গুলি ৬ মাসের মধ্যে ১০ ফিট পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়া ছিল ও তাহাতে প্রচুর শাখা হইয়াছিল। সেপ্টম্বর মাসে ক্ষেতটি জলে প্লাবিত হইয়া যায়। তখন ধঞ্চের গোড়াগুলি পচিয়া ক্ষীণ হইতে লাগিল এবং সেগুলিকে

উৎপাটন করিয়া ফেলিবার আবশ্যক হইল। ইতি পূর্ব্বে ধঞ্চের পাতা অনেকই ক্ষেতে ঝরিয়া পড়িয়াছে এবং গাছ উপড়াইবার সময় অবশিষ্ট পাতাগুলি ছড়িয়া ক্ষেতে ফেলা হইল। এই ক্ষেত্র হইতে ৯০ পাউণ্ড বীজ পাওয়া গেল এবং ধঞ্চের শিকড় ও কাষ্ঠ, জ্বালানি কাষ্ঠ হিসাবে বিক্রয় করা হইল।

ধঞ্চে পাতাগুলি পচিয়া আসিলে ভাল করিয়া চাষ দিয়া ও তাহার উপর ৪ গাড়ী গোয়ালের সার ছড়াইয়া ধান বোনা হইয়াছিল। মিঃ টি, ভি, এস, চার্লু লিখিতেছেন যে, ইহাতে ফলন অত্যাশ্চর্য্য হইয়াছে। যে ক্ষেতে আগের বৎসরে ৭৫ পাউণ্ড ধান হইয়াছিল, বর্ত্তমান বর্ষে উপরোক্তমতে পাট করিয়া ৪৫০ পাউণ্ড ধান হইয়াছে, ঐ জমির লবণাক্ততা একেবারে কমিয়া গিয়াছে। ধঞ্চেশিকড় মাটির নীচে ১॥০ ফুট পর্য্যন্ত প্রোথিত হওয়ায় মাটির নীচে জল নিঃসরণের সুবিধা হইয়াছে। জমিতে জল বসা হইলে খারাপ হয়। জমির নিম্ন স্তরে জল নিকাশের সুবিধা হইলে যে কোন জমির উন্নতি হয়।

গরুর রক্তামাশায়—রক্তামাশয় রোগ গরুর একটা কষ্টদায়ক পীড়া। গরুর এই রোগ হইলে গোবরের সহিত রক্ত আম নির্গত হয়।

কারণ—গরু যদি কদর্য্য ঘাস, ঘোলা জল, বিষাক্ত উদ্ভিদ আহার করে অথবা জলা জমিতে থাকে, তাহা হইলে এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ—গরুর রক্তামাশয় রোগ হইলে, তাহার কম্পদিয়া জ্বর হইবে, জলবৎ মলের সহিত আম ও রক্ত মিশ্রিত থাকিবে এবং বার বার দাস্ত হইবে। যে আম মলের সহিত নির্গত হইবে, তাহা ডিমের ভিতরস্থিত লালার মত।

চিকিৎসা—গরম জলে ফ্লানেল উত্তমরূপে ভিজাইয়া পেটে সেঁক দিবে, অথবা লৌহ অল্প গরম করিয়া পেটে আস্তে আস্তে চাপ দিবে। যাঁহাদের নিকট ফ্লানেল না থাকে তাঁহারা কম্বল গরম জলে ভিজাইয়া সেঁক দিতে পারেন। আর যাঁহাদের নিকট ফ্লানেল বা কম্বল নাই, তাঁহারা লৌহ গরম করিয়া পেটে সেঁক দিতে পারেন।

যদি মল নির্গমনের বেগ অধিক হয়, তাহা হইলে গরুর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া একগাছি দড়িদ্বারা বাঁধিয়া দিবে, মধ্যে মধ্যে ঈষদুষ্ণ জল মলদ্বারে পিচকারি করিয়া দিবে।

পথ্য—ভাতের মাড়ের সহিত তিসির মাড় ও কলাই সিদ্ধ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার গরমজল পান করিতে দিবে।

বাসস্থান—গরুর যদি এই রোগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে শুষ্ক, ছায়াযুক্ত, অথচ বাতাস যায় এমন স্থানে রাখা উচিত। রাত্রিতে শীতবোধ হইলে গরুর গাত্রে কম্বলদিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

রোগ সারিয়া যাইবার পর তিন চার বা পাঁচ মাস কাল উত্তম পুষ্টিকর কাঁচা নরম ঘাস খাওয়াইবে।

আমাদের নর্শরির নিকট কোন কৃষকের নিকট উক্ত রোগের চিকিৎসার বিষয়

জানিতে পারার প্রবন্ধটি লিখিত হইল। যদি কাহারও গরুর রক্তামাশায় রোগ হইয়া থাকে, তাহাহইলে তিনি যেন এই চিকিৎসাটি একবার পরীক্ষা করেন। চিকিৎসাটি অত্যন্ত সহজ। ফল কি হয় তাহা আমায় জানাইলে বিশেষ বাধিত হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ আশ, প্রচারক।

কলিকাতায় খাদ্য দ্রব্যের আমদানি রপ্তানি।—১৯১৩ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসে কলিকাতায় ১, ২২, ৫৩, ০০০ মণ চাউল ও ধান আমদানি হইয়াছিল। ১৯১৪ সালের ঐ ৮ মাসে ১, ৩৯, ০২, ০০০ মণ চাউল ও ধান আমদানি হইয়াছে। বঙ্গের নানা স্থান হইতে যত চাউল আমদানি হয়, এক ২৪ পরগণা হইতে তাহার প্রায় অর্দ্ধেক আসিয়া থাকে। বঙ্গের নানা স্থান হইতে ৪৯ লক্ষ মণ ধান চাউল কলিকাতায় আসিয়াছে। ধান চাউলের আমদানি বেশী হইয়াছে বটে কিন্তু গমের আমদানি কমিয়াছে, ১৯১৩ সালের ৮ মাসে ৫৯ লক্ষ মণ গম আসিয়াছিল, ১৯১৪ সালের ৮ মাসে কেবল ৩২ লক্ষ মণ আসিয়াছে।

গোশালার সংস্কার।—কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষ এবং হেলথ্ আফিসার মহাশয়, সহরের গোশালার সংস্কার সাধনে উদ্‌যোগী হইয়াছেন এবং তদুদ্দেশ্যে নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন করিতেছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি ও আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদিগের ব্যবস্থার সমর্থন করিতেছি। আমরা ইতঃপুর্ব্বে একবার কলিকাতার কয়েকটি গোশালার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া তৎসম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি। এবিষয়ে কঠোরহৃদয় গোপদিগের আব্দারে কর্ণপাত করিলে উহা কোন প্রকারেই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হইত না। আমরা দেখিয়াছি, গোপগণ স্বল্পায়তন স্থানে এত অধিক সংখ্যক গাভীকে বাঁধিয়া রাখে যে, তাহারা স্বচ্ছন্দে শয়ন, অঙ্গসঞ্চালন এবং শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। গোশালায় গাভীদিগের শোচনীয় অবস্থা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই মর্ম্মভেদ হয়। গরুর ন্যায় উপকারী পশুর প্রতি মানুষ এরূপ ভীষণ অত্যাচার করিতে পারে, তাহা না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। কলিকাতার অনেক গোশালা মিউনিসিপ্যালিটির কলঙ্করূপে সহরের বুকের উপর রহিয়াছে। এতদিনে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ সে কলঙ্কের অপনোদনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন দেখিয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদিগের প্রশংসাবাদ করিতেছি। আশাকারি, গোশালা সমূহের সংস্কার কার্য্য যাহাতে অচিরে সুসম্পন্ন হয় তাঁহারা অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করিয়া সহৃদয় সজ্জনগণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।

অষ্ট্রেলিয়ার শস্য।—অষ্ট্রেলিয়ায় এবার গোধূম অল্প জন্মিয়াছে, এজন্য অষ্ট্রেলিয়াকে ভিন্নদেশ হইতে উহার আমদানি করিতে হইতেছে কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট

মূল্যের হার নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ায় বাহির হইতে কেহ গোধূম পাঠাইতে পাইতেছে না। এদিকে অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যেই দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার গোধূম তাসমানিয়ায় যাইতে দেওয়া হইতেছে না এবং ভিক্টোরিয়ার শস্য উক্ত প্রদেশের সীমার বাহিরে যাইতে দেওয়া হইতেছে না। এক দেশের মধ্যে আমদানি রপ্তানির এইরূপ নিয়ম প্রায় দেখা যায় না। ভারতে দুর্ভিক্ষের সময়েও এদেশ হইতে শস্যের রপ্তানি বন্ধ হয় না। অবাধ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ইতস্ততঃ করেন, ইহাই ক্ষোভের বিষয়।

কৃষিশিক্ষা।—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, নিরক্ষর কৃষকদিগকে বৈজ্ঞানিক কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ত্রিপুরা ব্রাহ্মণ-বেড়িয়ায় একটি কৃষি-বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সুব্যবস্থায় স্থানীয় কৃষককুল সবিশেষ উপকৃত হইতেছে। উক্ত বিভাগের এগ্রিকালচারাল সুপারভাইজার শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এবং তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্তের শিক্ষানৈপুণ্যে ও সৌজন্যে স্থানীয় জন-সাধারণ মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কৃষকদিগেকে বীজ-নির্ব্বাচন এবং অস্থিচুর্ণের সাহায্যে ক্ষেত্রে সার প্রদান বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। তাঁহাদিগের এই চেষ্টায় বড় সুফল ফলিয়াছে, কৃষকেরা এ বিষয়ে অনেক নূতন তথ্য শিখিয়াছে। আপাততঃ তাঁহারা কৃষকদিগকে উন্নত শ্রেণীর আলুর চাষ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহারা যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি, তাঁহাদিগের উদ্যম সফল হইবে।

গো-রক্ষার ব্যবস্থা।—আমাদিগের কৃষি-বিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয় গবাদি পালিত পশু রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। প্রচুর খাদ্যের অভাবে এতদঞ্চলের পালিত পশুগুলির অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছে। এভাবে আর কিছুদিন গত হইলে পশুবংশ নির্ম্মূল হইবে বলিয়াই আশঙ্কা হয়। একে খাদ্যের জন্য হনন অবাধে চলিতেছে, তাহার উপর অনাহারে পশুগুলি মরিতেছে, ইহাতে পশুর বংশ কতদিন থাকিবে? পূর্ব্বে এ দেশে গো-চারণের যে সকল ভূমি ছিল তৎসমুদায় ক্রমশঃ জমিদার ও প্রজাবর্গ দখল করিয়া আবাদ করিতেছে। কাজেই পশুদিগের খাদ্যের অভাব ঘটিয়াছে। কৃষি-বিভাগের ডাইরেক্টার মহোদয় এ বিষয়ে ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এসোসিয়েসন বলিয়াছেন যে, যে সকল ভূমি জমিদার বা প্রজা দখল করিয়া লইয়াছে তাহা বাহির করিবার এখন কোন উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি ভূমি সংগ্রহ বিষয়ক আইন অনুসারে ন্যায্য মূল্য দানান্তে ভূমি সংগ্রহ করেন এবং সেই সেই ভূমি গো-চারণের জন্য রাখিয়া দেন, তাহাহইলেই উপায় হইতে পারিবে, নচেৎ নহে; কথাটি সঙ্গত বটে। কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিলে আমরা সুখী হইব।

আমরা শুনিয়া নিরতিশয় সুখী হইলাম যে কুমিল্লায় মাননীয় নবাব সাহেব ত্রিপুরা জেলায় গো-গ্রাস ও গোচারণ স্থান রক্ষাকল্পে বিশেষ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি

সত্বরই জেলার প্রধান জমিদার তালুকদারসহ এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। গো-গ্রাস ও গোচারণ স্থানের অভাব বশতঃ দেশে কৃষককুলের যে কি অসীম কষ্ট হইয়াছে, দুগ্ধের কিরূপ অভাব হইয়াছে তাহা সকলেরই জানা আছে। গো-গ্রাস রক্ষার ভার কেবল ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড কি গভর্ণমেণ্টের উপর দিলে চলিতে পারে না। জমিদার তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের চেষ্টাই প্রধানতঃ প্রয়োজন। আমাদের দেশীয় জমিদারগণ নিজেরা পথ প্রদর্শক হইয়া উদ্যোগী হইলে দেশের সকলেই তাঁহাদের পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইবেন। নবাব সাহেবের এই শুভ ও মহৎ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের একটি অভাবনীয় অসুবিধা বিদূরিত হইবে　　ত্রিপুরা-গাইড।

ভারতে তুলার চাষ

কথায় বলে—ভাত-কাপড়, অর্থাৎ শুধু পেটের ভাত হইলেই চলে না, পরণের কাপড়ও চাই। এই ভাতের গোড়া ধান, আর কাপড়ের গোড়া তুলা।

কাপড়ের প্রচলন খুবই বাড়িতেছে ও আফ্রিকার বন্য-উলঙ্গ অসভ্য জাতিও খৃষ্টান প্রচারকের প্রয়াসে ও বিলাতি বণিকের উদ্যোগে চর্ম্ম, হস্তিদন্ত, রবার প্রভৃতির বিনিময়ে কাপড় পরিতেছে। আমাদের দেশে সাঁওতাল, কোল, মিসমি প্রভৃতি জাতি পূর্ব্বে সামান্য আবরণে লজ্জা নিবারণ করিত, আজকাল তাহারা পুরাদস্তুর মাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের খরিদ্দার হইয়াছে। গত পঞ্চাশ বৎসরের তুলনায় পৃথিবীতে কত কাপড়ের কল বাড়িয়াছে, তাহার হিসাব লইলেই কাপড় ব্যবহারের পরিমাণটা বুঝা যায়।

ভারত পূর্ব্বে পৃথিবীকে কাপড় যোগাইত। ঢাকাই কাপড় ইউরোপের অভিজাত সম্প্রদায়ের সুদুর্লভ সখের সামগ্রী ছিল। আরব বণিক্গণ ভারতীয় বস্ত্র স্থলপথে লইয়া গিয়া বিলাতি বাজারে বহুমূল্যে বিক্রয় করিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতাগমনের জলপথ আবিষ্কৃত হইলে বস্ত্র ব্যবসায়ের বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি হয়। তখন যে সমস্ত ইউরোপীয় ভারতে আসিত, তাহারা বণিক মাত্র—বাণিজ্যের দিক্‌টাই আগে দেখিত; সুতরাং তাহাদের তখন স্বদেশে কাপড় প্রস্তুত পদ্ধতি প্রচলন করিবার প্রবৃত্তি জাগে নাই। ইংরেজের ভারতাধিকারের ও বিদেশে উপনিবেশ সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোন্নতির যে নবযুগের আবির্ভাব হয়, যাহার ফলে শ্রমলাঘবের যন্ত্রাদির প্রচলন ও নূতন নূতন কলের প্রবর্ত্তন হইয়া শিল্পজগতের যুগান্তর উপস্থিত করে, সেই সময়ে বিলাতে বস্ত্র বয়নের বিস্তার ঘটে। ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের প্রতিযোগিতায় শুল্ক বসাইয়া বিলাতে প্রথম শিশু-শিল্পের রক্ষা, পরে অবাধ বাণিজ্যের প্রবল তরঙ্গে ভারতের বস্ত্র শিল্পের সর্ব্বনাশ এই সব ঐতিহাসিক কথা।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। ভারতে মাটির গুণে সোণা ফলে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি"—একথাটা ভুলিলে চলিবে না। আমেরিকা যুক্তরাজ্য বিদ্যাবুদ্ধিতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইলেও কৃষিকর্ম্মকে খাট করিয়া শিল্প-বাণিজ্যকে প্রাধান্ত দেয় নাই। আমেরিকাবাসীরা যে কাপড়ের কল চালাইতে পারে না তাহা নহে, কিন্তু উৎপাদনের আপেক্ষিক মূল্যে (Comparative cost of production) পোষাইতে পারে না বলিয়াই কাপড় বোনে না, তুলা উৎপাদন করে এবং সেই তুলা লাঙ্কাশায়ারের তাঁতিদিগকে বিক্রয় করিয়া দেশে প্রভূত ধনাগম করে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে নৈতিক সংরক্ষণ পাইয়া দেশে যে কতিপয় শিল্প বাঁচিয়াছে তন্মধ্যে বোম্বাই মিলের মোটা সূতার কাপড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কলের কাপড় কিছু কিছু চলিতেছে বলিয়া তুলাকে অবহেলা করিলে চলিবে না। আপেক্ষিক ব্যয়ের তারতম্যকে অবজ্ঞা করিয়া—দেশে কাপড়ের কল করিবার যে উৎসাহ উদ্‌যোগ দেখা যায় তাহার একাংশ তুলা উৎপাদনে দিলে শুধু যে আমাদের মিলওয়ালাদের সস্তায় ভাল তুলা সরবরাহ করা যায় তাহা নহে, বিদেশে প্রভূত পরিমাণে তুলা রপ্তানি করিয়া দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অধিক ধনাগম হইতে পারে।

বিলাতেআন্তর্জ্জাতিক কার্পাস সমিতির ও বয়ন সম্মিলনীর সেক্রেটারী মিঃ আর্ণোস্মিড কোইমবাটুরে সংস্থাপিত ভারত কৃষি বোর্ডে ভারতে তুলার চাষ সম্বন্ধে একটি সুন্দর সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ছিলেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে যত তুলা উৎপন্ন হইতেছে তাহা প্রচুর নহে। বিশেষতঃ মার্কিণে এবৎসর তুলার ফসল কতকটা নষ্ট হইয়া গিয়া তুলার বাজারে বিষম টান পড়িয়াছে। ফলে বিলাতে অনেক মিলে তুলার অভাবে কার্য্যের সময় কমাইতে হইতেছে—অনেক মিল কিছুদিনের জন্য বন্ধ পর্য্যন্ত করিতে হইতেছে। এই তুলাসমস্যা হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিতে একমাত্র ভারতবর্ষই পারে। গবর্ণমেণ্ট ভারতে অধিকতর তুলা উৎপাদন করে বহুদিন হইতেই চেষ্টা করিতেছেন,—আরো বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের লোকের এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে।

বিলাতে বহুদিন হইতেই এই তুলাসমস্যা উঠিয়াছে। লাঙ্কাশায়ারের তাঁতিরা তুলা হইতে সূতা টানিয়া কাপড় বোনে সত্য, কিন্তু তুলার জন্য তাহাদিগকে সাধারণতঃ মার্কিণের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। যাহাতে নিজেদের বিস্তৃত উপনিবেশ সমূহে এই তুলার চাষ হইতে পারে, তাহার চেষ্টা বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে শুধু যে মার্কিণের মুখাপেক্ষী হইতে না হয় তাহা নহে, অনেক বেকার ইংরেজ [illegible]র অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। চেম্বারলেন সাহেব Preferetail Tariff [illegible]আপোষ-সংরক্ষণ শুল্ক-ব্যবস্থা কল্পনা কালে ভারতকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। [illegible]তের কার্পাস সমিতিও হয়ত সে কারণে ভারতে তুলার চাষের সংকল্প পরিত্যাগ

করিয়াছিলেন। ফলে মার্কিণের সহিত প্রতিযোগিতায় তুলা উৎপাদনের চেষ্টা উপনিবেশ সমূহের মধ্যই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিধির বিধানে উপনিবেশে তুলা উৎপাদনের চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। তাই ভারতের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

পৃথিবীর মধ্যে এক মার্কিণ ব্যতীত ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তুলা উৎপন্ন হয়। সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র, কাটিবাড়, কঙ্কণ, বেরার, মধ্যপ্রদেশ—ভারতে তুলা উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান এবং সেই সমস্ত স্থানেই তুলার চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু অনুকূল জলবায়ুর প্রভাবে ও ভূমির উর্ব্বরতার হিসাবে বিঘা পিছু যত তুলা উৎপন্ন হওয়া উচিত, তাহা হয় না এবং তুলা উৎপাদনের উপযোগী যত জমি পড়িয়া আছে, তাহার তুলনায় অতি অল্প জমিতেই তুলার চাষ হইয়া থাকে। প্রথমটার কারণ আমাদের দেশের কৃষককুলের অজ্ঞতা ও দারিদ্র, দ্বিতীয়টার কারণ আমাদের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কৃষিকার্য্যে অবহেলা। গবর্ণমেণ্ট কৃষি ইন্‌স্পেক্টার নিয়োজিত, কো অপারেটিভ ক্রেডিট্‌সোসাইটী সংস্থাপিত এবং আমেরিকান কার্পাস বীজ সরবরাহ করিয়া কৃষককুলের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ভাগলপুর, কানপুর, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে কৃষিবিস্থালয় স্থাপন করিয়া দেশের ধনী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সন্তানগণকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু সে ব্যবস্থাকে যদি দেশের লোকে সরকারী চাকরি পাইবার একটা নূতন পন্থা মনে করে, তাহা হইলে নাচার।

চা, চিনি, কফি, কোকো, তামাক, রবার প্রভৃতি সাহেবদের অতিপ্রয়োজনীয় ও নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষগুলি গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু কেবল কুলির কার্য্য ব্যতীত তদ্দেশীয় লোককে ঐ সমস্ত দ্রব্য উৎপাদনের আর কোন বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সাহেবদের পক্ষে অনুপযোগী ও অস্বাস্থ্যকর হইলেও তাহারা স্বদেশে টাকা তুলিয়া এসিয়া ও আফ্রিকাখণ্ডে আসিয়া বিস্তীর্ণ জঙ্গলকে আবাদে পরিণত করে এবং সেই দেশীয় লোকের দ্বারা ঐ সমস্ত জিনিষ উৎপন্ন করাইয়া সাহেব সওদাগরের মারফতে স্বদেশে বিক্রয় করে। আসাম ও দার্জ্জিলিঙ্গের চা, নীলগিরির কফি, রবার প্রভৃতি ভারতের প্রধান রপ্তানির দ্রব্য সমূহ সাহেবদের করতলগত। ইহাতে দেশে প্রচুর ধনাগম হয় বটে; কিন্তু দেশবাসীর ভাগ্যে কুলির মজুরী ব্যতীত আর কিছু থাকে না। বিহারের নীলের চাষ এতদিন সাহেবদের একচেটিয়া ছিল; কিন্তু জার্ম্মেণীর নকল নীল বাহির হইয়া নীলের বাজার নরম হইয়া গিয়াছে। যাহারা পূর্ব্বে নীলের চাষ করিত তাহাদের অনেকে এখন হয় জমিদার হইয়াছে, আর নয় সেই ক্ষেত্রে অন্য শস্য উৎপন্ন করিতেছে।

কেবল মাত্র পাট ও তুলা আমাদের দেশের লোকের হস্তে এখনো আছে। তাহার একমাত্র কারণ এই দুইটা জিনিসই আমাদের দেশে বহু পূর্ব্ব হইতে ছিল। কেবল ইংরেজ বণিক আসিয়া ইহার বৈদেশিক বাজার খুলিয়া দিয়া ইহার আরো প্রসার

করিয়াছে। যে জিনিসের বাজারে টান থাকে, সেই জিনিসই লোকে প্রস্তুত করিতে চাহে। চালের টান অপেক্ষা যদি পাটে টান বাজারে বেশী থাকে, তাহা হইলে পাটের দিকেই লোকে ঝুঁকিয়া পড়িবে; অর্থাৎ যে জমিতে চাষী ধানের চাষ করিত সেই জমিতেই পাটের চাষ করিলে তাহার যদি অধিকতর লাভ হয়, তাহা হইলে পর বৎসর সে আর ধান রুইবে না পাট বুনিবে। এইরূপে আমাদের দেশে পাটের চাষ বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু পাটের জমি কম; বাঙ্গালা দেশের আদ্রজলবায়ু ও পদ্মার নিকটবর্ত্তী নিচু ভিজে জমি ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোথাও পাট হয় না। বাঙ্গালায় পাট বুনিবার উপযোগী এক চাকলার বেশী জমি বা পড়ো জমি পাওয়া যায় না বলিয়া ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে বলিয়া, সাহেবেরা এ কার্য্যে নামিতে পরে নাই। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে পাট চাষ পূর্ব্ব হইতেই ছিল বলিয়া আমরা পাট করিয়া খাইতেছি। কিন্তু যদি আমাদের দেশে পাট চাষ না থাকিত, তাহা হইলে সাহেবেরা বাধ্য হইয়া রায়তের নিকট হইতে জমি কাড়িয়া লইয়া নীল বুনার ন্যায় বাঙ্গালার ধেনো জমিতে যে পাট বুনিত না, তাহা বলা সুকঠিন। কারণ পৃথিবীতে পাটের জমি কম, ধানের জমির অভাব নাই, কিন্তু সাহেবেরা বসিয়া নাই। নিম্ন ব্রহ্ম কাম্বোডিয়া ও ব্রাজিলে পাট উৎপাদনে চেষ্টা চলিতেছে।

তুলার সম্বন্ধেও তাই। কিন্তু বাঙ্গালায় পাটের ন্যায় তুলা ভারতে একচেটিয়া জিনিস নহে। মার্কিণ, মেক্সিকো, ব্রেজিল, চিলি, মিশর প্রভৃতি দেশে তুলা উৎপাদিত হইতেছে। কিন্তু এক মার্কিণ ব্যতীত ভারতবর্ষের ন্যায় তুলা উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রয়োজনের উপযুক্ত প্রচুর তুলা উৎপন্ন হইতেছে না, তুলার বাজারে বিষম টান পড়িয়াছে। কোন্ দেশে তুলা উৎপাদন করিয়া এই টানের মুখে যোগান দিতে পারা যায়, তাহার চিন্তা বিলাতের বড় বড় মনীষিগণ করিতেছেন। ভারতবর্ষের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ব্রেজিল প্রভৃতি দেশে তুলার চাষের উপযোগী যথেষ্ট জমি পড়িয়া আছে সত্য, কিন্তু দেশ সুশাসিত নহে—সর্ব্বদাই অরাজক অত্যাচারে জর্জ্জরিত। সেখানে সুবিধায় কুলি মিলে নাই বলিয়াই মাল পাঠান ও যাতায়াতের সুবিধা নাই। কিন্তু ভারতের এ সব অসুবিধা নাই। সুতরাং ভারতে যে তুলাচাষের উপযুক্ত ক্ষেত্র তাহা বলাই বাহুল্য। এইজন্যই স্মিথ সাহেবের ভারতে আগমন। এই জন্যই তুলার চাষের প্রসার প্রতিকল্পে প্রবন্ধ পাঠ।

এখন কথা এই, তুলার চাষ ভারতবাসী করিবে না বিদেশীরা আসিয়া করিবে? বাঙ্গালার ন্যায় অন্যান্য প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, বাঙ্গালায় পেটো জমির ন্যায় তুলার জমি অল্প নহে, বাঙ্গালায় যেমন সবই চাষ জমি, অন্যান্য প্রদেশে বেশীর ভাগই পড়ো জমি, বিশেষতঃ ভারতে তুলার জমি এত পড়িয়া রহিয়াছে যে এক চাকলায় দশ-হাজার একার (সাড়ে তিন বিঘায় এক একার জমিও সুদুর্লভ নহে। সুতরাং বিদেশীর

বণিকগণকে জমির জন্য ভাবিতে হইবে না, টাকার জন্যও ভাবিতে হইবে না, কারণ তাহাদের দেশের লোক এসব কার্য্যে টাকা দিতে সমুৎসুক ; আর কুলি—সে ত ভারতে অনেক মিলিবে। যাহারা এখন তুলার চাষ করিতেছে, তাহারা যে বাঙ্গালার নীল চাষের ন্যায়, পরে সাহেবদের জমি ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের কুলি হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? নীল, চা, কফি, রবার প্রভৃতির চাষ যাহা চেষ্টা করিলেই আমাদের দেশের লোকে করিতে পারিত, তাহা আমাদের হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে।

পত্রাদি

পুরাতন বাগানের সংস্কার—শ্রীননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বালিব্যান চাবাগান, আসাম।

একটি পুরাতন বাগান জমা করিয়া লইয়াছেন। বাগানে আম, লিচি, কাঁটাল ও অন্যান্য ফলের গাছ ৩১০টা আছে, বাগানটির পরিমাণ ১১ বিঘা। গাছে ফল ভাল হয় না। কিপ্রকারে বাগানটির সংস্কার করা যায়, গাছগুলি বেশ ফলিতে আরম্ভ হয় ইহাই জিজ্ঞাস্য। তিনি বৃক্ষগুলির মূলদেশের চারিদিকে আড়াই ফিট প্রশস্থ ও এক ফুট গভীর মাটি তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া প্রত্যেক গাছে ৩০ সের পরিমাণ গোময় সার দিয়া ঢাকিয়া দিয়াছিলেন। তারপর জল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ইহাতেও আশানুরূপ ফল পান নাই ; কারণ জানিতে চান।

উত্তর—আপনার হতাশ হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। বাগানটি ১৫ বৎসর পতিত অবস্থায় পড়িয়াছে। আপনি ১ বৎসরের মধ্যে কারকিৎ মেরামত করিয়া ইচ্ছানুরূপ ফলবতী করিতে পারিবেন ইহা কতকটা দুরাশা।

আম, লিচির কথা বিশেষ উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন কিন্তু জানিবেন যে বিশেষ তদ্বির সত্ত্বেও বাঙলা ও আসামে আম লিচির ফল সকল বৎসর তাদৃশ সন্তোষজনক হয় না। আবহাওয়ার বিপর্য্যয়ে এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

ফলের গাছের যেরূপ পাইট করিয়াছেন, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। গাছের চারিদিকে যতদূর শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে, ততদুর পর্য্যন্ত মাটি বিচলিত করা কর্ত্তব্য এবং বর্ষা শেষে কার্ত্তিক মাসে শিকড়গুলি বাহির করিয়া রৌদ্র হাওয়া খাওয়ান দরকার। গাছের আহার যোগাইবার সুবিধার্থ গাছের মূলদেশে কোপান স্থানের প্রান্তভাগ দিয়া চারিদিক বেড়িয়া খাত খনন করিতে পারিলে ভাল হয়। এই খাতটি অন্ততঃ দুই ফিট গভীর × দুই ফিট চওড়া হইবে। এই খাতের মধ্যে গাছের আয়তন অনুসারে ৫ পাউণ্ড হইতে ১০ পাউণ্ড

হাড়চূর্ণ, আধ পাউণ্ড হইতে ২ পাউণ্ড সোরা এবং ৫ হইতে ১০ মণ গোময় সার ছড়াইয়া দিবেন। তৎপরে আবশ্যকানুযায়ী মধ্যে মধ্যে খাতটি জলে পূর্ণ করিয়া দিবেন। বৃক্ষে সার প্রদানের এই প্রকৃষ্ট নিয়ম। একটা বড় গাছে কেঃ টানের তিন টান নিতান্ত কম।

১৫ বৎসর অযত্নে বাগানের কতকগুলি গাছ খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা; সেগুলি কাটিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য।

বাগানের সমুদয় জমিটি কোদাল কোপাইয়া বা লাঙ্গল দ্বারা চষিয়া মাটিতে রৌদ্র, বৃষ্টি, হাওয়া খাওয়াইয়া বা তাহাতে শণ, ধঞ্চে, সয়সিম বুনিয়া বাগানের জমিটি সাধারণতঃ উর্ব্বরা করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। জমিতে লাঙ্গল মৈ দিয়া কারকিৎ মেরামত করিলে জমির রস রক্ষা হয় এবং এমতাবস্থায় ফলের গাছের ফাঁকে ফাঁকে শাকপাত তরিতরকারি জন্মাইবার সুবিধা হয় এবং পরোক্ষে ফল গাছগুলির উন্নতি হয়।

দুই হাজার বর্গফুট জমি সহজে ঘাস জন্মাইবার উপায়—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র লাল মৈত্র, জাহানাবাদ, গয়া।

জোয়ার বীজ ১০০০ বর্গ ফিট জমিতে ১ সের লাগিবে। ইহা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে লাঙ্গলের শিরালে শিরালে বপন করা যায় কিম্বা ক্ষেতময় হাতে ছড়াইয়া বপন করা চলে। চারা হইতে চারার অন্তর ৯ ইঞ্চ × ৯ ইঞ্চ হইবে। বর্ষারম্ভেই এইসকল বীজ বপন করিতে হয়। বৈশাখ হইতে আষাঢ়ই প্রশস্থ সময়।

যথার্থই গিণিঘাসের বীজের দাম অধিক। একসঙ্গে ২০০,০০০ হাজার বর্গ ফুট পরিমাণ জমিতে গিণিঘাষের আবাদ করা ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িবে। হাজার বর্গফুট প্রথমে আবাদ চাষ করুন। ইহায় ৬ পাউণ্ড বীজ লাগিবে। তিন বৎসরের মাথায় ইহা হইতে যথেষ্ট বীজ জন্মিবে এবং বাকি জমিতে বুনানি চলিবে। আর একটা কৌশল অবলম্বন করা যায়। তিন বৎসরে গিণিঘাষের ঝাড় বাঁধিবে। সেই ঝাড় হইতে চারা তুলিয়া বসাইয়া সত্ত্ব সত্ত্ব আবাদ বাড়ান যাইতে পারে। এইরূপে আবাদ করিতে পারিলে আশু ফল পাওয়া যায়।

দুর্ব্বাঘাষেরও দাম বেশী, ইহা সংগ্রহে খরচ অধিক বলিয়া ইহা দুর্ম্ল্য। দূর্ব্বা বীজও ৬৲ টাকা পাউণ্ডের কম মিলে না। দূর্ব্বাচাষ করিতে হইলে আগে সামান্য একটু জায়গায় ঘাস করিয়া লইয়া তারপর সেই ঘাসের চাপ তুলিয়া কুচাইয়া অন্যত্র বসাইয়া আবাদ বাড়ানই কর্ত্তব্য। এই প্রকারে কার্য্য করিলে কম খরচে কার্য্যসিদ্ধি হইবে —

ঘাসবীজ বপনের এখনও সময় আছে আরও দুই মাস অপেক্ষা করিতে পারেন। সময়ে সব বীজ ভারতীয় কৃষি সমিতি হইতে পাইবেন।

ভদ্রলোকের চাষ, ইক্ষু, বেগুণ, জমিতে চূণ—শ্রীকীর্ত্তিবাস নন্দী, বোলপুর, পোঃ বোলপুর।

মহাশয়! বস্তুত ভদ্রলোকদিগের মামুলী রকমের চাষ করিয়া বিশেষ লাভ হয় না। সাধারণতঃ বেগুণ, মূলা, শাকপাতের চাষ করিয়া ভদ্রলোকে চাষীদের সমান লাভ করিতে পারে না। ভদ্রলোকের প্রতি হাতে খরচ ও নগদ মজুর ধরিয়া কাজ—চাষীদের নিজের কাজ এবং নিজের পরিশ্রমে অনেক কাজ অগ্রসর হয়। এইজন্য সামান্য সামান্য চাষগুলি ভদ্রলোকের পোষায় না।

ইক্ষু, আলু, কলা, পেপে, মানকচু ইত্যাদি ভদ্রলোকের চাষ; ইহাতে খরচ অধিক, কিন্তু ঝঞ্ঝট কম।

ইক্ষু চাষের যে প্রণালী বলিয়াছেন তাহা মন্দ নহে। বিঘা প্রতি ১ মণ চূণ, ৫০ মণ গোময় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাঁকমাটি ছড়ান মন্দ নহে। ২০০ মণ মাটি অতি কম। বিঘায় অন্ততঃ ৩০০ ঝুড়ি মাটি ছড়ান আবশ্যক। ১ ঝুড়ি মাটি এক মনের অনেক বেশী। আপনি জল সেচিয়া জমিতে চাষ দিবার কথা লিখিয়াছেন কিন্তু তাহার আবশ্যক হয় না। আশ্বিনের শেষে বা কার্ত্তিকমাসে জমিতে রস থাকিতে থাকিতে জমি চষিয়া তাহাতে সার দিয়া রাখা যাইতে পারে। তারপর ইক্ষু বসাইবার সময় চাষ দিয়া ইক্ষু বসাইতে হয় এবং প্রত্যেক ইক্ষু চারার গোড়ায় গোড়ায় ২ বারে এক পোয়া রেড়ির খৈল দিতে হয়। ইক্ষু বসাইবার পর এবং প্রত্যেকবার খৈল দিবার পর, সেচ দিতে হয়। সময়মত বৃষ্টি হইলে সেচ দিবার আবশ্যক হয় না। অন্যান্য পাইট আপনি যেমন লিখিয়াছেন সেই মতই। কৃষকে বহুবার ইক্ষু চাষ সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে।

বেগুণ—রেড়ির অপেক্ষা সরিষার খৈল দেওয়া ভাল। বিঘায় ২ মণ খৈল যথেষ্ট।

সব জমিতে অল্পাধিক পরিমাণে চূণ আছে। যাহাতে চূণ আদৌ নাই সে জমিতে চূণ অধিক মাত্রায় দিতে হয়। জমির অবস্থা বুঝিয়া চূণের পরিমান নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে হইবে। বিঘা প্রতি ১ মন বা ২ মন যেমন যেখানে দারকার। বর্ষাশেষে জমিতে চূণ ছিটাইয়া চাষ কর্ত্তব্য। কৃষিরসায়ণ পুস্তকখানিতে এইসকল বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ঐ বইখানি লইতে আপনাকে অনুরোধ করি।

শস্য নাশে কর্তৃপক্ষের প্রতিকার চেষ্টা—গত বৎসরের প্রবল বন্যায় চট্টগ্রাম জেলার আমন ধান নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের সহৃদয় কালেক্টর মিঃ ক্লেটন বাহাদুর তাহা দেখিয়া ও জানিয়া এদেশীয় প্রথামতে পাহাড়িয় ছরাদিতে বাঁধ (গোধা) দিবার বন্দোবস্ত করিয়া পানি আউস ধান উৎপাদনের সুবিধা করিয়া দেন। তদ্দারায়

এদেশে বিস্তর পানি আউস ধান উৎপন্ন ও দেশের পরম উপকার সাধিত হয়। দুরার বাঁধা জল ব্যবহারে স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে বলিয়া এক অযথা আপত্তি হয় কিন্তু দুরার জল সাধারণের ব্যবহারযোগ্য বুঝিয়া ঐ আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নাই। গত বৎসর স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ কষ্ট সহ্য করিয়া এ দেশের শত সহস্র নিরাশ্রয় প্রজাকে অকালে কাল কবল হইতে মুক্ত করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের উন্নতি কামনা করি।

বর্ত্তমান বর্ষে অনাবৃষ্টিতে আমন ধানের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এমতাবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষের দয়া ব্যতীত নিরাশ্রয় প্রজাগণের কোন উপায় নাই। আমরা আশা করি, মাননীয় কালেক্টর ও সুযোগ্য কমিশনার বাহাদুর দুরাদিতে গোধা বাঁধিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া নিরাশ্রয় প্রজাগণকে প্রতিপালন করিবেন। নিবেদক—শ্রীআবদুল জলিল। গ্রাম আজিপুর, পোঃ ফটিকছড়ি।

সার সংগ্রহ

মৈমনসিংহে আলু চাষের বিস্তার—গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ হইতে এ জেলার জন্য একজন ডিষ্ট্রীক্ট এগ্রিকালচারেল অফিসর নিযুক্ত আছেন। গত বৎসর তিনি অনেক কৃষককে দার্জ্জিলিঙ্গের আলুর বীজ বিতরণ করিয়াছিলেন। তদ্দারা স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট আলু উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম, এই জেলায় উৎকৃষ্ট আলুর চাষ বৃদ্ধি করিবার এবং তজ্জন্য কৃষকগণকে উৎসাহিত করিবার ইচ্ছায় গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ এই নগরে একটি প্রদর্শনী স্থাপন করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন।

সূর্য্যকান্ত টাউনহলে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে এক প্রদর্শনী খোলা হইবে। ঐ প্রদর্শনীতে দার্জ্জিলিঙ্গের আলুর বীজ হইতে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট আলু প্রদর্শিত হইবে। যাঁহারা নিজ ক্ষেত্রের উৎপন্ন আলু ঐ প্রদর্শনীতে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অন্ততঃ দুই সের ভাল আলু ডিষ্ট্রীক্ট এগ্রিকালচারেল অফিসর শ্রীযুক্ত এস, সেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

যাঁহারা এ জেলায় দার্জ্জিলিঙ্গের আলুর চাষ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা উপরি উক্ত প্রদর্শনীতে তাঁহাদের আলু উপস্থিত করিবেন তাঁহারা আলুর ভাল মন্দ তারতম্যানুসারে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। ঐ পুরস্কার বিতরণ জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ২০০৲ দুই শত টাকা প্রদান করিয়াছেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া পুরস্কার বিতরণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। আমরা অবগত হইলাম, ময়মনসিংহের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট কৃষি-বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ ব্ল্যাকউড সাহেব মহোদয় উক্ত প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইবেন। আমাদের দৃঢ় ধারণা ময়মনসিংহ জেলার কৃষক সম্প্রদায় এবং জনসাধারণ এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া আলুর

চাষ সম্বন্ধে নানাবিধ বিষয় শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন না, এবং আমরা ভরসা করি, এই নগরের ভদ্র মণ্ডলী এ প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ে বিবিধ তথ্য অবগত হইবেন, এবং কৃষকগণকে উৎসাহিত করিবেন।

ঘৃতের পরিবর্ত্তে চর্ব্বি—সঞ্জিবনী লিখিয়াছেন যে কয়েক দিন হইল গোবিন শীল নামক একব্যক্তি মাণিকতলায় এক চর্ব্বির কারখানা স্থাপন করিবার জন্য মিউনিসিপালিটির সভাপতির নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন। দরখাস্তকারী লিখিয়াছিলেন, চর্ব্বির ব্যবসায় অতি উত্তম, ইহাতে কোন দুর্গন্ধ নাই, ইহা মানুষের খাদ্য দ্রব্য।

মাণিকতলা মিউনিসিপালিটীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মিঃ আসগর সাহেব মৌলবী খলিল আহম্মদ নামক জনৈক কমিশনারকে কারখানার খবর লইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মৌলবী সাহেব কারখানা দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন।—

"এই কারখানা ভেজাল ঘি তৈয়ার করিবার জন্য স্থাপন করা হইবে। এই ঘি চীনা বাদামের তৈল ও গরু, ছাগল, শূকর, ভেড়া এমন কি সাপ ও টিকটিকীর চর্ব্বি দ্বারা প্রস্তুত করা হইবে। দরখাস্তকারী স্বীকার করিয়াছে যে, মানুষের জন্যই ইহা প্রস্তুত করা হইবে। হাড়ের মজ্জা না মিশাইলে চর্ব্বির মধ্যে প্রকৃত ঘৃতের মত দানা হয় না সুতরাং কারখানার মধ্যে অনেক হাড় মজুত করিয়া রাখিতে হইবে।"

এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া সভাপতি মিঃ আসগর গোবিন শীলের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং মাজিষ্ট্রেটকে এই কারখানার সম্বন্ধে যথা কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

ঘৃত প্রস্তুতের গোপনীয় কাহিনী প্রকাশ করাতে আমরা মিঃ আসগর ও মৌলবী খলিল আহাম্মদকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বাগানের মাসিক কার্য্য

ফাল্গুন মাস।

সব্জী বাগান—তরমুজ, খরমুজ, সশা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি যেসকল দেশী সব্জী চাষ মাঘ মাসে প্রায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই মাসে প্রায় শেষ করিতে হইবে। সব্জীক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। চাঁপানটে বীজ এইসময় বপন করিলে ও জল দিতে পারিলে অতি সত্বর নটে শাক পাওয়া যায়।

কৃষি-ক্ষেত্র—ছোলা, মটর, যব, সরিষা, ধনে প্রভৃতি সমুদয় এতদিনে ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া গোলাজাত করা হইয়াছে। এইসময় ক্ষেত্র সকল চষিয়া ভবিষ্যতে পাট, ধান প্রভৃতি শস্যের জন্য তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। ইক্ষু এই সময় বসান হইয়া থাকে।

ফলের বাগান—ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিচ প্রভৃতি ফলবৃক্ষে জল দিবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কার্য্য নাই।

ফুলের বাগান—এখন বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুলগাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুলগাছগুলির তদ্বির না করিলে জল্‌দি ফুল ফুটিবে না। জল্‌দি ফুল না ফুটিলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

টব বা গামলার গাছ—এইসময় টবে রক্ষিত পাতাবাহার, পাম প্রভৃতি ও মূলজ ফুল ও বাহারি গাছ সকলের টব বদলাইয়া দিতে হয়।

পান চাষ—পান চাষ করিবার ইচ্ছা করিলে এই সময় পানের ডগা রোপণ করিতে হয়।

বাঁশের পাইট—বাঁশ ঝাড়ের তলায় পাতা সঞ্চিত হইয়াছে, সেই পাতায় এই সময় আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই ছাই বাঁসের গোড়ায় সারের কার্য্য করে, এবং নিম্ন-বঙ্গে যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক, সেইখানে এই প্রকার বহুদূরব্যাপী অগ্নি জ্বালিলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

ঝাড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া ও শিকড় উঠাইয়া না ফেলিলে ঝাড় খারাপ হয়। আগুন দ্বারা পোড়াইলে এই কার্য্যের সহায়তা হয়। পুকুরের পাঁক মাটিতে বাঁশের খুব বৃদ্ধি হয়।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

পঞ্চদশ খণ্ড,—১১শ সংখ্যা

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্

ফাল্গুন, ১৩২১

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়্যাকর্স হইতে
শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ খণ্ড। | ফাল্গুন, ১৩২১ সাল। | ১১শ সংখ্যা।

পাটের জমিতে আলু ও রবি শস্যের চাষ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (গিরিডী) লিখিত

১। গত দুই বৎসর হইতে বঙ্গীয় কৃষক-কুলের দৈবনিগ্রহে পাট চাষে সম্পূর্ণ ক্ষতি হইতেছে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান বর্ষে পাটের আবাদ সমগ্র বঙ্গে ভাল হইয়াও ক্রেতার অভাবে একেবারেই ক্ষতি হইয়াছে। ইহা স্পষ্টতর ভগবানের অভিপ্রায় ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। নীলের আবাদও বঙ্গদেশ হইতে এই ভাবেই উঠিয়া গিয়াছিল। দৈব আঘাত ভিন্ন মানুষের কোন বিষয়ে চৈতন্য হয় না। পাট চাষে, চাষারা আশু এবং অসময়ে চাকৃচিক্যশালী আশাতীত রজত মুদ্রা পাইয়া আহ্লাদে আট্‌খানা হইয়া অমিতব্যয়ীতা দোষে, নিজ নিজ বিলাসের বস্ত্র খরিদ, আহার বিহারের স্বচ্ছন্দতা, জমিদারের খাজানা এবং মহাজনের দেনা শোধ করিয়া সমুদায় টাকাই ব্যয় করিয়া ফেলে। বাজারে খাদ্যাদি খরিদের সময়, একগুণ জিনিষের তিনগুণ দাম দিয়া ক্রয় করে এবং ৬ ছয় মাসের মধ্যেই সংগৃহীত টাকা খরচ করিয়া পুনরায় স্থানীয় কৃষিব্যাঙ্ক ও অন্যান্য উত্তমর্ণের দ্বারস্থ হয়। সঞ্চয় শীলতা কাহাকে বলে, তাহা মূর্খ কৃষকেরা আদৌ জানে না। এই জন্যই "তুমি যে তিমিরে, তুমি সেই তিমিরে" এই পুরাতন সঙ্গীতের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। এবার পাটের হটাৎ এই দুর্দ্দশা দেখিয়া, লোকের সেই জ্ঞান টুকু হওয়া উচিত। তবে কোন কোন বুদ্ধিমান দূরদর্শী লোকে, কিছু বুঝিয়া চলিতে জানে স্বীকার করা যায়। উৎপন্নকারী কৃষক-কুলের দোষেই বর্ত্তমান দেশের এত দৈন্যদশা ও অভাব আসিয়া পড়িয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাও স্বীকার্য্য বিষয় যে, চাষার ঘরে অন্ন না থাকিলে, সমগ্র দেশেই হাহাকার উঠে। চাষা ভাইরা যদি নানাবিধ ধান, তরিতরকারি তৈলশস্যের চাষ একবারে তুলিয়া

দিয়া, কেবল পাটের টাকার মোহে, প্রত্যেক মজুরকে, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ১৲ টাকা হারে মজুরী দিয়া পাটের আবাদ না করিত, তবে, প্রত্যেক জিনিষের এত অভাব হইত না। আজ যদি প্রত্যেক কৃষক, অর্দ্ধেক পাট এবং অর্দ্ধেক জমিতে, পূর্ব্বের ন্যায় আউশ, বোরো, জোঠে, প্রভৃতি ধান, তরিতরকারি, শাক সব্জী, দাইল কলাই, এবং তৈল শস্যের আবাদ করিত, তবে, একা পাট অবিক্রেয় হইলে, দেশের লোকে এত ক্ষতি বোধ করিত না। আর ধান করিলে, ২।৩ বৎসর গোলায় মজুত করিয়া রাখিলেও তাহাতে আদৌ ক্ষতি বা অবিক্রেয় হইত না, কারণ ইহা বাঙ্গালী বলিয়া কেন, আজিকালি ভারতের সকল জাতিরই প্রধান খাদ্য বলিয়া পরিগণিত। সকলেই ধান ও চাউল খরিদ করিয়া থাকে। কিন্তু পাট, একমাত্র বিদেশী লোকে খরিদ করে ছাড়া, এদেশের লোকের এত দরকার হয় না।

২। যাহাই হোক্, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায়, কৃষকেরা যে সকল উচ্চ ধরণের জমিতে মাটি তুলিয়া এবং সার ছড়াইয়া দিয়া, পাটের চাষের তদ্বির করিয়া রাখিয়াছে, সেই সমুদায় উচ্চ ধরণের জমির পাট গাছ, তাড়াতাড়ি কাটিয়া ফেলিয়া, নিম্নলিখিত ভাবে গোল আলুর চাষ আরম্ভ করিয়া দিলে, সম্ভবতঃ পাটের ক্ষতি অনেকাংশে পোষাইয়া যাইতে পারে। বর্দ্ধমান, বৈদ্যবাটী প্রভৃতি কতক্গুলি স্থানের চাষী ভিন্ন এখনও অধিকাংশ স্থানের কৃষকেরা, আলুর চাষ শিখে নাই ও জানে না। তবে পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম প্রদেশের অধিকাংশ নীচু ও জলা ভূমিতে, আলুর চাষ হইতে পারে না। তথায় চৈতে বোর এবং এক প্রকার আশু বালাম ধান ভিন্ন, অন্য কোন ফসল এ সময় হইবে না।

৩। আশ্বিন মাসে প্রায় সর্ব্ব দেশেই বর্ষার বিরাম হয়। সেই সময় উক্ত পাটের জমিগুলিতে মহিষের লাঙ্গল দ্বারা, গভীর করিয়া, চাষ দিয়া ধূলিবৎ কর্ষণ করতঃ পাটের গোড়া গুলা বেশ করিয়া বাছিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্রকে নিষ্কণ্টক করিয়া ফেলিতে হইবে। পাট, শিম্বি জাতীয় গাছ। সুতরাং শিম্বি জাতীয় উদ্ভিদের মূলে যে গোলাকার গাঁইট্ থাকে, তাহাতে উদ্ভিদ পরিপোষক একপ্রকার সারাল পদার্থ জন্মাইয়া ঐ মৃত্তিকাকে বেশ সারাল করে। অতএব পাট গাছের শিকড়গুলি তুলিয়া দিয়া, ঐ জমিতে অল্প পরিমাণে আবর্জ্জনা গোবরসার, ছাই সার ছড়াইয়া দিয়া, আরও দুই একবার লাঙ্গল ও মই দিয়া জমিগুলি, চৌরস ও সমতল করিয়া লইয়া, দুই হাত অন্তর ঐ লাঙ্গলের দ্বারা শীরাল কাটিয়া যাইয়া সেই ছোট ছোট শীরালের মধ্যে মধ্যে আবার আধ হাত অন্তর এক একটী ছোট ছোট কুঁড়ী বিশিষ্ট বীজ আলু ফেলিয়া যাইবে। কিম্বা চোক্ওয়ালা বড় বড় বীজ আলুকে ঐ সকল চোক সুদ্ধ ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া, নির্দ্দিষ্ট শীরাল বা পিল্'তে রোপণ করিলেও চলিতে পারে। বীজের রোপণ শেষ হইলে, তখন পিলীস্থিত

রোপিত বীজের উপর অতি অল্প অর্থাৎ ১ ইঞ্চি পরিমিত ধুলিবৎ কোমল মৃত্তিকার দ্বারা বীজ গুলি বেশ করিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। ৩।৪ দিন পরে ঐ বীজাঙ্কুর গুলি, চারা রূপে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইয়া উঠিলে, তখন রেড়ির খৈলের সহিত ধুলিবৎ মাটি মিশাইয়া উহাদের গোড়ায় অল্প অল্প পরিমাণ দিয়া, গোড়া ঢাকিয়া দিয়া যাইতে হয়। রেড়ির খৈলের দুর্গন্ধে (White ant) উই বা অন্য কোন কীটাদি আসিয়া ছোট চারার কোন প্রকার অনিষ্ট করে না। এই খৈল সংযুক্ত মাটীর সহিত অতি সামান্য পরিমাণ (Sulphate of Copper) তুঁতের গুঁড়া মিশাইয়া দিলে, সকল আশঙ্কাই মিটিয়া যায় বটে কিন্তু এদেশীয় হাতে কলমে তদ্বিরকারী কৃষকেরা আলুর ক্ষেতে তুঁতের গুঁড়া দেওয়ার নাম শুনিলে একবারেই চম্‌কাইয়া উঠিবে বলিয়া প্রয়োগ নিষেধ করিতে বাধ্য হইলাম। তবে শিক্ষিত ভদ্র লোকে এই কাজে হাতদিলে উক্ত খৈলের সহিত তুঁতের গুঁড়া মিশাইয়া দিতে পারেন। তাহাহইলে আলুর পাতায় যে ছত্র রোগ হয়, তাহার আর কোন আশঙ্কাই থাকে না। সাধারণতঃ এদেশের লোকে গোবরের সার ভিন্ন অন্য কোন প্রকার সার প্রদানই পছন্দ করেন না। বৃথা লেখার চাতুর্য্য দেখাইয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা আবশ্যক মনে করি না।

৪। এই ভাবে আলুর চারা যত বড় হইতে থাকিবে ততই শীরালের দুই ধার হইতে ৫।৭ দিন অন্তর অল্প অল্প মাটি তুলিয়া গাছের গোড়া আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। আর আলু গাছের গোড়ার চারাগুলি সতেজ না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্তভাবে অল্প অল্প পরিমাণে ৩।৪ বার মাত্র খৈলের সহিত তুঁতের গুঁড়া মিশাইয়া দিতে হয়। বাঙ্গালার মাটি স্বভাবতঃই সরস ও বালি দোয়াঁশ ; সুতরাং ক্ষেতের বিশুষ্কতা এবং সরসতা বুঝিয়া নিরস জায়গায়, গর্ত্ত বা পুষ্করিণী হইতে পিলীর গোড়ায় মোটের উপর ২।৩ বার জল সেচন করিলেই চলে। ভাঁড় বা অন্য কোন পাত্রে করিয়া গোড়ায় গোড়ায় জল ঢালিয়া দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে শিকড় বাহির হইয়া, গাছ চম্‌কাইয়া নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যায়, আলু ধরে না। আলু গাছের গোড়ায় যতই আল্গা ভাবে মাটি উচ্চ করিয়া দেওয়া যাইবে ততই শিকড় চালাইয়া গাঁইটে গাঁইটে বেশী পরিমাণে আলু ধরিবে।

৫। ইহা কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ্। গাছগুলি ১হাত পরিমাণ উচ্চ ঝাড়াল হয়। লালআলুর ন্যায় লতান গাছ নহে। যতই নীচের দিকে শিকড় চালাইতে পারিবে ততই উহার গাঁইটে গাঁইটে আলু ফলিবে। গাছের তেজ কম হইলে আলুর পরিমাণ বেশী হয়।

বিঘা প্রতি বীজের পরিমাণ

৬। এক বিঘা জমিতে দুই হাত অন্তর বীজ রোপণ করিলে ৪০ চল্লিশ টী Row বা পিলীতে ছোট বীজ হইলে ১॥০ দেড় মণের কিছু বেশী লাগে। আর বড় বীজ

হইলে প্রায় আড়াই মণ বীজ লাগে। কারণ ঐ প্রকার বীজ আলু ওজনে বেশী এবং পরিমাণে কম হয়। চোক্ কাটিয়া পুঁতিলে ইহা অপেক্ষাও কম লাগে। কলিকাতার ভারতীয় কৃষি-সমিতির (Indian Gardening Association) সুরক্ষিত বীজই চাষের পক্ষে ঠিক উপযুক্ত ও বিশ্বাস্য। এখানকার বীজ প্রায় নিষ্ফল হয় না। ইঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রথামত বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখেন। অনেকের বিশ্বাস বাজারের আলু পুতিলেই বেশ আলু হয়, কিন্তু সেটী সম্পূর্ণ ভ্রম। ঐ খানকার নাইনিতাল আলুর প্রতি মণ বীজ ১০৲ হিসাবে পাওয়া যায়। ঐ আলু বাজারেও ৶০ আনা হইতে ।০ আনায় ⁄১ সের মিলে না। তবে বৈদ্যবাটীর দেশী আম্‌রুপি, লাল গোরক্ষপুরীর দাম কম।

৭। উৎকৃষ্ট ফলন হইলে, প্রতি গাছের গোড়া হইতে অগ্রহায়ণের শেষে এবং ফাল্গুন মাসের ১৫ই মধ্যে দুইবারে ⁄২॥০ আড়াই সের আলুর কম পাওয়া যায় না হাতে কলমে কৃষিকার্যের হিসাব দেখাইতে গেলে ঠিকজিনিষের পরিমাণ এবং বাজার দরের উঠতি পড়তি মূল্য ধরিয়া খরচা এবং আয়ের পরিমাণ আনুমানিক ভিন্ন, কখনই প্রকৃত অঙ্কপাত করিয়া দেখান যায় না। যিনি তাহা দেখাইতে চেষ্টা করেন, সেটি কেবল লেখনীর চাতুর্য্যে ভ্রমাত্মক হিসাব দেওয়া মাত্র। বিশেষতঃ আজ কাল যেরূপ জিনিষের দর চড়িয়াছে এবং মজুর দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় কেহই একথা খাঁটি করিয়া বলিতে সহসী হন্ না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ মধ্যে প্রতি সের ৶০ হইতে ⁄৫ পয়সা পর্য্যন্ত বাজার দর উঠিলে ও পড়িলেও এই চাষে লোকসানের ভাগ অপেক্ষা লাভের অংশই বেশী। আর একবারে পাইকারি হারে মণ দরে বিক্রয় করিয়া দিলে পাটের ন্যায় থোকা টাকা পাওয়া যায়।

৮। অগ্রহায়ণে দুই একটী গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তুলিবার উপযুক্ত হইয়াছে কিনা বুঝিলে এক ফসল আলু তুলিয়া লইয়া তাহার গোড়ায় পুনরায় অল্প অল্প মাটী মিশাল খৈলের গুঁড়া দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। প্রথম আলু বাজারে বাহির করিলে, নূতন আলু বেশী দরে বিক্রয় হয়। নুতন আলু ৶০—৶১০ পয়সা হারে বিক্রয় করিলে বেশী দাম পাওয়া যায়। তুলিবার সময় অতি সাবধানে তুলিতে হয়। যেন শিকড় ছিঁড়িয়া না যায়। বাঙ্গালা দেশের আলুর গাছে, মাঘ মাসের শেষে দক্ষিণা বাতাস বহিলে, গাছের পাতা পিঙ্গল বর্ণ হইয়া শুখাইতে আরম্ভ করে। সুতরাং ১৫ই ফাল্গুন মধ্যে গাছ মরিতে আরম্ভ হইলে শেষ ফসল তুলিতে হয়। প্রথমতঃ দুই একটী গাছের গোড়া খুঁড়িয়া আলু পুষ্ট হইয়াছে কিনা, দেখিতে হইবে। কাঁচা বীজ প্রস্তুত হয় না। নাইনিতাল অপেক্ষা বাঙ্গালার মাটীতে বৈদ্যবাটী, আম্‌রুপি, গোরক্ষপুরী লালবর্ণের আলু ও দার্জ্জিলিঙের আলুরই

বেশী ফলন হয়। আর এই কয় প্রকার আলু খাইতে মিষ্টাস্বাদ ও নরম। কিন্তু বর্ষার বাতাস পাইলে অনেক পচিতে আরম্ভ হয়। নাইনিতালের তত পচন ধরে না। নাইনিতালের ফলন নিতান্ত মন্দ হয় না। বর্ষাকালে রাখিবার ও খাইবার পক্ষে নাইনিতাল ভাল। আলু আজ কাল নিত্য আহারীয় তরকারি মধ্যে গণ্য। ভাতের অভাব হইলে অনেক সময় গোল আলু সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জীবনধারণ করা যায়। ইহাতেও শরীর পোষক শ্বেতসার Starch যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ইহা আমিষ ও নিরামিষ সকল ব্যঞ্জনেই খাটে। বর্ষার জন্য রাখিবার আলুকে, ঘরের মধ্যে বিশুষ্ক স্থানে বালি পাতিয়া রাখিতে হয়। সকলে ঠিকমত বীজ রাখিতে পারে না, সেই জন্য বীজ আলু, নারসরী এবং গোলা হইতে খরিদকরাই উচিত, কারণ তাঁহারা পৃথক ভাবে বীজ রক্ষা করেন।

দাইল কলাই এবং তৈল শস্য

৯। রবিশস্য কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ এবং ঐ সকল উচ্চ ধরণের জমিতে বপন করিতে হয়। আলুর ক্ষেতের পাশাপাশি জমিতে ঐ ভাবে চাষ দিয়া, সোণামুগ, শ্বেত সর্ষপ শোর গুঁজা এবং তিসি বা মসিনা ঐ সময় বুনিয়াদিয়া একসঙ্গে ফাল্গুন, চৈত্র মাসের মধ্যে একত্রে অনেক গুলি ফসল পাইয়া লাভ করা যায়। কয়টী ফসল একসঙ্গে বুনিলে পাতলা করিয়া বুনিতে হয়। এই সকল শস্যও আজকাল বেশী দরে বিক্রিত হইতেছে।

১০। মুগ, তিন প্রকার। সরু দানা সোণামুগ, মোটা দানা ঘোড়া মুগ, কৃষ্ণমুগ। সুতরাং সরু দানা নল্‌ছিটীর মুগই উৎকৃষ্ট, সোণার ন্যায় বর্ণ, সুগন্ধ এবং সুস্বাদু। ঘোড়া মুগ ভাল নহে। কৃষ্ণমুগও মন্দ নহে। সুতরাং সোণামুগ এবং কৃষ্ণমুগেরই দাম বেশী। তিসী বা মসিনাও উৎকৃষ্ট শস্য। ইহা হইতে যথেষ্ট তৈল নির্গত হয়। এই তৈল অধিকাংশ রঙ ফলান কাজে লাগে। রেলওয়ে কোম্প্যানি এই তৈল নানাবিধ রংঙের কাজে লাগাইবার জন্য খরিদ করিয়া থাকেন। সর্ষপের তৈলের সহিত এই তৈল দোকানদারেরা ভাঁজাল দিয়াও থাকে। শ্বেত সরিষার এদেশের চাষারা চাষ করে না বটে, কিন্তু ইহার ফলন অত্যন্ত বেশী, দানা মোটা ও শাদাবর্ণ, তৈল বেশী হয়। তৈলের ঝাঁজ অত্যন্ত অধিক। ডাক্তারেরা এই সর্ষপ হইতে Mustard প্রস্তুত করিয়া রোগীর শরীরে লাগান। অন্যান্য লোকে নানাবিধ তরকারিতে দিয়া খাইয়া থাকে। দামও অধিক। শোরগুঁজাও তৈল্য শস্য মধ্যে পরিগণিত। ইহারও ফলন বেশী, তৈলও অধিক হয় এবং অত্যন্ত ঝাঁজ সুতরাং ইহার চাষেও বেশ লাভ হয়। এই সমুদায় চাষ এককালীন উঠাইয়া দেওয়ায়, যাবতীয় দাইল কলাই এবং তৈলশস্যের অভাব বশতঃ সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাদিরও অভাব হইয়া দর চড়িয়া গিয়াছে।

কুল

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত।

কুলের সংস্কৃত নাম বদরী। এই নামের অপভ্রংশ করিয়া কোন কোন দেশে ইহাকে "বরই" কোন দেশে "বইর" বলিয়া থাকে। বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভাল জাতীয় কুল জন্মে। আমরা যাহাকে নারিকেলী কুল বলি, তাহার গাছ বঙ্গদেশে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আনীত হইয়াছে এরূপ বোধ হয়। নারিকেলী কুল এখন বঙ্গদেশের নানাস্থানে বিস্তর জন্মিতেছে। কুলের মধ্যে নারিকেলী কুলই উৎকৃষ্ট। তদ্ব্যতীত বৃন্দাবনী, কাশীর কুল, গয়ার কুল নামধেয় কয়েক জাতি এতদ্দেশে আছে, সে গুলিও মিষ্টতায় মন্দ নহে। দেশীয় কুলের আঁটী বড় এবং অধিকাংশই তীব্র অম্লরস বিশিষ্ট, এগুলি প্রায়ই অযত্নে বন জঙ্গলে আপনা হইতেই জন্মে। বালকেরা অপক্কাবস্থাতেই গাছ হইতে কুল পাড়িয়া খাইতে আরম্ভ করে। কাঁচা কুলে কফ, কাশী, উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মে, এই জন্যই বোধ হয় সরস্বতী পূজায় না দিয়া কুল খাওয়া বালকদিগের পক্ষে নিষেধ, এইরূপ একটী প্রবাদ বচন চলিয়া আসিতেছে।

ইহার আঁটীর চারা ও কলমের চারা উভয়ই রোপিত হইয়া থাকে। চোঙ্গ কলমে চারা প্রস্তুত হয়। সচরাচর দেশী কুলের চারার মস্তকে নারিকেলী বা অন্য কোন উৎকৃষ্ট জাতীয় কুলের চোঙ্গ বসাইয়া কলম করা হইয়া থাকে, দেশী কুলের আঁটীর যেখানে সেখানে চারা জন্মে এবং ফলও তাদৃশ ভাল নয় বলিয়া উহার কলম করিবার আবশ্যক হয় না। দোয়াঁশ মৃত্তিকা কুল গাছের পক্ষে উপযোগী। কলমের চারা রোপণ করিয়া বড় সতর্ক থাকিতে হয়। কারণ কলমের নিম্নস্থ চারার কাণ্ড হইতে পুনঃ পুনঃ ফেকড়ি বাহির হইয়া কলমের মস্তকস্থ চোঙ্গের তেজ হানি করতঃ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। এজন্য অনেক সময় নারিকেলী কুলের কলম রোপণ করিয়া তাহাতে দেশী কুল ফলিতে দেখা যায়। এই দোষ নিবারণের জন্য সর্ব্বদা তদারক আবশ্যক। চারার গাত্র হইতে নূতন ফেকড়ি উদ্গত হইলেই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। কিন্তু সাবধান যেন চারার ফেকড়ি ভ্রমে চোঙ্গের ফেকড়ি না ভাঙ্গা হয়। কিছুদিন এইরূপ করিলে চোঙ্গের শাখা প্রশাখা গুলি নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধি পাইয়া প্রবল হইয়া দাঁড়াইবে। তখন আর চারায় ফেকড়ি বাহির হইবে না। হইলেও চোঙ্গকে বিনষ্ট করিতে পারিবে না। কলমের চারা রোপণ করিয়া যে পর্য্যন্ত তাহার শিকড় না লাগিবে, তাবৎ আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে গোড়ায় জল দিতে হইবে। কার্ত্তিক মাসে

গাছের গোড়া খুঁড়িয়া সার দিলে ফল বড় হয়। ফল ফুরাইয়া গেলে কুল গাছের সমুদয় ডাল কাটিয়া ফেলিতে হয়। কারণ তাহাতে অল্প দিনের মধ্যেই অসংখ্য নূতন ফেকড়ি জন্মিয়া বৃক্ষের যুবত্ব রক্ষা করে, সুতরাং বার্দ্ধক্য দোষ ঘটিলে বৃক্ষের ফল ছোট হওয়া বা অল্প ফল প্রসব করা প্রভৃতি যে সকল দোষ হয়, তাহা হইতে পারে না। ঐ নূতন ফেকড়ি জন্মিলেই কুল গাছের কলম করা ভাল, কারণ তখন চোঙ্গ তোলা সহজ।

এস্থলে কিরূপে কুলের চোঙ্গ কলম করিতে হয় তাহা উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বরং অনেক কৌতুহলপ্রিয় পাঠক পরীক্ষা করিয়া কৌতুহলও নিবারণ করিতে পারেন। শাখার বাহিরের ছাল প্রকৃত অবস্থায় রাখিয়া অভ্যন্তরের কাষ্ঠ বিমোচন করিলে চোঙ্গের ন্যায় দেখায়, এই জন্য ইহাকে চোঙ্গ কলম কহে। এদেশে কেবল কুল গাছেরই চোঙ্গ কলম করা হয়, অন্য কোন বৃক্ষের করিতে দেখা যায় না।

যে চারার সহিত চোঙ্গ কলম করিতে হইবে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া কাণ্ডের উপরিভাগে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের চারিদিগের ছাল তুলিয়া চড়ক গাছের আলের ন্যায় করিবে। ছালের সঙ্গে যেন কাষ্ঠ না উঠে এরূপ সাবধান হইবে। অনন্তর তৎসম জাতীয় বৃক্ষের তদুপযুক্ত স্থূল ও কোমল শাখা আনয়ন করতঃ তাহার যে স্থানে চোক আছে, সেই স্থানের ছাল প্রকৃতাবস্থায় রাখিয়া চারার মস্তকের আলের পরিমাণ উহার অভ্যন্তরের কাষ্ঠ কৌশলে উন্মোচন করিবে। তাহাতে কাষ্ঠহীন শূন্যগর্ভ ছাল অবিকল চোঙ্গের ন্যায় হইবে। ঐ চোঙ্গ উক্ত ছিন্ন মস্তক চারার আলে এরূপ চাপিয়া বসাইবে, যেন কিছুমাত্র ফাঁক না থাকে, অথচ চোঙ্গ ফাটিয়া না যায়। অভ্যন্তরে ফাঁক থাকিলে বা চোঙ্গ ফাটিয়া গেলে কদাচ অভিপ্রেত কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। বলা বাহুল্য চারাটীকে কোন গামলা বা টবে রাখিয়া বড় করিতে হইবে। চোঙ্গ বসান হইলে চারাকে ছায়ায় রাখিয়া উপরে সছিদ্র ভাঁড় ঝুলাইয়া তাহাতে প্রতিদিন জল দিবে, নতুবা সূর্য্য কিরণে উহা শুকাইয়া যাইবে। শাখা হইতে চোঙ্গ তোলা ও তাহা চারার মস্তকে বসান ক্রিয়া সদ্য সদ্যই সম্পন্ন করিবে। অনেকগুলি চোঙ্গ তুলিতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন শাখা হইতে চোঙ্গ তুলিয়া সে গুলিকে কোন পাত্রে জলের মধ্যে রাখিবে, নতুবা চারার মস্তকে বসাইতে যে বিলম্ব হয়, সেই বিলম্বেই চোঙ্গ গুলি শুকাইয়া যায়। রাঙচিতে, ভেরেণ্ডা প্রভৃতির শাখা হইতে ধীরে ধীরে ডাল মোচড়াইয়া যেরূপে চোঙ্গ বাহির করা যায় তাহা অনেকেই অবগত আছেন। ঐ প্রকারে বাহিরের ছাল হইতে অভ্যন্তরের কাষ্ঠ পৃথক করিতে পারিলেই সুবিধা, তাহা না পারিলে শাখার যে অংশে চোক আছে, তাহার উপরিভাগে এক অঙ্গুলি পরিমিত স্থান

রাখিয়া অবশিষ্ট ছাল তুলিয়া ফেলিবে। অনন্তর ঐ চোক সংলগ্ন ছাল ধারণ পূর্ব্বক ক্রমে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সজোরে টানিলেই উহা কাষ্ঠ হইতে খুলিয়া যাইবে। লেবু, কুল, গোলাপ প্রভৃতি বৃক্ষে এই রূপ কলম করা যাইতে পারে। কাগজী ও অন্য লেবুর চারায় কমলা লেবুর চোক্ষ বসাইলে কমলা এবং দেশী কুলের চারায় নারিকেলী কুলের চোক্ষ বসাইলে নারিকেলী কুল হইয়া থাকে। যে সময়ে ঐ সকল বৃক্ষের নূতন শাখা জন্মে সেই সময়েই এই কলম করা সুবিধাজনক। ফল ফুরাইয়া গেলে মাঘ মাসেই প্রায় কুলের শাখা কর্ত্তিত হইয়া থাকে, এবং ফাল্গুন মাসে অসংখ্য নূতন শাখা জন্মিয়া বৃক্ষকে সুশোভিত করে। এজন্য ফাল্গুন মাসেই কুলের কলম করা কর্ত্তব্য।

অসময়ে কুল রক্ষা করিবার উপায়—বৃক্ষ হইতে কতকগুলি টাট্‌কা সুপক্ব কুল পাড়িয়া আনিয়া তাহা রৌদ্রে শুষ্ক হইতে দিবে। শুকাইয়া যখন কুল গুলির উপরের খোসা চুপসিয়া আসিবে, তখন তাহাতে সর্ষপ তৈল ও কিছু হরিদ্রা মাখাইয়া আবার রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ একটী তৈলাক্ত মৃত্তিকার ভাণ্ডে মুখ আবদ্ধ করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। মধ্যে মধ্যে বাহির করিয়া রৌদ্রে দিবে এবং সর্ষপ তৈল মাখাইবে, নচেৎ কুল গুলিতে এক প্রকার শাদা শাদা ছাতা জন্মিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবে। এইরূপে যত্নপূর্ব্বক রাখিলে দুই বৎসর পর্য্যন্ত বেশ অবিকৃতাবস্থায় থাকে। আবশ্যক মত কতকগুলি কুল একখণ্ড নেকড়ায় ঢিলা করিয়া বাঁধিয়া ভাতের মধ্যে সিদ্ধ করিয়া লইয়া লবণ, তৈল সংযোগে বেশ চাটনীর মত হইবে। অথবা গুড় বা চিনি সংযোগে ইহার অতি উত্তম মিষ্ট অম্ল হয়। ইহা অতীব মুখ রোচক। কেহ কেহ বা দাইলের সহিত পাক করিয়া খাইয়া থাকেন, তাহাতেও মন্দ হয় না।

আর এক প্রকারে কুল রাখা যাইতে পারে। কুলগুলি ৫।৭ দিন রৌদ্রে দিলেই বেশ নরম হইয়া যাইবে। তখন কোন মৃত্তিকা পাত্র বা পাথর কি কাচপাত্রে অথবা চীনা মাটীর বাসনে কুল গুলিকে হাত দিয়া চটকাইয়া চটকাইয়া শাঁস গুলি বহির্গত করিবে ও আঁটী খোসা ফেলিয়া দিবে। পরে একখনি সরু চালুনীতে ছাঁকিয়া তাহাতে যদি ইচ্ছা হয় কিছু গুড় বা চিনি মিশ্রিত করতঃ চেটাইয়ের উপর যেরূপ প্রণালীতে আম্রের আমসত্ব দেওয়া হয়, সেই প্রণালীতে আমসত্ব দিয়া রাখিবে। আম্রের আমসত্ব কিরূপে দিতে হয় তাহা ইতিপূর্ব্বে "কৃষকে" "আম্রের ব্যবসা" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। এজন্য কুলের আমসত্ব সম্বন্ধে এস্থলে আর পুনরুল্লেখ করা হইল না। যদি আমসত্ব দিয়া রাখিবার ইচ্ছা না হয়, তবে ঐ রস কদলী পেটোতে ঢালিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ২।৩ দিন রৌদ্রে শুকাইলেই বেশ ঘন হইয়া হইয়া আসিবে, তখন ছোট ছোট গুলি করিয়া আবার রৌদ্রে উত্তমরূপ শুষ্ক করিতে হইবে। পরে আমসত্ব বা গুলি

যাহাই হউক না কেন তাহাতে বেশ করিয়া সর্ষপ তৈল মাখাইয়া মৃত্তিকা ভাণ্ডে উত্তমরূপে রাখিয়া দিবে, এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিবে। আবশ্যক মত ভাতে সিদ্ধ করিয়া লবণ তৈল সংযোগে বেশ সুস্বাদু চাটনী হইবে।

কুলের জেলী—পাকা কুল গুলি উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া লইয়া সেগুলি ঢেঁকিতে বা হামানদিস্তায় ফেলিয়া গুঁড়া করিয়া লইতে হয়। কুলের গুঁড়া সুক্ষ্ম ছাঁকনিতে ছাঁকিয়া লইলে তাহা হইতে আঁঠি গুলি ও খোসার অংশ বাদ যাইবে। পরিষ্কৃত কুলের গুঁড়া লইয়া চিনির রসে পাক করিলে অতি মুখ রোচক জেলী প্রস্তুত হয়। ইহাতে জিরে ও মেথি ভাজার গুঁড়া প্রভৃতিমিশাইলে জেলী আরও সুস্বাদু হয়। এই রূপ জেলী সাহেব মহলে চড়া দামে বিক্রয় হইতে পারে।

কুল বৃক্ষের কর্ত্তিত শাখা প্রশাখা গুলিতে জ্বালানী কাষ্ঠের অভাব মোচন হইতে পারে। ইহার কাষ্ঠ বড় মন্দ নহে। তবে ইহা খুব শক্ত কিম্বা দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে বলিয়া ইহাতে কোন কোন কৃষিযন্ত্র ব্যতীত বড় একটা আসবাবাদি প্রস্তুত করিতে দেখা যায় না। অধিকাংশ স্থলে ইহার কাণ্ড সমেত জ্বালানী কাষ্ঠ রূপেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

তৈল ও খৈল

তৈল কথাটী তিল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ তিল হইতে যাহা বাহির হয় তাহাকে তৈল বলে। বোধ হয় আর্য্যদের আমলে এদেশের লোক তিল হইতেই বেশী পরিমাণে তৈল প্রস্তুত করিত। তিল ভিন্ন আরও অনেক বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশন করা যায়। যে তৈল দিয়া আমরা তরকারী ও মাছ রন্ধন করি, সরিষা পিষিয়া তাহা বাহির করে। পোস্ত ও সোরগোঁজার বীজে অনেক তৈল নিহিত আছে। এই দুই বীজ সচরাচর সরিষার সহিত মিশাইয়া, ঘানিতে মাড়িয়া লোকে তৈল বাহির করে। বিহার ও ছোটনাগপুর প্রদেশে মহুয়া নামক এক প্রকার বৃহৎ বৃক্ষ আছে, ইহার ফুল সুমিষ্ট। পশ্চিম বাঙ্গালায় মহুয়া ফুল মানুষের আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়, মহুয়া গাছের বীজ কোঁচড়া নামে অভিহিত। মহুয়া বীজ হইতে লোকে তৈল বাহির করে। সেই তৈল সরিষা তৈল বলিয়া বাজারে বিক্রীত হয়, কিন্তু তাহা সরিষা তৈলের ন্যায় সুগন্ধ নহে।

বঙ্গদেশে কোন কোন স্থানে লোকে মূলার বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত করে ও সেই তৈল রন্ধন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এরণ্ড ও রেড়ির বীজ হইতে প্রচুর পরিমাণে তৈল প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে এই তৈল রাত্রিকালে লোকে প্রদীপে জ্বালাইত। কিন্তু

ঘরে আলো করিবার নিমিত্ত এখন কেরোসিন তৈল প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রাদ্বীপ, রুষ, মার্কিণ প্রভৃতি দেশের স্থানে স্থানে মৃত্তিকার ভিতর এক প্রকার তৈল নিহিত আছে। কূপ খনন করিয়া লোকে এই তৈল উত্তোলন করে, এই জন্য ইহাকে মেটে তৈল বলে। ইহাকে পরিষ্কার করিলে কেরোসিন তৈল হয়। রেড়ির তৈল ঔষধে ও অন্য অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশের ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকে তিসি বা মসিনা নামক এক প্রকার ছোট ছোট গাছের চাষ করে। শীতকালে যখন ইহার নীল বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তখন বহুদূর পর্য্যন্ত ক্ষেত্রগুলি মনোহর শোভা ধারণ করে। বিলাতের লোক তিসির ছালে সুতা কাটিয়া সুন্দর কাপড় প্রস্তুত করে। কিন্তু এদেশে তাহা হয় না, কেবল বীজের জন্য চাষ করে। প্রায় সমুদয় তিসির বীজ বিদেশে রপ্তানি হয়। তিসির তৈল রন্ধন অথবা জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় না, বায়ু লাগিলে এই তৈল শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়, অধিক উজ্জ্বল হয় ও অল্প দিনে উঠিয়া যায় না। এই জন্য লোকে শ্বেত, লাল প্রভৃতি রঙ মিশ্রিত তিসির তৈল দ্বারা ঘরের দরজা জানালার কপাট, চৌকাট রঞ্জিত করে। পুস্তকাদি ছাপিবার নিমিত্ত যে কালী ব্যবহৃত হয় তাহাও তিসি তৈল মিশাইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। পক্ক ও শুষ্ক নারিকেলের শাঁস হইতে অধিক পরিমাণে তৈল বাহির হয়। আমাদের দেশে এই তৈল লোকে সচরাচর মাথায় মাখে ও সাবান প্রস্তুত করে। কুসুম নামক গাছের ফুলে রঙ হয়, ফুলের নিমিত্ত পূর্ব্বে এদেশে চাষ করা হইত। মেজেণ্ডার রঙের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া কুসুম ফুলের অনাদর হইয়াছে। প্রদীপে জ্বালাইবার নিমিত্ত লোকে কুসুমের বীজ হইতে পরিষ্কার তৈল বাহির করিয়া থাকে। কার্পাসের বীজ হইতে মার্কিণ দেশের লোকে অধিক পরিমাণে তৈল বাহির করে; কিন্তু আমাদের দেশের লোকে ইহা হইতে তৈল বাহির করে না। গাছের কেবল যে বীজ হইতে তৈল বাহির হয় তাহা নহে। ফুল, ফল, পাতা, কাষ্ঠ ও মূল হইতেও লোকে তৈল বাহির করে। গোলাপ ফুল হইতে যৎসামান্য গোলাপী আতর বাহির করা হয়। কমলা লেবুর ফুল হইতে যে সুগন্ধ যুক্ত তৈল উৎপন্ন হয়, তাহাকে নিরোলী বলে। ভারত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে কাজীপুটি নামক এক প্রকার গাছের পাতা হইতে লোকে কাজীপুটি তৈল বাহির করে। ভারতবর্ষের নানাস্থানে লেন, রুষা প্রভৃতি কয়েক প্রকার ঘাসের পত্র হইতে ও খস্‌খস্‌ নামক ঘাসের মূল হইতে সুগন্ধযুক্ত তৈল নিঃসৃত হয়। চিড় প্রভৃতি গাছের কাষ্ঠ হইতে তারপিন তৈল হয়। গর্জ্জন গাছের কাষ্ঠ হইতে গর্জ্জন তৈল ও চন্দন কাষ্ঠ হইতে লোকে চন্দন তৈল প্রস্তুত করে। বীজকে ঘানিতে পিষিবার কালে উত্তাপ দিয়া অধিক পরিমাণে তৈল বাহির করে। বীজকে শিলে পিষিয়া তাহার পর জলের সহিত তাহাকে সিদ্ধ করিলে তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে।

অনেক স্থানে লোকে ঘরে রেড়ির বীজ হইতে এইরূপে তৈল বাহির করে। নারিকেল কুরিয়া তাহা হইতে দুধ বাহির করিয়া সেই দুধ অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক করিলে তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে। টাট্‌কা নারিকেল তৈলে কোনরূপ দুর্গন্ধ থাকে না, সেই জন্য তাহা দিয়া তরকারী রাঁধিতে পারা যায়, নারিকেল তৈল পুরাতন হইলে তাহাতে এক প্রকার গন্ধ হয়, তখন আর ইহা খাইতে পারা যায় না।

তিল তিন জাতীয় যথা—কৃষ্ণ তিল, শ্বেত তিল ও কাঠ তিল। কাঠ তিলের বর্ণ লালচে; ইহা অপর দুই জাতীয় তিল অপেক্ষা কিছু কঠিন ও ইহা হইতে অধিক তৈল বাহির হয়। ভিন্ন স্থানে লোকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিল বপন করে। কাঠ তিলের বীজ জ্যৈষ্ঠ মাসে বুনে ও ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে কাটে। সেই জন্য ইহাকে আশু তিল কহে। কৃষ্ণ ও শুক্ল তিল লোকে শীত কালে বপন করে, বসন্ত ও গ্রীষ্ম কালে কাটিয়া থাকে। কৃষ্ণ তিলের তৈল স্নিগ্ধ, মাথায় মাখিলে মস্তিষ্ক শীতল থাকে। তিল তৈলের সহিত নানারূপ ঔষধ পাক করিয়া দেশীয় চিকিৎসকগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কবিরাজী তৈল প্রস্তুত করে। মল্লিকা, চামেলী, জুঁই প্রভৃতি ফুল স্তরে স্তরে তিল দ্বারা কিছুক্ষণ আবৃত করিয়া রাখিলে তিল তৎতৎ সুগন্ধ যুক্ত হইয়া পড়ে। সেই তিল ঘানিতে পিষিলে যে তৈল বাহির হয় তাহাকে ফুলেল তৈল বলে। সরিষা, রবি খন্দ অর্থাৎ শীতকালের ফসল। কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করে। প্রায়ই মটর, যব প্রভৃতি অন্য ফসলের সহিত ইহাকে বপন করে। ইহা পলিপড়া জমিতে অধিক পরিমাণে ফলে, ইহা ফাল্গুন মাসে কাটে। সরিষা তিন জাতীয় যথা—শাদা সরিষা, কাল সরিষা ও রাই সরিষা। বাঙলায় এই তিন জাতীয় সরিষারই চাষ করে।

খৈইল—নারিকেল খৈইল, সরিষায় খৈইল, তিলের খৈইল, মসিনার খৈইল, চিনাবাদামের খৈইল, মহুয়া বীজের খৈইল গরুর আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রেড়ির খৈইল গো মহিষের খাদ্য নহে।

তৈল যুক্ত বীজ ও ফল মাড়িলে উহার তৈল বাহির হইয়া যায় কিন্তু উহার খেতসার অথবা চিনি উহাতে রহিয়া যায়; এই জন্যই খৈইল জীব জন্তু ও উদ্ভিদের পুষ্টিকর খাদ্য। আরও যতই তৈল বাহির কর না কেন, খৈইলে খানিক তৈল থাকিয়া যাইবেই যাইবে, এই কারণ বশতঃ খৈইল গো মহিষের পক্ষে সবিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খৈইল যেমন গো মহিষের পক্ষে উত্তম খাদ্য সেইরূপ জমির পক্ষেও উত্তম সার। কিন্তু সাররূপে খৈইলে যে উপকার সাধিত হয়, খাদ্যরূপে তদপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। কারণ খৈইলের অন্যান্য অংশ জমির পক্ষে হিতকর হইলেও তাহাতে যে তৈল, খেতসার ও চিনি থাকে, তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে

জমির কোন উপকার হয় না, কিন্তু তাহাতে গো মহিষাদির বিশেষ উপকার সাধিত হয়। অতএব যদি বিশেষ লাভ চাও তবে খৈইল প্রথমে গরুকে খাওয়াইতে দিবে। তৎপরে সেই গরুর গোবর জমিতে দিবে, এইরূপ ব্যবস্থায় খৈইলের কোন অংশ নষ্ট হয় না, গো, মহিষ ও ফসল উভয়েরই উপকার হয়।

বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি ও রাজসাহী বিভাগের চাষীরা আলু ও আখের ক্ষেতে নিয়মিত রূপে সরিষার ও রেড়ির খৈইলে দিয়া থাকে। সরিষার খৈইল গো মহিষে খায়, রেড়ির খৈইল গো মহিষের খাদ্য নহে। এই জন্য চাষীরা সাধারণতঃ চাষে সরিষার খৈইল অপেক্ষা রেড়ির খৈইল বেশী দিয়া থাকে। চাষীরা আখের ক্ষেতে বিঘা প্রতি ৬/ মণ হইতে ১০/মণ পর্য্যন্ত খৈইল দিয়া থাকে। সরিষার খৈইলের ব্যবহার করিলে, আখে চিনির পরিমাণ বাড়ে এবং আলু কম পচে। এই জন্য চাষীরা অনেক সময় আখ ও আলু সম্বন্ধে রেড়ি অপেক্ষা সরিষার খৈইলেরই অধিক পক্ষপাতী। রেড়ীর খৈইলে পোকার উপদ্রব কমিয়া থাকে।

সাময়িক কৃষি সংবাদ

গাছের ছালের তন্তু বা আঁস সম্বন্ধে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের পরীক্ষা—

গত দুই বৎসর ধরিয়া ইতিপূর্ব্বে সংগৃহীত ও শ্রেণীসমূহে বিভক্ত বিভিন্ন জাতীয় পাটের আঁস বা সূত্রের গুণের আলোচনায় এবং কেবল এক জাতীয় বৃক্ষ মনোনয়ন প্রণালীদ্বারা সূত্রের উৎকর্ষ সাধিত হওয়া সম্ভব কি না সেই বিষয়ের অনুসন্ধান করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, জাতিভেদে সূত্রের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিশেষ প্রভেদ হইয়া থাকে এবং ঐ প্রভেদ বংশ পরম্পরায় অর্থাৎ একটী বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষেও দৃষ্ট হয়। যে সমস্ত সূত্র বা সূক্ষ্ম সূত্রের দ্বারা আঁস গঠিত তাহাদিগের দৈর্ঘ্যের উপরই অধিক পরিমাণে পাটের আঁসের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে। এই সকল সূক্ষ্ম সূত্রগুলিকে পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, তাহাদের দৈর্ঘ্যের সহিত গাছের দৈর্ঘ্য বা হ্রস্বতার বিশেষ সম্পর্ক নাই। কারণ, কয়েকটী ছোট জাতীয় এবং কয়েকটী বড় জাতীয় বৃক্ষেও দীর্ঘ সূক্ষ্ম সূত্র পাওয়া গিয়াছে, অপর পক্ষে আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে ছোট বড় উভয় জাতীয় গাছেও দীর্ঘ সূক্ষ্ম সূত্র পাওয়া যায়। এই উপলক্ষ্যে কয়েকটী বড় জাতীয় গাছের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে, কারণ তাহাদের হইতেই প্রচুর পরিমাণে সূত্র সংগ্রহ হইয়া থাকে, এবং পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে একই বড় জাতির মধ্যে কতকগুলি গাছ, সূক্ষ্ম সূত্রসকলের দৈর্ঘ্য বিষয়ে, অন্যান্য গাছসকলের অপেক্ষা বিশেষ উৎকৃষ্ট। এই ভিত্তির

উপর নির্ভর করিয়া, যে সব গাছ হইতে বেশ বড় বড় সূক্ষ্ম সূত্র পাওয়া যায় সেইরূপ গাছ সকল বাছিয়া দেখা গিয়াছে, যে তাহাদের হইতে উৎপন্ন গাছ সকল এই বিষয়ে তাহাদের উৎকর্ষ অক্ষুন্ন রাখিয়াছে ; একই জাতীয় আবাছা গাছের উৎপন্ন সূত্রের গড় দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কোন কোন স্থলে শতকরা ১০ গুণ এবং দুই একটি স্থলে প্রায় ২০ গুণ উৎকৃষ্ট। এই কার্য্যের ফলে আমরা দুই এক জাতীয় পাট পাইয়াছি ; ইহাদের উৎপাদিকাশক্তি অন্যান্য জাতির সমান হইলেও যে সকল সূক্ষ্ম সূত্রের দ্বারা ইহাদের তন্তু গঠিত হয় সেই সকল সূক্ষ্ম সূত্রের দৈর্ঘ্য বিষয়ে ইহাদিগের স্পষ্ট উন্নতি দেখা যায়। বীজ বিতরণের জন্য এই সকল জাতির সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হইতেছে।

পাটে সার দেওয়া—

গাছের খাদ্যের বিবিধ উপাদান সম্বন্ধে পাটের পক্ষে কি কি আবশ্যক তাহার আলোচনার জন্য সারবিষয়ক পরীক্ষা পরম্পরা আরম্ভ করা হইয়াছে এবং চলিতেছে। এই কার্য্য কখনও এতদূর অগ্রসর হয় নাই যে তাহা হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে ; কিন্তু ইহার ফলে দেখা গিয়াছে যে, ঢাকার কৃষিক্ষেত্র যে স্থানে অবস্থিত সেই স্থানের লালমাটীতে চূণ এবং ফস্‌ফরিকাম্ল (Phosphoric acid) প্রয়োগ করিলে পাট গাছের বৃদ্ধির বিলক্ষণ সহায়তা হয়।

অন্যান্য সূত্র বা আঁস—

আলোচ্যকালের মধ্যে পাট ব্যতীত যে সকল প্রধান সূত্র বা আঁস লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল তাহা এই :—

(১) শণ

(২) সিদা (Sida)

(৩) আগেভ্‌ (Agaves)

রাজসাহীর কৃষিক্ষেত্রে, স্থানীয় শণের সহিত তুলনা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে শণ সংগ্রহ করিয়া উৎপন্ন করা হইতেছে। ইহা হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট ফল পাইবার সময় এখনও হয় নাই। তবে বোধ হইতেছে যে স্থানীয় শণ অপেক্ষা স্থানান্তর হইতে আনীত একটি বা দুইটি জাতি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। ক্ষেত্রে সিদা লইয়া ক্ষুদ্রাকারে পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং $\frac{1}{10}$ একর করিয়া খণ্ড খণ্ড জমি হইতে গড়ে একর প্রতি ১২ মণ করিয়া সিদা পাওয়া গিয়াছে। ঢাকার কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন সূত্রের একটি নমুনা, যাহা Imperial Institute এ প্রেরিত হইয়াছিল, উহার মূল্য কলিকাতায় "প্রথম দেশীয় মার্ক" এর সহিত (যাহার মূল্য টন প্রতি ২০ পাউণ্ড ছিল), টন প্রতি ৩০ পাউণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সিদা লইয়া এখনও পরীক্ষা চলিতেছে।

গত দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহু একর জমিতে সিসল শণ এবং অন্য প্রকার আগেভ্ রোপণ করা হইয়াছে, কিন্তু কোন স্থলেই সুফল হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, মেক্সিকো ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে এই সকল গাছের যে সময়ে ফুল হয়, এখানে তদপেক্ষা শীঘ্র ইহাদের ফুল হইয়া থাকে। ফুল হইবার পর গাছ মরিয়া যায় বলিয়া, এই অকালে পুষ্পোৎপত্তি ফলে আবাদের উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস হয়; এবং যে পর্য্যন্ত পুষ্পোৎপত্তির সময় নিয়মিত করিবার কোন উপায় আবিষ্কৃত না হয়, ততদিন সম্ভবতঃ কখনই ভারতবর্ষে আগেভের আবাদে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে না। অতএব যে সকল বিষয়ের দ্বারা সূত্রোৎপাদন হিসাবে এই গাছের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, যথা, একরপ্রতি পাতার ওজন, পাতাতে সূত্রের শতকরা হার, পুষ্পোৎপত্তির কাল ইত্যাদি সেই সমুদায় বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন যত প্রকার আগেভ্ পাওয়া সম্ভব তাহাদের পরস্পরের মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে, আলোচ্য কালের মধ্যে ঢাকাতে পরীক্ষা আরম্ভ করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে, সময়ে কোন নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে।

ইজিপ্টে তুলা বীজ বিতরণ—

ইজিপ্টে তুলা চাষের উন্নতি কল্পে বহুবিধ চেষ্টা হইতেছে। তথাকার কৃষি-বিভাগ রায়তদিগকে ভাল জাতীয় বপনোপযোগী তুলাবীজ যোগাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তুলা বীজ ছোট বড় সকল চাষীকেই দেওয়া হয়। সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রে ভাল জাতীয় তুলা বীজ আনিয়া প্রথমতঃ বড় চাষীগণকে দেওয়া হয়। তাহাদের ক্ষেত্রোৎপন্ন বীজের অর্দ্ধাংশ লইয়া অপরাপর ছোট চাষীগণের মধ্যে বিতরিত হয়।

সকলকে বিনা মূল্যে বা অল্প মূল্যে বীজ যোগান এক প্রকার অসম্ভব। সেই জন্য সরকার হইতে বড় চাষীগণকে বীজ উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করা হইতেছে। তাহারা বিধিমত সরকারের সাহায্য না করিলে সর্ব্বত্র সমভাবে বীজ সরবরাহ হইবেনা। তিন বৎসর যাবৎ এই পদ্ধতিতে কাজ হইতেছে এবং সুখের বিষয় উত্তর উত্তর বীজ বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে এই বিষয় প্রচলিত হইলে মন্দ হয় না।

ভারতীয় সয়বীনের গুণাগুণ—

লণ্ডনে মেঃ ষ্টুয়াটকোপের কারখানায় মাঞ্চুরিয়ার ও ভারতের সয়বীনের তুলনাকরা হইয়াছে। ভারতের সয়বীনে মানঞ্চুরিয়ার বীন অপেক্ষা তৈলভাগ কিঞ্চিৎ কম। নেপালি বীন তুলনায় মানঞ্চুরিয়ার বীনের প্রায় সমান। এমতাবস্থায় কারখানা ওয়ালারা মনে করেন যে দামে কিছু কম সুবিধা হইলেই ভারতের বীন তাঁহাদের কাজে লাগিতে পারে। সয়বীনকে বাঙলা দেশে লোকে হনুমান কলাই বলিয়া জানে।

ফাল্গুন, ১৩২১ সাল।

বাল্যে বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষার আবশ্যকতা

অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় কৃষি-বিদ্যা-শিক্ষাও বাল্যে আরম্ভ করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে চাষী বলিয়া একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় আছে। আমরা মনে করি তাহারাই কেবল ক্ষেতে বাগানে কাজ করিবে; তাহারাই চাষের কাজ শিখিবে; শস্য উৎপাদন করিবে, জঙ্গল কাটিয়া বাগান বসাইবে, শস্যক্ষেত্র রচনা করিবে। ভদ্রলোকের যেন একাজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। যাহারা সাহিত্য পড়িবে, যাহারা ন্যায় ও দর্শন লইয়া জীবন যাপন করিবে, তাহাদের সহিতও যেন ক্ষেত পাথারের কোন সম্পর্ক নাই। যাঁহারা বিজ্ঞান লইয়া নাড়াচাড়া করেন তাঁহারা কৃষির সহিত কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ রাখিতে রাজী হইলেও, মনোবিজ্ঞানের সহিত যে ইহার কি সম্বন্ধ তাহা অনেকেই সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পান না।

শিক্ষাকে আমরা মোটামুটি দুইটি ভাগে বিভাগ করিতে পারি। নিজের, সংসারের ও সমাজের বিবিধ অভাব মোচনের জন্য যে চেষ্টা ও তাহার জন্য যে সাধনা তাহাই আমাদের ব্যবহারিক শিক্ষা। শিল্প-শিক্ষা, কৃষি-শিক্ষা, ব্যবসায় শিক্ষা, পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা ব্যবহারিক বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। মানসিক বৃত্তি সমূহের উৎকর্ষ সাধন করিয়া সকল বিষয় তত্ত্বতঃ জানিবার জন্য যে চেষ্টা তাহাই আমাদের অধ্যাত্ম বিদ্যায় পরিসমাপ্ত হয়। এই অধ্যাত্ম বিদ্যা আমাদিগকে পরম জ্ঞানে পৌঁছাইয়া দেয়। যে কোন বিদ্যাই শিক্ষা করি না, যদি আমরা সকল তত্ত্ব বিচার করিয়া শিক্ষা না করি, যদি আমরা সমুদয় ব্যাপারের অধ্যাত্ম তত্ত্বটুকু বুঝিয়া রাখিতে না পারি তবে নিশ্চয়ই আমাদের বিদ্যাটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অধ্যাত্ম তত্ত্বটুকু জানা না থাকিলে ব্যবহারিক জগতেও আমাদের বিদ্যার সম্পূর্ণ স্ফুরণ হয় না। প্রাণীজগতে ও উদ্ভিদ জগতে প্রকৃতির কার্য্য বিশেষ রূপে লক্ষ্য

করিতে হইবে, তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতে হইবে, প্রকৃতির কার্য্য দেখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। প্রকৃতিই আমাদিগকে শিখাইয়া পড়াইয়া মানুষ করেন। প্রকৃতির ক্রোড়ে আমাদের শারিরীক ও মানসিক বিকাশ হয়।

শিক্ষামন্দিরের অভ্যন্তরে চতুঃসীমার মধ্যে আমাদের কতটুকু জ্ঞানের উন্মেষ হইতে পারে। প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে আসিয়া না দাঁড়াইলে, আমাদের কল্পনা অনন্ত বিস্তৃতি লাভ করিবে না, আমাদের বস্তুজ্ঞান, পদার্থ জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে না, আমাদের সৌন্দর্য্য বোধ জন্মিবে না, আমাদের নৈতিক জ্ঞান লাভের পথ মুক্ত হইবে না, এক কথায় আমাদের দেহ ও মন বলিষ্ঠ হইবে না। গৃহ মধ্য হইতে ছাত্রদিগকে বাহিরে আনিবা মাত্র তাহারা সমকালে অপরাপর প্রাণীজগতের ও উদ্ভিদ জগতের সংস্রবে আসিল। তাহাদের ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, মন বিচার করিয়া বুঝিতে শিখিল, স্বভাবের শিশু স্বভাবের কোলে মানুষ হইতে লাগিল।

কি প্রকারে বৃক্ষের উৎপত্তি হইতেছে, কি প্রকারে তাহাদের দেহ বৃদ্ধি হইতেছে, কি রকমে তাহারা আহার সংগ্রহ করিতেছে, কি উপায়ে আত্মরক্ষা করিতেছে, কেমন করিয়া তাহারা কীটাদির ভক্ষ্য হয়, তাহাদের হাত হইতে কি প্রকারেই বা পরিত্রাণ পায়। কীটাদি বা কি রূপে জন্মে ও মরে এই সকল লক্ষ্য করিতে করিতে তাহারা বুদ্ধিমান, বিবেচক ও জ্ঞানী হইয়া উঠিবে। চাষীর ছেলেকে চাষ শিখাইবার জন্য কলেজে পড়িতে পাঠাইবার আবশ্যক হয় না, রাজার ছেলে রাজকার্য্য আপনা হইতে শিখে। প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ পাতাইবার জন্য আমাদের বৃত্তি গুলি সর্ব্বদাই উন্মুখী। মনেতে সর্ব্বদা সকল বিষয়েরই ছাপ পড়িতেছে। গ্রামোফনের রেকর্ডের মত তাহার উপর কাঁটা ঘুরাইয়া দিলেই সুর বাজিয়া উঠিবে। এই জন্য বলিতেছি যে, বাল্যকালে রেকর্ডটি ঠিক করিয়া না রাখিলে সময়ে ঠিক বাজিবে না বা বেসুর বাজিবে। শৈশবে কৃষি-শিক্ষা বা উদ্যান চর্চ্চার ব্যবস্থা করিলে পরিণত বয়সে সৌন্দর্য্য জ্ঞান আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিবে, বস্তু বিচার জন্মিবে, ষড়ঋতুর সংযোগ বিয়োগের উপলব্ধি হইবে, জড় বিজ্ঞানে আস্থা জন্মিবে, মনোবিজ্ঞানের রসাস্বাদনে সামর্থ লাভ হইবে, ব্যবহারিক জগতের কার্য্যে কৌশল শিক্ষা হইবে, জীবিকা অর্জ্জণে ও সমাজ সেবায় যোগ্যতা লাভ হইবে। এমতাবস্থায় কৃষি-শিক্ষা কি শিক্ষার অঙ্গ হইতে বাদ দেওয়া চলে?

কৃষি-শিক্ষা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন—অন্ন সংস্থান শিক্ষার মহান্ উদ্দেশ্য না হইলেও ইহা যে একটি মূল উদ্দেশ্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহাদের অন্ন বস্ত্রের অভাব তাহাদের নিকট এই শিক্ষাটি মহত হইতে মহত্তর। আগে জীবনরক্ষা তারপর অন্য যা কিছু। চাষীর ছেলে যে কেবল চাষ করিবে এমন কিছু কথা নাই আবশ্যক হইলে তোমাকেও ঐ কর্ম্ম করিতে হইবে। এমতস্থলে বিদ্যাটা শিখিয়া

রাখা মন্দ নহে। কেহ না হয় উচ্চ বংশে জন্মিল, ভাল লেখা পড়া শিখিল। মনে করিলে ত সে দশ জনকে একত্র করিতে পারে, একটা মূলধন খাড়া করিতে পারে এবং দশজন চাষীকে লইয়া চাষের কাজে লাগিয়া যাইতে পারে। এতে নিজেদের কল্যাণ হয় ও দেশের ধন বৃদ্ধি হয়। কিছু কাল পূর্ব্বে জন সাধারণের অবস্থা সচ্ছল ছিল, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের জন্য কাহাকেও বড় ভাবিতে হইত না, ছেলেদের সামান্য লেখা পড়া শিখিলেই চলিত। স্থানীয় শাসনকর্ত্তা, জমিদারের গোমস্তা ও আদালতের লোকের সহিত ভদ্রভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে ও পত্রাদি লিখিতে পারিলে, বৈষয়িক কাগজ পত্র গুলি বুঝিয়া রাখিতে পারিলে ও ঘরে বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণকে রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠ করিয়া শুনাইতে পারিলেই তাহাদের যথেষ্ট লেখা পড়া হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইত এবং সকলের নিকট তাহারা প্রশংসা অর্জ্জন করিত। কিন্তু এখন সে দিন নাই এখন যে কোন বিষয় হউক না কেন তাহাতে বিশেষ জ্ঞান না জন্মিলে তাহা হইতে অর্থোপার্জ্জন হয় না। কৃষি-বিদ্যায়, উদ্যান বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী না হইলে তাহাতে ভদ্রলোকের লাভ হওয়া কঠিন। সেই জন্য বারংবার বলি যে, যদি কৃষি-কর্ম্মকে জীবিকার উপায় করিতে চাও তবে বাল্য জীবন হইতে কৃষি ও উদ্যান তত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ করা হউক। বীজ বাল্যে উপ্ত না হইলে পরিণামে ফলদায়ী হইবে না।

কৃষি-কর্ম্মে মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ—কৃষি-কর্ম্মে ও উক্ত উদ্যানচর্য্যায় নিয়ত ছাত্রের দৈনন্দিন কার্য্য ক্রমশঃ সুনিয়মিত হইয়া থাকে। কৃষি-কর্ম্মে অধ্যবসায় শিক্ষা হয়, কৃষক-কুল প্রায়ই বড় অধ্যবসায়ী। সতর্কতা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতা কৃষির মূল মন্ত্র। বৃক্ষ লতাদির নিকট হইতে আমরা সহিষ্ণুতা শিক্ষা করি, বৃক্ষ লতাদির ফল প্রদান আত্মত্যাগের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ক্ষেত্ত পাথারে কাজ করিবার সময় দিগন্ত ব্যাপী সুনীল আকাশ দেখিয়া, স্রোতস্বিনীর মধুর কল্লোল, গোবৎসাদির হাম্বারব, পাখীর আকুল তান শুনিয়া, লতা-পল্লব-পুষ্পাদির বিমোহন সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া হৃদয় যে কি এক অপূর্ব্বভাবে ভরিয়া যায়, তাহা ভাবিতে গেলে আত্মহারা হইতে হয়, হৃদয় মধুময় হইয়া উঠে, আপনা আপনি চরিত্র গঠন হইয়া যায়। সমাজ সংস্রবে আসিলে এই সকল চরিত্র মধুক্ষরণ করে। উন্মুক্ত আকাশতলে যত অধিকক্ষণ যাপন করিবে, লতাপাতা, ফল, পুষ্প লইয়া যত নাড়া চাড়া করিবে, নদী, নির্ঝরিণী, পাহাড় পর্ব্বতের মধ্যে যত বিচরণ করিবে ততই তুমি শিষ্ট শান্ত হইবে, ততই তুমি নির্ভীক ও সাহসী হইবে, ততই তুমি বিনয়ী ও পর দুঃখকাতর হইবে। হৃদয়ের মধ্যে সুন্দর মধুরের মিলন ছবি, কোমল কঠিনের সংযোগ চিত্র ও বিশালতা ও ব্যাপকতার অপূর্ব্ব দৃশ্য ফুটিয়া উঠিবে।

কৃষি-কর্ম্মে আর শিখিবে যে, তোমার কোন জিনিষ অকেজো নহে। তৃণ গাছটি হইতে তোমার উপকার, খোসা ভুসীতেও তোমার আবশ্যক, বিষ্ঠা মূত্রেও তোমার প্রয়োজন। তুমি যাকে রাখিবে সেই তোমাকে রক্ষা করিবে। তুমি মিতাচারী, মিতভাষী, মিতাশী, মিতব্যয়ী, না হইলে তোমার কাজ চলিবে না। ঘড়ি যেমন কোন একখানি চাকা খারাপ হইলে বন্ধ হইয়া যায়, তেমনি তোমার কাজের কোন অঙ্গ হানি হইলে কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে।

ধনী ও নির্ধনের, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মিলন—কৃষিই ধনী নির্ধনকে একত্রে মিলায়। চাষা চাষ না করিলে রাজার রাজ্যপাট চলে না, ব্যবসায়ীর ব্যবসা চলে না, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান চর্চ্চা হয় না, কবির কবিত্ব ফুটে না, তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর তত্ত্বালোচনা হয় না, সাহিত্যিকের সাহিত্য সেবা হয় না, এমন কি তপস্বীর তপস্যার বিঘ্ন হয়। এ হেন কৃষিকাজ সকলেরি কিছু কিছু জানিয়া রাখা ভাল। সকল শিক্ষার মত আদিকর্ম্মের শিক্ষাটা বাল্যে বিদ্যালয়ের সংস্রব না ঘুচিতে ঘুচিতে আরম্ভ করিতে পারিলেই মঙ্গল।

পত্রাদি

উদ্ভিদের আত্মরক্ষা—শ্রীসনাতন দেব, বেলগাছী, কলিকাতা

বিগত মাসের ‘কৃষকে’ উদ্ভিদের আত্মরক্ষার অদ্ভুত কৌশল সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। কৃষক পাঠে কোন স্থানে দেখিয়াছি যে উদ্ভিদগণও গতিশীল কিন্তু ইহার অর্থ বোধ করিতে পারিলাম না। কোন বৃক্ষ লতাকে আমরা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে দেখি নাই।

উত্তর—যিনি উদ্ভিদের স্বভাব তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়াছেন, উদ্ভিদগণ যে গতিশীল তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন। উদ্ভিদগণ শিকড় দ্বারা আহার সংগ্রহ করে। উদ্ভিদের শিকড়স্থানই তাহাদের পাদদেশ। মানুষ, পশু, পক্ষী যেমন চলিয়া ফিরিয়া ইতস্ততঃ আহার সংগ্রহ করে উদ্ভিদও তাহাই করে। এক এক শ্রেণীর উদ্ভিদ শিকড় দ্বারা খাদ্য পানীয় সংগ্রহ করিতে বহুদুর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। বট বৃক্ষ আবার নিজ অঙ্গ হইতে শিকড় বাহির করিয়া তাহা স্থানে স্থানে মাটিতে প্রোথিত করে ও এই রূপে বহুদুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বাধা না পাইলে বাঁশ, ঘাস প্রভৃতি উদ্ভিদ শিকড় চালাইয়া তেউড় ছাড়িতে ছাড়িতে দুই এক মাইল পর্য্যন্ত অনতিকাল মধ্যে বিস্তার লাভ করিতে পারে। কোন একটি কলাগাছ যেখানে বসান হইল, স্বাভাবিক অবস্থায় তাহাকে থাকিতে দিলে ঝাড় বাড়িতে বাড়িতে সে দশ

কাঠা জমি অতিক্রম করিয়া স্বতন্ত্র স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে। এই প্রসঙ্গে উদ্ভিদের পরিণামদর্শিতার কথা মনে আসে। আমরা কৃষি-তত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু লিখিত 'কৃষকের' দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত একটি ছোট খাট সারগর্ভ প্রবন্ধ স্থানান্তরে বাহির করিলাম।

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধান—কৃষকের গ্রাহক অনুগ্রাহক অনেকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কোন একটি ধানের অনুসন্ধান করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদিগকে এমন একটি ধান বলিয়া দেওয়া হউক যাহা ফলনে অধিক হইবে এবং যাহার চাউল তত মোটা হইবে না।

উত্তর—প্রত্যেক বিভাগে, প্রত্যেক জেলায় সরু মোটা অনেক প্রকার ধানের চাষ হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে ফলনে কোন্‌টি ভাল তাহা স্থানীয় চাষীরা নির্দ্ধারিত করিয়া সেই গুলিরই অধিক আবাদ করে। সর্ব্বত্র সমান ফলিবে বা সর্ব্বত্র গুণে সমান হইবে এ রকম একটা ধানের কথা বলিয়া দেওয়া কঠিন। কৃষি-বিভাগের পরীক্ষা দ্বারা এখনও এমন কোন বিশেষ প্রকার ধান নির্ণীত হয় নাই যাহা কৃষকদিগের নিকট সকল জায়গার জন্য সর্ব্বতোভাবে ভাল বলিয়া উপস্থিত করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, মধ্য প্রদেশের মিহি আউশ বাঙলায় আসিয়া মোটা হইয়া যায়। বর্দ্ধমানের বাদসাভোগ বাঙলায় তেমন ফলেনা। চট্টগ্রামের বালাম যেমন মিহি ও ফলনে অধিক হয় অন্যত্র তেমন হয় না। আসামের হাতীসাল ধানের ফলনের মত কোন ধান অদ্যাপিও আসামে হয় নাই। কিন্তু ধান চাষের একটা সঙ্কেত মনে করিয়া রাখা কর্ত্তব্য—এক জমিতে একই ধানের চাষ বারম্বার করা উচিত নহে। তাহাতে ধান খারাপ হয় ও ফলন কমিয়া যায়।

কৃষি কর্ম্মে লাভ—শ্রীবসন্ত কুমার দত্ত, পাবনা

ইনি আই, এস, সি, পাশ করিয়াছেন। চলিত পদ্ধতি চাকুরির অনুসন্ধান না করিয়া চাষাবাদ করিতে চান এবং তাহা ভদ্রলোকের পক্ষে লাভজনক হইবে কি না তদ্বিষয়ে আমাদিগকে বিচার করিতে বলিয়াছেন।

আমাদের উত্তর—হাতে হাতিয়ারে কাজ করিতে না পারিলে চাষে সুফল প্রত্যাশা করা যায় না। অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় ইহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করা চাই, অধ্যবসায় থাকা চাই'ও সময়োচিত কার্য্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা চাই। জমিতে বীজ ছড়াইলেই গাছ হইয়া ফল ফলে না। ছেলে মানুষ করিতে হইলে যেমন ছেলের সঙ্গে ছেলে হইতে হয়, গো পালন করিতে হইলে যেমন গরুর সঙ্গে গরু হইতে হয়,

তেমনি উদ্ভিদ পালন করিতে গেলে মানুষকে উদ্ভিদ পরিবার ভুক্ত হইতে হইবে। তাহাদের স্বভাব বুঝিয়া, জমির অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিতে হইবে। পশু পক্ষীর ন্যায় উদ্ভিদের রীতিমত খাদ্য যোগাইতে হইবে তবেত তাহারা ফল প্রসব করিবে! এক কথা—চাষে নেশা না জন্মিলে চাষে নামা বৃথা।

বই পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া চাষে কৃতবিদ্য মনে করিলে চলিবে না। চাষীদের চাষা বলিয়া ঘৃণা না করিয়া তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে রাজী হইলে তবে আপনার চাষে নামা কর্ত্তব্য নতুবা অকর্ত্তব্য। এতটা প্রস্তুত হইলে চাষে অলাভ হইবে না। যত্নে না হয় কি?

বৎসরাধিক কাল তুলা গাছ রক্ষার উপায়—লক্ষ্মীর বীজের (আমাদের জীবনরক্ষক ধান্য, গম প্রভৃতি শস্যকে লক্ষ্মীর বীজ কহে) ন্যায়, তুলার গাছ ফল পাকিলেই মরিয়া যায় না। যত্নের সহিত রক্ষা করিলে, ক্রমাগত তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত এক গাছ হইতেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম বৎসরের সমুদয় তুলা উঠিয়া গেলে পর, তিন চারি মাস পর্য্যন্ত জমিতে পূর্ব্বের ন্যায় জলসেচন করা আবশ্যক। মাঘমাসের শেষভাগে কি ফাল্গুন মাসের শেষে, জমি বেশ করিয়া কোপাইয়া দিয়া, প্রত্যেক গাছের গোড়ায় সারমিশ্রিত মাটী দিতে পারিলে ভাল হয়। এই সময় পুরাতন গাছগুলি একবার ছাঁটিয়া দিতে হইবে। দুই তিন বৎসরে গাছগুলি ৫।৬ হাত উচ্চ হয়; সুতরাং সেই সময় ঘন সন্নিবিষ্ট গাছ হইতে বাছিয়া বাছিয়া, এক একটী গাছ তুলিয়া ফেলিয়া, অবশিষ্টগুলির বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ইহাতে গাছের সংখ্যা কমিয়া গেলেও ফলের সংখ্যা কম হইবে না।

কার্পাস চাষে কৃষকের লাভ—সুশৃঙ্খলার সহিত একবিঘা জমিতে কার্পাস-বীজ বপন করিলে এক বা ততোধিক মণ তুলা একবৎসরের মধ্যেই পাওয়া যায়। প্রতিমণের মূল্য খুব কম করিয়া ধরিলেও, এক বৎসরে এক বিঘা জমিতে ব্যয়বাদে ১৫৲ হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে। চাষ, রোপণ, জমির খাজনা প্রভৃতিতে কৃষকের যে ব্যয় হয়, তাহা উপরি ফসলে উঠিয়া যাইতে পারে। কার্পাস ক্ষেতে ধারে ভিতে লাউ কুমড়ার চাষ করা যাইতে পারে, মধ্যে আদা হলুদ দিলে কার্পাসের ক্ষতি হয় না। তবে এরূপ স্থলে কার্পাস গাছ খুব ঘন বসান চলে না।

সার-সংগ্রহ

বঙ্গেশ্বরের কৃষি-কার্য্য পরিদর্শন

ঢাকাতে অবস্থান কালে মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্থানীয় এগ্রিকালচারেল ফারম পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি নিকটবর্ত্তী গ্রামের কয়েকটী গ্রাম্য "ব্যাঙ্ক" দেখিতে যান। কো-অপারেটীভ্ ডাইরি ফারম প্রাঙ্গণে শতাধিক গ্রাম্য কৃষক গবর্ণর বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মিলিত হইয়াছিল। "কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক" এর সবডেপুটী কালেক্টার বাবু জ্যোতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং অর্গানাইজার বাবু হীরালাল দাসগুপ্ত গবর্ণর বাহাদুরকে তথায় সসম্মানে গ্রহণ করেন। অষ্টম বর্ষীয় একটী গ্রাম্য কৃষকবালক গবর্ণর বাহাদুরকে কুসুমমাল্য শোভায় বিভূষিত করে। গবর্ণর বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, এই বালকের পিতা একজন কৃষক এবং গ্রাম্য ব্যাঙ্কের জনৈক সভ্য। তিনি হাসিয়া বালকটীর প্রদত্ত মাল্য ও পুষ্পগুচ্ছ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মান্যবর গবর্ণর বাহাদুর এই ডাইরিতে মাখন তুলিবার কৌশল প্রত্যক্ষ করিয়া, পরে নিকটবর্ত্তী এক গ্রাম্য "ব্যাঙ্ক" এর চেয়ারম্যানের জমী দেখিতে গমন করেন। এই ব্যক্তির যে সব ধানি জমীতে অস্থিসার ব্যবহার করা হইতেছে তাহা প্রজাপ্রাণ বঙ্গেশ্বরকে প্রদর্শন করান হয়। অপর জমী হইতে এই জমীতে যে বেশী শস্য পাওয়া যায় ইহাও তাঁহাকে জানান হয়। তিনি ফিরিয়া কো-অপারেটিভ্ ডাইরি ফারমে আসিয়া একটী গ্রাম্য "ব্যাঙ্ক" এর জমা খরচ বহি দেখেন। এই সব হিসাব পত্র গ্রাম্য কৃষকগণ নিজেরা লিখিয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই সকল ব্যাঙ্কের লোকেরা অনেক ফৌজদারী মোকদ্দমা আপোষে মিটাইয়া দিয়া দুরবস্থ লোকের অর্থ বাঁচাইয়া দিয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি আরও সুখী হন। শিশুদিগের শিক্ষার জন্য ইহারা একটী স্কুল খুলিয়াছে শুনিয়াও তিনি বড় প্রীতি লাভ করেন। তিনি মণিপুর নামক গ্রামের

ব্যাঙ্কের লোকদের স্বহস্তনির্ম্মিত বস্ত্র খরিদ করিয়া লন। গবর্ণর বাহাদুরের এই পরিদর্শনে কৃষকগণ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছে। একজন কৃষক গ্রাম্য ভাষায় গবর্ণর বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করে, গবর্ণর বাহাদুরকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইলে, প্রত্যুত্তরে তিনি উহাদিগকে উৎসাহ পূর্ব্বক কয়েকটী কথা বলেন। গবর্ণর বাহাদুরের কথাও কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। দিবা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত গবর্ণর বাহাদুর প্রখর সূর্য্য কিরণে দাঁড়াইয়া রহিয়াছিলেন।

১৭ই তারিখে প্রাতে গবর্ণর বাহাদুর আবার গ্রাম্য "ব্যাঙ্ক" পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এবার স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এগ্রিকালচারেল্ ফারমের নিকটবর্ত্তী ফারমে গমন করেন। এই কৃষিক্ষেত্র হইতে অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণ, রাজাবাজার গ্রামের ক্ষেতের উপর দিয়া গবর্ণর বাহাদুর পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বরাবর রাজাবাজার ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী সেখ ইব্রাহিমের বাড়ী উপস্থিত হইয়া ব্যাঙ্কের শস্য-ভাণ্ডার পরিদর্শন করেন। ব্যাঙ্কের সভ্যদিগকে প্রয়োজন মতে এই ভাণ্ডার হইতে শস্য ধার দেওয়া হয়। এবম্বিধ উদ্দেশ্যমূলক অনুষ্ঠান পছন্দনীয় বোধ হওয়ায়, গবর্ণর বাহাদুর এই প্রদেশে এইরূপ কয়টী ভাণ্ডার আছে তাহা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইহার পর গবর্ণর বাহাদুর ব্যাঙ্কের হিসাব বহি দেখেন। প্রসিডিং বহিতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমাদির আপোষ নিষ্পত্তি দেখিয়া তিনি সন্তোষ লাভ করেন।

অতঃপর সদাশয় বঙ্গেশ্বর খোসখানা গ্রামের ব্যাঙ্ক দেখিতে যান। এখানেও তিনি ব্যাঙ্কের কাগজ পত্রাদি পরিদর্শন করেন। তিনি ব্যাঙ্কের সভ্যদিগকে ধন্যবাদ দিয়া তাহাদের সহিত করমর্দ্দন করেন এবং তৎপর মটর-যানে গবর্ণমেণ্ট হাউসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

উদ্ভিদ জাতির পরিণামদর্শিতা

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বসু লিখিত—কৃষক ২য় বর্ষ.)

পিপীলিকার পরিণামদর্শিতার বিষয় অনেকে অবগত আছেন, মধুমক্ষিকাও পরিণামদর্শী বলিয়া বিখ্যাত। শীতকালে আহার সংগ্রহের অন্তরায় হইবে বলিয়া উহারা আপন আপন আবাস স্থানে গ্রীষ্মকালে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। উহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনুষ্যজাতিও সঞ্চয়ের কৌশল শিক্ষা করিতে পারে।

লোকে উদ্ভিদদিগকে জীবনীশক্তি এবং গতিহীন বলিয়া জানে; কিন্তু গতি-শীলতা, জীবনী-শক্তি এবং পরিণামদর্শিতার বিষয়ে তাহাদিগের কার্য্য-কলাপ দেখিলে অনেক বুদ্ধিমান্ প্রাণীকেও অবনত মস্তক হইতে হয়।

উদ্ভিদ জাতির জীবনীশক্তি এবং পরিণাম-দর্শিতার একটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, তাহারা কি রূপে ভবিষ্যতের নিমিত্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। যে সময় প্রচুর আহার্য্য পাওয়া যায়, সেই সময়ে উদ্ভিদ্ জাতি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য, আপন আপন শরীরের ভিতর সঞ্চয় করিয়া রাখে। উদ্ভিদের শরীরের এরূপ স্থানে ঐ সকল খাদ্য রক্ষিত হয় যে, ঐ খাদ্যের বিন্দু মাত্র নষ্ট হয় না।

পলাণ্ডু, মূলা, ওল, কচু, কলা, আলু, লাল আলু, শতমূলী, আরারুট, আদা প্রভৃতি উদ্ভিদের বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদিগের ভূ-গর্ভস্থিত মূল এবং কাণ্ডের মধ্যে তাহারা আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। কারণ, উল্লিখিত উদ্ভিদ্ গুলির মূল এবং কাণ্ড শীঘ্র নষ্ট হয় না। সাগু গাছ, ইক্ষু গাছ, কাণ্ডে (অর্থাৎ কাণ্ডের যে অংশ জমির উপর থাকে) এবং মুসব্বর, ঘৃতকুমারী, পাথরকুচি প্রভৃতি উদ্ভিদ্ পত্রের মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। এই সকল বৃক্ষের প্রায় বীজ বা শস্য হয় না। অথবা এই সকল বৃক্ষে যে সকল বীজ জন্মে, তাহারা এরূপ নিস্তেজ হয় যে, তাহা হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হইতে পারে না। যদি ঐ সকল বৃক্ষের উৎপত্তি বীজের উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে তাহাদিগের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইত কিন্তু পরিণামদর্শিতার বলে, তাহারা আপনাদিগের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। স্বাভাবিক বন্য অবস্থায় হউক অথবা গৃহপালিত অবস্থায় হউক, খণ্ডিত বা অখণ্ডিত শিকড়, মূল, ডাঁটা অথবা পত্র সাহায্যে এই সমস্ত গাছ বংশ বৃদ্ধি করে।

এই সকল বৃক্ষাংশ হইতে যে চারা জন্মে, তাহারা উক্ত বৃক্ষাংশের মধ্যে সঞ্চিত খাদ্যে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। যখন চারাগুলি সম্পূর্ণ রূপে জমিতে বসিয়া যায় এবং আপনাদিগের খাদ্য আপনারাই আহরণ করিতে সমর্থ হয়, তখন যে সকল কন্দ বা মূল হইতে তাহাদিগের উৎপত্তি হইয়াছিল, সে গুলি বিশীর্ণ হয়। কারণ তাহাদিগের মধ্যে যে সকল সার পদার্থ ছিল, তাহা তখন নবোদ্গত উদ্ভিদ-শিশুর জীবন রক্ষায় ব্যয়িত হইয়া যায়।

যে সকল বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের বীজের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আহার্য্য পদার্থ সঞ্চিত থাকে। নারিকেল, কাঁটাল, হিজলি বাদাম, আম্র, লিচু প্রভৃতি ফলের বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। ঐ সকল বৃক্ষের ফলে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষের আহার্য্য সঞ্চিত থাকে। ধান, গম, যব, জোয়ার প্রভৃতি শস্যের ভিতরেও খাদ্য পদার্থের প্রাচুর্য্য পরিদৃষ্ট হয়। অধিকাংশ বৃক্ষই বীজের দ্বারা বংশবিস্তার করে এবং যতদিন তাহাদিগের জীবন থাকে, ততদিন তাহারা বীজরূপ নিভৃত ভাণ্ডারে, ভাবী উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য, খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। মনুষ্যেরাই পুত্রাদি প্রতিপালনের জন্য পরিণামদর্শী হইয়া থাকে; কিন্তু যে

পরিণামদর্শনের বলে উদ্ভিদেরা বীজ পরিপোষণে সমর্থ হয়, তাহার বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে, মনুষ্যের মানসিক শক্তির ঔজ্জ্বল্যও ম্লানমূর্ত্তি ধারণ করে। অনেকে জানেন যে, অণ্ডমধ্যবর্ত্তী কুসুমের চতুর্দ্দিকে যে অণ্ডলাল থাকে, তাহা কুসুমরূপী শাবকের পরিপোষণার্থ নিয়োজিত হয়। ফলের মধ্যবর্ত্তী শাঁস সেইরূপ বীজকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। বৃক্ষের সঞ্চিত ধন বীজের মধ্যে নিহিত হওয়ায় সেই বীজ হইতে যে বৃক্ষ জন্মে তাহারা জীবন-সংগ্রামে স্বাধীনভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারে।

উদ্ভিদ জাতির পরিণাম দর্শিতার আরও একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। প্রতিবর্ষে বৃক্ষের পুরাতন পত্র ঝরিলে নূতন পত্র উদ্গত হয়, ইহা সকলেই জানেন। পত্র সকল ঝরিয়া যাইবার পূর্ব্বেই বৃক্ষেরা ধীরে ধীরে সেই সকল পত্রের ভিতর হইতে সমস্ত আহার্য্য পদার্থ টানিয়া লইয়া দেহের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী অংশে রক্ষা করে। বৃক্ষ সকল পত্র সমূহ হইতে আহার্য্য টানিয়া লইতে আরম্ভ করিলে, পত্রগুলি পীতবর্ণ, ঈষৎ রক্তাভা অথবা ধূসর বর্ণ হইতে থাকে। পত্রের মধ্যে যে সবুজ পদার্থ থাকে তাহার দ্বারাই পত্র-সমূহ বায়ু হইতে উদ্ভিদের পোষণোপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে। যদি সবুজবর্ণ পদার্থ থাকিতে থাকিতে পত্র পড়িয়া যায়, তবে তাহার সহিত তাহার সবুজ রঙ অনর্থক নষ্ট হইবে, এইজন্য বৃক্ষ সমূহ পাকা গৃহিণীর ন্যায় পত্রের ভিতর হইতে সবুজ রঙ টানিয়া লইয়া স্বীয় শরীরের স্থায়ী অংশে রক্ষা করে। বস্তুতঃ মনুষ্যদিগকেও বৃক্ষের নিকট হইতে পরিণামদর্শিতা শিক্ষা করিতে হয়।

পরিণামদর্শিতার দৃষ্টান্ত এখানেই শেষ হইল না। যে বৃক্ষ যেরূপ অবস্থায় থাকে, সে সেইরূপে আত্মরক্ষা করে। প্রয়োজনমতে বীজের অল্পতা বা বহুলতা জন্মে। প্রকৃতির ধ্বংসকারিণী শক্তি সহ্য করিবার জন্য বীজগুলি কঠিন আবরণে পরিবেষ্টিত হয় অথবা এরূপ ভাবে গঠিত হয় যে, তাহাতে বীজের কোন অনিষ্ট হয় না। নারিকেলের গঠন প্রণালী সকলেই দেখিয়াছেন। উহার বীজ অতি দৃঢ় আবরণে আবৃত। নারিকেল সমুদ্রের ধারেই অধিক জন্মে, সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত হইতে তাহার বীজ রক্ষা করা প্রয়োজন; সুতরাং নারিকেল বীজ কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত।

কয়েক প্রকার কপি লইয়া পরীক্ষা

পরীক্ষার স্থল—গোবিন্দপুর কৃষি-ক্ষেত্র ও অন্য চাষীর ক্ষেত্র

চীনা বাঁধা কপি—

ইহা বাঁধে না, শাকের মত ইহার পাতা কাটিয়া খাইতে হয়। গবাদির ইহা প্রিয় খাদ্য। কলিকাতার সন্নিকটে কাশিপুরে ইহার চাষ হইতেছে। ২ ফিট অন্তর সারি ও ১২ ইঞ্চি অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। ১ বিঘা জমিতে ৭০০০ চারা বসান হয়।

বাঁধা কপি

ড্রমহেড— এই কপির ডাল গুলি সুগোল হয়। অন্যান্য কপি অপেক্ষা ইহা নিরেট। সিদ্ধ কিম্বা ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাইতে সুমিষ্ট।

স্যাভয় বা কাফি কপি

এই কপি চেপ্টা ধরনের। শীতের প্রারম্ভ হইতে ইহার চাষ আরম্ভ হয়। সমস্ত শীতকাল এবং শীত অবসান পর্য্যন্ত সমান ভাবে ইহার আবাদ চলিতে থাকে। তুষার পাতে ইহার বিশেষ ক্ষতি হয় না। তুষার গলিয়া যাইবার সময় স্যাভয় কপিগুলি ভালরূপ বাড়িয়া উঠে।

ড্রমহেড ও স্যাভয় এই দুই জাতীয় কপি খুব বড় বড় হয়। গোবিন্দপুর ক্ষেত্রে বর্ত্তমান বর্ষে ড্রমহেড কপি গুলি ওজনে ৮ হইতে ১০ সের, স্যাভয় কপি ৬ হইতে ৮ সের হইয়াছিল। ড্রমহেড, স্যাভয় অপেক্ষা নিরেট সেই জন্য স্যাভয় কপি গুলি আকারে ড্রমহেড অপেক্ষা বড় দেখায় কিন্তু ড্রমহেডগুলি দমে ভারি। বাজারে স্যাভয় কপি লইতে লোকে সহজে আকৃষ্ট হয়। উক্তক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা ভারি ড্রমহেড কপি ওজনে ১৯॥০ সাড়ে উনিশ সের ও স্যাভয় ১৬।০ সোয়া ষোল সের হইয়াছিল। কাশিপুরে প্রেমচাঁদের কপি আরও ভাল হইয়াছে, তাহার ক্ষেতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাঁধা কপির ওজন ২২ সের। তাহার অধিকাংশ কপি ১০।১১ সের হইয়াছিল। প্রেমচাঁদ প্রত্যেক কপি চারাতে ৩ বারে ১ পোয়া খৈল দিয়া থাকে। গোবিন্দপুর ক্ষেত্রে কপিতে বোনসুপার ও সোরা দেওয়া হইয়াছিল। ৩ ভাগ বোনসুপার ১ ভাগ সোরা এই অনুপাতে মিশাইয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় ॥০ অৰ্দ্ধপাউণ্ড হিসাবে (১ পোয়ার কিছু কম) দেওয়া হইয়াছিল। বিগত বর্ষে কপিতে পোকা লাগিয়া বড় ক্ষতি করিয়াছে। প্রেমচাঁদ ও গোবিন্দপুরের অন্যান্য চাষীরা একথা আমাদিগকে জানাইয়াছে। রাত্রে আলো জালিয়া পোকা মারার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমাদের মনে হয় প্রত্যেক বৎসরে নূতন স্থানে বীজতলা করিলে পোকার উপদ্রব বোধ হয় কমিতে পারে।

উচ্ছের গুণাগুণ

কারবেল্লং কঠিল্লং স্যাৎ কারবেল্লী ততো লঘুঃ।
কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্ ॥
জ্বরপিত্তকফাস্রঘ্নং পাণ্ডুমেহক্রিমীন্ হরেৎ।
তদ্‌গুণা কারবেল্লী স্যাদ্বিশেষাদ্দীপনী লঘুঃ ॥

উচ্ছের সংস্কৃত নাম কারবেল্লী। কারবেল্ল ও কঠিল্ল করলার নামান্তর। কারবেল্ল অর্থাৎ করলা আকারে বড় এবং করবেল্লী অর্থাৎ উচ্ছে আকারে ছোট। হিন্দী ভাষায় উচ্ছেকে ছোট করেলী এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লঘু করেলী বলে। উদ্ভিদ্বিদ্যায় ইহা মোমার্ডিকা কারেন্টিয়া (Momardica Charantia) পর্য্যায়ভুক্ত।

যে জমিতে বালির ভাগ অধিক সেই জমিতে উচ্ছে ভালরূপ ফলিতে দেখা যায়। এদেশে অনেক স্থানে কার্ত্তিক মাসে উচ্ছে বীজ বপন করা হয়। কিন্তু একটু চেষ্টা করিলে সকল সময়ে উচ্ছের চাষ করা যাইতে পারে। শ্রাবণ মাসের প্রথমে উচ্ছের বীজ বপন করিয়া প্রচুর ফসল লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। আড়াই হাত অন্তর মাদা কাটিয়া বীজ বুনিতে হয়। প্রত্যেক মাদায় ২।৩টি বীজ রোপন করিলে যথেষ্ট হয়। গাছ একটু বড় হইয়া উঠিলে ডাল পালা আশ্রয় করিয়া দিবে। এক প্রকার হরিদ্রা বর্ণ পোকা উচ্ছে গাছের শত্রু। এই সকল পোকা মধ্যে মধ্যে বাছিয়া মারিয়া না ফেলিলে গাছ সকল নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং সকল পরিশ্রম পণ্ড হয়। হরিদ্রার জল অথবা বাকস পাতার ক্বাথে এ পোকা মরে না। ছাই দিলে কোন ফল হয় না। মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া এবং গাছ উল্টাপাল্টা করিয়া দিলে ভাল হয়।। উচ্ছে একটী ভাল তরকারী। মধ্যে মধ্যে খাইলে শরীরে হিত বৈ অহিত করে না। হরিদ্রাবর্ণ উচ্ছে ফুল গুলি বেশ চক্ষুতৃপ্তিকর। ইহার চাষ করিতে কোন গৃহস্থের অমনোযোগী হওয়া উচিত নহে। আয়ুর্ব্বেদ মতে উচ্ছে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক। চক্র দত্তের মতে উচ্ছে লতার রস হরিদ্রাচুর্ণসহ পান করিলে হাম, বসন্ত ও বিস্ফোটক রোগ আরগ্য হয়। পত্র ও ফলের একই গুণ। ছেলেদের হাম হইলে গৃহিণীরা উচ্ছে পাতার রস ব্যবহার করেন। সুশ্রুত ঋষি বলেন, উচ্ছে লতার কাথ দ্বারা পক্ক ঘৃত বাতরক্তের মহৌষধ। উচ্ছে রক্তপরিষ্কারক। এক প্রকার কীটাণু বাতরক্তের জন্মদাতা। উচ্ছের বীজ উক্ত কীটাণুধ্বংসকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা শীতবীর্য্য, ভেদক, লঘু ও তিক্তরস, উচ্ছে জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্তদোষ, পাণ্ডু মেহ ও কৃমিনাশক। ইহা বাতবৃদ্ধিকারক নহে। উচ্ছে অগ্নিদীপক।

থাইমলের অশেষ গুণ—থাইমলের নাম শুনিয়াছি কিন্তু জিনিষটা কি তাহা আমরা অনেকে জানি না। থাইম (Thyme) নামক এক প্রকার শাক বা মশালার গাছের তৈলাংশ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। অস্ত্র চিকিৎসকগণ ক্ষত যাহাতে বিষাক্ত না হয় তজ্জন্য ইহা ব্যবহার করেন। একমাত্র জর্ম্মণীতে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। যুদ্ধে হাজার হাজার লোক আহত হইতেছে, সুতরাং প্রচুর থাইমলের প্রয়োজন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুষিয়ায় থাইমল দুর্ল্ভ হইয়াছে। থাইমলের জন্মস্থান জর্ম্মণীতেও ইহা দুর্ল্ভ হইয়াছে—যে পদার্থ হইতে থাইমল প্রস্তুত হয় তাহা জর্ম্মণীতে জন্মে না।

এত কাল পরে ইংরেজেরা জানিয়াছেন যে বাঙলা দেশের যোয়ান গাছও থাইমগাছের মত। ইহা হইতেও থাইমল প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাঙলা ভিন্ন আর কোথাও থাইমল জন্মে না। জর্ম্মণ বণিকেরা বাঙলা দেশ হইতে যোয়ান স্বদেশে পাঠাইতেন, তথাকার রসায়নবিদগণ তাহা হইতে থাইমল প্রস্তুত করিতেন। জগতের সমস্ত দেশে তাহা বিক্রয় করিয়া জর্ম্মণ ব্যবসায়ীরা ধনোপার্জ্জন করিতেন।

যোয়ান হইতে থাইমল প্রস্তুত করা অতি সহজ। ইংলণ্ডে সম্প্রতি থাইমল প্রস্তুতের আয়োজন করা হইতেছে। বাঙলী কেন এই নূতন ব্যবসায় ব্রতী হইবে না? আমাদের বেঙ্গল কেমিকেল ও ফার্ম্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস এই ব্যবসায় আরম্ভ করুন, ও অপর দশ জন কে শিক্ষা দিন।

বোরিক কটন—অস্ত্র চিকিৎসায় বোরিক কটন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে তুলার অভাব নাই কিন্তু উৎসাহ উদ্যমের অভাবে কেহ বোরিক কটন তৈয়ারি করে না। ইহার জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, কলিকাতার সুবিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র বোরিক কটন প্রস্তুতের এক কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। শীঘ্রই সেই কারখানার দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করা হইবে।

সিমূল তুলা—বঙ্গে সিমূল তুলার অভাব নাই। ইহা গদি ও বালিস তৈয়ার করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্প্রতি ইহার এক নূতন ব্যবহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডের নৌ-বিভাগ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, নাবিকদের ওয়েষ্টকোট অর্থাৎ সিনাবন্ধের ভিতর সিমূল তুলা দিলে তাহা কর্ক অপেক্ষা হাল্‌কা হয়। নাবিকগণ জলে পড়িলেও জলমগ্ন হয় না। ইহার আর গুণ এই সিমূল তুলা ভরা সিনাবন্ধ পরিধান করিলে বুক বেশ গরম থাকে, ইহার আর এক গুণ এই যে এই তুলা ভরা সিনাবন্ধ পরিলে বন্দুকের গুলি সহজে তাহা ভেদ করিয়া বক্ষস্থলে বিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং সিমূল তুলার আদর খুব বেশী হইয়াছে। ইংলণ্ডের নৌযুদ্ধ বিভাগ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সিমূল তুলার জলে ভাসাইয়া রাখিবার শক্তি কর্ক অপেক্ষা ৫ গুণ বেশী। এক জনের যদি তুলাভরা সিনাবন্ধ থাকে, তবে ২ জন লোক তাহার বলে ২৪ ঘণ্টা কাল জলে ভাসিতে পারে। আমাদের দেশের সিমূল তুলার ব্যবসায়ীগণ এই বিষয়ের তত্ত্বালোচনা করিলে ভবিষ্যতে লাভবান হইবেন।

বঙ্গের শ্রমশিল্প বিদ্যালয়—বঙ্গে জেলাবোর্ডের ব্যয়ে যে সকল শ্রমশিল্প বিদ্যালয় পরিরক্ষিত হইতেছে ১৯১৩-১৪ সনে তাহার সংখ্যা বর্দ্ধিত হয় নাই। মেদনীপুর টেকনিকেল স্কুলের জন্য তথাকার জেলাবোর্ড যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তদনুপাতে তাহার অবস্থোন্নতি ঘটে নাই, এই স্কুলটি ব্যয় বহন করিয়া রক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত কিনা তৎসম্বন্ধে উক্ত বোর্ডের চ্যায়ারম্যান সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বাঁকুড়া জেলাবোর্ড ঐ জিলার একটি শাখা-বয়ন বিদ্যালয়ের জন্য ৩০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; রঙপুর জেলা বোর্ড রঙপুরের বেইলি গোবিন্দলাল টেকনিকেল স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। অনেক জেলা বোর্ড টেকনিকেল স্কলারশিপ ও বিশেষ বৃত্তি দিয়া অনেক ছাত্রকে নিম্নলিখিত বিদ্যালয় সমূহের অধ্যয়ন পরিচালনের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, যথা, শিবপুরের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শ্রীরামপুরের বয়ন বিদ্যালয়, বেলগাছিয়ার ভেটেরিনারি কলেজ, কলিকাতার মুকবধির বিদ্যালয় ও আর্টস্কুল, ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল এবং আরও কয়েকটি বিদ্যালয়। যশোহর ও মালদহের জেলাবোর্ড প্রত্যেকে চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষার্থ একটি করিয়া বালিকাবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

এখন তন্তুবায় শ্রেণীর মধ্যে ঠকঠকি তাঁতের বেশ আদর হইয়াছে। ইহা আজকাল বীরভূম জেলায় বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমাতে ক্রমশঃ ইহার প্রচলন হইতেছে।

মেদিনীপুর জেলার স্বাবং নামক স্থানে যে শিল্প শিক্ষালয় আছে তাহার বেশ ভাল বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রেশমকীট পালন করিলে তাহাতে কত সুবিধা হয় স্থানীয় রেশম ব্যবসায়ীরা এখন ইহা বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

বঙ্গীয় বজেট

দুই বৎসরের মোটামুটি হিসাব এইরূপ,—

১৯১৪-১৫

জমা	...	...	৬,২০,০৬,০০০ টাকা
খরচ	...	...	৬,৫৬,৮৬,০০০ টাকা
উদ্বৃত্ত	...	...	২৮১,৩১,০০০ টাকা।

১৯১৫-১৬

জমা	...	...	৬,১৮,০৭,০০০ টাকা
খরচ	...	...	৬,৫৮,২৯,০০০ টাকা
উদ্বৃত্ত	...	...	২,৪১,০৯,০০০ টাকা।

জমা খরচ মিলাইয়া দেখা যাইতেছে, জমা অপেক্ষা খরচ ১৯১৪-১৯১৫ সালে ৩৬,৮০,০০০ ছত্রিশ লক্ষ আশী হাজার টাকা এবং ১৯১৫-১৬ সালে ৪০,২২,০০০ চল্লিশ লক্ষ বাইশ হাজার টাকা বেশী কিন্তু তাহা হইলেও মূলে অনাটন নাই বরং ১৯১৪-১৫ সালে ২,৮১,৩১,০০০ দুই কোটি একাশী লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা এবং ১৯১৫-১৬ সালে ২,৪১,০৯,০০০ দুই কোটি একচল্লিশ লক্ষ নয় হাজার টাকা থাকিয়া যাইবে। পূর্ব্ব বৎসরের মজুত তহবিল ধরিলেই ইহার কারণ বুঝা যাইবে।

মোটের উপর, বজেট দেখিয়া বুঝা যায় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অবস্থা অস্বচ্ছল নহে। যুদ্ধের জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। দেশের বাহিরে যুদ্ধ হইলে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ক্ষতি হয় না; কারণ এরূপ যুদ্ধে কেবল রেল, খাল ও শুল্ক-বিভাগেরই আয় কমিয়া থাকে,—তাহাতে ক্ষতি হয় ভারত গবর্ণমেণ্টের। শস্যহানি হইলেই প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আয় কমিয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে শস্য ভালই হইয়াছে। আগামী বর্ষেও শস্যহানির তেমন

সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টেরও আয় কমিবে বলিয়া মনে হয় না। এই হিসাবেই বজেটের আয় ধরা হইয়াছে। আয় যদি এইরূপই হয়, তবে, যথা প্রয়োজন খরচ করিয়াও বরাদ্দ মত প্রচুর টাকা তহবিলে মজুত থাকিবে, এই টাকা লইয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট পরবর্ত্তী বৎসরে কাজ আরম্ভ করিতে পারিবেন। তবে, যুদ্ধের জন্য যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে একবারে একটু আঁচও সহিতে হইবে না, এমন কথা বলা যায় না। পাট এখন এদেশের প্রধান ফসল হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; সুতরাং পাটের অবস্থার উপরও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আয় অনেকটা নির্ভর করে। পাট বিক্রয় বন্ধ হইলে কৃষকেরা জমির কর যোগাইয়া উঠিতে পারিবে না। এবার পাটের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে, তাহার টাল সামলাইতেই অনেক কৃষককে বেগ পাইতে হইবে। ইহার উপর আগামী বৎসরেও যদি এইরূপ ঘটে, তবে ব্যাপার যে আরও গুরুতর হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

অমৃতসরে দুর্ভিক্ষ—পঞ্জাব অমৃতসরে দুর্ভিক্ষের আগুন ধু ধু জ্বলিয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীগণ আপাততঃ দশহাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া এক দুর্ভিক্ষ ফণ্ড খুলিয়াছেন। এ বিষয়ে বর্দ্ধমান প্লাবনের সেই দানশৌণ্ড লালা নারায়ণ দাস খান্নার উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। গত ২১শে ফেব্রুয়ারি হইতে অমৃতসরে চারিটী আটার দোকান খোলা হইয়াছে। ঐ সকল দোকানে টাকায় দশসের দরে আটা বিক্রীত হইতেছে—জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেই ঐ সকল দোকানে স্বল্প মূল্যে আটা পাইতেছেন। যে সকল মধ্যশ্রেণীর দুঃষ্টলোক দোকানে আসিয়া আটা ক্রয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন, তাঁহাদের জন্য প্রত্যহ বিশ মণ আটা দ্বারে দ্বারে যোগান হইতেছে। বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র সস্তায় আটা পাইবার ছাড় পত্র পাইয়াছে। তা'ছাড়া অনেক অনাথ আতুরকেও বিনামূল্যে আটা সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত আটার দোকান খোলা থাকে। স্থানীয় অধিবাসীগণ সময় থাকিতে দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য অবহিত হইয়াছেন, ইহা অবশ্য সুসংবাদ সন্দেহ নাই ; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এখনও নীরব।

দুর্ভিক্ষ সংবাদ—অনারেবল নবাব সৈয়দ হোসেন হায়দর চৌধুরী খাঁ বাহাদুর সম্প্রতি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "—এ প্রদেশে বিশেষতঃ ঢাকা ও বাখরগঞ্জ জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে কি না? যদি দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ কি এবং গবর্ণমেণ্ট তাহা রোধ করিবার জন্য কি ব্যবস্থা করিতেছেন।" প্রত্যুত্তরে গবর্ণমেণ্ট পক্ষে অনারেবল মিঃ কার বলেন —"দুর্ভিক্ষের সংবাদ অমূলক, গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে এদেশে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় অনেক জেলায় ধানের ফলন বার আনা রকম হইয়াছে, তবুও গত বৎসর ঠিক এই সময়ে ধানের দর যেরূপ ছিল এবার তাহা অপেক্ষা অনেক সস্তা আছে। তবে গম, দাইল প্রভৃতি কয়েকটী অপ্রধান খাদ্যের দর কিছু চড়িয়াছে বটে কিন্তু তাহাকে দুর্ভিক্ষ বলা যায় না। কর্ত্তৃপক্ষ এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং সহসা বিপদের আশঙ্কাও নাই।" কর্ত্তৃপক্ষ যাহা বলিতেছেন তাহা অভ্রান্ত হইলে আশার কথায় বটে।

বাগানের মাসিক কার্য্য

চৈত্র মাস।

সব্জীবাগান।—উচ্ছে, ঝিঙ্গে, করলা, শসা, লাউ, কুমড় প্রভৃতি দেশী সব্জী চাষের এই সময়। ফাল্গুন মাসে জল পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাষের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতির চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। সেই গুলিতে জল সেচন এখন একটী প্রধান কার্য্য। ঢেঁড়স ও স্কোয়াস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভুট্টা দানা মাসের শেষ করিয়া বসাইলে ভাল হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য অনেক সময় গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। আশু বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদি ফলাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বেগুন বীজ বুনিয়া থাকে।

কৃষিক্ষেত্র।—এই মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে এবং আউশ ধানের ক্ষেত্রে সার ও বাঁশ ঝাড়ে, কলা গাছে ও কোন কোন ফল গাছে এই সময় পাঁকমাটী সার দিতে হয়। এখানে বাঁশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য লোককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। "ফাল্গুনে আগুন, চৈত্রে মাটী, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।" বাঁশের পতিত পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুন দিতে হয়, চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটী দিতে হয় এবং পাকা বাঁশ না হইলে কাটিতে নাই।

এই মাসেই ধঞ্চে, পাট, অরহর, আউশ ধান বুনিতে হয়।—চৈত্রের শেষে ও বৈশাখ মাসের প্রথমে তুলা বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে। কিন্তু নাবী ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান।—শীতকালের বিলাতী মরসুমি ফুলের মরসুম শেষ হইয়া আসিল। শীতেরও শেষ হইল, গোলাপেরও ক্রমে ফুল কমিয়া আসিতেছে; এখন বেল, মল্লিকা, জুঁই ফুটিতেছে। এই ফুলের ক্ষেত্রে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। শীত প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে মিগোনেট, ক্যাণ্ডিটাফ্‌ট, পপি, অ্যাষ্টারসম, ফ্লক্স প্রভৃতি ফুলবীজ এই সময় বপন করা চলে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় সালগম, গাজর, ফুলকপি প্রভৃতি বীজ বপন করা হইতেছে, আলু বসান হইতেছে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্য কোন বিশেষ কার্য্য নাই। জল্দি লিচু যাহা এই সময় পাকিতে পারে, সেই লিচু গাছে জাল দ্বারা ঘিরিতে হইবে।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

পঞ্চদশ খণ্ড,—১২শ সংখ্যা

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্

চৈত্র, ১৩২১

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

KRISHAK

Under the Patronage of the Governments of Bengal and E. B. and Assam.

THE ONLY POPULAR PAPER OF BENGAL

Devoted to Gardening and Agriculture. Subscribed by Agriculturists, Amateur-gardeners, Native and Government States and has the largest circulation.

It reaches 1000 such people who have ample money to buy goods.

Rates of Advertising.

1 Full page Rs. 3-8. 1 Column Rs. 2.

½ Column Rs 1-8

MANAGER—"KRISHAK,"
162, Bowbazar Street, Calcutta.

কৃষি সহায় বা Cultivators' Guide.—
শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী দত্ত M.R.A.S., প্রণীত। মূল্য ॥০ আট আনা। ক্ষেত্র নির্ব্বাচন, বীজ বপনের সময়, সার প্রয়োগ, চারা রোপণ, জল সেচন ইত্যাদি চাষের সকল বিষয় জানা যায়।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাতা।

Sowing Calendar বা বীজ বপনের সময় নিরূপণ পঞ্জিকা—বীজ বপনের সময় ক্ষেত্র নির্ণয়, বীজ বপন প্রণালী, সার প্রয়োগ ক্ষেত্রে জল সেচন বিধি জানা যায়। মূল্য ৵০ দুই আনা। ৵১০ পয়সা টীকিট পাঠাইলে—একখানি পঞ্জিকা পাইবেন

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাতা।

শীতকালের সব্জী ও ফুলবীজ—
দেশী সব্জী বেগুন, ঢেঁড়স, লঙ্কা, মূলা, পাটনাই ফুলকপি, টমাটো, বরবটি, পালমশাক, ডেঙ্গো, প্রভৃতি ১০ রকমে ১ প্যাক ১৷০; ফুলবীজ আমারান্থস, বালসাম, গ্লোব আমারান্থ, সনফ্লাওয়ার, গাঁদা, জিনিয়া, সেলোসিয়া, আইপোমিয়া, কৃষ্ণকলি প্রভৃতি ১০ রকম ফুলবীজ ১৷০;

নাবী—পাহাড়ি বপনের উপযোগী—
বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, বীট ৪ রকমের এক প্যাক ॥০ আট আনা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাতা।

সার !! সার !! সার !!

গুয়ানো

অত্যুৎকৃষ্ট সার। অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়। ফুল ফল, সব্জীর চাষে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। অনেক প্রশংসা পত্র আছে। ছোট টিন মায় মাশুল ॥৵০, বড় টিন মায় মাশুল ১৲ আনা।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কৃষক।

সূচীপত্র।

চৈত্র ১৩২১ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]
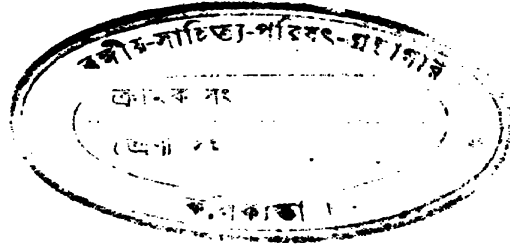
কৃষিশিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিকপত্র

১৫শ খণ্ড। { চৈত্র, ১৩২১ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

গোধন রক্ষা

শ্রীশশি ভূষণ সরকার লিখিত

চাষীর প্রধান সম্বল, গৃহস্থের একটি প্রধান অবলম্বন গোধন কিরূপে রক্ষা হয় তাহা বিশেষরূপে চিন্তা করিবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে। ভারতের কোথাও গবাদির খাদ্যোপযোগী তৃণ শস্যের অভাব কোনকালেই ছিল না। ঘটনা বিপর্য্যয়ে অঘটন ঘটিতেছে, মানুষ গরুর খাদ্য পানীয়ের অভাব দিনের দিন ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর অনুভব করিতেছে। খাদ্য শস্যের দাম চড়িয়া যাইতেছে, বিদেশে অধিকতর রপ্তানি হইতেছে। ভারতের দীন প্রজা অসময়ের জন্য সংস্থান করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। নদী, খাল অনেক বুজিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে কিন্তু তাহার স্থানে কৃত্রিম পয়ঃ প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে, রেল রাস্তা বহুবিস্তার লাভ করিয়াছে। পয়সা থাকিলে দূর দূরান্তর হইতে খাবার জিনিষের যোগান আসিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু পয়সা কোথায়?

দেশের জমিদারগণের দৃষ্টি প্রজারক্ষার দিকে নাই, বরং তাহার প্রতিকুল চলিয়াছে। ব্যবসার পসার বাড়িয়াছে, ব্যবসায় অনেকে ধনকুবের হইতেছে, বিলাসব্যসনে, তাঁহাদের অর্থব্যয় হইতেছে। তাঁহারা আত্মাভিমানে অন্ধ হইয়াছেন, কৃত্রিম আত্ম প্রতিষ্ঠায় তাঁহারা অকাতরে কত পয়সাই না খরচ করেন কিন্তু প্রজাকুল যে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে সেদিকে তাঁহারা ফিরিয়াও চান না।

তাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট, তাঁহাদের দৃষ্টি সামান্য একটু গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। কয়জন জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তি কিরূপে গোবৎসাদি ও মানুষের পানীয় জলের সংস্থান

করিয়া দিবার জন্য জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিতে আজকাল কৃতসঙ্কল্প? কেবল বর্ত্তমান-যুগে সাধারণের হিতার্থে দেউল জাঙ্গাল, রাস্তা ঘাট করিয়া দিতেছেন? গোচরণের জমি-গুলি পর্য্যন্ত অপহৃত হইয়াছে, দরিদ্র কৃষকবৃন্দের গোবৎসাদির চরিবার স্থান এখন কোথায়? খাদ্য পানীয় অভাবে গোধন পালে পালে নিধন হইতেছে। দুর্ব্বল দেহে যে রোগের প্রকোপ অধিক। গরীব চাষীর হালের গরু মরিয়া গেলেই সে উৎসন্ন যাইতে বসিল। নিঃস্বপ্রজার সে ক্ষতি সামলাইয়া লইবার উপায় নাই।

দেশে দেশে যৌথ ঋণদান সমিতি স্থাপিত হইয়া দরিদ্র প্রজাবৃন্দের শুষ্ক প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছে। সেই শুভ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যদি যৌথ পশুবীমা প্রথা প্রতিষ্টিত হয়, তবে বুঝি গোধন রক্ষা হইতে পারে; নতুবা ভারতের গোধন ও প্রজার রক্ষা নাই। এখানে রোগে, মড়কে কি কেবল গোবৎসাদি মরিতেছে, ভারতে যে নিত্য কত গোহত্যা হয় তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইচ্ছা করিলে কি এই অবাধ হনন কতক পরিমাণেও নিবারণ করা যায় না? আমরা রাজদ্বারে গোধন রক্ষার প্রতিকুল প্রথার ভালমন্দ বিচার প্রার্থী।

পশুবীমা কার্য্য কি প্রকারে চলিতে পারে—

পশুবংশ বৃদ্ধি কল্পে দেশে দেশে গোশালা প্রতিষ্ঠিত হউক। পশুকুলের উন্নতি হেতু সেখানে ভাল জাতীয় ষণ্ড প্রতি-পালিত হউক। প্রত্যেক বড় গৃহস্থ, প্রত্যেক বড় চাষী সেখানে পরহিতকল্পে দুই একটি গোবৎস্ প্রেরণ করুক। সে গুলি সাধারণের খরচে সাধারণের জন্য প্রতিপালিত হউক। আবশ্যকানুযায়ী সকলেই সেখান হইতে যৎসামান্য ব্যয়ে হালের গরু, গাড়ীর বলদ, দুগ্ধবতী গাভী পাইবে। শ্রাদ্ধোপলক্ষে বৃষ উৎসর্গ হিন্দুর কি সুন্দর প্রথা ছিল। এখনও বৃষ উৎসর্গ হয়, সেটা কিন্তু বৃষ উৎসর্গের ভাণ মাত্র। কর্ম্মকর্ত্তা বৃষের কিছু মূল্য ধরিয়া দিয়াই খালাস। যার বৎস্ তার ঘরে রহিল। হয় ত সেই বৎস্ না খাইতে পাইয়া মরিল, অথবা হাল টানিতে রহিল, কখন বা হাটে বাজারে বিক্রয় হইয়া কশাইয়ের হাতে পড়িল। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় পরিণাম আর কি হইতে পারে। হিন্দুর ধর্ম্ম এখন বড় আবিল হইয়া পড়িয়াছে কোন রকমে ধর্ম্মের ঠাট্টা বজায় আছে মাত্র। গ্রামে যদি একটা বৃষ সংসঙ্কল্পে প্রতিপালিত হয়, তাহাতে যে গ্রামের কত কল্যাণ, একথা ভাবিয়া দেখিবার কাহারও সময় নাই।

গোশালার সঙ্গে বীমা পদ্ধতি প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই বীমা পদ্ধতির কথা আমরা কৃষকে কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি। গোশালা সংশ্লিষ্ট প্রশস্ত মাঠ ময়দান থাকা চাই। প্রত্যেক কেন্দ্রে কেন্দ্রে অভাব মোচন উপোযোগী যথেষ্ট সংখ্যক গোবৎসাদি প্রতিপালিত হওয়া আবশ্যক। এই সু-মহান্ ব্রতের উদ্যাপন দশের দ্বারা ভিন্ন হইতে পারে না। ধনী নির্ধনী সকলে একযোগ না হইলে হইতে পারে না।
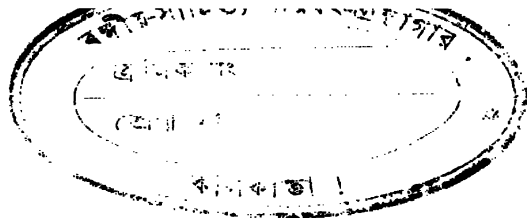
ইহার জন্য যে প্রচুর অর্থের আবশ্যক। দশজনে দিলে অভাব হয় না, এক জনে দিলে কুলায় না। যাহাদের গোবৎস্ আছে, তাহাদেরই ত গোবৎসাদির নিধন আশঙ্কা আছে। মৃত্যু ত কেহ নিবারণ করিতে পারে না এবং মরিলে কেহ বাঁচাইতে পারে না। তবে মানুষে পারে কি যে, মৃত্যুজনিত অভাব মোচন করিতে? তোমার একটি গাভী মরিয়া গেল তোমার গাভীটি যদি বীমা করা থাকে তবে তুমি অচিরে তদনুযায়ী বা তদপেক্ষা ভাল গাভী পাইতে পার। এইরূপে হল-বাহী, ভার-বাহী, শকট-বাহী বলদের অভাব মোচন হইতে পারে। তোমার প্রত্যেক গোবৎসাদির জন্য তুমি বীমা কোম্পানির নিকট কিছু দিয়া যাও, তাহাদেরও সেই অর্থে কাজ চলিবে এবং সময়ে তোমার আবশ্যক মত অভাব মোচন হইবে। কতকগুলি ক্ষুদ্র শক্তি একত্র হইয়া একটা মহান্ শক্তিতে পরিণত হয় এবং তাহার দ্বারা নিশ্চয়ই মহান্ ব্যাপার সাধিত হইতে পারে। ভারতে গো-মড়ক যথেষ্ট আছে। সাধারণতঃ বয়সে ও সামান্য সামান্য রোগে দুইটা দশটা গরু মরার অভাব অতি সহজে মোচন হইতে পারে, কিন্তু মড়কের সময় সামলান দায়। এরূপস্থলে প্রত্যেক গরু প্রতি বীমায় খরচের হার অধিক হয়। গোশালাগুলি এই গ্রামসকল হইতে দূরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। গোশালায় মড়ক না প্রবেশ করিতে পারে। ইহার জন্য কি রকমের আইন কানুন আবশ্যক তাহার বিবরণ দিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গ বাড়াইতে চাহি না। আবশ্যক হইলে তাহার ব্যবস্থা সহজেই হইবে।

প্রথমতঃ যৌথ বীমা পদ্ধতি প্রচলিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যাহাদের কল্যাণে গোশালা প্রতিষ্টিত হইবে তাহারই, অর্থে সামর্থেও গোবৎসাদি দান করিয়া তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবে। ইহাতে প্রথমতঃ রাজা জমিদারগণেরও সাহায্য আবশ্যক হইবে। ব্যবসায়ের জন্যও গোশালা চালান যাইতে পারে। গরীব দেশে সর্ব্বাত্রই এই রকমের ব্যবসা আরম্ভ না করিয়া যৌথ পদ্ধতিতে কার্য্যারম্ভ করাই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। গোপালন, গোশালা সংস্থাপন ও রক্ষা সম্বন্ধে পুস্তকাদির অভাব নাই কিন্তু সব পুস্তকগুলি বিদেশীয়। আমাদের দেশে শাস্ত্রই একমাত্র অবলম্বন। শাস্ত্রবিধি জানিয়া চলিলে আমাদের গোধনের এত দুর্দ্দশা ঘটিত না। পারিপার্শ্বিক ঘটনা পরম্পরা দ্বারা আমাদের শাস্ত্রমত চলার অনেক ব্যাঘাত হইতেছে, সুতরাং আমাদিগকে বৈদেশিক অনুকরণে কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

যৌথ পশুবীমার প্রথা কোথায় নাই? ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, ফ্রান্স, ইটালি, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, বেলজিয়ম, এমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া সকল জায়গায়ই আছে। ফল কথা যেখানে চাষাবাদের উন্নতি হইয়াছে, সেখানেই পশুবীমার প্রচলন হইয়াছে। ঐ সমস্ত দেশে পশুবীমার কত প্রসার তাহা দুই একটা দৃষ্টান্ত দ্বারাই বুঝা যাইবে। বেলজিয়মের মত একটা ছোট দেশে যাহার আয়তন ১১,৩৭৩ বর্গ মাইল তথায় ১৯০৯ সালে ১,১৪২টা পশুবীমা সমিতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল

সমিতির সভ্য সংখ্যা ১০১,৭০৯ জন, বীমাকৃত পশুর সংখ্যা ২৯৪,৫৮৩। ঐ সকল পশুর প্রত্যেকের গড় মূল্য ২০০৲ টাকা। ফ্রান্সে ১৯১০ সালে পশুবীমা সমিতির সংখ্যা ৮,৪২৮, জার্ম্মণিতে ৮,৪০০। যৌথ বীমাসমিতির আরও একটু সুবিধা এই যে, প্রত্যেক সভ্যই পশুকুলের তত্ত্বাবধান করিতে পারেন এবং পশুপালন ও পশুরক্ষা সম্বন্ধে যুক্তি পরামর্শ দিতে পারেন। কার্য্যকরীসঙ্ঘ তাঁহাদের যুক্তি পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করেন এবং তদনুযায়ী নিজেদের কার্য্য নিয়মিত করেন। অনেক দেশে পশুবীমা সমিতিতে গবর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্য করেন। কোন কোন দেশে পশুবীমা করিতে আইন দ্বারা বাধ্য করা হয়।

বীমা পদ্ধতি দ্বারা যদি পশুরক্ষার কোন বিধি ব্যবস্থা এদেশে প্রচলিত হয়, তবে পশু প্রতি বীমার হার কিরূপে ধার্য্য হইবে তাহা বীমাসমিতির লোকে স্থির করিয়া লইতে পারিবেন। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে প্রত্যেক পশুর মূল্যের অনুপাতে বীমার হার নির্ণিত হইবে, নতুবা আর অন্য উপায় নাই। যেখানে বীমাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তথায় বীমার হার মূল্যের অনুপাতে শতকরা ২ হইতে ৩ পর্য্যন্ত হয়। দেশে মড়কাদি উপস্থিত হইলে উক্ত হার ৬ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কোন দেশেই খুব ছোট বাছুরের বা অতি বৃদ্ধ পশুর বীমা হয় না, বোধ হয় তাহা হওয়াও সঙ্গত নহে কিম্বা যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, চৌর্য্য, অগ্নিদাহ, বজ্রাঘাত বা জলপ্লাবনে অথবা হারাইয়া পশু নষ্ট হইলে কোন বীমাকৃত পশুর জন্য অর্থ সাহায্য করা হয় না। এরূপ সাহায্য করিতে হইলে বীমা কোম্পানির দায়িত্ব এত অধিক হয় যে, তাঁহারা সামলাইতে পারেন না এবং এরূপস্থলে বীমার হার এত অধিক করিতে হয়, সেহারে বীমা করিয়া কেহ লাভবান হইবেন, এরূপ আশা থাকে না।

আমরা শুনিতেছি বোম্বায়ে শীঘ্রই পশুবীমার প্রচলন হইবার আয়োজন হইতেছে। সেখানকার কার্য্য দেখিয়া অন্যত্র সেই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা হইবে। কার্য্য দেখিবার জন্য অপেক্ষাই বা কেন? ভাল কাজ সর্ব্বত্রই এক সঙ্গে আরম্ভ করা আরও ভাল। বীমার একটা সাদাসিদা অর্থ এই বুঝা উচিত যে ভবিষ্যতের উপকারার্থে কাহারও নিকট সময় মত কিছু কিছু গচ্ছাইয়া রাখা। ধান গচ্ছাইয়া রাখিলে দরকার মত ধান পাওয়া যায়, গরু বাছুর গচ্ছাইয়া রাখিলে ভবিষ্যতে সে গুলি ফিরিয়া পাওয়া যায় অথবা তৎ-পরিবর্ত্তে অন্য গরু বাছুর পাওয়া যায়। অথবা কিছু কিছু টাকা গচ্ছাইয়া রাখিলে যাহা অভাব হইবে তাহার মোচন হয়। পরস্পর আদানপ্রদান, পরস্পর সাহায্য। কিন্তু লোকে কাহার নিকট গচ্ছিত রাখিতে পারে? যাহার নিকট চাহিলে আবার পাওয়া যাইবে, তাহারই নিকট লোকে অসময়ের জন্য গচ্ছিত রাখে। কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকটও সে সুবিধা হয় না, কেন না সে ত অমর নহে। তাই পাঁচে মিলিয়া কাজ করা। ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু আছে কিন্তু কোন সমিতির মৃত্যু সহজে ঘটে না। যদি গোধন

রক্ষাই আমাদের অভিপ্রায় হয় আমরা প্রথমে একটি সমিতি গঠন করিব। সমিতির গোধনপালনে নিরত হওয়া আশ্বক, এবং সমিতির তদুপযুক্ত জায়গা জমি থাকা আবশ্যক। এইরূপ সমিতির দ্বারা সাধারণ চাষীর বিশেষ উপকার দর্শিবে। প্রত্যেক কাজেই সহযোগিতার আবশ্যক। সাধারণের হিতকামনা, তদ্বিষয়ে অধ্যবসায় এবং কার্য্য-কুশলতা না থাকিলে কোন কার্য্যই সুসম্পাদিত হইতে পারে না। ভারতের গোধন রক্ষা হইলে ভারতের প্রজা রক্ষা হইবে, প্রজা রক্ষা হইলে তবে রাজার রাজ্য রক্ষা। একথা কি আমরা বড় ছোট সকলে প্রত্যহ একবার স্মরণ করিব না এবং সময় পাইলে রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিব না ?

ছোটনাগপুরে আসন্ গাছের গুটীপোকা

শ্রীউপেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী—(গিরিডি)

ছোটনাগপুর বিভাগের জঙ্গল পরিভ্রমণ করিলে, অনেক প্রকার মূল্যবান উৎপন্ন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা স্থানীয় সাঁওতাল, কোল, কাহারেরা, সূক্ষ্ম শিল্পের ব্যবহার না জানিয়া, হিন্দুস্থানি, মাড়ওয়ারি প্রভৃতি ব্যবসায় নিপুণ জাতির নিকট কাঁচা মাল Rough materials রূপে অল্প মূল্যে বিক্রয় করতঃ, যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। আর ব্যবসায় চতুর জাতিরা তাহাই সূক্ষ্ম শিল্পে পরিণত করিয়া, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। আবার ইউরোপবাসীর হাতে পড়িয়া, তাহাই চতুর্গুণ লাভের বস্তু হইয়া উঠে। শিক্ষিত বাঙ্গালী কিন্তু ইহার নাম মাত্রও জানেন না।

১। গিরিডির নিকটস্থ ছোট ছোট পর্ব্বতের জঙ্গলে নানা জাতীয় পাহাড়ীয়া ছোট বড় গাছ আছে। সাঁওতাল জাতি তন্মধ্যে ছোট ছোট কুটীরে বাস করে। এই সকল স্থানে আসন্ নামক এক প্রকার ছোট ছোট গাছ আছে। ইহা দেখিতে কতকটা সরু ধরণের সুন্দরী গাছের মতন্। পাতাগুলিও অনেকটা ঐ গাছের পাতার ন্যায় একটু লম্বা আকার। বর্ষার আনেকটা শেষ হইয়া আসিলে সাঁওতাল্ রমণীগণ নিজ নিজ গৃহ পালিত গুটী পোকার বীজ, ঐ সকল আসন গাছে গাছে বসাইয়া দিয়া, ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত একটু চৌকি দেয় যাহাতে ঐ সকল পলু বা প্রজাপতি জাতীয় গুটী পোকাকে, কোন পক্ষিতে খাইয়া না ফেলে বা বড় হইয়া উড়িয়া না যায়। ৮।১০ দিন পরে, পোকাগুলি বড় হইয়া উঠিয়া আসন্ গাছের কচি কচি পাতা খাইয়া, পক্ষবিশিষ্ট হইয়া গুটী বাঁধিতে আরম্ভ করে। তখন আর উহাদের চৌকি দিবার প্রয়োজন হয় না। ক্রমশঃ আসনের

পাতা খাইয়া, গুটীগুলি বেশ বড় আকার ধারণ করে। এক একটী গাছে ১০।১২টী করিয়া গুটী জন্মায়। সুতরাং ভাদ্র মাসের প্রথমেই পলু বসাইয়া আশ্বিন মাসের শেষেই গুটী ভাঙ্গিয়া লইতে হয়; নতুবা পোকা কাটিয়া উড়িয়া পলায়ন করে।

২। উক্ত রমণীগণ বড়ই পরিশ্রমী। নিজ নিজ আসন ডাল হইতে গুটী সংগ্রহ করিয়া নিকটস্থ সহরের বাজারে হিন্দুস্থানী, মুসলমান প্রভৃতি দোকানদারদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া, অধিকাংশ লোকেই মোটা ধরণের কাপড় বুনানের জন্য সূতা বিনিময় লইয়া থাকে। কেহ বা নগদ টাকাও লয়।

৩। এদেশে, গুটীর ছোট, বড় এবং উজ্জ্বল ও মলিন বর্ণের জন্য প্রতি পণ (৮০টা) ৮৲ টাকা হইতে ১৫।১৬৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হয়। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই মুদী-দিগের নিকট হইতে, বাজার দর অনুসারে কার্পাসের সূতা খরিদ করিয়া, তাহার দ্বারা এক প্রকার অসংস্কৃত ভাবের হস্ত চালিত তাঁতে, কাপড় বুনিয়া, নিজেদের পরিধেয় বস্ত্রের সংস্থান করে, ইহারা মিহি কাপড়ের পক্ষপাতি নহে। নিজেদের লজ্জানিবারণের বস্ত্র নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লয়। তাহারা আমাদের ন্যায় অলস বা পরমুখাপেক্ষী নহে।

৪। সুতরাং আসন গাছে, গুটীপোকা বসাইবার পূর্ব্বে, উহাদের দরকার মত সূতার দাদন দিতে পারিলে, বাজার দরের উপর, অনেক "বলন্" বা বেশী গুটী দিয়া থাকে। ঐ সকল ক্রেতা দোকানদারেরা, পুনরায় ঐ গুটী আবার বীরভূম, বাঁকুড়া মালদাহ, মুর্শীদাবাদ, প্রভৃতি স্থানের রেশমব্যবসায়ী শিল্পীদের নিকট ৫৲ হইতে ১০৲ টাকা হার কুড়িধরণে বিক্রয় করিয়া বেশ লাভ করে। পরে, ঐ সকল শিল্পীরা ঐ গুটী হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট তসর, মট্‌কা, চেলি, গরদের চাদর, ইত্যাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম শিল্পবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। পূর্ব্বে এদেশে রেশমের কাজটী বড়ই প্রচলিত ছিল। তখন গুটীপোকার চাষ, অধিকাংশ লোকেই করিত। এখন নানা কারণে তাহা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কেবল মুর্শীদাবাদ, জঙ্গীপুর প্রভৃতি স্থানেই তুতের চাষ ও ভাল রেশমের কারবার এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তুতের পাতা খাইয়া যে রেশম প্রস্তুত হয় তাহাই বেশ উজ্জ্বল চাক্‌চিক্যশালী, এবং নরম রেশম হয়। আর আসন্ ইত্যাদি গাছের পাতা খাইয়া যে রেশম প্রস্তুত করে তাহা একটু ময়লা সূত্র প্রস্তুত করে বলিয়া তাহা হইতে তসর ও মট্‌কা কাপড় তৈয়ারি হয়। পলুপোকা একই বলিয়া বোধ হয়।

ছোট নাগপুরে হরিতকী—

৫। ছোট নাগপুরে গুটীপোকার চাষ করিতে গেলে আর একটি জিনিষের দিকে নজর পড়ে। ইহা অরণ্য জাত হরিতকী। এই সকল স্থানে হরিতকীও প্রচুর পরিমাণে জন্মে ও পাওয়া যায়। ইহা ফাল্গুন চৈত্র মাসে পাকিয়া

ঝরিয়া পড়ে। তাহাই কুড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত সাঁওতাল রমণীরা নিকটস্থ গিরিডি প্রভৃতির বাজারে ১৲ হইতে ১॥০ টাকা হারে বিক্রয় করিয়া যায়। তাহাই আবার স্থানীয় মুদী দোকানদারেরা কলিকাতা এবং অন্যান্য বড় বড় সহরে চালান দেয়। হরিতকীর গুণ অশেষ—যথা—

কোষ্ঠ পরিষ্কারক, তিক্তাস্বাদ নিবারক, কষায়ক, মৃদুবিরেচক ইত্যাদি। ইহা হইতে কবিরাজ মহাশয়েরা, নানাবিধ মোরব্বা, সিরাপ এবং অন্যান্য ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

মাছের ব্যবসায়—

৬। ছোটনাগপুর ডিভিসান মধ্যে আর একটী ব্যবসা খুব ভালই চলিতে পারে। মাছ বাঙ্গালীর একটি প্রধান খাদ্য। মাছ না হইলে অধিকাংশ বাঙ্গালীর ভাত খাওয়াই হয় না। অনেক লোক উৎকৃষ্ট মাছের ব্যঞ্জন পাইলেই ঘৃতদুগ্ধ পর্য্যন্তও চাহে না। বাঙ্গালীজাতি মাছমাংসভোজী বলিয়া এতদূর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। বিশেষতঃ সর্ব্বপ্রকার চিংড়ী মাছে ফস্ফরাস (Phosphorus), পদার্থ অধিক থাকায় এই জাতি সাধারণতঃ এত চতুর ও বুদ্ধিমান। এইসকল দেশে আজকাল বিস্তার বঙ্গালী নানা কাজে এবং সাস্থ্যকর জলবায়ুহেতু বাস করেন। কিন্তু এদেশে মাছের বড়ই অভাব হেতু অধিকাংশ লোকেই বড় কষ্ট বোধ করেন। এজন্য যদি কোন পরিশ্রমী ও কর্ম্মপটু বাঙ্গালী, মুঙ্গের ভাগলপুরের গঙ্গা এবং তৎপার্শ্বস্থ খাড়ি হইতে স্বল্প মূল্যে মাছ খরিদ করিয়া গিরিডি, মধুপুর, শিমূলতলা, দেওঘর, সিতারামপুর, জামতাড়া, ঝরিয়া, ধানবাদ প্রভৃতি স্থানে প্রত্যহ ভোরের ট্রেণে, বাক্সবন্দী করিয়া মাছের চালান্ দেয়, তবে বেশ দুই পয়সা লাভ হইতে পারে। এতদঞ্চলে হাট বাজারে মাছ তরকারী ভিন্ন অন্যান্য অবশ্যকীয় বস্তু, অনেক পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশের ন্যায়, যদিও এদেশের নদীতে নানাবিধ মৎস্য পাওয়া যায় না কিন্তু রোহিত, কাতল, রেওয়া ইত্যাদি উৎকৃষ্ট জাতীয় মাছও বেশী পরিমাণে মিলে। আর গঙ্গা, দামোদর, বরাকর, নদীতেই ইহাদের পোনা জন্মে। এদিকে অতি তুচ্ছ গড়ুই বা ছোট ছোট চেং মাছের প্রতিসের ।৵০, ।৶০ আনার এক কপর্দ্দকও কম নহে। ইহা অতি ক্ষুদ্র, এবং তাহাও কদাচিত মিলে। রোহিতাদির সের ৸৵০, ১৲ টাকা হারে বিক্রয় হয়। তাহাও সর্ব্বদা মিলে না।

৭। পূর্ব্বে এদেশীয় হিন্দুস্থানীরা মাছ খাইত না। কিন্তু বঙ্গালীদের দেখা দেখি উহারাও খাইতে শিখিয়াছে। সুতরাং এই প্রধান খাদ্যটীরও বড়ই অভাব হইয়াছে।

বিশেষতঃ বর্ষাকালে যখন অধিকাংশ মৎস্যই ডিম ছাড়ে, তখন যদি সেই ডিম্ব স্রোতের অনুকূলে ভাসিয়া যাইয়া, খাড়ি বা খালাদি স্থির জলের মধ্যে, যাইয়া, ডিম ফুটিয়া পোনা জন্মাইতে পারে। তবেই নদীময় বড় বড় মাছে পূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে

বড় বড় বাষ্পীয় পোত, সর্ব্বদা এদেশীয় নদ নদীতে প্রবল বেগে যাতায়াত করাতে, ঐ সকল সদ্যপ্রসূত ডিমের ঝাঁক্ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কাটিয়া যাওয়ায় তাহা হইতে প্রায়ই পোনা জন্মাইতে পায় না। সুতরাং নদীতে মাছের ভাগও অতি কম হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে খাদকের সংখ্যাও অধিক হইয়া পড়িয়াছে।

মৎস্য রক্ষা।—

৮। অধিক দূর হইতে মাছের চালান দিতে গেলে উহাকে যত দূর পারা যায় টাট্‌কা অবস্থায় রাখা চাই। এজন্য টাট্‌কা মাছকে চালান দিবার পূর্ব্বে পেট্‌টা চিরিয়া, পচনশীল নাড়ীগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া কিঞ্চিত লবণ হলুদ মিশান জলে চুবাইয়া, বরফ দিয়া, বাক্সবন্দী করতঃ চালান দিতে হয়। তাহা হইলে মাছ পচে না। প্রায় টাট্‌কা অবস্থায় ক্রেতার হাতে আসিয়া পড়ে। বিশেষতঃ কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত মাছের চালান দিলে, বেশ দুই পয়সা লাভ হয়। শীতকাল ছাড়া, অন্য সময়েও এইভাবে মাছের চালানে দস্তরমত কারবার চলে ও লোকের উপায় হইতে পারে।

শৃঙ্গাটক ও শঠীর পালো

স্বর্ণ প্রসবিণী ভারত ভূমিতে কোটী কোটী মণ শ্বেত সার বা পালো প্রস্তুত হইতে পারে, এরূপ বহুপ্রকার উদ্ভিদ ও তজ্জাত পদার্থ স্বভাবতঃই জন্মিতেছে, এবং আমাদেরও অযত্নে বর্দ্ধিত হইয়া মরিয়া যাইতেছে। কত কোটী কোটী টাকার জিনিষ প্রতি বৎসর মাটীতে জন্মিয়া মাটী হইয়া যাইতেছে, এ দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত কেহই তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান লয়েন না। কৃষির উপর অযথা ঘৃণাবশতঃ কৃষিকার্য্যে লিপ্ত না থাকাই ইহার মুখ্য কারণ। যাহাহউক শৃঙ্গাটক ও শঠী এই দুইটী অনায়াস লভ্য পদার্থ হইতে পালো প্রস্তুত করিতে পারিলে যে একটী ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বহুদিনের কথা বলিয়া স্মরণ হইতেছে, তখন অকাল মৃত্যুর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার জন্য বঙ্গদেশবাসীর গৃহে সন্তান জন্মিত না। তৎকালে প্রসূতির বুকের দুধ বর্দ্ধিত করিবার জন্য ঔষধ প্রয়োগেরও ব্যবস্থা ছিল না। মাতৃস্তন্যে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ছিল, তখন প্রত্যেক গৃহস্থের গোয়ালে দুগ্ধবতী গাভী থাকিত। গো পালন হিন্দু মাত্রেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত, গোচারণ মাঠ ছিল, মাঠে ঘাসের অভাব হইত না। মরাই ভরা ধান্য ছিল, পুকুর ভরা মাছ ছিল, সুতরাং গোদুগ্ধের অভাব কল্পনার অতীত ছিল। সে সময়ে টীনের কৌটা ভরা এরারুট, বার্লি, করণফ্লাওয়ার ও জমাট দুগ্ধ প্রভৃতির নামও এদেশবাসীর অজ্ঞাত ছিল, তখন কোন প্রকার খাদ্যেরই অভাব

ছিল না, শিশু-খাদ্যের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইত না। সেই যুগে রুগ্ন শিশুর জন্য স্থলে ছিল "শঠী", আর জলে "শৃঙ্গাটক"। এই দুইটি অতি সুলভ ও সহজলভ্য জিনিসের পথ্য স্বরূপ ব্যবহার প্রথা এতদ্দেশে বহুদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ অযত্ন সম্ভূত উল্লিখিত পদার্থ দুইটী, গুণে রুগ্ন শিশুর পক্ষে অমৃত তুল্য সুখাদ্য, রোগ নাশক ও সহজ পাচ্য। আজকাল মাতৃস্তন্যেও দুগ্ধ নাই, খাঁটী গোদুগ্ধও এক প্রকার আভিধানিক শব্দ হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই বাঙ্গালীর ঘরে সুস্থ ও সবল শিশু খুব কম, একমাত্র খাদ্যের অভাব ও কুখাদ্য গ্রহণের ফলেই বঙ্গদেশে যে শিশুগণ দিন দিনই রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত ও স্বীকার্য্য। এদেশে শিশু খাদ্য নাই এ কথা বলা যায় না, তবে আজকাল বাজারে শিশু খাদ্যের নামে যে সব বার্লি, এরোরুট, জামট দুগ্ধ প্রভৃতি বিক্রয় হয়, তাহা কি খাঁটী পাওয়া যায়? কতই ভেজাল মিশ্রিত হইয়া সুস্থ ও সবল শিশুর পক্ষে বরং অখাদ্যই হইয়া পড়ে।

যে দেশে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার শঠীমূল বা প্রকৃত শিশু খাদ্য স্বতঃই জন্মিতেছে এবং মাটীতে জন্মিয়া মাটী হইয়া যাইতেছে, মাটীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে, যে দেশে অসংখ্য অব্যবহার্য্য খাল, বিল, ডোবা, পুকুর প্রভৃতি জলাশয় নানারূপ জলজ উদ্ভিদ এবং পানা প্রভৃতিতে আবৃত রহিয়া স্বীয় স্বীয় বৃথা জন্মের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনের দুঃখেই যেন মৃতপ্রায়, ভরাট হইয়া যাইতেছে, সেই দেশে শিশু খাদ্যের অভাব আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও মিথ্যা নহে। শিশু খাদ্যের অভাব সর্ব্বত্র। এই অভাব দূর করিবার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া চাষ করিবার প্রয়োজন হয় না। বহু অর্থ ব্যয়েরও আবশ্যক হয় না, চাই শুধু অভাব বোধ। অভাব বোধের আবশ্যক, জন্মিলেই তাহা দূর করিবার বাসনা স্বাভাবিক। ঘরে ঘরে অকাল মৃত্যুর ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে, তথাপি অভাব বোধ হইতেছে না, বাঙ্গালীর উদাসীনতাই ইহার কারণ।

"শৃঙ্গাটকং জল ফলং ত্রিকোণ যানমিত্যপি।
শৃঙ্গাটকং হিমং স্বাদু গুরু বৃষ্যং কষায়কম্।
গ্রাহি শুক্রানিল শ্লেষ্মপ্রদং পিত্তাপ্রদাহমুৎ।

শৃঙ্গাটক, জল ফল ও ত্রিকোণ ফল এই কয়েকটিই ইহার সংস্কৃত নাম। শৃঙ্গাটক শীতবীর্য্য, স্বাদু, কষায় মধুর রস, গুরু, পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, বায়ু বর্দ্ধক ও কফ কারক। ইহা পিত্ত, রক্ত দোষ দাহ নাশক। এতগুলি গুণসম্পন্ন বলিয়াই প্রাচীনকালে কবিরাজেরা অতিসার এবং আমাশয় প্রভৃতি রোগে প্রায়ই শৃঙ্গাটকের পালো একমাত্র পথ্য স্বরূপ ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিতেন। শৃঙ্গাটক ও জল ফল নাম দেশের অপরিচিত হইলেও উহার অপভ্রংশ শিঙ্গারা বা পানিফল সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। শৃঙ্গাটকের অপভ্রংশে শিঙ্গারা হওয়া অসঙ্গত নহে। কিন্তু জল ফলের অপভ্রংশ পানিফল যে কিরূপে

সিদ্ধ হইতে হইতে পারে, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। অনেকের অনুমান এই নামটি মুসলমান রাজত্বকালে রূপান্তরিত হইয়াছে।

অনেকেই শিঙ্গারার আস্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু ইহার গুণাবলীর বিষয় অত্যল্প সংখ্যক লোকেই অবগত আছেন। এই অযত্ন প্রসূত ফলের দ্বারা যে এদেশের একটী বিশেষ অভাব অনেকাংশেই দূর হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে সহসা প্রবৃত্তি হয় কি? একদিন যে জিনিষের বড় আদর ছিল, তাহার পরিচয় পাইলে ভবিষ্যতেও যে আবার আদর হইবে না কে বলিতে পারে? অব্যবহার্য্য হ্রদ, খাল, বিল, ডোবা, পুকুর, জলা প্রভৃতি জলাশয় মাত্রেই পানিফল জন্মিয়া থাকে এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যেই ইহার গাছ দ্বারা পূর্ণ হয়। কর্দ্দম বহুল নিশ্চল জলাশয়ের মধ্যে যেগুলিতে বারমাসই জল থাকে, সেই সমুদয় জলাশয়ে একবার বীজ রোপণ করিলেই হইল। যে সকল স্থানে কেবল বর্ষার সময়ই জল থাকে, ঐ সকল স্থানে বর্ষার জল জমিলেই বীজ ছড়াইতে হইবে। মাঘ মাসে এক একটী শিঙ্গারা পায়ের নীচে চাপিয়া পুতিতে হয়। এক মাসের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং অল্প দিনের মধ্যেই জলের উপর গাছ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কম জলেই ইহার ফলন বেশী হয়। ফল সংগ্রহ করিবার পর গাছগুলি পাতলা ভাবে রাখিয়া অবশিষ্টগুলি উঠাইয়া লইয়া স্থানান্তরে জলাশয়ে ফেলিয়া দিতে হয়, এইভাবে ফেলিয়া দিলেও গাছগুলি ক্রমশঃ সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়া জলাশয়টি পূর্ণ করিয়া ফেলে। মাঘ মাসে রোপণ করিলে কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে গাছের ফল সুপুষ্ট ও সুপক্ক হইতে থাকে। এই সময় ফলগুলি সংগ্রহ করিতে হয়। শিঙ্গারা কাঁচা খাইতেও বেশ লাগে। পালো প্রস্তুত করিতে হইলে ফলগুলি শুষ্ক করিয়া রাখিতে হইবে। ইহার পালো প্রস্তুত প্রণালী খুব সহজ। শুষ্ক ফলের খোসা ছাড়াইয়া তাহা উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া লইলেই পালো প্রস্তুত হইল। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ পালো প্রস্তুত করিতে হইলে, আরও একটু পরিশ্রম করিতে হয় অর্থাৎ উক্ত পালোগুলি কোন জলপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া উহা বারম্বার উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইতে হয়। শিঙ্গারার পালো হইতে অনেক উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে। এই পালোতে প্রস্তুত লুচি, হালুয়া, জিলাপি, বালুসই প্রভৃতি যেমন সুস্বাদ তেমনই লঘুপাক ও উপাদেয়। শিঙ্গারার পালো প্রস্তুত করিতে পারিলে প্রকৃত শিশু খাদ্যের অভাব যে বিদূরিত হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্যবসায়ের হিসাবে না হউক, শিশু খাদ্যের হিসাবেও যদি গৃহস্থগণ তাহাদের হাজাবুজা ডোবা পুকুরগুলিতে শিঙ্গারার চাষ করেন, তাহাহইলে শিশুর অকাল মৃত্যুর সংখ্যা যে অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে তাহা নিঃসন্দেহ। স্মরণ রাখিবেন, বর্ত্তমান সময়ে জলে শৃঙ্গাটক ও স্থলে শঠি এই দুইটীই চাষ বঙ্গীয় শিশুর জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। এক্ষণে শঠীর পালো সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

শঠির সংস্কৃত নাম যথা,—

"শঠী পলাশী ষড় গ্রন্থা সুব্রতা গন্ধ মূলিকা। গন্ধারিকা গন্ধবধূ বধূঃ পৃথু পলাশীকা। ভবেদ গন্ধ পলাশীতু কষয়া গ্রহণী লঘুঃ। তিক্তা তীক্ষ্ণাচ কটুকা সোষ্ণাস্য মল নাশিণী॥ শোথ কাস ব্রণ শ্বাস শূলা শ্মান গ্রহা পহ্ম। নির্গন্ধ গুণতে ন্যাশ ক্রিমিকুষ্ঠ বিনাদিনী॥"

(পদার্থ চিন্তামণি)।

অর্থাৎ পলাশী, ষড় গ্রন্থা, সুব্রতা, গন্ধ মূলিকা, গন্ধারিকা, গন্ধবধূ, বধূ, পৃথু ও পলাশীকা এইগুলি নাম আছে। অনেক বৃদ্ধ লোকের মুখে শুনিয়াছি, তাহারাও তাহাদের বৃদ্ধ পিতা পিতামহ প্রভৃতির নিকট শঠী হইতে আবির প্রস্তুতের কথা শুনিয়া আসিতেছেন। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সস্তা এরোরুট আমদানি হওয়ার পূর্ব্বে শঠীর পালো হইতেই আবির প্রস্তুত হইত।

শঠী হইতে পালো প্রস্তুত করা বিশেষ কষ্টকর বা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নহে। শীতের প্রারম্ভেই শঠী গাছগুলি বিবর্ণ হইয়া যায় ও মরিতে আরম্ভ করে। ইহাই পালো প্রস্তুত করিবার প্রসস্ত সময়। শঠীর মূলগুলি কোদালী দ্বারা কোবাইয়া মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে তুলিয়া লইতে হয়। মূল উঠাইবার পর তৎসংলগ্ন শিকড়গুলি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। অনন্তর শঠী মূলগুলিকে পরিষ্কাররূপে ধৌত করিয়া তদুপরিস্থ মৃত্তিকা ও শুষ্ক বাকল প্রভৃতি পৃথক করিয়া ফেলিতে হইবে। কার্য্য সৌকর্য্যার্থে শিকড় কাটার পর মূলগুলিকে একটী পাত্রে বা ঝাঁকায় করিয়া কোন জলাশয়ে অন্ততঃ ৩।৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখার পর একটী লোক তাহার উপর দাঁড়াইয়া মাড়াইতে থাকিবে এবং তদুপরে অল্প জল সেচিয়া দিবে। এইপ্রকারে উপরিস্থ শুষ্ক বাকল ও কাদামাটী ইত্যাদি ধুইয়া গিয়া মূলগুলি বেশ পরিষ্কার হইবে। তৎপরে ঢেঁকিতে কুটিয়া বা শিল নোড়ায় বাটিয়া বা অন্য কোন উপায়ে শঠী কুটিয়া লইতে হইবে। অথবা একখানি সমচতুষ্কোণ টীনের পাতে ঘন ভাবে ছিদ্র করিয়া লইয়া এক একখানি শঠী মূল উহার উপর ঘর্ষণ করিলে করাতের গুড়ার ন্যায় সূক্ষ্ম ভাবে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। কুট্টিত শঠীগুলি কোন একটা পাত্রে রাখিয়া উহাতে জল ঢালিয়া রগড়াইবে। পরে একখানি কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া উদ্ভিদাংশ ও শ্বেতসার পৃথক করিবে। এইরূপে ইহার শ্বেতসার অংশ তলদেশে বসিয়া গেলে উপরের জল আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিবে। পৃথকীকৃত পালো বারংবার পরিষ্কার জলে ধুইয়া লইতে পারিলেই বেশ শাদা পরিষ্কার পালো পাওয়া যাইবে এবং ইহাই চলনসই পালো প্রস্তুত হইল।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত—মালদহ।

সাময়িক কৃষি সংবাদ

চিনা-কপি—

আসামে ইহাকে "নেপালি লাই" বলে। ইহা বাঁধা-কপির ন্যায় একটী শাক; বাঙ্গালা দেশের কোন কোন জেলে ইহার চাষ হইয়া থাকে। গবাদি জন্তুকে খাওয়াইবার পক্ষেও ইহা উপযোগী। গতবৎসর খুলনা জিলায় ঘাটভোগ নামক স্থানে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিঘা প্রতি ১১৭ মণ চিনা-কপি জন্মাইয়াছিলেন। কটকেও উহা খুব ভাল জন্মিয়াছিল।

পাট কাটিবার উপযুক্ত সময়—

বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ বলেন যে, পাট যত দেরী করিয়া কাটা যায়, উহার ফলন ততই বেশী হয়। অধিকন্তু গাছের ফুল বাহির হইলেই হউক, আর বীজ পাকিলেই হইক, যে অবস্থাতেই গাছ কাটা যাউক না কেন, উহার সূতার (অর্থাৎ পাটের) গুণের বড় একটা তারতম্য হয় না।

ধান রোপণ করিবার প্রণালী—

বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ বলেন যে, আমন ধানের চাষে ক্ষেত্রে ১২ ইঞ্চি অন্তর একটী মাত্র ধানের চারা লাগাইলে যেরূপ শস্য উৎপন্ন হয়, গোছা (অর্থাৎ একস্থানে কতকগুলি) করিয়া ঘন ঘন চারা লাগাইলে সেরূপ হয় না। একটী করিয়া লাগাইতে হইলে চারা গাছগুলি বাছিয়া লইতে হয়। বাঙ্গালা দেশের কোন কোন স্থানে একটী করিয়া ধানের চারা গাছ লাগাইবার প্রথা আছে। উর্ব্বরা মাটীতে ও উপযুক্ত সময়ে ধান রোপণ করিলে চারা হইতে ফেঁকড়ি বাহির হইয়া ঝাড় বাঁধিতে পারে; কিন্তু অনুর্ব্বরা জমিতে অথবা দেরী করিয়া ধান রোয়া হইলে, চারা গাছ বাড়িতে পারে না; সুতরাং সে স্থলে একটী করিয়া চারা লাগাইলে অভিপ্রেত ফল পাইবার আশা কম।

পাটের পরে রোয়া আমন ধান অথবা গোল আলু—

বঙ্গপ্রদেশের কৃষি-বিভাগ বর্দ্ধমান কৃষি-ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে পাটের পরে রোয়া আমন ধান অথবা আলু উত্তম জন্মিতে পারে। পাটের পরে ধান দিতে হইলে, পাটে বিঘা প্রতি ৪৫ মণ গোবর দিলে ভাল হয়, ধানে কোন সার দিবার দরকার হয় না। আর পাটের পরে আলু লাগাইতে হইলে পাটে সার না দিয়া, আলুতে সার দিলে ভাল হয়, এরূপস্থলে আলুতে বিঘা প্রতি নিম্নলিখিত সার দিয়া উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে—

(ক) ৮০ মণ গোবর; অথবা (খ) সাড়ে সাত মণ রেড়ীর খৈল;
অথবা (গ) ৬৭ মণ গোবরের সহিত ১ মণ সুপার ও ১ মণ সোরা।

আলু উঠিয়া গেলে, পরে যথাসময়ে ঐ জমিতে পাট বুনিলে, উহার জন্য আর সারের প্রয়োজন হয় না।

গো-মহিষাদির খাদ্যোপযোগী শস্য
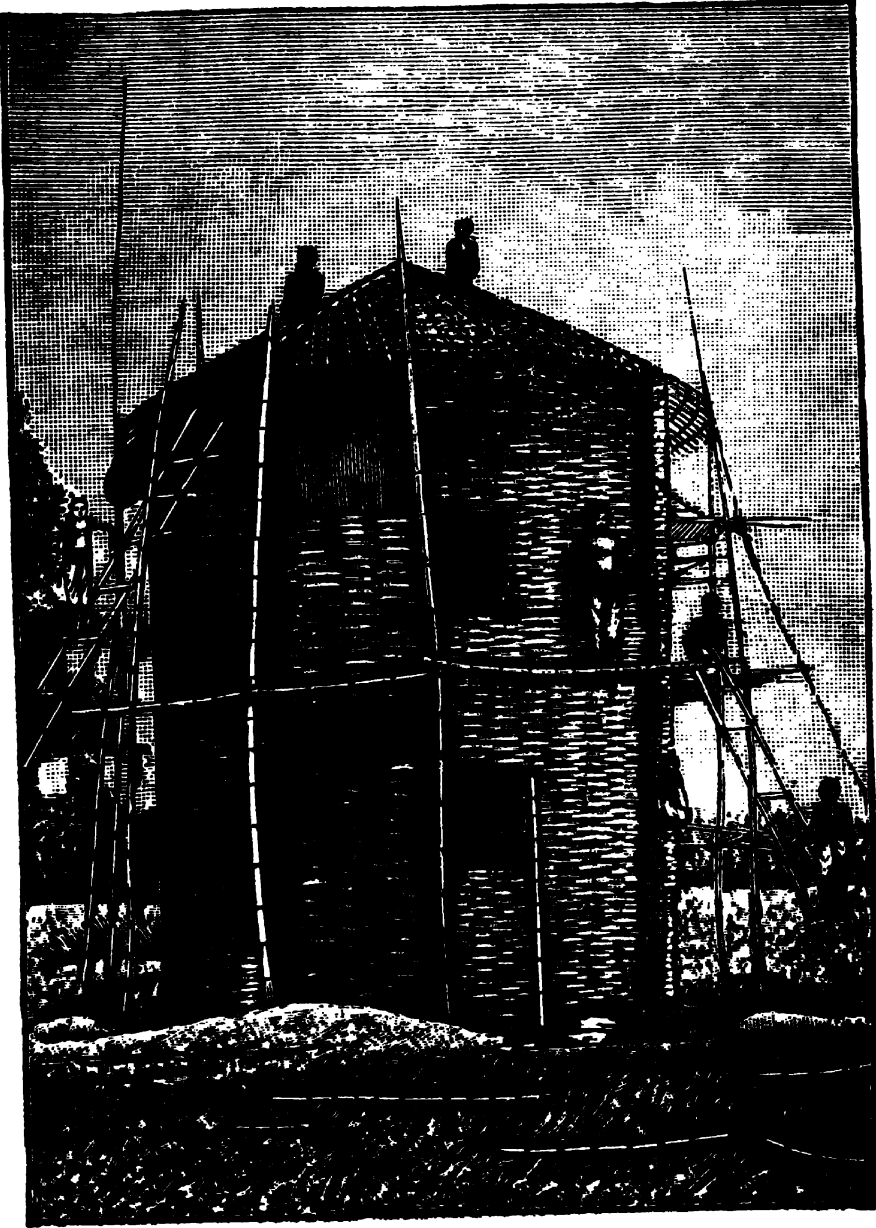
সাইলো (Silo) বা পশুখাদ্যের গোলা

আমাদের দেশের অনেক স্থানে লোকসংখ্যা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে আবাদের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে বড়িয়া এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, গরু বাছুরের চরিবার স্থান নাই, বা থাকিলে এত কম যে, শুধু চরানির উপর গরুবাছুর পোষা অসম্ভব হইয়াছে। এরূপ স্থলে গো মহিষাদির খাইবার উপযোগী শস্য জন্মান নিতান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অনেক প্রকার শস্য আছে ইহাদের মধ্যে আমাদের দেশের পক্ষে জোয়ার

নামক শস্যই উৎকৃষ্ট। রাজসাহী ও মুরশীদাবাদের স্থানে স্থানে গোমহিষাদির জন্য এই ফসলের আবাদ হইয়া থাকে; সেখানে জোয়ারকে গ্যামা বলে। আমাদের দেশে জোয়ারকে স্থানে স্থানে দেওধান বলে। কেহ কেহ খৈ তৈয়ারী করিয়া খাইবার জন্য বাড়ীর কাছে কিছু কিছু দেওধান লাগাইয়া থাকে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে জোয়ারের দানা মানুষের প্রধান খাদ্য, ও উহার ডাঁটা কাঁচা অবস্থায় অথবা শুকাইয়া গরুবাছুরকে খাওয়ান হয়। এই শস্যের চাষ আমাদের দেশে প্রচলিত হইলে গো মহিষাদি পালন করিবার বড়ই সুবিধা হইতে পারে। বিশেষতঃ যেখানে চরাণিমাঠের অভাব হইয়াছে, সেখানে ইহার আবাদ প্রচলিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

জোয়ার বর্ষাকালে হয়। আউষ ধানের উপযোগী উঁচু মাটিতে ইহা উত্তম জন্মিতে পারে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ বুনিতে হয়। আউষ ধানের জন্য জমি যেরূপ ভাবে তৈয়ারি করিতে হয়, ইহার জন্যও সেইরূপ করিলে চলে। এক বিঘা জমিতে ৪ সের বীজের দরকার। বুনিবার পরে জমিতে আর হাত দিতে হয় না। ৪।৫ সপ্তাহের ভিতর গাছ এত ঘন হইয়া উঠে, যে মাটী দেখা যায় না ও উহার ভিতর কোন আগাছাও জন্মিতে পারে না। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জোয়ার পাকে। ভাদ্র বা আশ্বিন মাস হইতে জোয়ারের গাছ কাঁচা কাটিয়া গো মহিষাদিকে খাওয়ান যায়, পরে পাকিয়া গেলে উহা শুকাইয়া রাখিলে শীত ও গ্রীষ্মকালে দরকার মত গরুবাছুরকে খাওয়ান যাইতে পারে। এক বিঘা জমি হইতে ডাঁটাপাত লইয়া ৭০।৮০ মণ কাঁচা ঘাস পাওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক গরুকে গড়ে ২০ সের জোয়ার দিলে এক বিঘা জমির উৎপন্ন ঘাস দ্বারা একটী গরু ৪।৫ মাস পালন করা যাইতে পারে। শুষ্ক জোয়ার দা দিয়া বিচালির মত ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া দিতে হয়। কাঁচা জোয়ারও কাটিয়া দিলে ভাল হয়। ফুল বাহির হইবার পূর্ব্বে জোয়ার গরুবাছুরকে দিতে নাই; কারণ নিতান্ত কাঁচা অবস্থায় জোয়ারের গাছে কখন কখন একরূপ বিষাক্ত পদার্থ জন্মে যে, উহাতে গবাদির অনিষ্ট হইতে পারে। যদি কোন গরু জোয়ার খইয়া বিষের লক্ষণ দেখায়, তাহাহইলে উহাকে তৎক্ষণাৎ অনেকটা দুধ পান করাইয়া দিবে; দুধ না পাইলে জলে গুড় গুলিয়া উহাকে খাওয়াইয়া দিবে। ইহাতে বিষ কাটিয়া যাইবে।

জোয়ার ছাড়া আরও নানাবিধ শস্য আছে যাহা গোমহিষাদির জন্য জন্মান যাইতে পারে। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় যে সকল স্থান বন্যায় ডুবিয়া যায়, সে সকল স্থানের কৃষকেরা খলিয়া ঘাস নামে এক প্রকার নলজাতীয় ঘাস নদীর চরে রোপণ করে। বর্ষাকালে ইহা বাড়িয়া জলের উপরে উঠে, তখন অন্য ঘাস পাওয়া যায় না; লোকে ঐ ঘাস কাটিয়া আনিয়া গরুকে খাওয়ায়। মটর, খেঁসারি, বরবটী প্রভৃতি ডাইলের গাছ গোমহিষাদির বিশেষতঃ গাভীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী খাদ্য। মটরজাতীয় গাছমাত্রে মাংস ও রক্ত-বৃদ্ধিকর বস্তু অধিক পরিমাণে থাকে। কাঁচা জই ও ভুট্টাগাছও গবাদির সুন্দর খাদ্য।

গিনিঘাস নামক একপ্রকার ঘাস আছে উহার চাষ করিলে বারমাস অনায়াসে গরুর খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে। গিনি-ঘাসের চাষ-প্রণালী অন্য সময় লেখা যাইবে।

সাইলো—

গো মহিষাদির খদ্যোপযোগী কাঁচা ঘাস বা অন্যান্য কাঁচা গাছ পুঁতিয়া রাখিলে উহা শীঘ্র নষ্ট হয় না, এবং আবশ্যক মতে তুলিয়া উহা গরু বছুরকে খাওয়াইতে পারা যায়। যে স্থানে বা গৃহে এরূপভাবে গবাদির খাদ্য রক্ষিত হয় তাহাকে "সাইলো" বলে, ও ঐরূপ রক্ষিত খাদ্যকে "সাইলেজ" বলে। সাইলো—পশু খাদ্যের গোলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। পৃথিবীর অনেক দেশে সাইলোর ব্যবহার আছে। দেখা যায় অনেক স্থলে বৎসরের একভাগে গো মহিষাদির বিস্তর খাদ্য পাওয়া যায়, অথচ অন্য সময় এত দুষ্প্রাপ্য হয় যে, গো মহিষাদি ঘাস অভাবে শীর্ণ হইয়া পড়ে। যখন বেশী খাদ্য পাওয়া যায় তখন শুকাইয়া রাখিলে বা সাইলোতে পুতিয়া রাখিলে, পরে উহা বিশেষ কাজে লাগিতে পারে। যে সকল ঘাস বা গাছের ডাঁটা মোটা, সেগুলি শুকাইলে গরু বাছুরে ভাল করিয়া খায় না, এবং বর্ষাকালে উৎপন্ন হইলে উহা শুকাইতেও পারা যায় না। কিন্তু সাইলোতে রাখিলে উহার রস বজায় থাকে ও উহা শুকাইবারও কোন প্রয়োজন হয় না।

খাসিয়া পাহাড়ে শীতকালে ঘাস সমস্তই মরিয়া যায়, তখন গরুর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। উপর-শিলং কৃষিক্ষেত্রে জঙ্গলী ঘাস ও ভুট্টার গাছ দিয়া সাইলোর পরীক্ষা কয়েক বৎসর ধরিয়া করা হইয়াছে। বর্ষাকালে (ভাদ্রমাসে) সাইলোতে উপরোক্ত গবাদির খাদ্য সকল রাখা হয়, আর মাঘফাল্গুন মাসে যখন দুষ্প্রাপ্য হয়, তখন সাইলো খুলিয়া উহার ভিতর হইতে সঞ্চিত খাদ্য বাহির করিয়া কৃষিক্ষেত্রের গরুবাছুরকে খাওয়ান হয়। এই কৃষিক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত দেখিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামের ২।৪ জন খাসিয়া কৃষক সাইলো নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছে। তাহারা প্রতিবৎসর এই প্রণালী অনুসারে ক্ষেত্রজাত ভুট্টার গাছ ও জঙ্গল হইতে ঘাস সংগ্রহ করিয়া সাইলোতে পুঁতিয়া রাখে ও ৩।৪ মাস পরে উহা উঠাইয়া ব্যবহার করে।

এইরূপ, যে যে স্থানে বৎসরের একভাগে গবাদির প্রচুর খাদ্য জন্মে, অথচ অন্য সময় দুষ্প্রাপ্য হয়, সেরূপ স্থানে সাইলো প্রস্তুত করিয়া উহাতে গবাদির আহার সঞ্চিত করিয়া রাখিলে বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে।

সাইলো নানা প্রকার আছে; তাহাদের মধ্যে যে দুই রকম সাইলো সাধারণ লোকে প্রস্তুত করিতে পারে, তাহাদের কথা বলিতেছি। এক প্রকার সাইলো, শুধু মাটীতে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান অথবা গোলাকার একটী গর্ত্ত বই আর কিছুই নহে। গর্ত্তটী যত বড় ও যত গভীর হয় ততই ভাল। গর্ত্তটী উচ্চভূমিতে হওয়া চাই; দেখিবে যেন উহার তলা হইতে জল বহির না হয়, অথবা চতুষ্পার্শ্ব হইতে জল বহিয়া উহার ভিতরে না পড়ে। জল লাগিলে ঘাস পচিয়া যইবে। দ্বিতীয় প্রকার সাইলো জমির উপর নির্ম্মিত হয়।

ইহা গোল বা চতুষ্কোণ হইতে পারে। ইহার দেওয়াল তক্তা অথবা মাটী বা ইট দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়; দেওয়াল এরূপ হওয়া চাই যেন উহার ভিতর দিয়া কোন মতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, কারণ বায়ুর সংস্পর্শে কাঁচা ঘাস পচিয়া যায়।

সাইলোর উপর চাল দিয়া ঢাকিয়া রাখা উচিত, নতুবা বৃষ্টির জল ভিতরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ঘাস নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

ঘাসের ভিতর হইতে যতদূর পারা যায় বায়ু বাহির করিয়া দিয়া, যাহাতে পুনরায় বাহিরের বায়ু উহার সংস্পর্শে না আসিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে, ঘাস স্তরে স্তরে রাখিয়া পা দিয়া সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ ধার ও কোণাগুলিতে, ভাল করিয়া চাপিয়া দিবে; ঘাস ভরা হইয়া গেলে, উহার উপর এক ফুট বা বেশী মাটী চাপাইয়া রাখিবে।

সাইলোতে রক্ষিত ঘাস মাত্রেই অল্পবিস্তর পচিয়া যায়, কারণ হাজার চেষ্টা করিলেও কিছু না কিছু বায়ু উহার ভিতর থাকিয়া যায়। সাধারণতঃ সাইলোর উপরিভাগ ও পার্শ্বের ও কখন কখন তলায় কিছু কিছু ঘাস নষ্ট হয়। ভাল সাইলো হইলে ৩ ইঞ্চির বেশী ঘাস পচে না। বড় সাইলো হইতে ছোট সাইলোতে অনুপাত সম্বন্ধে অধিক পরিমাণ ঘাস পচিবার কথা, সেইজন্য সাইলো যত বড় হয় ততই ভাল। সাইলো ১০ ফুট × ১০ ফুট × ৮ফুট হইতে ছোট হইলে ভাল হয় না। মাটীর নীচের সাইলো ৮ ফুটের বেশী গভীর করা সাধারণতঃ সম্ভবপর হয় না, কারণ, আমাদের দেশের মাটী এত ভিজা যে কয়েক ফুটের মধ্যেই জল বাহির হইয়া পড়ে। মাটীর উপরে নির্ম্মিত সাইলো যত ইচ্ছা গভীর করা যাইতে পারে। উপরিভাগ, পার্শ্ব ও তলার ঘাস অল্প বিস্তর নষ্ট হয়; সেইজন্য ভাল ঘাস ভিতরে রাখিয়া উপরে, পাশে ও তলায় নিকৃষ্ট জঙ্গলী ঘাস বা অন্য পাতা তলার একটী স্তর রাখিলে ভাল হয়।

ঘাস, ভুট্টাগাছ, জোয়ার, জই ইত্যাদি নানারকম গবাদির আহার্য্য সাইলোতে রাখা যাইতে পারে। ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি মোটা ডাঁটা বিশিষ্ট দ্রব্য ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রাখা উচিত; না কাটিয়া রাখিলে উহারা সাইলোর ভিতর সুন্দররূপে চাপিয়া বসে না।

ফুল হইবার পর অথচ বীজ নরম রহিয়াছে, পাকে নাই, এই অবস্থায় ঘাস, ভুট্টা, জোয়ার ইত্যাদি কাটিলে উহা গবাদির আহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়। এই সময় উহাতে পুষ্টিকর সামগ্র বেশী পরিমাণ থাকে। ভুট্টা গাছ হইতে কাঁচা ভুট্টা উঠাইয়া লইয়া, পরে উহা সাইলোতে রাখা যাইতে পারে, কিন্তু যেখানে কাঁচা ভুট্টা উঠাইবার দরকার নাই, সেখানে বাধ্য হইয়া ভুট্টা না পাকা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। আধ্-পাকা ভুট্টার ফল ও গাছ একত্রে কাটিয়া সাইলোতে রাখিলে, অতি উৎকৃষ্ট সাইলেজ প্রস্তুত হয়।

২।৩ দিন অন্তর অল্পে অল্পে ৩।৪ বার সাইলো ভরিতে পারিলে ভাল হয়। প্রত্যেকবার ভরিবার পর, পা দিয়া ঘাস চাপিয়া দিয়া, উহার উপর কয়েকখানি ভারি কাঠ রাখিয়া

দিবে। ২।৩ দিনের মধ্যে ঘাস এত গরম হইয়া উঠিবে যে উহার ভিতর হাত রাখিতে পারা যাইবে না। তখন কাঠগুলি উঠাইয়া লইয়া, পুনরায় আর এক স্তর ঘাস রাখিয়া, পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত চাপা দিবে। এইরূপ ভাবে ৩।৪ স্তর রাখা শেষ হইয়া গেলে, আরও ২।৩ দিন অপেক্ষা করিয়া, পরে উহার উপর মাটী চাপা দিবে। এইরূপ ভাবে ঘাস রাখিলে, উহা ভাল করিয়া জাঁতিয়া বসিবে ও বায়ু অতি কম পরিমাণেই উহার ভিতর থাকিতে পারিবে। বেশী বায়ু থাকিয়া গেলে অথবা যদি পরে বাহির হইতে বায়ু ঘাসের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে, তাহাহইলে ঘাস অতিরিক্ত মাতিয়া (fermented) উঠে ও সাইলেজ টক্ হইয়া পড়ে। আর যদি ঘাস একবার খুব গরম হইয়া উঠে ও পরে উহা হইতে বায়ু যতদূর সম্ভব দূর করিয়া দেওয়া যায়, তাহাহইলে সাইলেজ মাতিতে পারে না, সুতরাং মিষ্ট হয়।

সাইলেজে, বিশেষতঃ টক্ সাইলেজে, এরূপ একটী গন্ধ হয় যে উহা অনভ্যস্ত গরুবাছুরে প্রথমতঃ খাইতে চায় না। অল্পক্ষণ বাতাসে রাখিয়া দিলে গন্ধ অনেক পরিমাণে চলিয়া যায়। গবাদিকে প্রথম সাইলেজ দিবার সময়, উহার উপর একটু লবণ ছড়াইয়া দিলে, উহারা সহজেই উহা খাইতে আরম্ভ করে। সাইলো হইতে ঘাস বাহির করিবার সময় স্তরে স্তরে বাহির করিবে। প্রত্যহ নূতন নূতন স্তর বাহির হওয়া চাই; দুই একদিন বায়ুর সংস্পর্শে থাকিলে উহাতে ছাতা পড়ে।

এক বিঘা জমি হইতে ১০০ মণ ভুট্টার গাছ ও ভুট্টা পাওয়া যাইতে পারে। ১০০ মণ গাছ ও ভুট্টা কাটিয়া সাইলোজাত করিলে ৭৫ মণ সাইলেজ পাওয়া যাইতে পারে। ঘরে বাঁধিয়া দুগ্ধবতী গাভীকে খাওয়াইতে হইলে ২০ হইতে ৩০ সের ঘাসের দরকার। প্রত্যহ ২৫ সের হিসাবে ৭৫ মণ সাইলেজ দিয়া একটী গাভীকে ১২০ দিন বা ৪ মাস খাওয়ান যাইতে পারে। ভুট্টা সমেত গাছ খাওয়াইলে গাভীকে পৃথক্ অন্য কোন দানা (কলাই ইত্যাদি) দিবার দরকার হয় না, কিছু খৈল দিলেই চলে।

এক ঘন-ফুট সাইলেজ ওজনে প্রায় ২০ সের। এই হারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের ও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গবাদির জন্য কত বড় সাইলো প্রস্তুত করা দরকার, তাহা হিসাব করিয়া ঠিক করা যাইতে পারে।

বাঙলার তিল শস্য—(১৯১৪-১৫)

প্রথমে বৃষ্টির অভাবে তিল বোনার একটু অসুবিধা হইলেও পরে বৃষ্টি সুবিধামত হইয়াছিল। আবহাওয়ার অবস্থা তিলের আবাদের পক্ষে নিতান্ত খারাপ ছিল না।

বর্ত্তমান বর্ষে তিলের আবাদী জমির পরিমাণ ৬২,০০০ একর। বিগত বর্ষে ৫৫,৮০০ একরে তিল চাষ হইয়াছিল। ময়মনসিং ও চট্টোগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে তিল চাষ বাড়িতেছে। অনুমান ৸৵০ আনা রকম ফসল জন্মিয়াছে। একর প্রতি ৪।০ সোয়া চারি মণ

ফসল ধরিয়া লইলে বর্ত্তমান বর্ষে ৭,৮০০ টন তিল উৎপন্ন হইয়াছে বলিতে হইবে। বিগত বর্ষ অপেক্ষা ৮০০ টন অধিক তিল জন্মিয়াছে।

বিহার ও উড়িষ্যার তিল—(১৯১৫)

এই বিভাগের সর্ব্বত্র নাবী তিলের আবাদ হয়, কেবল পুরীতে হয় না। সম্বলপুরে তিলের আবাদ কিছু অধিক। ছোটনাগপুর, চাম্পারণ, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা ও আঙ্গুলে এই প্রদেশের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা তিল চাষ অধিক হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বর্ষে ২০৩,৫০০ একর পরিমাণ জমিতে তিলের আবাদ হইয়াছে বলিয়া অনুমান। বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ২১৭,৪০০ একর। একর প্রতি উৎপন্ন তিলের পরিমাণ একের চারি মণ ধরিয়া লইলে সমগ্র বিভাগে ২৫,৪০০ মণ তিল উৎপন্ন হইয়াছে। বিগত বর্ষে উক্ত বিভাগে ২৯,৫০০ মণ তিল জন্মিয়াছিল।

বঙ্গে ভাদুই শস্য—(১৯১৪-১৫)

বর্ত্তমান বর্ষে ভাদুই শস্য আবাদের পক্ষে আবহাওয়া তাদৃশ সুবিধাজনক ছিল না। পোকার উপদ্রবেও কিছু হানি হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষের ভাদুই শস্যের আবাদী জমির পরিমাণ ৬,০৭৫,৭০০ একর, বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ৬,১০২,৯০০ একর ছিল। এই ভাদুই চাষের জমির মধ্যে বর্ত্তমান বর্ষে আশুধান্যের জমি—৪,৯৯০,২০০—বিগত বর্ষে ৪,৯৯১,১০০ একরে আশুধান্যের আবাদ হইয়াছিল।

বিগত বর্ষ অপেক্ষা ফলে কিছু ভাল হইলেও মোটের উপর গড়ে ৸৵০ তের আনা রকম ফসলের অধিক হয় নাই। একর প্রতি ১০ মণ ঝাড়াবাছা শস্য উৎপন্ন হইয়াছে ধরিয়া লইলে সমগ্র বিভাগে ২৮,৯৬৩,৫০০ হন্দর ফসল জন্মিয়াছে। বিগত বর্ষের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ২৭,৫০৭,৫০০ হন্দর।

বঙ্গে তুলার আবাদ—১৯১৪-১৫—চতুর্থবিবরণী—

জলদি তুলার আবাদ কিছু বেশী পরিমাণে হইয়াছে, বর্ত্তমান বর্ষে জলদি তুলার জমির পরিমাণ ৮৯,৪৬০ একর। বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ৮৪,৮৭৩ একর ছিল। নাবী তুলার জমির পরিমাণ ২,১০০ একর, বিগত বর্ষে ১,৯০০ একর ছিল।

উৎপন্ন জলদি তুলার পরিমাণ ৩৩,৮২১ গাঁইট হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। বিগত বর্ষে ২৩,০০০ গাঁইট মাত্র জলদি তুলা পাওয়া গিয়াছিল। নাবী তুলার পরিমাণ ১,১৭৩ গাঁইট, বিগত বর্ষে ১,১৫৮ গাঁইট তুলা পাওয়া গিয়াছিল।

চৈত্র, ১৩২১ সাল।

বর্ত্তমান মহাসমর ও ভারতীয় বাণিজ্য

অর্দ্ধ বৎসরের অধিক ইউরোপ খণ্ডে যে মহা কুরুক্ষেত্র সংঘটিত হইতেছে তাহার ফলে সমস্ত পৃথিবী টলমল করিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সসাগরা বসুন্ধরার কয়েকটি প্রধান শক্তির তুমুল সংঘর্ষে জল, স্থল ও ব্যোমে সর্ব্বস্থানেই সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে এবং মুখ্য অথবা গৌণভাবে, অল্পাধিক মাত্রায় এই মহাযুদ্ধের তরঙ্গ পৃথিবীর সকল জাতির হৃদয় আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে। যেসময় ধরাতলবাসী বিভিন্নজাতি অথবা জাতি-সম্প্রদায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং স্ব স্ব প্রধান ছিল, যখন লৌহবর্ত্ম, সতার অথবা অতার বৈদ্যুতিক বার্ত্তা, বিরাট অর্ণবপোত ও ব্যোমযান প্রভৃতির সৃষ্টি হয় নাই, তখন যুদ্ধের ফলা-ফল অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই বিংশ-শতাব্দীতে আর সে দিন নাই। জ্ঞান-রাজ্যের বিস্তারের সহিত দূরত্ব কমিয়া গিয়াছে, সীমা অন্তর্হিত হইয়ছে এবং কল্পনাতীত বিষয়সমূহ কঠিন বাস্তব আকারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনুষ্যের এইরূপ বিশাল সভ্যতার ফলে বাণিজ্য ব্যাপার অতিশয় জটিল হইয়া পড়িয়াছে, এক দেশের স্বভাবজাত দ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়া অন্যদেশে রাশি রাশি অর্থব্যয়ে কলকারখানা প্রস্তত হইতেছে এবং সেই কারখানা শত পণ্যের মুখাপেক্ষী হইয়া লক্ষ লক্ষ লোক বসিয়া রহিয়াছে। বর্ত্ত-মান যুদ্ধে এই জগত-বাণিজ্যের বিপুল দেহে যে প্রতিঘাত লাগিয়াছে তাহার ফলে ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রায় শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং যুদ্ধ অবসানের যে আবার কতদিন পরে জগত-বাণিজ্য পূর্ব্ববৎ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিতে পারে তাহা সঠিক বলিতে পারা যায় না।

অপরাপর দেশের ন্যায় ভারতও অর্থাগমের জন্য পরমুখাপেক্ষী। প্রতি বৎসর ১৮৩ কোটি টাকা মূল্যের অধিক পণ্য এতদ্দেশে আমদানি হয় এবং ২৪৯ কোটি টাকার মূল্যের

অধিক দ্রব্য রপ্তানি হয়। এই মোট ৪৩২ কোটি টাকার উপর মূল্যের পণ্য সমূহের বিনিময় হয় বলিয়াই কোটি কোটি ভারতবাসী আহারের সংস্থান, গৃহ রক্ষা অথবা রাজকর প্রদান করিতে পারে। অপরপক্ষে এইরূপ বিনিময় বন্ধ হইয়া গেলে, যে বিষম ফল উৎপাদিত হয়, তাহা এখন গ্রামের সামান্য চাষী হইতে প্রাসাদবাসী সওদাগর পর্য্যন্ত সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন এবং এ সময় আরও অধিক মাত্রায় বুঝিতে পারিবেন।

আমাদের দেশ হইতে প্রধানতঃ ক্ষেত্রজ কিম্বা খনিজ পণ্য রপ্তানি হইয়া থাকে এবং প্রস্তুতীকৃত পণ্য আমদানি হয়। অপরাপর দেশের বিষয় ছাড়িয়া দিয়া এক্ষণে আমাদের শত্রুপক্ষ, জর্ম্মণি ও অষ্ট্রীয়া-হঙ্গারির বিষয় বিবেচনা করা যাউক। এই দুইটী দেশ হইতে যে সকল পণ্য ভারতে আইসে, তাহার মধ্যে অন্যতম ;—আলকাতরা, শতরঞ্চ, কাচের জিনিষ, লোহাপিত্তল ইত্যাদি কলকব্জা, তৈজস্‌পত্র প্রভৃতি, বীয়ার জাতীয় মদ্য, কল অথবা কলের অংশাদি, দেশলাই, তাম্র, কাগজ, রবারজাত দ্রব্য, শর্করা, নানাপ্রকারের রেশম, পশম ও তুলাজাত বস্ত্রাদি। পক্ষান্তরে এতদ্দেশ হইতে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি উক্ত দুইটি দেশে রপ্তানি হয় ;—কফি, নারিকেলের ছোবড়া, নীল, হরিতকী, নানাপ্রকার পশু-খাদ্য, চাউল, গোধূম, যব, ছোলা ও অন্যান্য দাউল, চামড়া, লাক্ষা, হাড়, নারিকেল তৈল, বিবিধ প্রকার খৈল, রেড়ীর তৈল, চিনার বাদাম, নারিকেলের শুষ্ক শাঁষ, তিসি, পোস্তবীজ, সরিষা, তিল, কয়েক প্রকার মশলা, চা, তুলা, শন, পাট, থলে, চট ও সেগুণকাষ্ঠ।

বঙ্গদেশের বিশেষভাবে বলিতে গেলে কয়েকটি পণ্যের বিশেষ উল্লেখ করিতে হয়। ১৯১৩—১৪ সালের বঙ্গদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বঙ্গদেশ হইতে ২০২ লক্ষ টাকার তুলা রপ্তানি হইয়াছে, ইহা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৮৫ লক্ষ টাকা অধিক। বেলজিয়ম ভিন্ন ইউরোপীয় অন্যান্য দেশে বঙ্গদেশীয় তুলার কাটতি কমিয়া যাইতেছে ; কিন্তু অন্যদিকে জাপান ও চীনে উহার বিক্রয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশের না হইলেও ভারতীয় তুলার কাটতি জর্ম্মণিতে কম নহে। কারণ উক্ত সালে ৪১০৮ লক্ষ টাকার রপ্তানি তুলার মধ্যে, জর্ম্মণি ও অষ্ট্রীয়া-হঙ্গারীতে যথাক্রমে ৫৯৮ লক্ষ ও ২৯৩ লক্ষ টাকার তুলা গিয়াছে। চামড়ার ব্যবসায় জর্ম্মণি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। বঙ্গদেশ হইতে বিগত বৎসর মোট সর্ব্ব প্রকার চামড়ার যে রপ্তানি হয় তাহার মধ্যে জর্ম্মণি অষ্ট্রীয়া-হঙ্গারী এবং ইংলণ্ড যথাক্রমে শতকরা ২৮·২৬৩ ·১৫ ভাগ লইয়াছেন। পাট বঙ্গদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য। যে পরিমাণ পাটজাত দ্রব্য ও পাট দেশান্তরে যায় তাহার মূল্য যথাক্রমে ২৮১৯ এবং ২৮০৩ লক্ষ টাকার কম হইবে না। গত বৎসর মূল্য যত বৃদ্ধি পাইয়াছিল সেরূপ বোধ হয় আর কখনও হয় নাই। কলিকাতা উন্নতি সাধন ট্রষ্ট, পাট হইতে ১৯১৩ সালে সোয়া এগার লক্ষ টাকা কর পাইয়াছেন। ভারত হইতে পাট ক্রয়ের হিসাবে জর্ম্মণি ও অষ্ট্রীয়া-হঙ্গারি যথাক্রমে তৃতীয় ও অষ্টম স্থান অধিকার করেন ও মূল্যের পরিমাণ যথাক্রমে ৬৭৪ লক্ষ ও ১৯৭

লক্ষ টাকা; চটের থলে ও থান যথাক্রমে ১৭ লক্ষ ও ১৩ লক্ষ বিগত বৎসর জর্ম্মণিতে গিয়াছিল। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে জর্ম্মণি এতদ্দেশের সাধারণ খরিদ্দার ছিলেন না।

বড় বড় জিনিষ ছাড়িয়া দিয়া সাধারণতঃ যে সকল জর্ম্মাণ ও অষ্ট্রীয়ান দ্রব্যের বাজারে প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে কাচের ও এনামেলের তৈজসপত্র, কলকব্জা, কাগজ, বস্ত্র ও সাজসজ্জাদি অন্যতম। অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যবান এই সমস্ত দ্রব্যের অনেকগুলি এতদ্দেশে প্রস্তুত হইতে পারে এবং কতকগুলি এখন প্রস্তুতও হইতেছে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের ব্যবসায় বিভাগ এই প্রকার দ্রব্যাদির কলিকাতায় যে একটি প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এখনও কয়েক শ্রেণীর দেশীয় পণ্য বিলাতী পণ্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সমকক্ষ না হইতে পারিলেও তাহাদের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ।

বিগত বৎসর এতদ্দেশে ১৯৪ লক্ষ টাকা অধিক মূল্যের কাচের দ্রব্য আমদানি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে চুড়ি, পুতি ও দানা, নকল মুক্তা, শিশি, বোতল, নল, গোলক ও দীপের অংশাদি, শার্শি প্রভৃতি অন্যতম। বেলওয়ারি দ্রব্যের আমদানিতে ইংলণ্ড, জর্ম্মাণ ও অষ্ট্রীয়া-হঙ্গারির অংশ যথাক্রমে ২৬, ২৮ ও ৮৭ লক্ষ টাকা। প্রতিবৎসর ৮০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের চুড়ি, এতদ্দেশে আইসে, সুতরাং কাচ পণ্যের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ধরিতে হইবে। চুড়ি ভিন্ন অপর যে সমুদায় জর্ম্মণ দ্রব্য বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে চিম্‌নি, গ্লাস্, ঔষধের শিশি, কাচের ছিপিওয়ালা বোতল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাচ প্রস্তুত এতদ্দেশে অনেক দিবস হইতে চলিয়া আসিতেছে কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্য সেরূপ সুন্দর হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেশী চুড়ি ও ফুঁকা শিশির বিষয় বলিতে পারা যায়। যুক্ত প্রদেশে আগ্রা জেলার অন্তর্গত ফিরোজা-বাদে যথেষ্ট পরিমাণে কাচের চুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এস্থলে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার হইতে ও স্থানীয় ব্যক্তি বর্গের দ্বারা অনেক চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু কাচের কারখানা এতদ্দেশে এখনও কৃতকার্য্য হয় নাই। বঙ্গদেশের কাঁচের কারখানা (Pioneer Glass Manufacturing Co. এবং Bengal Glass Compannу), মান্দ্রাজের কারখানা (Madras Glass Works), হায়দ্রাবাদের কাচ কার-খানা, রাজপুরের কারখানা (Himalayan Glass Works) প্রভৃতি সমস্তই প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়া গিয়াছে। পুরাতন কারখানা সমুদয়ের কেবল একমাত্র অম্বলার কারখানা (Upper India Glass Works) এখনও জাগিয়া আছে এবং বোম্বাইয়ে Western India Glass Works নামক একটি কারখানা স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। মিঃ ওয়াগ্‌লে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেশজাত কাচ প্রস্তুতের উপাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যে বিবরিণী প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, কাচ প্রস্তুতের

উপযুক্ত বালি ভারতে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। ক্ষার সম্বন্ধে কিছু অসুবিধা আপাততঃ আছে বটে কিন্তু বিলাতী বাইকার্ব্বনেট অব্ সোডাতে এখন কাজ চলিতে পারে। বস্তুতঃ যথেষ্ট মূলধন এবং সুদক্ষ কারিগর পাইলেই কাচের কারখানা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং চুড়ি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অল্প দক্ষতা সাপেক্ষ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে।

সর্ব্বশেষে জর্ম্মাণি ও অষ্ট্রীয়া দেশজাত বস্ত্রাদি বিশেষ বিবেচনা যোগ্য। এই শ্রেণীর পণ্যকে মোটামুটি ৫টি বিভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়—১। তুলাজাত, ২। পশমজাত, ৩। রেশমজাত, ৪। পাড়, লেস্, নেট, ফিতা প্রভৃতি এবং ৫। গেঞ্জি, মোজা, কম্ফর্টার প্রভৃতি পোষাক। তুলাজাত ৫১ লক্ষ, পশমজাত ৮৬ লক্ষ, রেশমজাত ২১ লক্ষ টাকার বস্ত্রাদি জর্ম্মাণি ও অষ্ট্রীয়া হইতে এতদ্দেশে আমদানি হয়। ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীতে যে সমুদায় দ্রব্য এতদ্দেশে আমদানি হয় তাহাতে জর্ম্মাণি ও অষ্ট্রীয়া-হঙ্গারির মোট অংশ যথাক্রমে ৩৬ লক্ষ ও ১৩ লক্ষ টাকা।

নানা প্রকার বস্ত্রাদি, সাজ ও পোষাক ব্যবসায়ে জর্ম্মাণি কিন্তু সকল প্রকার দ্রব্যে প্রতিযোগীতা করিতে আইসেন নাই। তাহার দৃষ্টি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর দ্রব্যের উপর। যথা তুলাজাত পণ্যের মধ্যে সস্তা কম্বল, গেঞ্জি ও মোজা। ইহাতে কিন্তু জাপান আজকাল বলবান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তুলাজাত সাল ও আলোয়ানের মধ্যে জর্ম্মাণ মলিদা শালের সহিত প্রতিযোগীতায় কেহ সমকক্ষ হইতে পারে না। পশমজাত দ্রব্য ভারতে যে কতক পরিমাণে উৎপাদিত হয় তাহা সকলেই জানেন। আপাততঃ ৫টি বড় বড় পশমের কল চলিতেছে। কিন্তু তাহা সত্বেও বহুল পরিমাণে পশমপণ্য দেশে আমদানি হয়। জর্ম্মণি হইতে যে সমস্ত দ্রব্য আসে তাহার মধ্যে শাল, কাটা কাপড় ও বুনিবার পশম অন্যতম। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা জর্ম্মণশালেরই কাটতি অধিক। আলোয়ানও আজকাল সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে রাজপুর অথবা অমৃতসহরের যে শাল আলোয়ান প্রস্তুত হইত তাহার মূল্য অধিক ছিল। জর্ম্মণির দ্রব্য আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। পক্ষান্তরে উক্ত দুই স্থানের কারিকরগণও জর্ম্মাণপশম আমদানি করিয়া তজ্জাত দ্রব্যাদির দ্বারা জর্ম্মাণপণ্যের সহিত প্রতিযোগীতার চেষ্টা করিয়াছে। রেশমজাত পণ্যে জর্ম্মণ, জাপান, চীন, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নিম্নস্থান অধিকার করিলেও ঐ জাতীয় এক শ্রেণীর পণ্যে তাহার প্রাধান্য যথেষ্ট—উহা মিশ্র রেশমজাত দ্রব্য। এই শ্রেণীর দ্রব্যের মধ্যে মখমল ও সাটিন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে সমুদয় জর্ম্মণ ও অষ্ট্রীয়ার পণ্যের সমালোচনা করিলাম, যুদ্ধের জন্য সে সমুদয়ের আমদানি একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য যাহার পুরাতন মাল অনেক আছে এবং সে সমুদায় নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জর্ম্মণি ও অষ্ট্রীয়া দেশজাত দ্রব্য এতদ্দেশ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইবে না। আজকাল জগতের সকল

প্রবীণ জাতিরই ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর জিবীকা নির্ব্বাহের জন্য নির্ভর করিয়া থাকেন। ভারতের মত এমন মহামূল্য বাজার পৃথিবীর আর অল্পস্থানেই আছে। সুতরাং এতদ্দেশে সকলেই স্ব স্ব পণ্য চালাইবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা নিজেদের বিপণি চালাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। কিন্তু প্রত্যেক ভারত-বাসীরও ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের ইহাই চরম সুযোগ আসিয়াছে। এ সময়ে আপাততঃ বিদেশ হইতে কোন কোন আমদানি দ্রব্য দেশীয় দ্রব্য দ্বারা স্থানান্তরিত হইতে পারে এবং কোন্‌গুলি দেশে প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতে পারে তাহার বিশেষভাবে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক এবং প্রত্যেক আশাপ্রদ ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান হওয়া প্রয়োজনীয়।

প্রথমেই কাগজের কথা আলোচনা করা যাউক। বনবিভাগের অভিজ্ঞগণের স্থানে স্থানে গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে ভারতে কাগজ উৎপাদক পদার্থের কোন অভাব নাই। হস্ত প্রস্তুত কাগজ ভারতে অনেক দিন হইতে আছে, কিন্তু কলের কাগজের নিকট তাহা সুলভ মূল্যের হিসাবে দাঁড়াইতে পারে না এবং তজ্জন্য ক্রমশঃ ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে। আপাততঃ দেশে পাঁচটি কাগজের কল আছে যথা—বঙ্গদেশে টিটাগড়, কাঁকনাড়া এবং রাণীগঞ্জ; যুক্তপ্রদেশে লক্ষ্ণৌ এবং বোম্বাই প্রদেশে পুনায় কাগজের কল। এতদ্ভিন্ন বোম্বাই ও সুরাটে দুইটি ছোট কল আছে; তাহাতে কেবল দেশী কাগজ প্রস্তুত হয়; এই সমস্ত কল উৎপাদিত কাগজ প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া থাকেন। বাজারে বিক্রয় করিতে হইলে ইহারা বিদেশীয় কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় কতদূর টিকিতে পারে তাহা বলা যায় না। যাহাহউক ১৯১২ সালে দেশীয় ও বিদেশীয় কাগজের মূল্য যথাক্রমে ৭৭ লক্ষ ও ১৩৫ লক্ষ টাকা ছিল; কিন্তু ১৯১৪ বিদেশীয় আমদানি কাগজের মূল্য ১৫৮ লক্ষ টাকা হইয়াছে; দেশজাত কাগজ এই অনুপাতে অতি সামান্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে,—বিদেশ হইতে নানাপ্রকার ব্যবহারের জন্য যে নানারূপ কাগজ আসে সে সবশ্রেণীর কাগজ দেশে প্রস্তুত হয় না। ফলতঃ কাগজকে ব্যবসায়ের হিসাবে ৫টি ভাগে বিভক্ত করা যায়—

১। প্যাকিং কাগজ; ২। ছাপাইবার কাগজ; ৩। লিখিবার কাগজ; ৪। সর্ব্ব প্রকারের কার্ডবোর্ড পিস্‌বোর্ড প্রভৃতি; ৫। অন্যান্য প্রকারের কাগজ এবং কাগজ হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি। এই কয়শ্রেণীর মধ্যে কম দামের জর্ম্মাণ ফুলিস্কেপ ও অষ্ট্রীয়ান চিঠির কাগজের কাটতি যথেষ্ট। কাগজ আমদানির পরিমাণ হিসাবে ইংলণ্ডের যুক্তরাজ্য, যথাক্রমে ক্রমশঃ জর্ম্মণি, অষ্ট্রীয়া, নরওয়ে, বেলজিয়ম, সুইডেন ও হল্যাণ্ড হইতে কম হিসাবে আসে। ইংলণ্ড ভিন্ন অপরাপর দেশ হইতে যে কাগজ আইসে তাহার অধিকাংশই ছাপাইবার কাগজ; এইগুলি প্রায় ১১ পাউণ্ড অথবা তন্নিম্ন শ্রেণীর কাগজ; জানিতে পাওয়া যায় যে জর্ম্মণি, অষ্ট্রীয়া ও নরওয়ে সুইডেন ভিন্ন আর কুত্রাপি এই শ্রেণীর কাগজ

সুলভতর মূল্যে প্রস্তুত হয় না। ভারতীয় কাগজ ব্যবসায় বিদেশীয় কাগজের সহিত সমকক্ষ না হইতে পারার কারণ এই যে বর্ত্তমান কলসমূহকে কাগজ প্রস্তুতের আদত পদার্থ অর্থাৎ কাঠের কাই (wood pulp) অধিকতর মূল্য দিয়া বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত গবেষণার বিবরণী সমূহ হইতে (The Manufacture of Paper and Paper Pulp in Burma by R. W. Sindall ; Vol. III, Pt. III, Indian forest Records 1912; Vol. IV, Pt. V. Indian Forest Records 1912 & Vol. V. Pt. III. Indian forest Records 1913) বুঝিতে পারা যায় যে, এতদ্দেশে বাঁশ হইতে এত অধিক পরিমাণে কাগজের উপাদান হইতে পারে যে তাহা দেশের সমস্ত অভাব মোচন করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিতে পারা যায় ; সাবুই ঘাস যে কাগজের অন্যতম উপাদান তাহা অনেকে জানেন, কিন্তু সাবুই ব্যতীত অপর অনেক ঘাস হইতে কাগজ তৈয়ারি হইতে পারে। বস্তুতঃ উপাদানের অভাব নহে এবং বর্ত্তমান সময় উপযুক্ত সুযোগও আসিয়াছে। এই সময়ে wood pulp প্রস্তুতের কল স্থাপনা করিলে যথেষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা।

কাগজের পরই জর্ম্মণ তৈজসপত্র ও যন্ত্রপাতি উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর পণ্যের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বাজারে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়—১। কৃষি-যন্ত্রাদি ; ২। গৃহ নির্ম্মাণের উপাদান চাবিতালা, কব্জা, বল্টু প্রভৃতি ; ৩। গার্হস্থ কঠিন পণ্য ; ৪। এনামেলের দ্রব্য ; ৫। নানা প্রকার যন্ত্রপাতি ; ৬। ধাতব দীপ ; ৭। কাচের দীপ ; ৮। কাচ ভিন্ন অপর উপাদানে প্রস্তুত দীপের অংশ সমূহ ; ৯। লোহার সিন্দুক ; ক্যাসবাক্স প্রভৃতি ; ১০। অপরাপর শ্রেণীর কঠিন পণ্য ; ১১। ছুরি কাঁচি প্রভৃতি। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া-হঙ্গারি, আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ, বেল্‌জিয়াম ও অন্যান্য দেশ হইতে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর যে পণ্য গত বৎসর আমদানি হইয়াছিল তাহার মোট মূল্য ৪২৬ লক্ষ টাকারও অধিক হইবে। ইহার মধ্যে জর্ম্মাণির অংশ ৮৪ লক্ষ এবং অষ্ট্রিয়ার অংশ ৩৩ লক্ষের অধিক অর্থাৎ মোট ১১৮ লক্ষ টাকা। সকলেই জানেন যে জার্ম্মাণে এনামেলবাসনে বাজার প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। বাটি, থাল, ডিস, ও গ্লাস ইহার মধ্যে অন্যতম। ব্রিটিস্ এনামেলের বাসন সুলভ মূল্যের হিসাবে ইহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না। জার্ম্মাণ বাসনের ন্যায় জার্ম্মাণের ছুরি, কাঁচি অন্যান্য দেশের ছুরি কাঁচির স্থান অধিকার করিয়াছে। সুখের বিষয় এই যে এতদ্দেশেও ছুরি কাঁচি ইত্যাদি প্রস্তুতের কারখানা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। কলিকাতা, বোম্বাই ও পুনায়ও কয়েকটি কারখানা আছেই ; এতদ্ভিন্ন পঞ্জাবে ওয়াজিরাবাদ, যুক্তপ্রদেশে মিরট ও বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান এই শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু বিলাতী পণ্যের সহিত প্রতিযোগীতা করিতে হইলে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং সুদক্ষ কারিকর নিয়োগ করা আবশ্যক। লণ্ঠনের বাজারে ডিজের আধিপত্য

জর্ম্মণ পণ্য কতক কমিয়া গেলেও উহাদের কাটতি এখনও কম নহে। চাবিতালা, কব্জা, লোহার সিন্দুক, ক্যাসবাক্স প্রভৃতিতে ভারতবর্ষ অনেক অগ্রসর হইয়াছে। বাজারে অবশ্য এখনও সুলভ জার্ম্মাণ দ্রব্যের অভাব নাই, তথাপি আরও দৃঢ়তর চেষ্টা করিলে দেশীয় প্রস্তুতকারকগণ সহজেই জার্ম্মাণ প্রতিযোগীতা পরাস্ত করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয়। ছাতির উপাদান কঠিন পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। ছাতির কাপড় প্রধানতঃ ইংলণ্ড ও ইটালী হইতে আমদানি হয়। সিক, কল প্রভৃতি ইংলণ্ড, জর্ম্মাণি বেল্‌জিয়াম ও জাপান হইতে আসে। এতদ্ভিন্ন প্রতিবৎসর জাপান এতদ্দেশে অনেক পরিমাণ বাঁশের ও কাঠের ছাতির হ্যাণ্ডেল প্রেরণ করিয়া থাকেন। এই ব্যবসায়ে জর্ম্মণির স্থান ইংলণ্ডের নিম্নেই। খুচরা দ্রব্যের মধ্যে জর্ম্মণি ও অষ্ট্রীয়া-হঙ্গারি হইতে প্রভূত পরিমাণে আয়নাওয়ালা টীনের বাক্স, আয়না, ছাকনি, চামচা, এলিউমিনিয়মের বাসন, ছুঁচ, তারের পেরেক গ্যালভোনাইজড্ লৌহের দ্রব্যাদি, লোহা ও তামার তার, কাঁটাওয়ালা তার, জর্ম্মণ সিলভারের দ্রব্যাদি ও চীনার বাসন আমদানি হয়। এই সমুদয় দ্রব্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিবার মত পণ্য এখনও দেশে প্রস্তুত হয় নাই।

দূরদেশে ফল প্যাক করিয়া পাঠাইবার বাক্স—

পঞ্জাবের সন্নিকটে কোয়েটা নামক স্থানে একটি ফলের বাগান সংস্থাপিত হইয়াছে। তথা হইতে মান্দ্রাজ, বোম্বাই, কলিকাতার বাজারে ফল চালান হয়। সাধারণতঃ যে সকল ঝুড়িতে ফল চালান হয় তাহাতে সমুদয় ফল ভাল অবস্থায় বাজারে আসিয়া পৌছে না। এই কারণে দূরদেশে ফল পাঠাইবার জন্য বাক্সের বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে। পিচাদি ফল যখন বাক্সে প্যাক করিয়া পাঠাইবার প্রথা প্রথম সুরু হয়, তখন ফলগুলি স্তরে স্তরে সাজান হইত এবং দুইটী স্তরের মাঝখানে একখানি পিচবোর্ড দেওয়া হইত। এখন বাক্সগুলির বিশেষ উন্নতি করা হইয়াছে। বাক্সটির মধ্যে পিচবোর্ডের খোপ করা থাকে, এক একটি খোপে এক একটি পিচ বা অন্য ফল থাকে। খোপগুলি এমন ভাবে গাঁথা যে ইচ্ছা করিলেই সে গুলি খুলিয়া ফেলা যায়।

নিম্ন চিত্র দেখিলে আধুনিক পিচের বাক্সের একটা ধারণা হইবে—
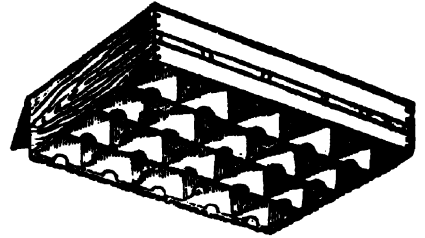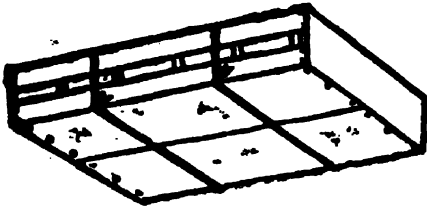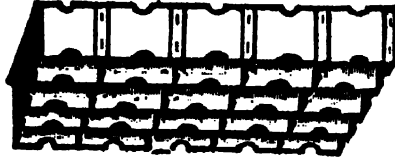
ফলের বাকস

বামদিকের চিত্রে কিরূপ ভাবে খোপগুলি বাক্সের মধ্যে সজ্জিত থাকে তাহা বুঝা যাইতেছে। দক্ষিণদিকের চিত্রে রেল গাড়িতে পাঠাইবার জন্য প্রস্তুত সম্পূর্ণ বাক্স দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। নিম্নে পিচবোর্ডের খোপগুলি আলাহিদা করিয়া দেখান হইয়াছে। এইরূপ প্যাক করিতে একটা সুবিধা এই যে ইহাতে ফলগুলি পরস্পর গায় গায় লাগিয়া দাগি হইতে পারে না। খোপ গুলি খোলা দেওয়ার সুবিধা থাকার একটা গুণ এই খোপ গুলি খুলিয়া সহজে বাণ্ডিল বাঁধিয়া খরিদ্দারকে দেওয়া যায় বা দূরে পাঠান যায়। বাক্সের সহিত খোপের চিপ গুলি দৃঢ় বদ্ধ করিয়া দিলে আর এই সুবিধাটুকু থাকে না। আধুনিক ফলের বাক্সের বায়ু চলাচলের পথ রাখা হয়। এই প্রকার নূতন ধরণের বাক্স বিগতবর্ষে ৫০০ শত বিক্রয় হইয়াছে। ফল ব্যবসায়ীরা ক্রমশঃ এই প্রকার বাক্সে ফল প্যাক করিবার মর্ম্ম বুঝিতেছে।

কোয়েটাতে বাক্স প্রস্তুতের আর একটু কৌশল আছে সেটুকু বুঝিয়া রাখা ভাল, বহিরাবরণ সম্পূর্ণ একখানি পিচবোর্ডের। পিচবোর্ডখানি এরূপভাবে খাঁজ কাটা যে মনে করিলেই সেই খানি বাঁকাইয়া মুড়িয়া বাক্সের আকারে পরিণত করা যায়। এই প্রকারে সুবিধা মত বাক্স পাইয়া ফল ব্যবসায়ীরা সানন্দে খরিদ করিতেছে। এমন সব বাক্স আছে যাহাতে ওজনে ৫ সেরের মত এক একটা পার্শেল করা যায়। পুষা হইতেও পিচাদি অন্যত্র পাঠাইবার জন্য এই প্রকার প্যাকিং বাক্স ব্যবহার হয়।

কোয়েটার বাক্সে ২০টা মঝারি, ১৫টা বড় পিচ ফল ধরে। অন্য ফল পাঠাইতে হইলেও এই বাক্স ব্যবহার করা চলে, মাঝখানকার খোপগুলি একটু ছোট বড় করিয়া লইতে হয় মাত্র।

এই প্রকারের বাক্সগুলিকে ইংরাজিতে ক্রেট (crate) বলে। যে ক্রেটে ৪থাক খোপ আছে তাহাতে আওরও প্যাক করা যায়। সাধারণ ক্রেট গুলিতে ২০টা পিচ,

নেক্‌টারিণ কিম্বা মাঝারি আপেল ১৫টা ধরিতে পারে। এই ক্রেট, ফল সমেত ৫সের মাত্র ওজনে হয়। ক্রেট প্যাক করিয়া ফলগুলি অনেক দূরে পাঠাইয়া ভাল অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

ক্রেটগুলির আরও উন্নতি বিধানের চেষ্টা হইতেছে। ভারতীয় পাতলা কাঠে ও বিদেশী পাতলা কাঠে ক্রেঠ তৈয়ারি করিয়া পরীক্ষা হইতেছে কোন্‌টি টেক্‌সই ও সস্তায় হয়। ভারতীয় রেলে চুরি খুব অবাধে চলে। ক্রেটে প্যাক করাতে চুরির প্রতিবিধান হইতে পারে। এ, হাউয়ার্ড, ইম্পিরিয়াল ব্যবহারিক উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ্‌।

কোন্‌ সারের ক্ষমতা কতকাল স্থায়ী—

খৈল প্রভৃতি নাইট্রোজান ঘটিত সার ও খড় কুটি কিম্বা পশু খাদ্যে ব্যবহৃত ঘাসের অজীর্ণ অংশ প্রভৃতি সারের ক্ষমতা কতদিন জমিতে থাকে তাহা লইয়া লণ্ডনে রদামষ্টেড্‌ ক্ষেত্রে একটা পরীক্ষা চলিতেছিল। ইহাতে স্থির হইয়াছে যে খৈল প্রভৃতি সারের গুণ সদ্য সদ্য ফসলে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম ফসলের পর সেইক্ষেত্রে দ্বিতীয় ফসলের সময়ও কথঞ্চিৎ থাকে, তার পর আর থাকে না। খড় কুটি, ঘাস পচিতে বিলম্ব হয় এবং ক্রমশঃ ফসলের উপকারে আসে। এই জন্য ইহাদের ক্ষমতা ৪ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে, তার পর আর থাকে না। নাইট্রোজেন ঘটিত সারের মধ্যে এমোনিয়া মিশ্রণগুলি ও সোরা নাইট্রোজেনের ক্ষমতা এক বৎসরেরই ব্যয়িত হইয়া যায়। পেরু গোয়ানো, সরিষার খৈল বা ঐরূপ যে কোন সার যাহাতে প্রটিন আছে এরূপ সারের ক্ষমতা প্রথম বৎসরে সম্পূর্ণ থাকে, ২য় বৎসরে যৎসামান্য থাকে। আবার নাইট্রোজান ঘটিত পশম, চুল, হাড় প্রভৃতি সারের গুণ ধীরে প্রকাশ পায় এবং ৪ বৎসর পর্য্যন্ত বেশ তেজ থাকে। ফস্‌ফরস ঘটিত সারের ক্ষমতা মাটিতে বহুদিন থাকে। এক বার প্রয়োগ করিলে যতদিন উহা সম্পূর্ণরূপে বৃক্ষ শরীরে নীত হয় ততকাল থাকে।

বাঙলাদেশের সীম—

এমেরিকায় সীমের বীজ লইয়া পরীক্ষা হইয়াছে। পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে ইহা অতি উত্তম পশুখাদ্য। বাঙলাদেশে যে কাল চেপ্টা বা অপেক্ষাকৃত গোল সীম হয় সেই সীমের কথাই বলা হইতেছে। অনুমান ইহার শাস্ত্রীয় নাম Stizolobium artorrimum, ইহার সহিত ঐ জাতীয় অন্য একপ্রকার বিষাক্ত সীমের সাদৃশ্য থাকায় ইহা মানুষে খাইতে বা পশুকে খাওয়াইতে ভয় করিত,—কারণ সন্দেহ হইত এই সীমের মত ইহা ব্যবহারেও ভেদ ও বমন হইতে পারে। পরীক্ষায় সে ভ্রম দূর হইয়াছে। ইহার কোন টক্‌সিক্‌ (বিষাক্ত) গুণ নাই কিম্বা ইহাতে বিষাক্ত চর্ব্বি বা ক্ষার বা গ্লুকোসাইডও নাই। বরং বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা ফরাস সীম, এমেরিকান

বা জাভা সীম অপেক্ষা গবাদির অধিক পুষ্টিকর খাদ্য। গবাদি পশুকে খাওয়াইয়া ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা হইয়াছে। লেখক বলেন যে ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খাঁটি খবর দিতে হইলে আরও অধিক পরীক্ষার আবশ্যক—সম্পাদক, এগ্রিকালচুরাল জর্ণাল অব ইণ্ডিয়া, পুষা।

সীমের দানা ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের দেশে লোকের কোন আতঙ্ক নাই। ইহা পশু খাদ্যে ও মানুষের খাদ্যে অবাধে ব্যবহার হইয়া থাকে। সীমের দানা চূর্ণ করিয়া গবাদিকে খাইতে দিলে তাহারা আগ্রহ করিয়া খায়। ইহাতে গবাদির দেহ বেশ পুষ্ট হয়। ইহার ছাতু মানুষে ও গবাদিতে খায়। খাইতে সুস্বাদু।

সীমের দাউল বাজারে বিক্রয় হয়। দোকানিরা ইহা জাপানি অড়হর বলিয়া বেচে। বস্তুতঃ ইহা জাপানি অড়হর নহে, জাপান হইতেও আসে না। ইহা বাঙলাদেশের সীম, বাঙলায়ই উৎপন্ন হয়। সম্পাদক "কৃষক"

পত্রাদি

কৃত্রিম কাষ্ঠ, পেষ্টবোর্ড বা পিচবোর্ড—

শ্রীপূর্ণানন্দ ঘোষ রায়, জমিদার, আঠপুর কাছারি, মুর্শীদাবাদ। কৃত্রিম কাষ্ঠ প্রস্তুতের যে খবর জানিতে চাহিয়াছেন, তাহার উত্তরে আপনাকে জানান যাইতেছে যে কৃত্রিম কাষ্ঠ প্রস্তুতের কারখানা ভারতবর্ষে স্থাপিত হয় নাই। কৃত্রিম কাষ্ঠ প্রস্তুতের জন্য যে কলকব্জা আবশ্যক তাহা আমরা অদ্যাপিও স্বচক্ষে দেখি নাই। এমেরিকান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল বোর্ডের রিপোর্টে আমরা কৃত্রিম কাষ্ঠ সম্বন্ধে খবরটা জানিতে পারিয়াছি মাত্র। এমেরিকার উক্ত শ্রমশিল্প সমিতির নিকট হইতে এই সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছি। খবর পাইলে আমরা কৃষকে লিখিয়া সকলকে জানাইব।

পিচবোর্ডে ঘরের ছাদ---

পিচবোর্ড দ্বারা ঘরের ছাদ নির্ম্মাণ হওয়া বিচিত্র নহে। তবে বাঙলা দেশে যে রূপ অত্যধিক বৃষ্টি তাহাতে বুঝা যায় যে ঐ ছাদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। পিচবোর্ডের উপর পুরু করিয়া রঙ লাগাইয়া রাখিতে পারিলে জলেও সহজে নষ্ট হয় না। প্রসিদ্ধ কাগজ ব্যবসায়ীগণের নিকট পিচবোর্ডের দর জানিতে পারা যাইবে। ৫ফিট×৩ফিট পরিমাণ বা তাহা অপেক্ষা অধিক লম্বা চওড়া পিচবোর্ড মিলে। পিচবোর্ডের দাম কম নহে। ছাদ নির্ম্মাণ উপযোগী লম্বা, চওড়া, পুরু পিচবোর্ড দ্বারা

ঘরের ছাদ প্রস্তুত করিতে হইলে এক বর্গ গজে ৩৲ টাকার কম খরচ পড়ে না। ১২৯১ সালে কলিকাতায় যে সার্ব্বদেশিক প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহার মিউজিয়াম ঘরের বারাণ্ডা নায় ছাদ সাজ সরঞ্জম সমস্তই পিচবোর্ড দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, এ কথা সত্য। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে কত খরচ হইয়াছিল তাহা আমাদের জানা নাই। মিউজিয়াম রিপোর্টে এ কথা জানিতে পারা যাইবে। রিপোর্ট পুস্তিকাখানি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে যাইলে বোধ হয় পাওয়া যায়। গৃহ নির্ম্মাণ উপযোগী পিচবোর্ড অপেক্ষা আরও অনেক স্থায়ী জিনিষ এ দেশে পাওয়া যায় সুতরাং এদেশে পিচবোর্ড দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ চেষ্টা বর্ত্তমান সময়ে নিষ্প্রয়োজন।

চিনি প্রস্তুত প্রণালী---

সুধীন্দ্রলাল দাস, কারেণ ব্যাঙ্ক, ৭নং মারচাণ্ট ষ্ট্রীট রেঙ্গুন। কৃষকে গুড় প্রস্তুত সম্বন্ধে বহুবার আলোচনা হইয়াছে। গুড়ের মাতভাগ চুয়াইয়া বাদ দিলে উপরে দানাদার সার থাকে। কোন ঝুড়িতে বস্ত্রখণ্ড বিছাইয়া তদুপরি দানাদারসার ভাগ ঢালিয়া দিয়া ঝাঁজী কিম্বা পাটা শ্যাওলা দ্বারা ঢাকিয়া দিয়া গুড় ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া চিনিতে পরিণত হয়। ইহাতে পরিশ্রম বেশী হয় এবং জিনিষ তাদৃশ ভাল হয় না। কল কৌশল প্রয়োগে কম খরচে ভাল চিনি প্রস্তুত হইতে পারে। আজকাল এইজন্য সেণ্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন (Centrifugal Machine) ও অন্যান্য অনেক কল বাহির হইয়াছে। সাজাহানপুরে ক্যারিউ কোম্পানির ভাঁটি খানার কল কব্জা দেখিয়া আসিলে আপনার এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ হইবে। মান্দ্রাজে পাঞ্জাব জিলার অস্কাকারখানায় উৎকৃষ্ট চিনি হয়। ইহার কল কব্জা নব বিজ্ঞানের অনুমোদিত। য়ুরোপে মরিসস্ ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিসে এই উপায়ে চিনি প্রস্তুত হয়। এই কারখানার ব্যয় সমধিক। অন্ততঃ ৫০০০ বিঘা জমিতে আখের চাষ না থাকিলে বা ৫০০০০ হাজার টাকা মূল ধন যোগাড় না হইলে ঐ রকমের ছোট খাট একটা কারখানা স্থাপন করা যায় না। আপনি কত মূল ধন যোগাড় করিয়াছেন জানিতে পারিলে আমরা সেই মত ব্যবস্থা দিব।

হিন্দু রসায়ন—

বিখ্যাত রাসায়নিক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সম্প্রতি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা রসায়ন শাস্ত্রের উপর কয়েকটি বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হন। তম্মধ্যে একটি বক্তৃতায় তিনি হিন্দু রসায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বহু পুরাকালে আধুনিক রাওলপিণ্ডি নামক উত্তর পঞ্জাবে সহরের সন্নিকটে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় লাহোরে ব্র্যাড্‌লাহলে প্রাচীন হিন্দু রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন

ও সভায় অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল; তিনি পঞ্জাবের প্রাচীন তক্ষশিলার বিদ্যালয়ের কথা সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে এইখানে কৌমারবচ অর্থাৎ ধাত্রীবিদ্যার এবং অন্যান্যশাস্ত্রে পারদর্শী জীবক, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনি, এবং প্রাচীন ভারতের ম্যাকেয়াভিলি চাণক্য সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে যে শুধু সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা হইত তাহা নহে, অনেক সময়ে বিদ্যার্থীগণ নানা বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন। বাৎসায়নের কামসূত্র নামক গ্রন্থে যে চৌষট্টি কলার নাম লিখিত আছে তাহাতে ধাতুবাদ, রসায়নশাস্ত্র, সুবর্ণরত্ন পরীক্ষা, রত্নমণিরঞ্জন করিবার প্রণালী ও খণিপরীক্ষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের বৃহৎ সংহিতায় অথবা বরাহ মিহিরে তখন লৌহ ও পারদ মিশ্রিত পদার্থটী একটী বলকারক ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং মহাভাষ্যকার পাতঞ্জলিকে লৌহনিষ্ক্রামণ পুস্তকের রচনা কর্ত্তা বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। তিনি ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্রের অভ্যুদয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে আরব ও ইউরোপীয়দিগের রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি পরশ পাথর ও সঞ্জীবনী সুধার অনুসন্ধান সহিত যোগ ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার বিপরীত। তিনি ডাঃ থিবোর মত উল্লেখ করিয়া বলেন যে বৈদিক আচার ও ধর্ম্মকার্য্য হইতে ভারতে জ্যামিতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে। যোগ শাস্ত্রের সহায়তা করে বলিয়া রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনা ভারতবর্ষে হইয়াছে। পরে রসায়নবিদ্যা তন্ত্রের সহিত মিলিত হয়। প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাগণ পারদভস্ম ও সংশোধিত অভ্রের গুণ শতমুখে বলিতেন। রসায়নবিদ্যা সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের নাম করিবার পর ডাক্তার রায় বলেন যে পরে পারদ সম্বন্ধে ভিন্ন এক খানা গ্রন্থের অভ্যুদয় ঘটিল। তিনি তৎপরে 'রস' শব্দের অর্থ ব্যাখা করিলেন। পূর্ব্বে রস অর্থে ধাতুজ-লবণ, খনিজ পদার্থ, ও পারদ বুঝাইত। কিন্তু ক্রমশঃই রসায়ন অর্থ শুধু পারদ ও অন্যান্য ধাতুতে প্রস্তুত বলকারক ঔষধকে বুঝাইতে লাগিল। লৌহনিষ্ক্রামণ বিদ্যার চূড়ান্ত পরিচয় কুতুবমিনার লৌহস্তম্ভ এবং এই সম্বন্ধে তিনি সার রবার্ট হ্যাফিল্ড মহোদয়ের অনুকূল মত বলিয়া উল্লেখ করিলেন। তিনি তৎপরে বলিলেন যে হিন্দুরাই সর্ব্বপ্রথমে দস্তা বাহির করেন এবং আরবেরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে ভেষজবিজ্ঞান ও অঙ্ক শাস্ত্রের সহিত ভারতের জ্ঞান ও বিদ্যা ইউরোপে লইয়া যান।

হাঁস মুরগী হইতে অধিক ডিম পাইবার উপায় কি ?—

এই কথা আমেরিকার একজন মোরগ পালকের মনে উদয় হইল। এই ব্যক্তির নাম মিঃ রিচার্ড নিউয়েল। তিনি দেখিলেন মুরগীগুলি শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে অধিক ডিম পাড়ে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে মুরগীগুলি গ্রীষ্মকালে অধিক-

ক্ষণ জাগিয়া থাকে এবং আহার অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ বেড়ায়। উহারা এই সময় অধিক মাত্রায় চাঞ্চল্য হেতু অধিক খাদ্য হজম করিতে পারে এবং অধিক মাত্রায় ডিম প্রসব করিতে পারে। তিনি রাতকে দিন করিবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। তিনি তাহার মোরগ শালার উঠানটি ছোট বড় বৈদ্যুতিক আলোতে সজ্জিত করিয়া লইলেন। রাত্র ৩টার সময় দুই একটা করিয়া ছোট আলো জ্বালা হইল। প্রথমে উষার আলোক মত আলো দেখা দিল, তার পর আলো বাড়িতে লাগিল। এখন প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই দিন দুপুরের মত আলো হইল। এখন দিনের মাঝখানে আর আলোর আবশ্যক নাই। আবার বেলা ৪টার সময় আলো জ্বালা হইল ; রাত্রি ৮॥পর্য্যন্ত ক্রমে আলো কমাইয়া অন্ধকার করিয়া দেওয়া হইল। মুরগীগুলি কৃত্রিম আলোতে দিনের আলো মনে করিয়া খুব সচঞ্চল হইয়া খাইয়া খেলাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

তাঁহার মোরগশালায় ১৫০ শত মোরগ ছিল। তিনি গড়ে শীতকালে প্রত্যহ ২৬টা মাত্র ডিম পাইতেন কিন্তু এই প্রথায় আলোর ব্যবস্থা হওয়ায় তিনি প্রত্যহ ৭৩টা ডিম পাইতে লাগিলেন। শীতকালে শীত নিদ্রার সময় মুরগীগুলির অধিকাংশ সময় আলস্যে কাটিয়া যাইত এবং তাহাদের খাদ্যাদি তাহাদের পালক ও দেহের পুষ্টিতে ব্যয়িত হইত কিন্তু এই প্রকার কৃত্রিম আলো পাইয়া তাহাদের অধিক ডিম দানের শক্তি জন্মিল। ইহার মোরগশালায় রাত দিন সমান সুতরাং ডিমের সংখ্যাও সারা বৎসরে কমবেশী নহে।

বাগানের মাসিক কার্য্য

বৈশাখ মাস

সব্জীবাগান।—মাখন সীম, বরবটী, লবিয়া প্রভৃতি বীজ এই সময় বপন করা উচিত। টেঁপারি কেহ কেহ ইতি পূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন, কিন্তু টেঁপারি বীজ বসাইবার এখন সময় হয় নাই। টেপারি বীজ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বসান চলে। শসা, বিলাতি কুমড়া, লাউ, স্কোয়াস বা বিলাতী কদু, পালা ঝিঙ্গা, পুঁই, ডেঙ্গো, নটে প্রভৃতি শাক বীজ এখনও বপন করা চলে। কিন্তু বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত বীজবপন কার্য্য শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভূট্টা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা বীজ বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বসাইতে পারা যায়। আশু বেগুনের চারা তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসে ২।১ দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে উহাদিগকে বীজ-ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া রোপণ করিতে হয়।

কৃষিক্ষেত্র।—বৈশাখ মাসের শেষভাগে আশুধান্য, ধনিচা, অরহর, পাট প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য এই সময় রিয়ানা ও গিনি ঘাস প্রভৃতি ঘাসবীজ বপন করিতে হইবে। কিন্তু বর্ষা বাহুল্য বৃষ্টি হইয়া জমিতে "যো" হইলে তবেই ঐ সমস্ত আবাদ চলিতে পারে। ভূট্টা, জোয়ার প্রভৃতি বীজ বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত, যদি উক্ত কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তবে বৈশাখের যে পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

কিঞ্চিৎ অধিক বারি পতন হইলেই চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমেই উহাদের বীজ বপন করা সম্ভব হয়, তাহাহইলে বৈশাখের শেষভাগে গাছগুলি তৈয়ারী হইয়া তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজ-ইক্ষু বা আখের টাঁক বসাইবার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ইক্ষুক্ষেত্রে বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হইবে। দুই শ্রেণী আখের মধ্যস্থল হইতে মাটি উঠাইয়া আখের গোড়ায় দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

ইক্ষুক্ষেতে ও শসাক্ষেতে জলের আবশ্যক হইলে সেচ দিতে হইবে। চুবড়ী আলু ও ওল এই সময় বা জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই বসাইতে পারিলে ভাল হয়। কলা, বাঁশ ও তুঁত গাছের গোড়ায় পাঁক মাটি এই সময় দিতে হয়।

ফুল বাগান।—বৈশাখ মাসে কৃষ্ণকলি, আমারান্থাস্, দোপাটী, গ্লোব আমারান্থাস্ সনফ্লাওয়ার, বা রাধাপদ্ম, লজ্জাবতী, মার্টিনিয়াডায়াণ্ড্রা, মেরিগোল্ড, সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, ধুতুরা প্রভৃতি দেশী মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হয়। বেল ও যুঁইফুলের ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে অপরিষ্যাপ্ত ফুল ফুটিবে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি গাছে আবশ্যক মত জল সেচন ও তাহাদের ফল রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কাজ নাই। আনারস গাছগুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে ও যত্ন পাইলে ফলগুলি বড় হয়।

আদা, হলুদ, আর্টিচোক যদি ইতিপূর্ব্বে বসাইয়া দেওয়া না হইয়া থাকে তবে সগুলি বসাইতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।